

# ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস

কাজী আতাহার মুবারকপুরী رحمۃ اللہ علیہ


ড. আহমাদ শালাবী





# ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস

মূল

কাজী আতাহার মুবারকপুরী   
ড. আহমাদ শালাবী

অনুবাদ ও পরিমার্জন

আবদুল্লাহ জোবায়ের (প্রথম অংশ)  
উমাইর লুৎফর রহমান (দ্বিতীয় অংশ)

## মন্দীপন

প্রকাশন লি মিত্তে ড

# সূচিপত্র

প্রথম অংশ

## প্রথম তিন যুগের শিক্ষাব্যবস্থা

অনুবাদকের কথা.....	১৬
নবিজির যুগে জ্ঞানচর্চা .....	১৮
হিজরতের আগে জ্ঞানচর্চা .....	১৮
⇒ মসজিদে আবু বকর রা.....	১৮
⇒ ফাতিমা বিনতুল খাতাব রা.-এর ঘর .....	১৯
⇒ আরকাম রা.-এর গৃহ .....	১৯
⇒ মক্কা এবং মদীনার মাঝে গামীমে জ্ঞানচর্চা .....	২০
হিজরতের পরে মদীনায় জ্ঞানচর্চা .....	২১
⇒ বনু যুরাইকের পাঠশালা.....	২২
⇒ মসজিদে কুবার পাঠশালা .....	২২
⇒ নাকিউল খাদিমার পাঠশালা .....	২৩
মসজিদে নববির কেন্দ্রীয় পাঠশালা.....	২৫
⇒ ক্লাসে বসার পদ্ধতি .....	২৬
⇒ আসহাবুস সুফফা .....	২৮
⇒ নবি ﷺ এর মজলিস যেমন হতো .....	৩১
⇒ নববি বিদ্যাপীঠে শিক্ষার্থীদের অবস্থা .....	৩৩
⇒ নবি ﷺ এর তালিম প্রদান পদ্ধতি.....	৩৯
ঘরোয়া পাঠশালা .....	৪৩



নৈশকালীন বিদ্যাপীঠ .....	৪৪
মুজাহিদদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা .....	৪৪
বিভিন্ন স্থানে জ্ঞানচর্চা .....	৪৫
<b>সাহাবায়ে কেরামের যুগে জ্ঞানচর্চা.....</b>	<b>৪৭</b>
মসজিদে জ্ঞানচর্চার মজলিস .....	৫০
মজলিসের সময়সূচি.....	৫১
মজলিসের পদ্ধতি .....	৫২
হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি .....	৫৩
তালিমের রীতিনীতি.....	৫৪
গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী কয়েকজন সাহাবি .....	৫৮
উবাই ইবনু কাব রা. ....	৫৯
উবাদা ইবনুস সামিত রা. ....	৬১
আবু হুরায়রা রা. ....	৬২
আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. ....	৬৮
আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. ....	৭১
উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রা. ....	৭৬
<b>তাবিয়ীদের যুগে জ্ঞানচর্চা .....</b>	<b>৭৯</b>
মদীনার ইলম এবং আলিমগণের শ্রেষ্ঠত্ব .....	৮১
মদীনার সাত ফকিহ .....	৮৩
শিক্ষার মজলিস .....	৮৪
সাল্লিদ ইবনুল মুসাইয়িব রাহ. ....	৮৫
উরওয়া ইবনু যুবাইর রাহ. ....	৮৬
কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ রাহ. ....	৮৭
সালিম ইবনু আবদিল্লাহ রাহ. ....	৮৮
ইবনু শিহাব যুহরি রাহ. ....	৮৮
রবীআতুর রায় রাহ. ....	৮৯
নাফে রাহ. ....	৯০
ইকরিমা রাহ. ....	৯০
ইবনু আবী যিব রাহ. ....	৯১
আবু হানীফা রাহ. ....	৯২
মদীনার দ্বীনি, ইলমি এবং সাহিত্য মজলিস .....	৯৪

⇒ মাজলিসুল কিলাদাহ .....	৯৫
⇒ ফকীহ সপ্তকের বৈঠক .....	৯৬
⇒ আসহাবুশ শূরা তথা উপদেষ্টা কমিটির মজলিস .....	৯৬
⇒ মাগায়ি সম্পর্কে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের মজলিস .....	৯৬
⇒ যাইনুল আবিদীন এবং উরওয়ার মজলিস .....	৯৭
⇒ ভাষা-সাহিত্যের মজলিস .....	৯৭
⇒ আকীক উপত্যকার মজলিস .....	৯৭
⇒ উরওয়ার কূপস্থ মজলিস .....	৯৮
⇒ বানুল মাওলার মজলিস .....	৯৯

## দ্বিতীয় অংশ

### ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তন

কৃতজ্ঞ যাদের কাছে .....	১০২
ড. আর্থার আর্বেরির ভূমিকা .....	১০৩
ভূমিকা .....	১০৫
আরবি অনুবাদের ভূমিকা .....	১১৬

### প্রথম অধ্যায় : শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ..... ১১৯

#### ১ম ভাগ: মাদরাসা শুরু হওয়ার আগে প্রচলিত পাঠশালা..... ১২১

১. পঠন ও লিখন শিক্ষায় ক্ষুদ্রে পাঠশালা .....	১২২
২. কুরআন ও মৌলিক জ্ঞান শিক্ষার পাঠশালা .....	১২৬
৩. রাজপ্রাসাদ-কেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা .....	১৩৫
৪. বই-বিক্রেতাদের দোকান .....	১৩৯
৫. জ্ঞানী লোকদের বাড়ি .....	১৪৩
৬. সাহিত্যের আসর .....	১৪৮
⇒ সাহিত্য আসরের কিছু নিয়মরীতি .....	১৪৯
⇒ খলিফাদের পদক্ষেপ .....	১৫২
⇒ হারুনুর রশিদের শাসনামল .....	১৫৭
⇒ বাদশাহ মামুনের শাসনকাল .....	১৫৯
⇒ বাদশাহ মামুনের পরবর্তী যুগ .....	১৬৩



⇒ জ্ঞানচর্চার বাদশাহি মজলিস .....	১৬৪
৭. মরুর পাঠশালা .....	১৭১
⇒ বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশ .....	১৭১
⇒ বিশুদ্ধ ভাষার আবাসস্থল .....	১৭৪
⇒ মরুর পানে শিক্ষার্থীরা .....	১৭৫
৮. মসজিদ .....	১৭৭
⇒ মসজিদ নির্মাণের সূত্রপাত .....	১৭৭
⇒ মসজিদের বিস্তৃতি .....	১৭৯
⇒ জামে আল-মানসুর .....	১৮১
⇒ দামিশকের জামে মসজিদ .....	১৮২
⇒ জামে আমর ইবনুল আস .....	১৮৪
<b>২য় ভাগ মাদরাসা ও বিদ্যালয় .....</b>	<b>১৮৮</b>
ইসলামি বিশ্বে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা .....	১৯২
⇒ নিজামুল মুলকের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাসমূহ .....	১৯৩
⇒ নুরুদ্দিন জেনগির প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাসমূহ .....	১৯৪
⇒ আইয়ুবী শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাসমূহ .....	১৯৫
দুটি গুরুত্বপূর্ণ টীকা .....	১৯৯
আল-মাদরাসাতুন নুরিয়াতুল কুবরা .....	২০০
⇒ মাদরাসা ভবনের নকশা .....	২০২
⇒ মাদরাসার শিক্ষকমণ্ডলী .....	২০৫
⇒ মাদরাসার যত ওয়াকফ প্রকল্প .....	২০৬
<b>দ্বিতীয় অধ্যায়: গ্রন্থাগার .....</b>	<b>২০৮</b>
গ্রন্থের সাহিত্য-বিষয়ক মূল্যায়ন .....	২১০
গ্রন্থাগারের সাহিত্য-বিষয়ক মূল্যায়ন .....	২১৪
গ্রন্থাগার-ভবন ও তার বিন্যাস .....	২১৭
মধ্যযুগে ইসলামি গ্রন্থাগারের বই-বিন্যাস .....	২১৯
গ্রন্থসূচি .....	২২০
গ্রন্থ ধার নেওয়া .....	২২২
গ্রন্থাগারের কর্মকর্তাগণ .....	২২৫
⇒ এক. পরিচালক (গ্রন্থাগারিক) .....	২২৫
⇒ দুই. অনুবাদকবৃন্দ .....	২২৯
⇒ তিন. অনুলিপিকারবৃন্দ .....	২৩১
⇒ চার. বাঁধাইকারীগণ .....	২৩৬

⇒ পাঁচ. পরিবেশকবৃন্দ.....	২৩৮
গ্রন্থাগারের আর্থিক স্থিতি .....	২৪০
গ্রন্থাগারের প্রকার .....	২৪২
১. পাবলিক লাইব্রেরি বা গণগ্রন্থাগার .....	২৪২
⇒ ক) বায়তুল হিকমা.....	২৪২
⇒ খ) নাজাফের হায়দারিয়া গ্রন্থাগার.....	২৪৩
⇒ গ) বসরার ইবনু সিওয়ার গ্রন্থাগার.....	২৪৭
⇒ ঘ) সাবুর গ্রন্থভাণ্ডার .....	২৪৮
⇒ ঙ) যাইদি মসজিদের ওয়াকফকৃত লাইব্রেরি .....	২৪৯
⇒ চ) কায়রোর দারুল হিকমা গ্রন্থাগার .....	২৫০
⇒ ছ) বিভিন্ন মাদরাসায় প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার.....	২৫১
২. ব্যক্তিগত ও সাধারণ স্তরের মাঝামাঝি .....	২৫৩
⇒ ক) নাসির লিদিনিল্লাহর প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার .....	২৫৫
⇒ খ) মুস্তাসিম বিল্লাহর গ্রন্থাগার.....	২৫৫
⇒ গ) ফাতিমি খলিফাদের গ্রন্থাগার .....	২৫৬
৩. ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার.....	২৫৭
⇒ ক) ফাতহ ইবনু খাকানের গ্রন্থাগার .....	২৬০
⇒ খ) হুনাইনের গ্রন্থাগার (২৬৪ হিজরি) .....	২৬০
⇒ গ) ইবনুল খাশশাবের গ্রন্থাগার (৫৬৭ হিজরি) .....	২৬১
⇒ ঘ) মুওয়াফফিকের গ্রন্থাগার (৫৮৭ হিজরি).....	২৬২
⇒ ঙ) জামালুদ্দিন কিফতির গ্রন্থাগার .....	২৬৩
⇒ চ) মুবাশশিরের গ্রন্থাগার.....	২৬৪
⇒ ছ) আফরাইমের গ্রন্থাগার (৫০০ হিজরি) .....	২৬৪
⇒ জ) ইমাদুদ্দিন আসফাহানির গ্রন্থাগার.....	২৬৫

## তৃতীয় অধ্যায়: শিক্ষক-সমাজ..... ২৬৭

শুরুর কথা.....	২৬৭
শিক্ষক ও প্রশাসনের মাঝে সম্পর্ক .....	২৬৭
শিক্ষকদের সামাজিক স্তর .....	২৭০
⇒ ১. মুআল্লিম বা মক্তবের শিক্ষক .....	২৭৬
⇒ ২. মুআদিব বা শাহজাদাদের শিক্ষক .....	২৭৮
⇒ ৩. মসজিদ ও মাদরাসার শিক্ষক .....	২৮৩
শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা.....	২৮৭
⇒ ১. ক্ষুদ্রে পাঠশালার শিক্ষকগণ.....	২৯৩



⇒ ২. শাহজাদাদের শিক্ষকগণ .....	৩০১
⇒ ৩. মাদরাসার শিক্ষকবৃন্দ .....	৩০৩
নিজামিয়া মাদরাসার শিক্ষকমণ্ডলী .....	৩০৮
⇒ দুটি টীকা.....	৩১১
সহকারী শিক্ষকবৃন্দ .....	৩১৪
শিক্ষকদের আচরণ ও দায়িত্ব .....	৩১৬
ইজায়ত বা শিক্ষকতার অনুমতি প্রদান .....	৩১৯
⇒ ইজায়তনামার সূত্রপাত.....	৩২২
⇒ ইজায়তের প্রকারভেদ .....	৩২৫
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শাস্তি ও দণ্ড .....	৩২৭
শিক্ষাবৃত্তি ও পুরস্কার .....	৩৩২
শিক্ষকদের পোশাক .....	৩৩৪
শিক্ষকদের সমিতি .....	৩৩৮

#### চতুর্থ অধ্যায়: শিক্ষার্থী সমাজ .....

জ্ঞান অর্জনের অনুপ্রেরণা .....	৩৪২
⇒ কুরআন থেকে কিছু আয়াত .....	৩৪৩
⇒ হাদিস থেকে কিছু বিবরণী .....	৩৪৪
⇒ মনীষীদের বাণী .....	৩৪৫
শিশুদের প্রতিপালন ও সুস্থ বিকাশ .....	৩৪৬
শিক্ষার অব্যাহত সুযোগ সৃষ্টি .....	৩৫০
প্রতিভা ও ঝোঁক অনুযায়ী নির্দেশনা প্রদান .....	৩৫৬
শিক্ষার বয়স .....	৩৫৮
পাঠশালা বা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী সংখ্যা .....	৩৬১
দেহ ও বোধশক্তি .....	৩৬৪
শিক্ষার্থীর আদবকেতা ও দায়িত্ব-কর্তব্য .....	৩৬৮
শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সম্পর্ক .....	৩৭১
ইলম অর্জনে শিক্ষার্থীদের পরিশ্রম ও সাধনা .....	৩৭২
ইলমের জন্য দূরদেশে সফর .....	৩৭৫
নারীদের শিক্ষাদীক্ষা .....	৩৮৫
⇒ তৎকালীন ইউরোপে নারীশিক্ষা .....	৩৮৫
⇒ মুসলিম বিশ্বের নারীসমাজ .....	৩৮৭
নারীদের দক্ষতার ক্ষেত্রসমূহ .....	৩৯২

⇒ দ্বীনি শিক্ষা .....	৩৯৩
⇒ সাহিত্য সাধনা .....	৩৯৫
⇒ চিকিৎসা-সেবা .....	৩৯৮
⇒ যুদ্ধে অংশগ্রহণ .....	৪০০
⇒ নারীদের আরও কিছু অবদান .....	৪০১



প্রথম অংশ

**প্রথম তিন যুগের  
শিক্ষাব্যবস্থা**

কাজী আতাহার মুবারকপুরী رحمۃ اللہ علیہ

## অনুবাদের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, অজস্র সালাম ও দরুদ মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর। তাঁর সকল সাহাবি ও সকল অনুসারীর ওপর।

বিশ্ববাসীর জন্য মহান আল্লাহর মনোনীত ও নির্বাচিত ধর্ম হলো ইসলাম। ইসলামের যাবতীয় বিধান পালনের মধ্যেই মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ। ইসলামের অনুশাসন থেকে মানুষ যত দূরে সরবে, তত তাদের মাঝে অকল্যাণ ছড়িয়ে পড়বে, তত তারা অধঃপতনের মুখে পড়বে। সুমহান এ ধর্মের সূচনাই হয়েছে 'ইকরা' (পড়ো) দিয়ে—'পড়ো সেই প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' মহান আল্লাহর সেই নির্দেশ রক্ষার্থে একেবারে গুরু থেকেই পাঠ ও জ্ঞানচর্চাকে মুসলমানগণ দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করেন। ওহির সূচনা থেকেই মহানবি ﷺ আপন সঙ্গীদের ঐশীবাণী শিক্ষা দিতেন। মহানবির সান্নিধ্যে থেকে সেই জ্ঞান লাভ করার পর সাহাবিগণ বাড়ি ফিরতেন। তাঁরাও সেই জ্ঞান ছড়িয়ে দিতেন পরিবার, প্রতিবেশী ও সমাজের মাঝে। এভাবেই ধীরে ধীরে ইসলামের প্রচার ও প্রসার হয়। মহানবির ইন্তেকালের পর অন্যায়-অবিচারে ধুকতে থাকা বিশ্বমানবতার মুক্তির লক্ষ্যে সাহাবিগণ সেই জ্ঞান ও আলো নিয়ে বেরিয়ে পড়েন পৃথিবীর নানা প্রান্তে। সাহাবি ও তাবিয়ীদের সেই ত্যাগ, বিসর্জন ও সীমাহীন পরিশ্রমের ফলেই আজ আমরা ইসলামের রত্ন লাভ করেছি।

সেই জ্ঞানচর্চা ও পাঠদানের ধারা ও পদ্ধতি কেমন ছিল, কীভাবে তা ইরশাদ লাভ করে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এসেছে, সেই ইতিহাসই উঠে এসেছে এ গ্রন্থে। একেবারে নববি যুগ থেকে নিয়ে সাহাবি, তাবিয়, তাবি-তাবিদি, জাহিদ, মুজতাহিদিন কত কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করে, আরাম ও বিলাসিতাকে পদদলিত করে এ জ্ঞান চর্চার ধারা অব্যাহত রেখেছেন—সেই ধারাটাই সংগৃহীত হয়েছে এ বইয়ে। গুরুত্ব দিকে মসজিদই ছিল মুসলমানদের



জ্ঞানচর্চা ও দীন প্রচারের মূলকেন্দ্র। এরপর ধীরে ধীরে ক্ষুদ্রে পাঠশালা (মক্তব), রাজপ্রাসাদ-কেন্দ্রিক পাঠশালা, বইবিতান, জ্ঞানীদের নিবাস, সাহিত্যের আসর, মরু পাঠশালা, গ্রন্থাগার... ইত্যাদিও জ্ঞান চর্চার স্থান হিসেবে পরিচিত হতে থাকে।

এরপর আইয়ুবি শাসনামলে বিখ্যাত উজির নিজামুল মুলকের একান্ত প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম সাম্রাজ্যে সুপারিকল্পিত মাদরাসা শিক্ষার ধারা শুরু হয়। কেন মসজিদ-কেন্দ্রিক শিক্ষা মাদরাসা-ভিত্তিক শিক্ষায় রূপান্তর হলো, তারও বিশদ আলোচনা বইতে উঠে এসেছে। এ সব ইসলামি মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় যাদের নাম ইতিহাসে সূর্ণাক্ষরে লেখা আছে, তারা হলেন নিজামুল মুলক, সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি, সুলতান নুরুদ্দীন জেনগি প্রমুখ। সেসব মাদরাসায় শিক্ষকদের গুণাবলি ও বিপুল মর্যাদার বিবরণ শুনে পাঠক অবশ্যই মুগ্ধ হবেন। তাছাড়া একজন প্রকৃত শিক্ষার্থীর চরিত্র কেমন হওয়া উচিত, কীসব গুণাবলির কারণে তারা জ্ঞানচর্চার শিখরে আরোহণ করেছিলেন, তাও এ বইতে স্থান পেয়েছে।

ড. আহমাদ শালাবীর লিখিত অংশটুকু অনুবাদের সুযোগ করে দেওয়ায় সন্দীপন প্রকাশনীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। দুআ করি, মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। পরকালে নাজাতের ওসিলা বানান।

উমাইর লুৎফর রহমান

২০/০৭/২০২৩



## নবিজির যুগে জ্ঞানচর্চা

### হিজরতের আগে জ্ঞানচর্চা


হিজরতের আগে মক্কায় এমন কোনো কেন্দ্রীয় স্থান ছিল না, যেখানে মুসলিমরা সুস্থিরভাবে পাঠদান চালিয়ে যেতে পারবে। রাতদিন চলত নানা ধরনের জুলুম-অত্যাচার। নানান অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যেতে হতো তাদের। ওই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যক্তিত্বই ছিল চলমান পাঠশালা। তবুও কোনো কোনো সাহাবি লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআনের তালিম নিতেন। তালিম দিতেন আল্লাহর রাসূল ﷺ, আবু বকর ؓ, খাব্বাব ؓ-সহ আরও কয়েকজন সাহাবি। তাই পরিস্থিতির নাজুকতা বিবেচনা করে যেসব স্থান এবং মজলিসে কুরআনের তালিম প্রদান করা হয়েছে, সেগুলোকেই বিদ্যাপীঠ বলা যায়।

### ✽ মসজিদে আবু বকর রা.







এই ধারাবাহিকতার নাম আসে আবু বকর ؓ এর মসজিদের। এটি ছিল একটি খোলা জায়গা। সেখানে আবু বকর ؓ নামাজ আদায় এবং কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তখন মুশরিকদের নারী এবং শিশুরা কুরআন শুনতে ভিড় জমাতো। এই অবস্থা মুশরিকরা মেনে নিতে পারেনি। তারা আবু বকর ؓ-কে উক্ত স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করে। কিন্তু ইবনুদ দাগিনা নামক এক মুশরিক তাঁকে নিরাপত্তা দেয়। আবু বকর ؓ কিছুদিন সে কথা মেনে চলেন। অবশেষে তিনি ঘরের আঙ্গিনায় একটি মসজিদ বানিয়ে নেন। এ সম্পর্কে সহীহ বুখারিতে এসেছে, আয়িশা ؓ বলেন, ‘... তারপর আবু বকর ؓ এর মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিল। নিজ ঘরের আঙ্গিনায় তিনি একটি মসজিদ তৈরি





করলেন। যাতে তিনি নামাজ আদায় ও কুরআন তিলাওয়াত করতেন।<sup>[১]</sup>


আবু বকর  এর মসজিদে কোনো শিক্ষক বা শিক্ষার্থী ছিল না বটে, তবে এটা ছিল কুরআন তিলাওয়াতের প্রথম কেন্দ্র। এখানেই কাফিরদের ছোট ছোট সন্তানেরা প্রথম কুরআন শুনতে পায়।




### ❖ ফাতিমা বিনতুল খাতাব রা.-এর ঘর

ফাতিমা বিনতুল খাতাব  ছিলেন উমর ইবনুল খাতাব  এর সহোদর বোন। স্বামী সাদ্দ ইবনু যায়িদ  সহ ইসলামের প্রাথমিক যুগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। স্বামী স্ত্রী দুজনেই নিজ ঘরে খাব্বাব  এর কাছে কুরআন শিখতেন। ইসলাম গ্রহণের আগে উমর  উন্মুক্ত তরবারি হাতে বেরিয়েছিলেন। তখন তিনি বোনের ঘরে এসে তাদের কুরআন পড়তে দেখেন। সীরাতু ইবনি হিশামে এসেছে, 'উমর তার বোন এবং ভগ্নিপতির কাছে গেলেন। তাদের কাছে ছিলেন খাব্বাব ইবনুল আরাতি। তাদের কাছে ছিল একটি সহীফা, যাতে সূরা ত্ব-হা লেখা ছিল। খাব্বাব  তাদের দুজনকে সেটা পড়াচ্ছিলেন।'<sup>[২]</sup>

অতএব ফাতিমা  এর ঘরকেও কুরআন শিক্ষার কেন্দ্র বলা যায়। যাতে অন্তত দুজন শিক্ষার্থী এবং একজন শিক্ষক ছিলেন। উমর  এর বক্তব্যে থাকা 'লোকেরা' শব্দ থেকে দুয়ের অধিক সংখ্যা বুঝে আসে।

### ❖ আরকাম রা.-এর গৃহ

আরকাম ইবনু আবিল আরকাম  ছিলেন প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। মক্কায় তাঁর ঘরটি ছিল সাফা পাহাড়ের ওপরে। ইসলামের ইতিহাসে এই জায়গাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি মক্কা নগরীর অন্যতম বরকতপূর্ণ স্থান। ইতিহাসের পাতায় এ জায়গাটিকে 'দারুল ইসলাম' এবং 'মুখতাবা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

নুবুওয়াতের পঞ্চম বছর দুর্বল মুসলমানরা ইথিওপিয়াতে হিজরত করেন। মক্কায় থেকে-যাওয়া মুসলমানরা সম্মুখীন হন কঠিন নির্যাতনের। অবশেষে নুবুওয়াতের ষষ্ঠ বছর সাহাবীদেরকে নিয়ে নবি  আরকাম  এর ঘরে আশ্রয় নেন। এখান থেকে দ্বীনি দাওয়াতের কাজ পরিচালিত হতো। এখানেই চলত দ্বীন ও কুরআনের তালিম। ইসলামের প্রাথমিক যুগে নবি  সেখানে অবস্থান

[১] বুখারি, ৪৭৬।

[২] সীরাতু ইবনি হিশাম, ১/২৯৫।



করে দাওয়াতি কাজ পরিচালনা করতেন। বড় একটি সংখ্যা সেখানে ইসলাম গ্রহণ করেছে।<sup>[১]</sup> পূর্বে এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারীদের এখানে দ্বীন ও কুরআনের তালিম দেওয়া হতো। ইমাম আবুল ওয়ালীদ যুরাকি রাহিমাহুল্লাহ আখবার মাক্কাহ-এ লিখেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবিগণ আরকাম ইবনু আবিল আরকামের ঘরে সমবেত হতেন। সেখানে তিনি কুরআন পড়তেন এবং তালিম দিতেন।'<sup>[২]</sup>

এই স্থানগুলো ছাড়াও মক্কার বিভিন্ন স্থানে সাহাবিগণ দু-দুজন বা চার-চারজন এক সাথে হয়ে কুরআনের পাঠচক্রে রত থাকতেন। বিশেষত উমর রাহিমাহুল্লাহ দারুল আরকামে এসে ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানদের হিম্মত বেড়ে যায়। তারপর থেকে তারা প্রকাশ্যে কুরআন শোনা এবং শোনানোর কাজ শুরু করেন। মক্কার গিরিপথে তিন বছর আবদ্ধ থাকার সময়ও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন পঠন এবং পাঠদানের কাজ জারি রেখেছিলেন। সেখানে আবু তালিবের পরিবারভুক্ত লোকেরা ছাড়া অন্যরাও যে ছিলেন, এটি তো প্রমাণিত। সুতরাং সেখানে তাদের পাঠচক্রের বিষয়টি সুস্পষ্ট।

একইভাবে হাবাশায় হিজরতকারী সাহাবিরাও তালিম প্রদান এবং গ্রহণে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁদের মাঝে ছিলেন মুসআব ইবনু উমাইর রাহিমাহুল্লাহ। মদীনায হিজরতের আগে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে মদীনাবাসীদের শিক্ষক বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। আরও ছিলেন জাফর ইবনু আবী তালিব রাহিমাহুল্লাহ। বাদশাহ নাজাশির দরবারে যিনি মুসলমানদের মুখপাত্র ছিলেন। বাদশাহর সামনে তিনি সূরা মারইয়াম তিলাওয়াত করলে তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল।

এই যুগে মুশরিকদের আড্ডা, বাজার, মৌসুমি মেলা এবং হজের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে গিয়েও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শোনাতে। দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। ফলে এ জায়গাগুলোও হয়ে ওঠে দ্বীন এবং কুরআনের শিক্ষাকেন্দ্র।

### ✽ মক্কা এবং মদীনার মাঝে গামীমে জ্ঞানচর্চা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যক্তিসত্তাই ছিল ইসলামি শিক্ষার এক চলন্ত বিদ্যাপীঠ। হিজরতের উদ্দেশ্যে চলতি পথেও তিনি তালিম জারি রেখেছিলেন। মক্কা এবং মদীনার মাঝামাঝি গামীম নামক স্থানেও সূরা মারইয়াম শিক্ষা দিয়েছেন।

ইবনু সাদ লিখেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় গামীম নামক স্থানে পৌঁছলে বুরাইদা ইবনুল হুসাইব আসলামি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর সাথে

[১] আল মুসতাদরাক আলমাস সইহইন, ৬১২৯।

[২] আখবার মাক্কাহ, ২/২১০।



দেখা করতে আসেন। নবি ﷺ তখন দুইনের দাওয়াত দিলে, বুরাইদা তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ইসলাম কবুল করেন। সেখানে ছিলেন প্রায় আশিটি পরিবার। তারপর নবি ﷺ সবাইকে নিয়ে ইশার নামাজ আদায় করেন। সে রাতে নবি ﷺ বুরাইদাকে সূরা মারইয়ামের প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াত শিখিয়ে দেন। বুরাইদা ﷺ বদর এবং উহুদ যুদ্ধের পর মদীনাতে উপস্থিত হয়ে উক্ত সূরার বাকি অংশ শিখে নেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সান্নিধ্যে থাকতে শুরু করেন।<sup>[১]</sup>

গামীম হলো মদীনার কাছে রাবিগ এবং জুহফার মাঝামাঝি কিংবা উসাইফান এবং মারকয যাহরানের মধ্যবর্তী একটি জায়গা। সেখানে আসলাম গোত্রের আশিটিরও বেশি পরিবার থাকত। সে হিসেবে জনসংখ্যার পরিমাণ হবে একশোরও বেশি। তাদের মাঝে বুরাইদা ﷺ এবং তাঁর সাথি ইসলাম গ্রহণ করেন আর সবাই মিলে নবি ﷺ এর ইমামতিতে ইশার নামাজ আদায় করেন। বিভিন্ন কিতাবে বুরাইদার কুরআন শিক্ষাগ্রহণের কথা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

## হিজরতের পরে মদীনাতে জ্ঞানচর্চা

মক্কায় সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল আর অসহায় লোকেরাই আগে ইসলাম কবুল করেছিলেন। ফলে তারা সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের জুলুমের শিকার হন। পক্ষান্তরে মদীনার মুসলিমদের অবস্থা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানকার নেতৃবৃন্দ, সম্ভ্রান্ত লোকেরা এবং গোত্রের নেতারা স্বেচ্ছায় আগ্রহী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের প্রসারে তারা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সহায়তার হাত। বিশেষত নানান জায়গায় কুরআনী তালিমের বন্দোবস্ত তারা করেছিলেন।

আকাবায় অনুষ্ঠিত প্রথম বাইয়াতের পর মদীনাতে কুরআনের চর্চা শুরু হয়। দলে দলে ইসলামের দীক্ষা নিতে শুরু করে মদীনার প্রধান দুটি গোত্র আওস এবং খাজরায়ের অভিজাত থেকে সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা। সাধারণ হিজরতের দুই বছর আগেই মদীনাতে মসজিদ তৈরি এবং কুরআনের তালিম শুরু হয়ে যায়। এ সম্পর্কে জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আসার দুই বছর আগে থেকেই আমরা মদীনাতে অবস্থান করেছি। আমরা তখন মসজিদ তৈরি এবং নামাজ কায়েম করতাম।'<sup>[২]</sup>

এই দু'বছরের মাঝে নির্মিত মসজিদে ইমামতির দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরাই তালিম প্রদান করতেন। সেসময় কেবল নামাজই ফরজ হয়েছিল

[১] তবাকাতু উদ্বনি সাদ: ৪/২৪২।

[২] বুসাহাবু ইব্বনি আবী শাইবাত, ৩৫২৫৮।



বিধায় কুরআনের পাশাপাশি নামাজের বিধান, মাসায়েল এবং নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া হতো। পাশাপাশি ছিল তিনটি স্বতন্ত্র বিদ্যাপীঠ, যেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে চলত শিক্ষাকার্যক্রম। সেগুলোতে নগরবাসী ছাড়াও দূরদূরান্তের মানুষজন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

### ✽ বনু যুরাইকের পাঠশালা

এটির অবস্থান ছিল শহরের কেন্দ্রস্থল বনু যুরাইকের মসজিদে। উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, মদীনায়ে বনু যুরাইকের মসজিদেই সর্বপ্রথম কুরআনের তালিম শুরু হয়। এখানে তালিম দানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন রাফে ইবনু মালিক যুরাকি রা। তিনি ছিলেন খাজরাজ গোত্রের শাখা বনু যুরাইকের লোক। প্রথম আকাবার দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল সা তাঁকে পূর্বের দশ বছরে নাযিল হওয়া কুরআন শিখিয়ে দিয়েছিলেন। যার মাঝে সূরা ইউসুফও ছিল। রাফে রা ছিলেন তাঁর গোত্রের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা। মদীনায়ে ফিরে তিনি গোত্রের মুসলিমদের কুরআন শিখতে উদ্বুদ্ধ করেন। শিক্ষাকার্যক্রম চালু করেন নিজের এলাকার একটি উঁচু স্থানে। পরবর্তীকালে সেই জায়গাতে নির্মিত হয় মসজিদে বনু যুরাইক। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত মসজিদুল গামামার কাছে দক্ষিণ দিকে ছিল এর অবস্থান। মদীনায়ে আগমনের পর রাফে রা এর শিক্ষাকার্যক্রম দেখে রাসূল সা অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। এই বিদ্যাপীঠে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ছিলেন বনু যুরাইকের মুসলমান।<sup>[১]</sup>

### ✽ মসজিদে কুবার পাঠশালা

এটির অবস্থান ছিল মদীনার দক্ষিণপ্রান্তে। পরবর্তীকালে এখানে মসজিদ নির্মিত হয়। এখানে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করতেন আবু হুযাইফা রা এর আজাদকৃত দাস সালিম রা। আকাবার বাইয়াতের পর অনেক দুর্বল এবং অসহায় মুসলমান হিজরত করে মদীনায়ে চলে আসেন। সালিম রা ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। এখানে ছিল সাদ ইবনু খাইসামাহ রা এর ঘর। যিনি ছিলেন আমর ইবনু আউফ গোত্রের সরদার। আকাবার বাইয়াতের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সেসময় তিনি অবিবাহিত থাকায় তাঁর ঘরটি ছিল খালি। ফলে মক্কা থেকে পরিবার ছেড়ে-আসা মুহাজিররা সেখানে অবস্থান করতেন। হিজরতের সময় রাসূল সা কুবাতে কুলসুম ইবনু হিদাম রা এর ঘরে উঠেছিলেন।

[১] আল ইসরাহ, ২/১৯০; ওয়াফাউল ওয়াফা: ২/৮৫; তবাকাতু ইবনি সাদ: ১ম খণ্ড: কুতুবুল মুজামম: ৪৫৯।



সাদ ইবনু খাইসামার ঘরও ছিল সেখান থেকে কাছেই। রাসূল ﷺ বিভিন্ন সময় সেখানে গিয়ে মুহাজিরদের সাথে কুশল বিনিময় এবং আলোচনা করতেন। এই স্থানে শিক্ষকতার দায়িত্বে থাকা সালিম রহিম এর কুরআন সম্পর্কে অনেক জ্ঞান ছিল। সাহাবিদের তিনি কুরআন শেখাতেন। আবার নামাজের ইমামতিও ছিল তাঁরই দায়িত্বে। রাসূল ﷺ এর মদীনায়া আগমন পর্যন্ত এখানকার শিক্ষাকার্যক্রম চলমান ছিল।<sup>[১]</sup>

### ❖ নাকিউল খাদিমার পাঠশালা

এর অবস্থান ছিল মদীনার প্রায় এক মাইল উত্তরে। আসআদ ইবনু যুরারাহ রহিম এর ঘরে। বনু সালামার মহল্লা পেরিয়ে নাকিউল খাদিমাত নামক স্থানে ছিল এই ঘরটির অবস্থান। আকাবায় বাইয়াত অনুষ্ঠিত হওয়ার পর আউস এবং খায়রাজের নেতৃস্থানীয় লোকেরা নবি ﷺ কাছে কুরআন এবং দ্বীন শিক্ষাদানের জন্য একজন শিক্ষক প্রেরণের আবেদন করেন। সে প্রেক্ষিতেই মুসআব ইবনু উমাইর রহিম-কে তিনি পাঠান। ইবনু ইসহাকের বর্ণনামতে আকাবায় অনুষ্ঠিত প্রথম বাইয়াতের পরপরই মুসআবকে আনসারদের সাথে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি লিখেন, ‘আনসার সাহাবিরা বাইয়াতের পরে যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, নবি ﷺ তখন মুসআবকে তাঁদের সাথে পাঠিয়ে দেন। আনসারদের কুরআন পড়ানো, ইসলামের তালিম দেওয়া এবং তাদের মাঝে দ্বীনি চেতনা সৃষ্টি করার নির্দেশ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। এরপর থেকে মুসআব রহিম “কারী” হিসেবে মদীনাতে পরিচিতি পান। আসআদ ইবনু যুরারাহ রহিম এর ঘরে তিনি অবস্থান করতেন।’<sup>[২]</sup>

এ দুজনের সম্মিলিত চেষ্টায় কুরআনের তালিম পৌঁছে যায় মদীনার ঘরে ঘরে। মুসআব রহিম এই দায়িত্বের পাশাপাশি আউস এবং খায়রাজের ইমামতির দায়িত্বও আঞ্জাম দিতেন। তাঁর পাশাপাশি সেখানে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করতেন আবদুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতুম রহিম। মুসআব রহিম এর সাথেই তিনি মদীনায়া এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গে সহীহুল বুখারিতে বারা ইবনু আযিব রহিম এর বক্তব্য পাওয়া যায়। তিনি বলেন, ‘সর্বপ্রথম আমাদের মধ্যে (মদীনাতে) মুসআব ইবনু উমাইর এবং ইবনু উম্মি মাকতুম আগমন করেন। তারা দুজনে লোকদেরকে কুরআন পড়াতেন।’<sup>[৩]</sup>

বারা ইবনু আযিব রহিম ছিলেন এই বিদ্যাপীঠেরই একজন শিক্ষার্থী। তিনি

[১] সীরাতু ইবনি হিশাম: ১/১৪৯৩।

[২] সীরাতু ইবনি হিশাম: ১/৪৩৪।




[৩] বুখারি, ৩৯২৫।



বলেছেন, 'রাসূল ﷺ মদীনাতে আগমনের আগেই আমি তিওয়ালে মুকামনাঙ্গের কয়েকটি সূরা আত্মস্থ করে নিয়েছিলাম।' আরেকজন শিক্ষার্থী মায়দ ইবনু সানিত বলেছেন, 'রাসূল ﷺ মদীনাতে আগমনের আগেই আমি ১৭টি সূরা পড়েছিলাম। তিনি আসার পরে সেগুলো তাকে শুনাতে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন।'।

নাকিউল খাদিমার এই বিদ্যালয় কেবল কুরআন শিক্ষার কেন্দ্রই ছিল না। বরং মদীনায় মুসলমানদের হিজরত করার আগ পর্যন্ত এটি ছিল ইসলামিক সেন্টার। আউস এবং খায়রাজ দীর্ঘদিন যাবৎ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। হিজরতের পাঁচ বছর আগ অবধি চলমান থাকা এই যুদ্ধ ইতিহাসের পাতায় ‘বুআস যুদ্ধ’ নামে পরিচিত। এতে সাধারণ লোকের পাশাপাশি দু-পক্ষের অভিজাত শ্রেণির অনেকেই নিহত হয়। ফলত গোত্র দুটি ধ্বংসের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে ইসলামের আগমন ছিল তাদের জন্য রহমত।

এ সম্পর্কে আয়াশা ﷺ বলেন, 'বুআস যুদ্ধ ছিল এমন এক যুদ্ধ, যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের হিজরতের পূর্বেই সংঘটিত করিয়েছিলেন। বস্তুত যা ছিল মদীনাবাসীদের ইসলাম-গ্রহণের পক্ষে সহায়ক। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ছিল নানা দল-উপদলে বিভক্ত। যুদ্ধে হতাহত হয়েছিল তাদের নেতৃস্থানীয় অনেক ব্যক্তি। তখন তাদের ইসলাম গ্রহণকে আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-এর জন্য অনুকূল করে দেন।' [১]

ইসলাম গ্রহণের পরেও তাঁদের মাঝে কিছুটা দূরত্ব ছিল। এক গোত্রের লোকেরা অন্যদের ইমামতি মানতে চাইতেন না। তবে মুসআব ইবনু উমাইর  এর ইমামতি তাঁরা নির্দিধায় মেনে নেন। এক বর্ণনায় এসেছে, এহেন পরিস্থিতিতে নবি  পত্র-মারফত মুসআব ইবনু উমাইর -কে জুমুআর নামাজ পড়াতে নির্দেশ দেন। সম্ভবত এই কর্মকৌশল অবলম্বনের কারণে জুমুআ ফরয হওয়ার আগে থেকেই তা মদীনায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল। প্রথম জুমুআতে মাত্র চল্লিশজন অংশগ্রহণ করলেও পরবর্তী জুমুআয় মুসল্লিদের সংখ্যা ৪০০ হয়ে যায়। প্রথম জুমুআয় একটি বকরি জবাই করে উপস্থিত মুসল্লিদের আপ্যায়ন করা হয়। এর মাধ্যমে গোত্র দুটির লোকদের মনে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক মহব্বত এবং কল্যাণকামিতার প্রেরণা। ১৭

আলোচ্য তিনটি পাঠশালা ছাড়াও মদীনার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং গোত্রের

15] अथर्ववेद उल्लेखः १/७०।

[२] बुधदि, ७१११।

(৫) এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে তবাকাতু ইবনি সাদ, সীরাতু ইবনি হিশাম, ওয়াফাউল ওয়াকফাউল দেখা যেতে পারে।



মাক্কো জ্ঞানের আসর আর বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো। বিশেষত বনু নাজ্জার, বনু আবদিল আশহাল, বনু যফর, বনু আমর ইবনু আওফ, বনু সালিম ইত্যাদি মসজিদের কথা উল্লেখযোগ্য। সেসব মসজিদের ইমামতি এবং শিক্ষাদানের দায়িত্বে ছিলেন উবাদা ইবনু সানিত, উতবা ইবনু মালিক, মুআয ইবনু জাবাল, উমর ইবনু সালামা, উসাইদ ইবনু হুদাইর এবং মালিক ইবনু উওয়াইরিস।

তৎকালীন পাঠশালাগুলোতে কুরআন তিলাওয়াত এবং নামাজের বিধান শিক্ষা দেওয়া হতো। কারণ, সেসময় পর্যন্ত ইবাদতের মধ্যে কেবল নামাজই ফরয হয়েছিল। এছাড়াও নবি ﷺ আকাবায় আনসারদেরকে যেসব বিষয়ের ওপর বাইয়াত করেছিলেন, সেসবের ওপর প্রশিক্ষণও ছিল তৎকালীন সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবিরা যে বিষয়গুলির ওপর নবি ﷺ বাইয়াত হয়েছিলেন সেগুলো হচ্ছে,

- » (ক) আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করা,
- » (খ) চুরি না করা,
- » (গ) ব্যভিচার না করা,
- » (ঘ) সন্তানকে হত্যা না করা,
- » (ঙ) কারো ওপর অপবাদ না দেওয়া,
- » (চ) রাসূলের অবাধ্যতা না করা।

মুসআব ইবনু উমাইর ﷺ-কে নবি ﷺ যেসব নির্দেশনা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তা তো পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী বিদ্যাপীঠগুলোতে কুরআনের তালিম এবং দ্বীনের পাঠদান চলত। মুখস্থ করানো হতো বিভিন্ন আয়াত এবং সূরা। রাত-দিন বা সকাল-সন্ধ্যার বাধ্যধরা রুটিন সেখানে ছিল না। যে-কোনো ব্যক্তি যে-কোনো সময় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। এভাবে অনেক মানুষ দ্বীনি তালিম গ্রহণ করেন।

## মসজিদে নববির কেন্দ্রীয় পাঠশালা

এরপর রাসূল ﷺ মদীনায়ে আগমন করেন। তারপর মসজিদে নববিতে চালু হয় কেন্দ্রীয় বিদ্যাপীঠ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অভ্যাস ছিল, ফজর নামাজের পরে তিনি একটি খুঁটির কাছে চলে আসতেন। দুর্বল-অসহায় মুসলমান, সুফফার সদস্য, কোমলমনা অমুসলিম, বহিরাগত মেহমান এবং প্রতিনিধিরা গোলাকারে সেখানে বসা থাকতেন। রাসূল ﷺ তাদেরকে কুরআন, হাদীস, ফিকহ-সহ



নানা বিষয়ের তালিম দিতেন। তাদের মন ভালো করার মতো কথাবার্তাও বলতেন। কিছুক্ষণ পরে নেতৃস্থানীয়, অভিজাত এবং সচ্ছল পরিবারের লোকেরা আসতেন। বৈঠকের মাঝে আর বসার সুযোগ থাকত না বলে তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দিকে তাকাতেন আবার রাসূল ﷺ-ও তাঁদের দিকে তাকাতেন। এরই প্রেক্ষিতে নাযিল হয় :

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ  
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

আপনি নিজেকে সেসব লোকের সাথে রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ডাকে।<sup>[১]</sup>

পরে তারা বলেন, এই লোকদের আপনি কিছুটা সরে বসতে বলুন। যাতে আমরা আপনার সার্বক্ষণিক সঙ্গী হতে পারি। এই আবদারের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো,

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

সেসব লোকদের আপনি তাড়িয়ে দেবেন না, যারা সকাল-বিকাল নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে।<sup>[২]</sup>

এই খুঁটিটি তাওবার খুঁটি নামেও পরিচিত। রাসূল ﷺ এর সাথে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না-পারার অনুশোচনায় আবু লুবাबा এই খুঁটির সাথে নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করেন। এই খুঁটির কাছে এসেই রাসূল ﷺ বেশিরভাগ সময় নফল নামাজ পড়তেন। এখানেই অনুষ্ঠিত হতো প্রাত্যহিক ইলমি মজলিস। এ প্রসঙ্গে আবু মুসা আশআরি ؓ বলেছেন, ফজর নামাজের পর আমরা রাসূল ﷺ এর কাছে বসে যেতাম। তখন কেউ তাঁকে কুরআন সম্পর্কে প্রশ্ন করত। কেউ ফারায়েজ সম্পর্কে আবার কেউ-বা সুপ্নের তাবির জানতে চাইত।<sup>[৩]</sup>

### ❖ ক্রমে বসার পদ্ধতি

প্রথম দিকে সে মজলিসে বসার কোনো বিশেষ ব্যবস্থাপনা ছিল না।

[১] সূরা আলাক, ১৮: ২৮।

[২] সূরা আনআম, ৬: ৫২।

[৩] কানুন সাওয়াহিদ, ১/৪৮।



যিনি যেখানে জায়গা পেতেন সেখানেই বসে পড়তেন। পরবর্তীতে রাসূল ﷺ চক্রাকারে বসার রীতি বানিয়ে দেন। জাবির ইবনু সামুরা ﷺ বলেছেন, 'রাসূল ﷺ এর বৈঠকে গিয়ে আমরা যে-যেখানে জায়গা পেতাম, সেখানেই বসে পড়তাম।' [১] তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সে বৈঠকে কি আপনিও থাকতেন? উত্তরে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, সেখানে আমি খুব বেশি অংশ নিতাম। নামাজের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি নামাজের স্থানেই বসে থাকতেন। এরপর তিনি বৈঠকের স্থানে আসতেন। বৈঠকে সাহাবিরা জাহিলি যুগের কথা বলে হাসিমুখে করলে তিনি মুচকি মুচকি হাসতেন।'

আবু সাঈদ খুদরি ﷺ বলেন, 'আমি ছিলাম দুর্বল মুসলমানদের অন্যতম। আমরা মুহাজিররা এতটাই অভাবী ছিলাম যে, কাপড় খুলে যাওয়ার ভয়ে একে অন্যের সাথে মিলে মিলে বসতাম। আমাদের মাঝে একজন পড়ত আর সবাই শুনত। একদিন এমন অবস্থায় রাসূল ﷺ উপস্থিত হলেন। তিনি আমাদের মাঝে বসে সবাইকে বৃত্তাকারে বসার নির্দেশ প্রদান করলেন। সাহাবিরা এমনভাবে বৃত্তাকারে বসে গেলেন যাতে নবি ﷺ এর চেহারা উপস্থিত সকলেরই নজরে আসে।' [২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু সাঈদ ﷺ বলেছেন, 'একবার আমি একদল অসচ্ছল মুহাজিরদের মাঝে বসা ছিলাম। এ সময় তারা একে অন্যের আড়ালে থেকে নিজেদের সতর ঢাকতে চেষ্টা করছিল। একজন কারী সাহেব আমাদের কুরআন পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। তিনি সেখানে দাঁড়ানোর কারণে কারী সাহেব পাঠ থামিয়ে দিলেন। এরপর তিনি সালাম দিয়ে জানতে চাইলেন, তোমরা কী করছিলে? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা এই কারীর জবান থেকে কুরআন শুনছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ أَمَرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَهُمْ

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক তিনি সৃষ্টি করেছেন, যাদের সঙ্গে থাকতে আমাকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

এই বলে একাত্ততা প্রকাশের জন্য আমাদের মাঝে তিনি বসে পড়লেন।

[১] আবু দাউদ, ৪৮২৫।

[২] আল ফাকীহ ওয়াস মুতাফফীহ: ২/১২২।



এরপর তিনি হাতের ইশারায় সবাইকে গোলাকার হয়ে বসতে বলেন। ফলে সকলের চেহারা হয়ে গেল তাঁর মুখোমুখি। তখন তিনি বললেন,

أَبَشِّرُوا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ، تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْمٍ  
وَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ

‘হে দরিদ্র মুহাজিরেরা! কিয়ামতের দিন পূর্ণ নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করো। ধনী ব্যক্তিদের অর্ধদিবস আগেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর সে অর্ধদিবস হবে পাঁচশ বছরের সমান।’<sup>[১]</sup>


### ✽ আসহাবুস সুফফা

রাসূল ﷺ এর মজলিস ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত। সমাজের যে-কোনো স্তরের লোক তাতে অংশগ্রহণ করতে পারত। আনসার-মুহাজির, আরব-অনারব, স্থানীয়-বহিরাগত, গ্রাম্য-শহুরে, মূর্খ-জ্ঞানী, বৃদ্ধ-যুবক এবং অভিজাত-সাধারণ সবাই একসাথে বসতেন। রাসূল ﷺ উপস্থিত জনতার মন-মানসিকতা, পরিবেশ-পরিস্থিতি, প্রকৃতি, ভাষা এবং বুঝশক্তি বিবেচনা করে তালিম দিতেন। তবে আসহাবুস সুফফা যারা ছিলেন, তারা সেখানে বিশেষ গুরুত্ব পেতেন। কারণ তারা দিবানিশি রাসূল ﷺ এর সহবতে থাকতেন। শিক্ষাদান, শিক্ষাগ্রহণ, যিকির, কুরআন তিলাওয়াত এবং পরস্পরে ইলমি আলোচনা ছাড়া অন্য কোনো ব্যস্ততা তাদের ছিল না।

আবু হুরায়রা ؓ ছিলেন আসহাবুস সুফফার সদস্য। তিনি বলেছেন, ‘আমি ৭০ জন আসহাবুস সুফফাকে দেখেছি, যাদের দেহে চাদর পর্যন্ত ছিল না। তারা কেবল লুঙ্গি পরে থাকতেন। কিংবা একটি মাত্র কস্মল দিয়ে মাথা থেকে পা অবধি ঢেকে রাখতেন। আবার খুলে যেতে পারে এই ভয়ে হাত দিয়ে সেটা ধরে রাখতেন। রাসূল ﷺ বিশেষ পদ্ধতিতে তাদের তালিম দান করতেন। এ ছাড়া তারা নিজেরাও যিকিরে ব্যস্ত থাকতেন।’


নিজের সম্পর্কে আবু হুরায়রা ؓ বলেছেন, ‘আমাদের মুহাজির ভাইয়েরা কাজারে কেনাবেচার ব্যস্ত থাকতেন এবং আনসার ভাইয়েরা মশগুল থাকতেন জমি-জিরাতের কাজে। আর আবু হুরায়রা খেয়ে না-খেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর

সাথে লেগে থাকত। তাই অন্যরা উপস্থিত না থাকলেও আবু হুরায়রা উপস্থিত থাকত এবং তারা মুখস্থ না করলেও সে মুখস্থ রাখত।<sup>[১]</sup>

আবু হুরায়রা  এর এই বক্তব্য আসহাবুস সুফফার প্রকৃত অবস্থাই তুলে ধরেছে। কারণ তারা সবাই নববি পাঠশালায় সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকতেন। তাঁদের সংখ্যা সাধারণত ৬০ থেকে ৭০ এর মাঝে থাকত। এর মাঝে কমবেশিও ঘটত। উলামায়ে কেরাম তাঁদের সামগ্রিক সংখ্যা ৪০০ বলেছেন। বরকত লাভের জন্য আরবি বর্ণমালার ক্রমানুসারে তাঁদের কয়েকজনের নাম তুলে ধরা হচ্ছে।

» আলিফ : আসমা ইবনু হারিসা আসলামি, আগার মুযানি, আউস ইবনু আউস সাকাফি

» বা : বারা ইবনু মালিক আনসারি, বাশির ইবনু খাস্যাসিয়া, বিলাল ইবনু রাবাহ,

» ছা : ছাবিত ইবনু দাহহাক আনসারি আশহালি, ছাবিত ইবনু ওয়াদীআ আনসারি, ছাকিফ ইবনু আমর, রাসূল  এর আজাদকৃত দাস সাওবান।

» জিম : জারিয়া ইবনু শাইবাহ, জুনদুব ইবনু জুনাদাহ, জুবাইল ইবনু সুরাকাহ।


» হা : হারিসা ইবনু নুমান আনসারি, হাজ্জাজ ইবনু আমর আসলামি, হুযাইফা ইবনু উসাইদ আবু মুরীহা গিফারি, হাযিম ইবনু হারমালা আসলামি, হারমালা ইবনু ইয়াস, হানযালা ইবনু আবু আমির।


» খা : খালিদ ইবনু যায়দ, খাব্বাব ইবনুল আরত, খুবাইব ইবনু ইয়াসাফ, খুনাইস ইবনু হুযাফা, খুরাইম ইবনু ফাতিক আসাদি।

» যাল : যুলবাজাদাইন আবদুল্লাহ মুযানি।

» রা : রাবীআ ইবনু কাব আসলামি, রিফাআ ইবনুল মুনযির।

» যা : যায়দ ইবনু খাত্তাব আবু আবদির রহমান।

» সিন : সালিম ইবনু উবাইদ আশজায়ি, আবু হুযাইফার আজাদকৃত দাস সালিম ইবনু উমাইর, সাইব ইবনু খাল্লাদ, সাঈদ ইবনু মালিক, সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস, সাঈদ ইবনু আমির, রাসূল  এর আজাদকৃত দাস সাফীনাহ, সালমান ফারসি।

» শিন : শাদ্দাদ ইবনু আউস, রাসূল  এর আজাদকৃত দাস শাকরান, শামউন আবু রায়হান আযদি।

[১] বুখারি, ১১৮।



» সোয়াদ : সাফওয়ান ইবনু বাইদা, সুহাইন ইবনু সিনান ।

» ত্বোয়া : তালহা ইবনু আমর আনসারি, তালহা ইবনু আমর নুযারি, তাখফা ইবনু কাইস গিফারি ।

» আইন : আম্মার ইবনু ইয়াসির, আমির ইবনু আবদিল্লাহ, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, আব্বাদ ইবনু খালিদ, আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস, আবদুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতুম, আবদুল্লাহ ইবনু উমর, আবদুল্লাহ ইবনু হারাম, আবদুল্লাহ ইবনু আবদিল আসাদ, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, উতবা ইবনু গাযওয়ান, উতবা ইবনু মুনযির, উসমান ইবনু মুনযির, ইরবাদ ইবনু সারিয়া, উকবা ইবনু আমির জুহানি, উকাশাহ ইবনু মিহসান, আমর ইবনু আউফ মুযানি, উয়াইমি ইবনু সাইদা আনসারি ।

» ফা : ফাদালাহ ইবনু উবাইদ, ফুরাত ইবনু হাইয়ান ।

» ক্বাফ : কুররাহ ইবনু ইয়াস ।

» কাফ : কাব ইবনু আমর আবুল ইউসর আনসারি ।

» মিম : মিসতাহ ইবনু আসাসাহ, মাসউদ ইবনু রবী, মুআয ইবনু হারিছ আনসারি ।

» নুন : নাযলা ইবনু উবাইদ আবু বারযাহ আসলামি ।

» হা : মুগীরা ইবনু শুবার আজাদকৃত দাস হিলাল ।

» ওয়াও : ওয়াবিসা ইবনু মাবাদ, ওয়াছিলা ইবনুল আসকা ।

» ইয়া : সফওয়ান ইবনু উমাইয়ার আজাদকৃত দাস ইয়াসার আবু ফাকীহা ।

এছাড়াও অনেকেই উপনামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। যেমন : আবু হুরায়রা, আবু সালাবা খুশানি, আবু রযীন, রাসূল ﷺ এর আজাদকৃত দাস আবু ফিরাস, আবু কাবশা এবং আবু মুওয়াইহিবা। তাঁদের সকলের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁদেরকেও সন্তুষ্ট করে দিন।

আসহাবুস সুফফার সদস্য ছিলেন আবু হুরায়রা ؓ এবং আবু সাঈদ খুদরি ؓ এর মতো অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবি। আবদুল্লাহ ইবনু উমর ؓ এবং আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ؓ এর মতো ফকিহ এই আসহাবুস সুফফারই সদস্য ছিলেন। তাঁদের ফিকহি মাযহাব উম্মতের মাঝে বিস্তৃত। আরও ছিলেন আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ؓ এবং সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ؓ এর মতো বিশুনিজেতা, যাদের হাতে বিজিত হয়েছিল শাম, খোরাসান এবং অনারবের বিশাল অঞ্চল। আসহাবুস সুফফার সদস্য আবুদ দারদা ؓ এবং আবু যার



এর মতো আবিদের তাকওয়া, সততা, আল্লাহভীতি, সত্যবাদিতা এবং দুনিয়াত্যাগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নেই। এখানে মাত্র অল্প কজনের নাম উল্লেখ করা হলো। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণির প্রতিটি সদস্যই ছিলেন ইলম, ঈমান, ইয়াকিন এবং আল্লাহভীরুতার জীবন্ত নমুনা।

### ❁ নবি ﷺ এর মজলিস যেমন হতো

নবি ﷺ এর বৈঠক ছিল অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ। তাতে অংশগ্রহণকারীরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পূর্ণ মনোযোগী থাকতেন। উসামা ইবনু শারিক রা বলেন, 'একবার রাসূল ﷺ এর কাছে আমি উপস্থিত হলাম। তখন সাহাবিরা তাঁকে ঘিরে এমনভাবে বসে ছিলেন, যেন তাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে।'<sup>[১]</sup>

নববি বিদ্যাপীঠে শিক্ষার্থীরা আদবের সাথে বসতেন। প্রয়োজন হলে নবি ﷺ এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বের হতেন। হাবীব ইবনু আবী সাবিত রা বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ এর বৈঠকে আমাদের কেউ যখন বসত, তখন কখনোই তাঁর হাঁটু প্রকাশ পেত না। ওঠার দরকার হলে অনুমতি নিয়ে উঠত।

বৈঠকের মাঝে রাসূল ﷺ বারবার ইস্তিগফার করতেন। আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা বলেছেন, গণনা করে দেখা যেত যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বৈঠকে বসলে সেখান থেকে ওঠার আগেই শতবার এ দুআটি পাঠ করতেন

رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ

হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি তাওবা কবুলকারী, পরম ক্ষমামূলী।<sup>[২]</sup>

নিচের শব্দগুলোর মাধ্যমে দুআ না-করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বৈঠক থেকে খুব কমই উঠতেন।

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ،  
وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبْلِغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ، وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تَهْوُونَ  
بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا

[১] আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ: ২/১২৩।

[২] তিরমিজি, ৩৪৩৪; মুসনাদু আহমাদ, ১৯৮২।



وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا  
عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا  
فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا  
تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا

‘হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে এই পরিমাণ আপনার ভীতি সঞ্চার করে দিন, যা আমাদের মাঝে এবং আপনার অবাধ্যতার মাঝে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। আপনার আনুগত্যের এই পরিমাণ তাওফীক দান করুন, যার মাধ্যমে আপনার জাম্নাতে প্রবেশ করাবেন। আপনার প্রতি এই পরিমাণ ঈমান দান করুন, যা দিয়ে দুনিয়ার মুশকিল আসান করে দেবেন। যতদিন বাঁচিয়ে রাখবেন, ততদিন আমাদের শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি-সহ সব শক্তি অটুট রাখুন। আমাদের পরেও এর কল্যাণ জারি রাখুন। যে আমাদের ওপর জুলুম করে, আমাদের পক্ষ হয়ে তার থেকে প্রতিশোধ নিন। যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন। দুইনের ব্যাপারে আমাদের কোনো পরীক্ষায় ফেলবেন না। দুনিয়াকে আমাদের মৌলিক চিন্তার বিষয় আর জ্ঞানের শেষ সীমা বানিয়ে দেবেন না। আমাদের প্রতি আন্তরিক নয়, এমন কাউকে আমাদের ওপর কর্তৃত্ব দেবেন না।’<sup>[১]</sup>

বৈঠকে রাসূল ﷺ এর প্রতিটি কথা এবং কাজ ছিল শিক্ষণীয়। কোনো কিছু না বুঝলে শিক্ষার্থীরা আদবের সাথে জিজ্ঞাসা করে বুঝে নিতেন। একবার বৈঠক থেকে ওঠার সময় রাসূল ﷺ এই দুআ পড়লেন,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ  
أَتُوبُ إِلَيْكَ

‘ইয়া আল্লাহ! পবিত্রতা এবং প্রশংসা আপনারই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাওবা করছি।’






তখন এক সাহাবি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে তো এই দুআ

[১] তিরমিডি, ৩৫০২।

আগে কখনো পড়তে গুনিনি। নবি ❀ বললেন, 'এই দু'আ হচ্ছে নতলিনের  
ভুলত্রুটির কার্যকারী।'।

❁ নববি বিদ্যাপীঠে শিক্ষার্থীদের অবস্থা

দ্বীনি ইলম হাসিল করার প্রতি রাসূল ﷺ খুব তাগিদ দিতেন। ইলম অনুেষণ করলে কেমন সাওয়াব মিলবে, সেটাও বলতেন। নববি বিন্যাপীয়ে আগত শিক্ষার্থীদের হাসিমুখে স্বাগত জানাতেন। একবার মুরাদ গোহের নাকওয়ান ইবনু আসসাল ﷺ এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইলম অনুেষণ করতে এসেছি। উত্তরে নবি ﷺ বললেন, 'ইলম অনুেষণকারীকে স্বাগতম। ইলম অনুেষণকারীকে ফেরেশতারা ঘিরে রাখেন এবং নিজেদের ডান দিয়ে তাদের ছায়া দেন। এসবের কারণ হচ্ছে ইলমের প্রতি তাদের ভালোবাসা।'

নববি বিদ্যাপীঠে স্থানীয় শিক্ষার্থী ছাড়া অনেক বহিরাগত শিক্ষার্থীও আসতেন। তাদের উপস্থিতি ছিল সাময়িক। আর স্থানীয় শিক্ষার্থীরা আসতেন সূতন্ত্রভাবে। শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কমবেশি হতো। আবু হুরায়রা  এর বর্ণনা অনুসারে আসহাবুস সুফফার ৭০ জন সাহাবির কথা পাওয়া যায়, যারা সবসময় উপস্থিত থাকতেন। আনাস  বলেছেন, বেশির ভাগ সময় আমরা ৬০ জন রাসূল  এর মজলিসে থাকতাম। কোনো কোনো সময় এ সংখ্যা বেড়ে যেত। বিশেষত বহিরাত প্রতিনিধিদলের আগমন ঘটলে সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেত। বুজাইলার প্রতিনিধিদলে ১৫০ জন, নাখার ২০০ জন এবং মুয়াইনার ক্ষেত্রে ছিল ৪০০ জন। এভাবে বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের লোক থাকত। তাদের আগমনের উদ্দেশ্য যেহেতু ছিল দ্বীন শিক্ষা, তাই বৈঠকেও তারা অংশগ্রহণ করতেন। কখনো জায়গা সংকুলান না হলে কেউ কেউ চলে যেতেন। অবশ্য দেখা যেত মদীনার লোকেরা জীবিকা নির্বাহের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারতেন না। তখন তারা পালানো অংশগ্রহণ করতে পারতেন। যিনি অংশগ্রহণ করতে পেরেছেন, তিনি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে বৈঠকের আলোচনা পৌঁছে দিতেন। এ ব্যাপারে উমর  বলেছেন, আমি এবং আমার এক আনসারি প্রতিবেশী বনু উমাইয়া ইবনু যায়দের মহল্লায় বাস করতাম। যা ছিল মদীনার উঁচু এলাকায়। আমরা দুজনে পালানো রাসূলুল্লাহ  এর মজলিসে হাজির হতাম। একদিন তিনি আসতেন, আরেকদিন আমি। আমি যেদিন আসতাম, সেদিনের খবর তাকে পৌঁছে দিতাম। আর যেদিন তিনি

[১] আবু দাউদ, ৪৮৫৯।

(২) জামিউ বায়ানিল ইলম: ১/৩২।



আসতেন সেদিন তিনি এমনটা করতেন।<sup>[১]</sup>

তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ রাঃ-কে এক ব্যক্তি বলল, 'আমরা তো আপনার চেয়ে ওই ইয়ামানি লোকটি (আবু হুরায়রা)-কে বড় জ্ঞানী মনে করি না।' তখন তালহা রাঃ বললেন, 'নিশ্চয় রাসূল সঃ থেকে তিনি যা কিছু শুনেছেন, তার অনেক কিছুই আমরা শুনিনি। আল্লাহর রাসূল সঃ সম্পর্কে তিনি যতটা জানেন, আমরা ততটা জানি না। আসলে আমরা ছিলাম অবস্থাসম্পন্ন। আমাদের অনেক ঘরবাড়ি এবং পরিবার-পরিজন ছিল। আমরা শুধু সকাল-সন্ধ্যায় রাসূল সঃ এর কাছে হাজির হতাম। এরপর আবার ফিরে আসতাম। পক্ষান্তরে তিনি ছিলেন নির্বাক মানুষ। সম্পত্তি বা পরিবারের ঝামেলা তার ছিল না। তার হাত থাকত রাসূল সঃ এর হাতের মধ্যে গোঁজা। নবীজি সবসময় তাকে নিজের সাথে রাখতেন। আমরা কোনো ভালো লোককে রাসূল সঃ সম্পর্কে মিছে কথা বলতে দেখিনি।'<sup>[২]</sup>

আনাস রাঃ বলেছেন, 'যেসব হাদীস আমরা বর্ণনা করি তার সবগুলোই যে আমরা রাসূল সঃ থেকে সরাসরি শুনেছি, এমনটা নয়। সে যুগে আমরা কারো সাথে মিথ্যা বলতাম না।'<sup>[৩]</sup>

নববি পাঠশালার অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ছিলেন বয়স্ক। জীবনের একটা অংশ অতিক্রম করার পরে তারা রাসূল সঃ এর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে ইমাম বুখারি রাঃ স্পষ্ট শব্দে লিখেছেন, 'নবি সঃ এর সাহাবিগণ বয়স্ক হওয়ার পরেও শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।'<sup>[৪]</sup>

তাদের মাঝে এমন ব্যক্তিও থাকতেন, যাদের হাঁটাচলার ক্ষমতা পর্যন্ত ছিল না। এ বয়সেও তারা রাসূল সঃ এর মজলিসে হাজির হয়ে দ্বীন শিখতে চেষ্টা করতেন। তাদের অবস্থার কথা বিবেচনা করে রাসূল সঃ জুতসই শিক্ষা প্রদান করতেন।

'বনু বাক্বা' এর প্রতিনিধিদলে মুআবিয়া ইবনু সাওর ইবনু উবাদাহ নামে একজন বয়োবৃদ্ধ লোক ছিলেন। সেসময়ই তিনি ছিলেন শতবর্ষী এক বৃদ্ধ। সাথে ছিলেন তার ছেলে বিশর। রাসূল সঃ এর কাছে মুআবিয়া রাঃ আরজ করলেন, 'আমি তো বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি। আপনাকে ছুঁয়ে বরকত গ্রহণ করতে

[১] বুখারি, ৮৯।

[২] আত তাবীখুল কাবীর: খ. ২; অধ্যায়: ২; পৃ. ১৩২।

[৩] জামউল কাওয়াইদ: ১/৫১।

[৪] বুখারি, ইলম অধ্যায়, ইলম এবং হিকমতের ক্ষেত্রে ঈর্ষা করা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ, খ. ১, পৃ. ১৯।



চাচ্ছি। আমার ছেলে আমার সাথে সদাচরণ করে। আপনি চেহারা হাত বুলিয়ে দিন।' বৃদ্ধ মুআবিয়ার কথায় রাসূল ﷺ অমত করলেন না। বিশর ইবনু মুআবিয়ার চেহারা হাত বুলিয়ে দিয়ে তিনি দুআ করে দিলেন।<sup>[১]</sup>

কাবীসা ইবনুল মুখারিক ﷺ বলেছেন, আমি একবার রাসূল ﷺ এর কাছে গেলাম। তিনি আমার আগমনের কারণ জানতে চাইলেন। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার বয়স বেড়ে গেছে। আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে। তথাপি আপনার কাছে এসেছি এমন কিছু শিখতে, যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন।' নবি ﷺ তখন বললেন, 'কাবীসা! ফজরের পর তুমি তিনবার **سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ** পড়বে। তাহলে যত পাথর, মাটি আর গাছপালার পাশ দিয়ে যাবে, সবাই তোমার জন্য ইস্তিগফার করবে। সেই সাথে অন্ধত্ব, কুষ্ঠ এবং বিকলাঙ্গতা হতে তুমি রেহাই পাবে। শোনো কাবীসা, তুমি এই দুআ করবে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِمَّا عِنْدَكَ وَأَفِضْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَانْشُرْ عَلَيَّ  
مِنْ رَحْمَتِكَ، وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ

হে আল্লাহ! আপনার কাছে থাকা কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আমার ওপর আপনার অনুগ্রহ ঢেলে দিন। ছড়িয়ে দিন আপনার রহমত। আপনার বরকত আমার ওপর নাযিল করুন।<sup>[২]</sup>

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ রাসূল! আমাকে কুরআন পড়া শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, 'তুমি আলিফ-লাম-রা বিশিষ্ট তিনটি সূরা পাঠ করো।' লোকটি বলল, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আমার অন্তর শক্ত হয়ে গেছে এবং জিহ্বা হয়ে গেছে আড়ষ্ট। তিনি বললেন, 'তাহলে হা-মীম বিশিষ্ট তিনটি সূরা পাঠ করো।' এবারও লোকটি আগের মতো কথা বলল। তখন তিনি বললেন, 'এমন তিনটি সূরা পাঠ করো যেগুলোর শুরুতে সাক্বাহা বা ইউসাক্বাহি আছে।' লোকটি এবারও আগের মতো কথা বলল। তারপর বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি সূরা শিখিয়ে দিন, যা সবদিক থেকে পরিপূর্ণ। তখন নবি ﷺ তাকে সূরা যিলযাল পাঠ করালেন। লোকটি বলল, ওই সত্য শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাকিয়েছেন। আমি কখনোই এর বেশি পড়ব না। তারপর লোকটি চলে গেলে

[১] তবাক্বাৎ ইবনু সাদ: ১/৫২৩।

[২] জামেউল ফায়েইদ, ২০৬।



নবি ﷺ বললেন, 'লোকটি সফল হয়েছে। লোকটি সফল হয়েছে।'।<sup>১১</sup>

শুধু-যে বয়স্করাই তালিম নিতেন, তা কিন্তু নয়। শিশু এবং তরুণরাও এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকতেন না। নবি ﷺ তাদের সাথে বন্ধুর মতো মিশতেন। স্নেহ করতেন। ইলম অর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। ইলম অর্জন করলে কেমন সাওয়ার হবে তার সুসংবাদ জানাতেন। তারা আগ্রহভরে নববি বিদ্যাপীঠে দলে দলে অংশগ্রহণ করতেন। পরবর্তীতে তাঁরা হাদীস বর্ণনাও করেছেন। নবিজির জীবদ্দশায় তাঁদের বয়স ছিল ৮ থেকে ১৫ বছর। হুসাইন ইবনু আলি, নুমান ইবনু বাশীর, আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর, আবুত তুফাইল কিনানি, উমর ইবনু আবী সালামাহ, সামুরা ইবনু জুনদুব, আবদুল্লাহ ইবনু উমর, আবু সাঈদ খুদরি, মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ, আনাস ইবনু মালিক, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস এবং সাহল সাদ রা ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

ইমাম বুখারি রা 'শিশুদের কুরআন শিক্ষাদান' সংক্রান্ত অধ্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা এর শৈশবে কুরআন মুখস্থ করার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এক বর্ণনায় আছে, রাসূল স একবার তাকে জড়িয়ে ধরে দুআ করেছিলেন,

اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ

। 'হে আল্লাহ! তাকে কিতাবের (কুরআনের) জ্ঞান দান করুন।'।<sup>১২</sup>

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা বলেন আমরা রাসূলুল্লাহ স এর কাছে ছিলাম। তিনি বললেন, 'বলো তো সেটা কোন গাছ, যা মুসলিম ব্যক্তির মতো—যার পাতা ঝরে না, এরূপ নয় এবং এরূপও নয় যা সর্বদা খাদ্য প্রদান করে।' ইবনু উমর রা বলেন, আমার মনে হলো সেটা খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু আমি দেখলাম আবু বকর রা এবং উমর রা কোনো কথা বলছেন না। তাই আমি এ ব্যাপারে কিছু বলা পছন্দ করিনি। অবশেষে কেউ কিছু বলছেন না দেখে রাসূলুল্লাহ স নিজেই বললেন, 'সেটা হচ্ছে খেজুর গাছ।' আমরা উঠে যাওয়ার পর উমর রা-কে আমি বললাম, 'আব্বা! আল্লাহর কসম! আমার মনে হয়েছিল যে সেটা খেজুর গাছ।' উমর রা বললেন, 'তখন এ কথা বললে না কেন?' আমি বললাম, 'আপনারা কিছু বলছেন না দেখে আমি কিছু বলা এবং মত ব্যক্ত করা পছন্দ করিনি।' তখন উমর রা বললেন, 'তুমি বললে সেটা আমার কাছে

[১১] আবু নাজি, ১৩৯৯।

[১২] বুখারি, ৭৭।



অবশ্যই অনেক অনেক জিনিস থেকে বেশি পছন্দনীয় হতো।<sup>[১]</sup>

সামুরাহ ইবনু জুনদুব ❦ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ❦ এর যুগে আমি ছিলাম কম-বয়সী। তাঁর কথা আমি মুখস্থ করে রাখতাম। তবে আমার চেয়ে বয়স্ক লোকেরা তাঁর কাছে উপস্থিত থাকতেন বলে আমি কথা বলা থেকে বিরত থাকতাম।'<sup>[২]</sup>

জুনদুব আবদুল্লাহ বায়ালি ❦ বলেন, 'রাসূল ❦ এর যুগে আমি ছিলাম শক্তিশালী বালক। আমরা কুরআন পাঠের আগে ঈমান শিখেছি। এরপর কুরআন পড়তে শুরু করলে আমাদের ঈমান আরও মজবুত হয়।'<sup>[৩]</sup>

আবু হুরায়রা ❦ সূত্রে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ❦ কোনো এক অভিযানে সংখ্যায় কম এমন ছোট একটি বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। বাহিনীর প্রত্যেকে তাদের যতটা কুরআন মুখস্থ ছিল ততটুকু রাসূল ❦-কে তিলাওয়াত করে শোনালেন। অবশেষে তাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে কমবয়সী ছিলেন তিনি রাসূল ❦-কে বললেন, 'অমুক অমুক সূরা এবং সূরা বাকারা আমার মুখস্থ আছে।' রাসূল ❦ তখন প্রশ্ন করলেন, 'সূরা বাকারা (পুরোটাই) তোমার মুখস্থ আছে?' সে সাহাবি বললেন, 'জি হ্যাঁ।' রাসূল ❦ বললেন, 'ঠিক আছে, তুমিই তাহলে এই বাহিনীর আমির।'<sup>[৪]</sup>

শুধু মদীনা বা এর আশেপাশেরই নয়, দূর-দূরান্ত থেকেও কমবয়স্ক সাহাবিরা এসে রাসূল ❦ এর কাছে তালিম নিতেন। বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদল আসার সময় তাদের বালকরা জিদ করে আগ্রহ সহকারে চলে আসতেন। এভাবে তারা রাসূল ❦ এবং প্রবীণ সাহাবিদের থেকে ইলম শিখতেন। ইলমচর্চায় কখনো-বা ছাড়িয়ে যেতেন বয়স্কদের।

তুজাইব গোত্রের প্রতিনিধিদল ফিরে যাওয়ার সময় আরব ও ইসলামি ঐতিহ্য অনুসারে রাসূল ❦ তাদের হাতে উপহার তুলে দিচ্ছিলেন। সেসময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সাথে আসা কেউ বাদ পড়েনি তো? উত্তরে তারা বলল, 'জি, একজন বালক আছে। তাকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে এসেছি।'

হেলোটিকে পাঠিয়ে দিতে বললেন আল্লাহর রাসূল ❦। তিনি উপস্থিত হলে

[১] বুখারি, ৪৬৯৮।

[২] মুসলিম, ৯৬৪।

[৩] তারীখুত তবারি, ১/২২৩।

[৪] তিরমিডী, ২৮৭৩।



রাসূল ﷺ তাকে সমাদর করলেন। কোনো প্রয়োজন আছে কি না, জানতে চাইলেন। উত্তরে ছেলেটি বলল, আমার প্রয়োজন গোত্রের অন্যদের প্রয়োজনের মতো নয়। আমি কেবল এজন্যই এসেছি, যেন আমার জন্য আপনি দুআ করেন। আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন। আমার অন্তরে তিনি যেন অমুখাপেক্ষিতা সৃষ্টি করে দেন। রাসূল ﷺ তখন দুআ করলেন,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاجْعَلْ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ

‘হে আল্লাহ! এই ছেলেটাকে আপনি মাফ করে দিন, তার প্রতি দয়া করুন এবং তার অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা সৃষ্টি করে দিন।’

এরপর রাসূল ﷺ তাকেও উপহার দিলেন। নবিজির দুআর ফলে ছেলেটিকে আল্লাহ তাআলা এমনভাবে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দিলেন যে, এরপর তাকে আর কারও কাছে হাত পাততে হয়নি।<sup>[১]</sup>

নববি বিদ্যাপীঠে আরবের পাশাপাশি অনারবরাও তালিম গ্রহণ করতেন। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে রাসূল ﷺ এর শিক্ষা থেকে তারাও উপকৃত হতেন। সে যুগেই পারস্য, রোম, হাবশা এবং হিন্দুস্তানের লোকেরা আরবে বসবাস করতেন। তবে পারস্যের লোক ছিলেন তুলনামূলক বেশি। ইরাক, ওমান, বাহরাইন, ইয়ামান এবং উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে পারস্য বংশোদ্ভূত অনেক লোক ছিল। এসব অঞ্চলের শাসকরাও ছিল পারস্য সম্রাটের অধীন। আরবরা যেমন পারস্যে যাতায়াত করত ﷺ পারস্যের লোকেরাও তেমনি বিভিন্ন কারণে আরবে আসত। এ কারণেই আরবি ভাষায় অনেক পারসিক শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

রাসূল ﷺ এর নুবুওয়াত প্রাপ্তির পর আরবের লোকদের মতো পারসিকরাও বিপুল পরিমাণে ইসলাম গ্রহণ করেন। বিশেষত পারস্যের বাদশাহ কর্তৃক ইয়ামানে নিযুক্ত শাসক ‘বায়ান’ ইসলাম গ্রহণের পরে অনেক পারসিক ইসলামের জায়গা করে আনে। নবিজির কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন বায়ান। রাসূল ﷺ এর কাছে তিনি জানতে চান, তারা কোন শ্রেণিভুক্ত হবেন। নবি ﷺ বলেন, ‘তোমরা আমার পরিবারের সদস্য বলে বিবেচিত হবে।’

নবীরাও নবি ﷺ এর কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতেন। তবে পুরুষদের ক্ষেত্রে তারা একই বৈঠকে উপস্থিত হতেন না। বরং তাদের জন্য ছিল পৃথক

[১] মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ: ১/২২৩; বাদুল বাআদ: ৩/৬১।



ব্যবস্থা। তারা এক জায়গায় সমবেত হতেন। রাসূল ﷺ সেখানে গিয়ে তাদের তালিম দিতেন। এছাড়াও মহিলারা নবি ﷺ এর প্রীদের থেকে বিশেষত উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. এর কাছ থেকে সমাধান জেনে নিতেন।

আবু সাঈদ খুদরি রা. বলেন, মহিলারা একবার নবি ﷺ-কে বলল, 'পুরুষেরা আপনার কাছে আমাদের চেয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাই আমাদের জন্য একটি দিন ধার্য করে দিন।' তখন তিনি তাদের সাথে বিশেষ একটি দিনের ওয়াদা করলেন। সে দিন তাদেরকে নসীহত করলেন ও নির্দেশনা দিলেন। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি যা যা বলেছিলেন, তার মধ্যে এ কথাও ছিল—'তোমাদের মধ্যে যে মহিলা তিনটি সন্তান আগেই পাঠাবে (অর্থাৎ জীবদ্দশায় তিনটি সন্তান যদি তার মারা যায়) তাহলে ওই বাচ্চারা তোমাদের জন্য জাহান্নামের অন্তরাল হয়ে থাকবে।' তখন এক মহিলা বললেন, দুটি পাঠালে? তিনি বললেন, 'দুটি পাঠালেও।' [১]

### ❖ নবি ﷺ এর তালিম প্রদান পদ্ধতি

নবি ﷺ এমনভাবে তালিম দিতেন যে, উপস্থিত সবাই সমানভাবে উপকৃত হতেন। গ্রাম্য-শহুরে, মূর্খ-জ্ঞানী, বৃদ্ধ-যুবক, আরব-অনারব সবাই নবি ﷺ এর কথা সহজেই অনুধাবন করতে পারতেন। নবীজির তালিম প্রদানের পদ্ধতি এতটাই চমৎকার ছিল যে, তা সহজেই শিক্ষার্থীর মনে গেঁথে যেত। আনাস রা. বলেন, নবি ﷺ (গুরুত্বপূর্ণ কথা) তিনবার করে বলতেন, যাতে তা (সহজেই) বুঝে নেওয়া যায়। আর যখন লোকদের কাছে এসে সালাম দিতেন, তখন তাদের তিনবার সালাম দিতেন। [২]

আয়িশা রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এতটাই স্পষ্ট এবং ধীরস্থিরভাবে কথা বলতেন যে, কোনো গণনাকারী চাইলে অনায়াসেই তা গণনা করতে পারত। [৩]

মুআবিয়া ইবনুল হাকাম সুলামি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে আমি নামাজ আদায় করেছিলাম। এমন সময় আমাদের মধ্যে একজন হাঁচি দিলে আমি ইয়ারহামুকাল্লাহ বললাম। তখন লোকেরা আমার দিকে আড়চোখে তাকাতে লাগল। আমি বললাম, আমার মা তার সন্তান হারিয়ে ফেলুক! আমার দিকে তোমরা তাকাচ্ছ কেন? তখন তারা উরুর ওপর হাত চাপড়াতে লাগল। তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে বুঝে আমি চুপ হয়ে গেলাম। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ

[১] বুখারি, ১০১।

[২] বুখারি, ৯৫।

[৩] আবু দাউদ, ৩৬৫৪।



❦ নামাজ শেষ করলেন। আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য কুরবান হোক! উত্তর মত এত সুন্দর করে শিক্ষা দিতে আমি আগেও কাউকে দেখিনি, পরেও কাউকে দেখিনি। আল্লাহর কসম! তিনি না আমাকে ধমক দিলেন, না মারলেন, আর না বকা দিলেন। বরং বললেন, 'নামাজে কথা কথাবার্তা বলাটা ঠিক নয়। নামাজ হচ্ছে, তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠের নাম।'<sup>[১]</sup>

একবার এক যুবক রাসূল ❦ এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন। এটা শুনে চতুর্দিক থেকে লোকেরা তাকে ধমক দিয়ে চুপ করতে বলল। তখন রাসূলুল্লাহ ❦ তাকে কাছে বসালেন। এরপর বললেন, 'তুমি কি এটা তোমার মায়ের ক্ষেত্রে পছন্দ করবে? সে উত্তর দিল, 'আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন! আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি সেটা কখনোই পছন্দ করি না। তখন রাসূল ❦ বললেন, 'তেমনিভাবে মানুষও তাদের মায়াদের জন্য সেটা পছন্দ করে না। এরপর রাসূল ❦ বললেন, 'তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য তা পছন্দ করবে? যুবক উত্তর দিল, 'আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন! আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি সেটা কখনোই পছন্দ করি না। তখন রাসূল ❦ বললেন, 'অনুরূপভাবে মানুষও তাদের মেয়েদের জন্য সেটা পছন্দ করে না। তিনি আরও বললেন, 'তুমি কি তোমার বোনের জন্য সেটা পছন্দ করবে? যুবক আগের মতোই উত্তর দিল। তখন রাসূল ❦ বললেন, 'তদ্রূপ লোকেরাও তাদের বোনের জন্য সেটা পছন্দ করে না। এরপর রাসূলুল্লাহ ❦ যুবকের মাথায় হাত রেখে দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! তার গুনাহ ক্ষমা করে দিন, তার মনকে পবিত্র করুন এবং তার লজ্জাস্থানকে হেফাজত করুন।'<sup>[২]</sup>

শিক্ষার্থীরা নানা সময় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। নবি ❦ তাদেরকে উত্তর জানিয়ে দিতেন। মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ ❦ বলেন, রাসূল ❦ এর কাছে আমি আরজ করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার থেকে আমি একটা কথা গুনেছি যার ব্যাপারে আমার মনে দ্বিধার সৃষ্টি হয়েছে।' উত্তরে তিনি বললেন, 'কোনো বিষয়ে তোমাদের মনে সংশয় সৃষ্টি হলে আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবে।'<sup>[৩]</sup>

আবু হুরায়রা ❦ বলেন, একবার একজন সাহাবি জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, 'যে

[১] মুসলিম, ৫৩৭।

[২] মুসলিম, ২৩২১।

[৩] আনউল কাবরীউদ: ১/৪৮।



সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী।' তখন তারা বললেন, আমরা তো আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, 'তা হলে (সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হচ্ছেন) আল্লাহর নবি ইউসুফ, যিনি আল্লাহর নবি (ইয়াকুব) এর পুত্র, আল্লাহর নবি (ইসহাক)-এর নাতি, এবং আল্লাহর খলিল (ইবরাহীম) এর প্রপৌত্র।' তারা বলল, আমরা আপনাকে এ সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, 'তাহলে কি তোমরা আরবের মূল্যবান গোত্রগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ? জাহিলি যুগের উত্তম ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পরও উত্তম, যদি তারা দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করে।' [১]

আবু যার   বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, 'আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।' আমি আবার প্রশ্ন করলাম, কোন ধরনের গোলাম মুক্ত করা উত্তম? তিনি বললেন, 'এমন গোলাম মুক্ত করা উত্তম, যে তার মনিবের কাছে বেশি প্রিয় এবং অধিক মূল্যবান।' আমি বললাম, আমি যদি তা করতে না পারি? তিনি বললেন, 'তা হলে অন্যের কাজে সাহায্য করবে অথবা কর্মহীনের কাজ করে দেবে।' আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি এমন কাজ করতেও অক্ষম হই? তিনি বললেন, 'তোমার মন্দ আচরণ থেকে লোকদের মুক্ত রাখবে। এটা হলো তোমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি সাদকা।' [২]

অনেক সময় আল্লাহর রাসূল   প্রশ্ন করতেন। উত্তরে সাহাবিরা বলতেন, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' তখন আল্লাহর রাসূল   নিজেই উত্তর বলে দিতেন। এমন করার উদ্দেশ্য ছিল সাহাবিদের মনে আশ্রয়ের সঞ্চার করা। আবু হুরায়রা   বলেন, একবার রাসূল   জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি জানো, কোন জিনিসের কারণে অধিকাংশ লোক জাহান্নামে যাবে?' সাহাবিরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূল   বললেন, 'দুটি ছিদ্র—লজ্জাস্থান এবং মুখ (এর কারণে)। অপরদিকে কোন জিনিসের বদৌলতে অধিক লোক জান্নাতে যাবে, জানো? আল্লাহর ভয় এবং উত্তম চরিত্রের কারণে।' [৩]

সাহাবিরা কখনোই নবিজির কাছে অতিরিক্ত প্রশ্ন করতেন না। অনেক সময় তো এমনও হতো যে, তাদের কোনো বিষয় জানা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নবিজির ব্যক্তিত্বের প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা থাকায় নিজেরা প্রশ্ন করতেন না। বরং তারা চাইতেন, অন্য কেউ এ প্রশ্ন করুক। এতে তাদের উত্তর জানা হয়ে যাবে।

[১] বুখারি, ৩৪৯৬।

[২] মুসলিম, ৮৪।

[৩] আল আদাবুল মুফরাদ, ২৮৯।



উমর ইবনুল খাতাব রাঃ বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সঃ এর কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমাদের কাছে এসে হাজির হলেন। তাঁর পরিধানের কাপড় ছিল ধবধবে সাদা, মাথার চুল ছিল লিকলিকে কালো। তাঁর মধ্যে সফরের কোনো চিহ্ন ছিল না। আবার আমরা কেউ তাকে চিনতামও না। তিনি নিজের হাঁটু নবি সঃ এর হাঁটুর সাথে লাগিয়ে বসে পড়লেন। আর নিজের হাত রাখলেন নবি সঃ এর দুই উরুর ওপর। তারপর বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, 'ইসলাম হচ্ছে—তুমি এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। নামাজ কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমজান মাসে রোজা রাখবে এবং বায়তুল্লাহয় পৌঁছার সামর্থ্য থাকলে হজ করবে।' আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তার কথা শুনে আমরা বিস্মিত হলাম—তিনিই প্রশ্ন করেছেন আবার তিনিই সত্যায়ন করছেন! এরপর আগন্তুক বললেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল সঃ বললেন, 'ঈমান হচ্ছে আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাদের প্রতি, তার কিতাবসমূহের প্রতি, তার রাসূলগণের প্রতি, আখিরাতের প্রতি এবং তাকদিরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখা।' আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন, আমাকে ইহসান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল সঃ বললেন, 'ইহসান হলো, তুমি এমনভাবে ইবাদত করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। যদি তুমি তাকে নাও দেখো, তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।' আগন্তুক বললেন, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল সঃ বললেন, 'এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাকারীর চাইতে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তিনি বেশি জানেন না।' আগন্তুক বললেন, তাহলে আমাকে এর আলামত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল সঃ বললেন, 'তা হলো এই যে, দাসী তার প্রভুকে জন্ম দিবে। (এককালের) নগ্নপদ, বস্ত্রহীন, দরিদ্র, বকরির রাখালদের বড় দালান-কোঠা নির্মাণের প্রতিযোগিতায় গর্ব-অহংকারে মত্ত দেখতে পাবে।'।

উমর রাঃ বলেন, পরে সে আগন্তুক চলে গেলেন। আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর রাসূল সঃ আমাকে বললেন, 'উমর! তুমি কি জানো, এই প্রণয়কারী কে ছিল?' আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূল সঃ বললেন, 'তিনি তো জিবরীল। তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।'।

আল-হা ইবনু উবাইদিল্লাহ রাঃ বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সঃ এর কাছে



এসে তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ।' সে বলল, আমার ওপর কি আরও কিছু ওয়াজিব আছে? তিনি বললেন, 'না, নেই। তবে নফল হিসাবে পড়তে পারো।' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আর রমজান মাসের সিয়াম।' সে জিজ্ঞাসা করল, আমার ওপর এ ছাড়া আরও কি ওয়াজিব আছে? তিনি বললেন, 'না, নেই।' তবে নফল হিসাবে পালন করতে পারো। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে যাকাতের কথা বললে সে জানতে চাইল, আমার ওপর কি এ ছাড়া আরও কিছু ওয়াজিব আছে? তিনি বললেন, 'না, নেই। তবে নফল হিসাবে করতে পারো।' তারপর লোকটি এই বলে প্রস্থান করল যে, আল্লাহর কসম! আমি এতে কোনো রকম হেরফের করব না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'সত্য বলে থাকলে সে সফল হবে।' [১]

## ঘরোয়া পাঠশালা

মসজিদে নববির কেন্দ্রীয় বিদ্যাপীঠ ছাড়াও অনেক স্থানে তালিমের ব্যবস্থা ছিল। মদীনার বিভিন্ন মসজিদে, পাড়ায় পাড়ায়, গোত্রে গোত্রে, ঘরে ঘরে এমনকি পথের ধারেও তালিম শুরু হয়। সাহাবিরা নিজে যেমন ইলম শিখতেন, তেমনি নিজেদের পরিবারকেও শেখানোর ব্যবস্থাও করতেন।

একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আকাশের দিকে তাকিয়ে ইলম উঠে যাওয়ার কথা জানালেন। তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন যিয়াদ ইবনু লাবিদ ؓ। তিনি জানতে চাইলেন, আমাদের থেকে কিভাবে ইলম ছিনিয়ে নেওয়া হবে, অথচ আমরা কুরআন তিলাওয়াত করে থাকি? আল্লাহর কসম! আমরা নিজেরাও তিলাওয়াত করব এবং আমাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকেও শেখাব। [২]

এক বর্ণনায় এসেছে, সাহাবি বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইলম কিভাবে উঠে যেতে পারে, অথচ তা ছড়িয়ে পড়েছে! আবার আমাদের অন্তরেও সংরক্ষিত আছে। [৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, সাহাবিরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইলম কিভাবে উঠে যেতে পারে, অথচ আমরা সবাই কুরআন পড়ি! আমাদের সন্তানদের পড়াই, তারাও তাদের সন্তানদের পড়াবে। [৪]

[১] মুসলিম, ২/৩৫৮।

[২] তিরমিযী, ২/১৫৩।

[৩] আল-ইসলাম, ৬/১০১।

[৪] ইবনু কাসীর, ২/১৫৩।



এই বর্ণনাগুলোতে মদীনায়ে জুড়ে থাকা ঘরোয়া বিদ্যাপীঠের একটা বগুচিৎ্র পাওয়া যায়।

## নৈশকালীন বিদ্যাপীঠ

সে যুগে ইলম হাসিলের জন্য নৈশ বিদ্যাপীঠও গড়ে উঠেছিল। অনেক সাহাবি সেসব নৈশকালীন বিদ্যাপীঠে অংশগ্রহণ করে কুরআনের ইলম অর্জন করতেন। তারা সেখানেই রাত কাটিয়ে সকালে নিজেদের কাজে বেরিয়ে যেতেন।

আনাস ইবনু মালিক রাঃ এমন সত্তরজন আনসার সাহাবির কথা উল্লেখ করেছেন, যারা রাতের বেলায় মদীনার শিক্ষকদের কাছে গমন করতেন। রাতে সেখানে থেকে তারা কুরআন শিখতেন। সকালে শক্তিশালী লোকেরা চলে যেতেন কাঠ এবং সুমিষ্ট পানি সংগ্রহের কাজে। আর আর্থিক দিক থেকে সামর্থবান লোকেরা বকরি কিনে পালতেন।<sup>[১]</sup>

নবিজির যুগে মসজিদের ইমামরাই সাধারণত কুরআনের তালিম দিতেন। তাদেরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত পাঠশালা। তালিম গ্রহণের জন্য সেখানে রাত দিনের ধরাবাঁধা কোনো সময়সূচি ছিল না।

## মুজাহিদদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা

সাহাবায়ে কেরাম জিহাদের মাঝেও শিক্ষাকার্যক্রম চালিয়ে যেতেন। শত্রুর এলাকায় কুরআন নিয়ে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও তাদের শিক্ষাকার্যক্রম বাহত হতো না। কোনো সাহাবির নেতৃত্বে সারিয়া যুদ্ধ শুরু হলে, বেশিরভাগ সাহাবি তাতে অংশগ্রহণ করতেন। অল্প কয়েকজন সাহাবি নিয়ে রাসূল সঃ মদীনায়ে থেকে যেতেন। এই সময়টাতে নাযিল হওয়া কুরআনের আয়াত যুদ্ধে সাহাবিরা জানতে পারতেন না। এমন অবস্থার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۖ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ  
مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا  
إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١١١﴾



মুসলিমদের পক্ষে এটাও সমীচীন নয় যে, তারা (সর্বদা) সকলে একসঙ্গে (জিহাদে) বের হয়ে যাবে। সুতরাং তাদের প্রতিটি বড় দল থেকে একটি অংশ কেন (জিহাদে) বের হয় না, যাতে (যারা জিহাদে যায়নি) তারা দ্বীনের উপলব্ধি অর্জনের চেষ্টা করে এবং সতর্ক করে তাদের কওম (এর সেই সব লোক)-কে, লোককে (যারা জিহাদে গিয়েছে,) যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে। ফলে তারা (গুনাহ থেকে) সতর্ক থাকবে।<sup>[১]</sup>

এরপর থেকে সাহাবিদের একটি দল রাসূল ﷺ এর সাথে মদীনাতে থাকতেন এ উদ্দেশ্যে যে, মুজাহিদদেরকে তারা মধ্যবর্তী সময়টুকুতে নাখিল হওয়া কুরআন শিখিয়ে দেবেন। আবার রাসূল ﷺ যখন সাহাবিদের নিয়ে জিহাদে বের হতেন তখন তাঁর সাথে থাকা সাহাবিরা মদীনা থেকে যাওয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবিদেরকে নাখিল হওয়া কুরআন শিখিয়ে দিতেন।<sup>[২]</sup>

## বিভিন্ন স্থানে জ্ঞানচর্চা

সাহাবিরা কোথাও বসে আলাপ আলোচনা করলে সেখানেও তাদের অধিকাংশ আলাপই হতো কুরআন এবং দ্বীনকে ঘিরে। এমনও হতো যে একজন অপরজনকে কুরআনের কোনো সূরা পড়তে বলেছেন কিংবা নিজেই কোনো একটি সূরা তিলাওয়াত করেছেন।<sup>[৩]</sup> সাহাবিদের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, কারও সাথে দেখা হলে বিদায় নেওয়ার আগেই তারা একে অপরকে সূরা আসর শোনাতে। তারপর সালাম দিয়ে একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিতেন।<sup>[৪]</sup>

যেসব সাহাবি পেশাগত বা অন্য কোনো কারণে নবিজির বৈঠকে হাজির থাকতে পারতেন না, তিনি এমন কোনো সাহাবি থেকে শিখে নিতেন যিনি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এভাবেই তাঁদের মাঝে চলতে থাকত শেখা এবং শেখানোর কাজ।<sup>[৫]</sup> এই বিষয়ে পূর্বেও দলিল উল্লেখ করা হয়েছে।<sup>[৬]</sup>

[১] কুরআন, ৯: ১২২।

[২] আল-আব্বাস ওয়াহিদ আলী: ১/৪০৩।

[৩] আল-কুতুব ইবনু মাল: ২/৩৭৪।

[৪] আল-মুজাহিদ আল-আব্বাস, ১: ১২৪।

[৫] কুশায়র, ৮৪।

[৬] আল-মুজাহিদ আল-আব্বাস সমীহীন, হাদীস নং: ১৬১৪।



রাসূল ﷺ মদীনা থেকে দূর-দূরান্তের অঞ্চলেও দ্বীনি তালিমের ব্যবস্থা করেছিলেন। সাহাবিদেরকে তিনি দ্বীনের প্রচারক এবং শিক্ষক বানিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পাঠাতেন। আসহাবুস সুফফার সদস্য কিংবা আগত প্রতিনিধিদলের সদস্যদেরও এই দায়িত্ব প্রদান করতেন। সহীহুল বুখারির একটি হাদীস থেকে জানা যায়, আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদলকে নবি ﷺ দ্বীনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন, 'এগুলো তোমরা মনোযোগ দিয়ে স্মরণ রেখো এবং তোমাদের পেছনে যারা রয়েছে (অর্থাৎ যারা আসতে পারেনি) তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে।'<sup>[১]</sup>

মক্কা বিজয়ের পর আতাব ইবনু উসাইদ ؓ-কে রাসূল ﷺ সেখানকার দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন। লোকদেরকে কুরআন আর দ্বীনি তালিম দেওয়ার জন্য মুআয ইবনু জাবাল ؓ-কেও সেখানে রেখে আসেন।<sup>[২]</sup>

রাসূল ﷺ এর নিযুক্ত দায়িত্বশীলরা শুধু যে নির্ধারিত অঞ্চল পরিচালনার কাজ করতেন, তা-ই নয়। বরং দ্বীনের প্রচার এবং তালিম প্রদানের দায়িত্বও তাদের ওপর ন্যস্ত থাকত। যেমন মুআয ইবনু জাবাল ؓ-কে রাসূল ﷺ ইয়ামানের জুনদ অঞ্চলের দায়িত্বশীল এবং বিচারক বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। সেখানকার লোকদের ইসলাম ও শরীয়তের তালিম প্রদান এবং কুরআন শেখানোর দায়িত্বও ছিল তাঁর ওপর।<sup>[৩]</sup>

আনাস ؓ বলেছেন, ইয়ামানবাসীরা রাসূল ﷺ এর কাছে একজন কুরআনের শিক্ষক চেয়ে আবেদন জানাল। রাসূল ﷺ তখন আবু উবাইদা ؓ-কে তাদের সাথে দিয়ে বলেছিলেন, 'এ হচ্ছে উম্মতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।'<sup>[৪]</sup>

[১] বুখারি, ৮৭।

[২] সীরাতু ইবনি হিশাম: ২/৫০০; তবাকাতু ইবনি সাদ: ১/৩৮৪।

[৩] তারীখু খলিফা ইবনু খাতিয়াত: ১/৭৩।

[৪] আল মুসতাদরাক আল্লাস সহীহাইন, ৫১৬৩।



## সাহাবায়ে কেরামের যুগে জ্ঞানচর্চা

রাসূল ﷺ এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম দ্বিনি ইলম প্রচার-প্রসারে কাজে নিয়োজিত হন। তারা ছিলেন ইসলামের মহান কাফেলার সদস্য, কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর বাহিনী, ঈমানের জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ এবং নববি পাঠশালার কৃতি শিক্ষার্থী।

রাসূল ﷺ ইন্তেকালের সময় পৃথিবীতে এমন লক্ষাধিক সাহাবি ছিলেন যারা রাসূলকে দেখেছেন এবং সরাসরি তাঁর কথা শুনেছেন। তাদের মাঝে পুরুষ এবং নারী উভয় শ্রেণিই ছিলেন। কেউ ছিলেন শহুরে আবার কেউ ছিলেন গ্রামের। কেউ দীর্ঘ সময় পেয়েছিলেন আর কেউ পাননি। তবে প্রত্যেকেই আল্লাহর রাসূল ﷺ এর নির্দেশনা অনুসারে দ্বীনকে অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। প্রত্যেকেই নিজের মতো করে ইলমি মজলিস তথা পাঠচক্রের আয়োজন করতেন।

খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে পৃথিবীর নানান অঞ্চল ইসলামের ছায়াতলে আসতে থাকে। নতুন নতুন বিজিত অঞ্চলে সাহাবিগণ বসতি স্থাপন করতে থাকেন। শাসন, বিচার এবং যুদ্ধাভিযান তারা আঞ্জাম দিতে থাকেন। পাশাপাশি চলতে থাকে শরীয়তের বিধিবিধান শিক্ষাদান এবং ইসলাম প্রচারের কাজ। তৎকালীন মুসলিম জাহানের প্রতিটি জনপদেই জ্ঞানের মশাল নিয়ে কোনো না কোনো সাহাবি ছুটে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ সেখানে স্থায়ীভাবে থেকে যেতেন আবার কেউ দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সেখানে কাটিয়ে দিতেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইলম অনুসারে তালিম প্রদান করতেন।

এক বর্ণনায় এসেছে, ৩০ হাজার সাহাবি মদীনাতে বসবাস করতেন এবং ৩০ হাজার সাহাবি থাকতেন আরবের বিভিন্ন গোত্রে। ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম বলেছেন, রাসূল ﷺ কে সরাসরি দেখেছেন এমন ১০ হাজার সাহাবি ছিলেন শুধু শামেই। হিমস শহরে ছিলেন এমন ৫ হাজার সাহাবি। কাতাদা ؓ বলেছেন,

কুফা শহরে এমন ১০৫০ জন সাহাবির আগমন ঘটেছিল যাদের মধ্যে ১৪ জন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এক বর্ণনামতে, হুদাইবিয়াতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন এমন ৩০০ জন সাহাবি এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এমন ৭০ জন সাহাবি থাকতেন ইরাকের কুফা নগরীতে।<sup>[১]</sup> এভাবেই জ্ঞানের বার্তা নিয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন নববি পাঠশালা থেকে তালিমপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ।

মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা, দামিশক, হিমস, মিশরসহ তৎকালীন মুসলিম জাহানের কেন্দ্রীয় শহরগুলোতে গড়ে উঠেছিল হিফজ, কিরাত, তাফসীর, হাদীস এবং দ্বীন শিক্ষার মজলিস। আলিম সাহাবিগণ সেসব জায়গায় দ্বীনের তালিম দিতেন এবং ফতোয়া প্রদান করতেন। প্রয়োজন অনুসারে ধারাবাহিক তালিমেরও আয়োজন করতেন। যে-কোনো সুযোগকেই তারা কাজে লাগাতেন। ইয়ামামার যুদ্ধে জাবির ইবনু আবদিল্লাহ সুলামি রাঃ আহত হলে চিকিৎসার জন্য ‘আকার’ নামক স্থানে তাকে রাখা হয়। তিনি যতদিন সেখানে ছিলেন, ততদিন সেখানকার লোকদের কুরআনের তালিম দিয়েছেন। সুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত চালিয়ে গেছেন পাঠকার্যক্রম।<sup>[২]</sup>

উমর রাঃ এর খিলাফতকালে আজারবাইজানে বিদ্রোহ দমন করা হয়। সেনাপতি আশআস ইবনু কায়স সেখানে মুসলমানদের বসতি স্থাপন করেন। তারা স্থানীয় লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। আলি রাঃ এর খিলাফতকালে আশআস ইবনু কায়স সেখানে গভর্নর হয়ে গেলে দেখেন—অধিকাংশ লোক শুধু মুসলিমই নয়; কুরআনের শিক্ষাতেও শিক্ষিত।<sup>[৩]</sup>

মুতাররিফ ইবনু আবদিল্লাহ আশশিখখির রাঃ একবার আন্নার ইবনু ইয়াসির রাঃ-কে বলেছিলেন, আমাদের একদল জিহাদ করে, আরেকদল (জনপদে) অবস্থান করে কুরআনের তালিম দেয়। মুজাহিদরা ফিরে এলে, তালিমদাতারা চলে যায় জিহাদে।<sup>[৪]</sup>

আরবের বিভিন্ন গোত্রে যে-সমস্ত সাহাবিরা অবস্থান করতেন তারা স্থানীয় লোকদের কুরআন এবং দ্বীন শিক্ষা দিতেন। শিক্ষাদান পদ্ধতি একাকী এবং সম্মিলিত—দুভাবেই হতো। যেখানে বসতেন, সেখানেই জ্ঞান আদান-প্রদানের রীতি ছিল তাদের অভ্যাস। আবু সাদ্দ রাঃ বলেছেন, সাহাবিরা কোথাও বসলে

[১] তাদরীবুর রাবি: ৪০২ এবং ৪০৫; তবকাতু ইবনি সাদ: ৬/৯।

[২] আত তারীখুল কাবীর: ৪/১৮৪।

[৩] ফুতুহুল বুলদান: ২৩৭ ও ৩২৪।

[৪] তবকাতু ইবনি সাদ: ১/৩৭৪।



ফিকহ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করতেন। নয়তো একজনকে কুরআন পড়তে বলতেন আর অন্যরা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন।<sup>[১]</sup>

উমর রা শিশু-শিক্ষার উদ্দেশ্যে মজবের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানকার উস্তাদদের জন্য বেতনের ব্যবস্থাও ছিল। তবে ফকিহ সাহাবিগণ যেসব পাঠচক্রের আয়োজন করতেন, সেগুলো ছিল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। সমস্ত প্রতিদান আল্লাহর কাছে, এই চেতনা থেকে তারা কাজগুলো করতেন। তাদের জন্য কোনো ধরনের বেতনভাতা নির্দিষ্ট ছিল না। ২০ হিজরিতে উমর রা পদমর্যাদা বিবেচনা করে রাষ্ট্রীয়ভাবে সাহাবিদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন। তা সত্ত্বেও অনেক সাহাবি ভাতা নেওয়া অপছন্দ করতেন। আবার অনেক সাহাবি নির্ধারিত অঙ্ক থেকেও কম ভাতা গ্রহণ করতেন। এই মহান দায়িত্বের বিনিময়ে ভাতা গ্রহণ করা বাদ দিয়ে, অনেকেই শিক্ষার্থীদের জন্য নিজের পকেট থেকে খরচ করতেন।<sup>[২]</sup>

কুরআন হাদীস এবং ফিকহ ফতোয়ার যে শিক্ষা এবং প্রচারণা সাহাবায়ে কেরাম আঞ্জাম দিয়েছেন, সবদিক থেকে তা ছিল নিষ্কলুষ। তাতে বিন্দু পরিমাণ সংশয়ের অবকাশ নেই। সাহাবিগণ সবাই নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন। তবে মানবিক দিক বিবেচনায় তাদের বিস্মৃতি ঘটতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে নিজের অপারগতার কথা জানিয়ে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁরা সর্বোচ্চ সতর্কতার পরিচয় দিতেন।

ইয়াযীদ ইবনু হাইয়ান হুসাইন ইবনু সাবুরা এবং উমর ইবনু মুসলিম রা একদিন যায়দ ইবনু আরকাম রা এর কাছে গেলেন। সেখানে যায়দকে হুসাইন রা বললেন, ‘আপনি তো বহু কল্যাণ প্রত্যক্ষ করেছেন। আল্লাহর রাসূল স কে দেখেছেন, তাঁর থেকে হাদীস শুনেছেন, তাঁর পাশে থেকে যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁর পেছনে সালাত আদায় করেছেন। আপনি তো বহু কল্যাণ লাভ করেছেন। রাসূলুল্লাহ স থেকে আপনি যা শুনেছেন, তা আমাদের বলুন।’ যায়দ রা বললেন, ভাতিজা! আমার বয়স হয়ে গেছে, আমি পুরোনো যুগের মানুষ। আল্লাহর রাসূল স এর কাছ থেকে যা যা সংরক্ষণ করেছিলাম, এর কিছু কিছু অংশ ভুলে গিয়েছি। তাই আমি যা বলি, তা গ্রহণ করো। আর যা বলা থেকে বিরত থাকি, সে ব্যাপারে আমাকে জোরাজুরি কোরো না।<sup>[৩]</sup>

ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রেও সাহাবিরা চাইতেন, অন্য কোনো আলিম সাহাবি

[১] তবাকাতু ইবনি সাদ: ২/৩৭৪।

[২] সিফাতুস সফওয়া: ১/২৫৮।

[৩] মুসলিম, ২৪০৮।

ফতোয়া দিক। নিজেকে জ্ঞানী হিসেবে জাহির করা বা এমনটা দাবি করা তারা এড়িয়ে চলতেন। সাহাবায়ে কেলাম ছিলেন কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে সমৃদ্ধ। এ জ্ঞানই তাঁরা বিতরণ করতেন। পাশাপাশি আরও কিছু বিষয়ের জ্ঞানও তাঁদের ছিল। যেমন আবু বকর, আবুল জাহম ইবনু হুযাইফা, জুবাইর ইবনু মুতইম আরবের বংশধারা সম্পর্কে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এ ছাড়াও উসমান ইবনু আফফান, আলি ইবনু আবি তালিব এবং আকিল ইবনু আবি তালিব এ বিষয়ে জ্ঞান রাখতেন।<sup>[১]</sup> যায়দ ইবনু সাবিত ছিলেন সুরিয়ানি ভাষার পণ্ডিত। রাসূল এর নির্দেশে মাত্র ১৭ দিনে এই ভাষা রপ্ত করেছিলেন। এ ব্যাপারে সহীহুল বুখারিতে বর্ণনা আছে। সুপ্নের ব্যাখ্যাদানে পারদর্শী ছিলেন আবু বকর। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ছিলেন তাফসীর, হাদীস, মাগায়ী, কবিতা এবং আরবের ইতিহাসের ব্যাপারে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। প্রতিদিন এসব বিষয় তিনি পৃথক পৃথকভাবে শেখাতেন। হাদীস, ফিকহ, ফারাজেজ, গণিত এবং আরবি কবিতা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখতেন আবুদ দারদা।<sup>[২]</sup> উকবা ইবনু আমির কুরআনের কীরাত, ফারাজেজ এবং ফিকহের ব্যাপারে উচ্চ ধারণা রাখতেন। পাশাপাশি কবি, লেখক, সাহিত্যিক এবং উঁচু স্তরের মুহাদ্দিসও ছিলেন তিনি। আয়িশা হাদীস, ফিকহ এবং ফারাজেজের সাথে সাথে আরবের বংশবিদ্যা, আরবি কবিতা এবং চিকিৎসাবিদ্যার ভালো জ্ঞান রাখতেন।<sup>[৩]</sup>

## মসজিদে জ্ঞানচর্চার মজলিস

মসজিদে নববি রাসূল এর জীবদ্দশাতেই প্রধান বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়েছিল। সাহাবি এবং তাদের পরবর্তী একশ বছর যাবত মুসলিম জাহানের মসজিদগুলোতে জ্ঞানচর্চার মজলিস বসত। ইমাম বুখারি সহীহুল বুখারিতে একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন, ‘মসজিদে ইলম এবং ফতোয়ার আলোচনা করা।’ এক ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস এর কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি বলেন, ‘আমি কি তোমাকে এর থেকে উত্তম নির্দেশনা দেবো? তুমি মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে ফরজ, সুন্নত এবং ইসলামি জ্ঞানের শিক্ষা দাও।’<sup>[৪]</sup>

সাহাবিদের যুগে মসজিদে নববির বিভিন্ন স্থানে ইলমি বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো।

[১] জামহারাতে আনসাবিল আরব: ৫।

[২] আল জারহ ওয়াত তাদীল: ২/২৭।

[৩] তবাকাতু ইবনি সাদ: ২/৩৭৫।

[৪] জামিউ বায়ানিল ইলম: ১/২১।



সেখানে অনেক স্থানীয় এবং বহিরাগত শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতেন। জুনদুব ইবনু আবদিল্লাহ রাঃ বলেন, ‘ইলম শেখার জন্য আমি মদীনায়ে গিয়েছিলাম। মসজিদে নববিত্তে প্রবেশ করে দেখি, শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন স্থানে গোলাকার হয়ে হাদীস আলোচনা করছে। বিভিন্ন পাঠচক্র পার হয়ে আমি একটিতে গিয়ে বসে পড়ি।’<sup>[১]</sup>

সাহাবিদের কাছে এসব ইলমি বৈঠক ছিল ইবাদত এবং বরকতের স্থান। তারা বিশ্বাস করতেন যে এসব বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা সাওয়াবপ্রাপ্ত হয়। কারণ রাসূল সঃ বলেছেন, ‘যখন কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর কোনো ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং একে অপরে সাথে পর্যালোচনায় নিয়োজিত থাকে, তখন তাদের ওপর শান্তি অবতীর্ণ হয়। রহমত তাদের আচ্ছাদিত করে নেয় এবং ফেরেশতারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নৈকট্যধারী (ফেরেশতাগণের) মাঝে তাদের আলোচনা করেন।’<sup>[২]</sup>

## মজলিসের সময়সূচি

এসব মজলিসের সময়সূচি সম্পর্কে এটা জানা যায় না যে সেগুলো কি দৈনিক ছিল না সাপ্তাহিক। অবশ্য রাসূল সঃ সকালে মজলিসে আগমন করতেন বলে জানা যায়। আর সাহাবায়ে কেরাম তো রাসূল সঃ এর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করতেন। সে হিসেবে তাদের মজলিসও সকালে হতে পারে বলে অনুমান করা যায়। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাঃ এর মজলিস সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি সপ্তাহের একেক দিন একেক বিষয়ের তালিম দিতেন।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাঃ তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র এবং মুখপাত্র ইকরিমা রাঃ-কে বলেছিলেন, ‘তুমি প্রতি জুমুআয় লোকদেরকে হাদীস শোনাবে। যদি এটা যথেষ্ট মনে না করো, তাহলে সপ্তাহে দুবার করতে পারো। আরও বেশি করতে চাইলে তিনবার। এর চেয়ে বেশি করে মানুষের মনে কুরআনের প্রতি বিরক্তি সৃষ্টি করো না।’<sup>[৩]</sup>

সম্ভবত তৎকালীন লোকদের সহজতার দিকে লক্ষ্য রেখে পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করা হতো। সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবিয়ীদের যুগে হাদীস বর্ণনার

[১] তবাকাতু ইবনি সাদ: ২/৫০০।

[২] মুসলিম, ২৬৯৯।

[৩] বুখারি, ৬৩৩৭।

মজলিসগুলো সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য এ যাবত আমাদের হাতে আসেনি। ইমাম সুয়ুতি রহ লিখেছেন, 'কোনো মুহাদ্দিসের হাদীস লেখানোর দিন বা সময় আমি জানতে পারিনি।'<sup>[১]</sup>

তবে জুমুআর দিন নামাজের আগে যে কোনো মজলিস হতো না, এটা নিশ্চিত। কারণ একটি হাদীস থেকে জানা যায়, জুমুআর দিন নামাজের পূর্বে মসজিদে গোল হয়ে বসতে রাসূল স বারণ করেছেন।<sup>[২]</sup> সম্ভবত এর কারণ ছিল যে, জুমুআর দিন চারিদিকের গ্রাম এবং শহরতলি থেকে মুসলমানরা দলে দলে মসজিদে নববিতে আসতে শুরু করতেন। মসজিদে প্রবেশ করে তারা যিকির আযকারসহ অন্যান্য নফল আমলে মশগুল হয়ে যেতেন। এজন্য মজলিস করা হতো না। সাহাবীদের যুগেও একই নিয়মের প্রচলন ছিল। অবশ্য জুমুআর নামাজের আগে ওয়াজ নসিহত করা হতো। আবু হুরায়রা রা এ সময় মিম্বরে দাঁড়িয়ে নসিহত করতেন। ইমামকে আসতে দেখলে বসে পড়তেন। মুআবিয়া ইবনু কুররা রা বলেন, মুয়াইনা গোত্রের ৩০ জন সাহাবিকে আমি দেখেছি, যাদের শরীরের নানা জায়গাতে জিহাদ এবং যুদ্ধের আঘাতের চিহ্ন ছিল। তারা জুমুআর দিন গোসল করে কাপড় বদলাতেন। সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। তারপর মসজিদে গিয়ে প্রথমে দু রাকআত নামাজ পড়তেন। এরপর ইমাম সাহেব খুতবার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত নিজেরা ইলম এবং সুন্নাহ নিয়ে আলোচনায় রত থাকতেন।<sup>[৩]</sup>

## মজলিসের পদ্ধতি

রাসূল স এর মজলিসে বসার পদ্ধতি কেমন ছিল তা আগে বলা হয়েছে। সাহাবিরাও সেভাবেই বসতেন। সাধারণত তাদের মজলিসগুলো হতো মসজিদের বিভিন্ন খুঁটির কাছে। উসমান রা নিজের খিলাফতকালে মসজিদে নববি সম্প্রসারিত এবং পুনর্নির্মাণ করেন। সেসময় তিনি পাথরের স্তম্ভ যুক্ত করেন। তখন মসজিদে নববির পরিসর আগের চেয়েও বেড়ে যায়। সে যুগে মসজিদে জ্ঞানচর্চা এবং যিকিরের মজলিসগুলোর চিত্র কেমন ছিল, তা বুঝে আসে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা এর কথা থেকে। এক ছাত্রকে তিনি বলেছিলেন, 'এই মসজিদে এমন সময়ও আমি কাটিয়েছি, যখন সেটা ছিল

[১] তাদরীকুর রাবি: ৩৪৪।

[২] আবু দাউদ, ১০৭৯।

[৩] আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফক্কিহ: ২/১৩০।



বাগানের মতো। এখন তো তার জায়গায় জায়গায় বড় বড় গাছ শোভা পাচ্ছে। যে গাছের নিচে তুমি চাও, বসতে পারো।<sup>[১]</sup>

## হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি

সাহাবায়ে কেরাম ওজু করে মজলিসে উপস্থিত হতেন। সেখানে গিয়ে দু রাকআত নামাজ পড়তেন। এরপর আদবের সাথে ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে কিবলামুখী হয়ে বিসমিল্লাহ পড়তেন। তারপর পড়তেন আল্লাহর হামদ এবং রাসূলের ওপর দরুদ। যে সাহাবি যে-বিষয়ে জ্ঞানী ছিলেন তিনি সে বিষয়ে আলোচনা শুরু করতেন। তবে একটি বিষয়ে সবাই ছিলেন অভিন্ন। সেটা হচ্ছে হাদীস বর্ণনা। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মূলনীতি এবং কর্মপন্থা অনুসারে হাদীস বর্ণনা করতেন। হাদীস কেবল মুখস্থ করা হবে নাকি লেখাও হবে, সেটা নিয়ে প্রথম দিকে তাদের মাঝে মতভেদ ছিল। তবে দ্রুতই হাদীস লেখার চল শুরু হয়ে যায়।

হাদীস বর্ণনার অনেকগুলো পদ্ধতি ছিল। পরবর্তীকালে মুহাদ্দিসগণ সেসবের ভিন্ন ভিন্ন পারিভাষিক নাম নির্ধারণ করেছেন। সাহাবিদের যুগে থাকা হাদীস বর্ণনার পদ্ধতিগুলো এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

» **প্রথম পদ্ধতি:** সাহাবিরা তাদের ছাত্রদের সামনে হাদীস বর্ণনা করতেন। ছাত্ররা সেসব লিখে নিতেন বা মুখস্থ করতেন। এটাই হলো হাদীস বর্ণনার সর্বোত্তম পদ্ধতি। এ পদ্ধতিই সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল।

» **দ্বিতীয় পদ্ধতি:** সাহাবায়ে কেরামের ছাত্ররা তাদের সামনে তাদের থেকে শোনা হাদীসের পুস্তিকা বা অনুলিপি পড়তেন। সাহাবিরা তখন তাদের পাঠকে সত্যায়ন করতেন।

» **তৃতীয় পদ্ধতি:** সাহাবিরা কিতাব থেকে পড়তেন আর ছাত্ররা তা শুনতেন।

» **চতুর্থ পদ্ধতি:** কোনো কোনো সাহাবি হাদীসের সংকলন তৈরি করে ছাত্রদের দিয়ে দিতেন। ছাত্ররা সেই সংকলন থেকে বর্ণনা করতেন।

» **পঞ্চম পদ্ধতি:** উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাঃ এবং অন্যান্য নারী সাহাবিরা পর্দার আড়াল থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। ছাত্ররা মনোযোগ দিয়ে তা শুনতেন।

[১] আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল: ১৮০।

» ষষ্ঠ পদ্ধতি : এ ছাড়াও সাহাবিদের মাঝে সমকালীনদের একজন থেকে অপরজনের এবং ছোটদের থেকে বড়দের বর্ণনা করার পদ্ধতির প্রচলন ছিল।

## তালিমের রীতিনীতি

আরবের বেশ কিছু অঞ্চলে অনারব জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা বসবাস করত। ইয়ামান এবং মক্কায় অনেক হাবশী বংশোদ্ভূত নাগরিক প্রাচীনকাল হতেই থাকত। এ ছাড়া হিন্দুস্তানের জাট-সহ অন্যান্য গোত্রের লোকজন ইরাক ও আরবের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাস করত। বিশেষত ইরাকের প্রধান দুই শহর কুফা এবং বসরা ছিল অনারব শহর। এ শহর দুটিতে ইরানি বংশোদ্ভূত লোক ছিল অনেক। এই বিপুল জনসংখ্যার মাঝে সাবেক দাস যেমন ছিল, তেমনি ছিল স্বাধীন জনগোষ্ঠীর লোক। তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামি সমাজভুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাদের অনেকেই উন্নীত হন ইসলামি জ্ঞানচর্চার নেতৃস্থানীয় স্তরে।

সাহাবিদের ইলমি মজলিসগুলোতে এধরনের ছাত্র ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাদের জন্য আরবি থেকে ফারসিতে অনুবাদ করে দেওয়ার মতো যোগ্য লোক দরকার পড়ত। বিশেষত আবু হুরায়রা রা এবং ইবনু আব্বাস রা এর মজলিসে অনেক ফারসিভাষী লোক অংশগ্রহণ করতেন। পারসিকদের বোঝার সুবিধার্থে আবু হুরায়রা রা তার মজলিসে ফারসি ভাষা ব্যবহার করতেন। তাঁর জন্মভূমি ছিল ইয়ামানের নাজরান অঞ্চলে। সম্রাট কিসরার সময় থেকেই সেখানে অনেক পারসিক বসবাস করত। সে অঞ্চলে আরবির পাশাপাশি ফারসিরও চল ছিল। তাই স্থানীয়রা সে ভাষা বলতে এবং বুঝতে পারত। সেই সূত্রেই আবু হুরায়রা রা এর ফারসি ভাষা জানা ছিল। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা তার মজলিসে থাকা পারসিকদের বোঝার সুবিধার্থে দোভাষী নিয়োগ দিয়েছিলেন। আবু জামরা এবং নসর ইবনু ইমরান এ দায়িত্ব পালন করতেন। তারা আরবি ফারসি উভয় ভাষাতেই ছিলেন দক্ষ। ইবনু আব্বাস রা এর কথা আরবি থেকে ফারসিতে অনুবাদ করে উঁচু আওয়াজে গোটা বৈঠকে ছড়িয়ে দিতেন তারা।<sup>[১]</sup>

ছাত্রদের প্রতি সাহাবিরা ছিলেন অত্যন্ত কোমলপ্রাণ। ছাত্রদের তারা অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এ ক্ষেত্রে আন্তরিকতায় কোনো রকম ঘাটতি রাখতেন না।

[১] বখারি। তাশিহাতুন নবী।



আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ؓ এর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, আপনি কাকে বেশি স্নেহ করেন? উত্তরে তিনি বললেন, ‘আমার সেই ছাত্রকে, যে উপস্থিত সবাইকে ডিঙিয়ে যতটা সম্ভব আমার কাছে এসে বসে। সামর্থ্য থাকলে আমি এমন ব্যবস্থা করতাম, যাতে তার মুখে কোনো মাছি না বসে। তার মুখে মাছি বসতে দেখলে আমার খুব কষ্ট হয়।’<sup>[১]</sup>

যির ইবনু হুবাইশ ؓ বলেন, সাফওয়ান ইবনু আসসাল ؓ এর কাছে আমি গেলে তিনি বললেন, হে যির! কী উদ্দেশ্যে তোমার আগমন? আমি বললাম, ইলমের অন্বেষণে। সাফওয়ান ؓ বললেন, ‘ইলম অন্বেষণকারীর জন্য ফেরেশতারা নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন।’<sup>[২]</sup>

আবুল আলিয়া রুফাই আররিয়াহি ؓ প্রথম জীবনে ছিলেন ক্রীতদাস। দাসত্বের জীবনেই তিনি কুরআন তিলাওয়াত এবং পড়ালেখা শিখেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ؓ তাকে ডেকে নিজের আসনের ওপর বসাতেন। অথচ কুরাইশের নেতৃস্থানীয় অনেকেই নিচে বসে থাকত। আবুল আলিয়ার সম্মান দেখে তারা নিজেরা বলাবলি করতেন, ‘ইলম এভাবেই ব্যক্তির সম্মান বাড়ায় এবং আলিমকে বসায় রাজার সিংহাসনে।’<sup>[৩]</sup>

সাহাবিদের মজলিসে অধিক পরিমাণে কমবয়সী কিশোর তরুণরাও অংশগ্রহণ করতেন। এ ব্যাপারে নবি ﷺ এর অসিয়ত ছিল যেন তাদের সাথে সদাচার করা হয়। সেমতে মজলিসে কমবয়সীদের দেখলে সাহাবিরা খুশি হতেন। তাদের উষ্ণ অভিনন্দন জানাতেন।

হারুন আবদি ؓ বলেছেন, আবু সাঈদ খুদরি ؓ তাঁর মজলিসে তরুণ শিক্ষার্থীদের আসতে দেখলে বলতেন, ‘নবিজি যাদের জন্য অসিয়ত করে গেছেন তাদের অভিনন্দন।’ আমরা জানতে চাইলাম, নবিজি আমাদের জন্য কী অসিয়ত করেছেন? তিনি বললেন, নবি ﷺ বলেছিলেন, ‘আমার মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে লোক আসবে। তাদের সাথে তোমরা কোমল আচরণ করো এবং তাদেরকে হাদীস শিক্ষা দিয়ো।’<sup>[৪]</sup> ইতিহাস সাক্ষী, সাহাবিদের মজলিসে বসা সেই কমবয়সী শিক্ষার্থীরাই নববি ইলমের ধারক বাহক হয়েছিলেন। পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন নববি ইলমির সুবাস।

[১] আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ: ২।

[২] তিরমিজি, ৩৫৩৫।

[৩] তাযকিাতুল হুফফায: ১/৫৮।

[৪] আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল: ১৭৬।

তালিম দানের সময় সাহাবিরা খুব রুঢ় হয়ে থাকতেন না। সেসময় তাদেরকে প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর দেখাত। হাসিমুখ, খোশালাপী এবং উদ্দীপ্ত থাকতেন। ছাত্রসুলভ মানসিকতার সাথে পরিচিত থাকায় পাঠ চলার সময় কখনো কখনো আনন্দদায়ক কথাও বলতেন। ছাত্রদের মাঝে যাতে বিরক্তির উদ্বেক না ঘটে সেজন্য তারা সতর্ক থাকতেন। আবুদ দারদা   বলতেন, ‘কখনো কখনো গুরুত্বহীন কথা বলে অন্তরকে হালকা করার চেষ্টা করি। যাতে এর মাধ্যমে তা হক কথার ক্ষেত্রে শক্তি খুঁজে পায়।’

আবদুল্লাহ ইবনু মিরদাস   বলেন, ইবনু মাসউদ   প্রতি বৃহস্পতিবার আমাদের নসিহত করতেন। তার আলোচনা এতটা হৃদয়স্পর্শী হতো যে, সম্পূর্ণ আলোচনা পর আমাদের আরও শুনতে ইচ্ছে হতো। আবু ওয়াইল   বলেন, ইবনু মাসউদ   প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদের উদ্দেশ্যে নসিহত করতেন। কেউ একজন তাঁকে বলল, হে আবু আবদির রহমান! আপনি প্রতিদিন আমাদের নসিহত করলে ভালো হতো। তিনি বললেন, ‘শোনো, তোমাদের ক্লান্ত করতে আমি পছন্দ করি না। আমি নসিহত করার ব্যাপারে তোমাদের (অবস্থার) প্রতি লক্ষ্য রাখি, যেমন রাসূল   আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। যাতে আমাদের বিরক্তির উদ্বেক না হয়।’<sup>[১]</sup>

রাসূল   এর মজলিস সম্পর্কে জাবির ইবনু সামুরা   বলেছিলেন, ‘তিনি দীর্ঘসময় নীরব থাকতেন। হাসতেন খুব কম। অনেক সময় সাহাবিরা তাঁর সামনে কবিতা আবৃত্তি করতেন। সাহাবিরা নিজেদের বিষয় নিয়ে হাসিমজা করলে তিনি মুচকি হাসতেন।’<sup>[২]</sup> তবে এই হাসিমজার মাঝেও মজলিসের ভাবগাম্ভীর্য বজায় থাকত। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ই নিজ নিজ সীমারেখায় থাকতেন। কোনো শিক্ষার্থীর মুখ থেকে অনুপযুক্ত কথা বেরিয়ে আসলে সেজন্য তারা কঠোর ভাষায় সতর্ক করতেন। সাহাবায়ে কেরাম তাদের ছাত্রদের শিখতে উদ্বুদ্ধ করতেন। এজন্য তাদের সাহস যোগাতেন। কখনো-বা পরীক্ষা করতেন। ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তাদের দিকনির্দেশনা দিতেন। তাদের দিয়ে মাসআলা বলাতেন।

সাইদ ইবনু জুবাইর   বলেন, ইবনু আব্বাস   একদিন আমাকে বললেন, ‘তুমি যে হাদীসগুলো আমার কাছে পড়েছ সেগুলো অন্যদের কাছে কিভাবে বর্ণনা করবে, সেটা আমি দেখতে চাই।’ সাইদ বলেন, এ কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম। তখন তিনি বললেন, ‘আমার সামনে তুমি হাদীস বর্ণনা

[১] বুখারি, ৭০।

[২] আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ: ২/১১০-১১১।



করতে পারছ, এটা কি তোমার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ নয়? তুমি সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারলে তো ভালো। আর ভুল হলে আমি শুধরে দেবো।’<sup>[১]</sup>

আবু হুরায়রা এবং আবু যার গিফারি রাঃ বলতেন, ‘দ্বীনি ইলমের একটি অধ্যায় শেখা আমাদের কাছে এক হাজার রাকাত নফল নামাজ থেকে উত্তম। আর কাউকে দ্বীনি ইলমের একটি অধ্যায় শেখানো আমাদের কাছে একশ রাকাত নফল নামাজ থেকেও উত্তম। চাই সে আমল করুক বা না-করুক। রাসূলুল্লাহ সঃ-কে আমরা এ কথা বলতে শুনেছি যে, ইলম তালাশরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার মৃত্যু হবে শহিদি মৃত্যু।’<sup>[২]</sup>

হাদ্রদের উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাঃ বলতেন, ‘ইলম ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তা অর্জন করো। মনে রাখবে, ইলম ফুরায় মূলত ইলমের অধিকারীদের মৃত্যুর মাধ্যমে। কার কখন কোন ইলমের দরকার পড়বে তা কেউ বলতে পারে না। অচিরেই এমন কিছু লোক তোমরা দেখতে পাবে, যারা আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করবে, কিন্তু তারা নিজেরাই কিতাবুল্লাহকে পিছনে ফেলে রাখবে। এজন্যই তোমাদের ইলম অর্জন করতে হবে। সাবধান! বিদআত থেকে বেঁচে থেকো। সাবধান! কলহ-বিবাদে জড়িয়ে না। আদি জিনিস তথা কিতাব এবং সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো।’<sup>[৩]</sup>

তিনি আরও বলতেন, ‘যে মজলিসে ইলম এবং হিকমতের কথা আলোচনা হয়, সেটাই সর্বোত্তম মজলিস। সেখানে আল্লাহর রহমত নাযিল হওয়ার ব্যাপারে আমি আশাবাদী। কারো সামনে তাদের বুঝের উর্ধ্বে এমন কোনো হাদীস বর্ণনা করা ফিতনার কারণ। শ্রোতা মনোযোগী হলে তবেই হাদীস বর্ণনা করবে। শ্রোতাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে দেখলে সাথে সাথে হাদীস বর্ণনা করা বন্ধ করে দেবে।’<sup>[৪]</sup>


হাজ্জাজ ইবনু আমর রাঃ বলেছেন, একবার আমি যায়দ ইবনু সাবিত রাঃ এর মজলিসে ছিলাম। এক ব্যক্তি এসে একটি মাসআলা জানতে চাইলে তিনি আমাকে বললেন, ‘মাসআলাটা তুমি বলে দাও।’ আমি বললাম, ‘আমরা তো আপনার কাছে শিখতে এসেছি।’ তারপরও যায়দ রাঃ আমাকে মাসআলাটি বলার নির্দেশ দিলেন। অগত্যা আমি বললাম, ‘যায়দ রাঃ থেকে আমরা এমনটিই

[১] তবাকাতু ইবনি সাদ: ৩।


[২] জামিউ বায়ানিল ইলম: ১/২৫ ও ১/১২৮।



[৩] তাযকিরাতুল হুফফায: ১/১৫।






[৪] মুসলিম ভূমিকা এবং অন্যান্য গ্রন্থ।

শুনেছি।' যায়দ  তখন বললেন, 'সে ঠিক বলেছে।'<sup>[১]</sup>

## গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী কয়েকজন সাহাবি

এক লাখেরও বেশি সাহাবি ঈমানের সাথে নবি  এর দেখা পেয়েছিলেন, তাঁর কথা শোনা এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাদের প্রত্যেকেই হয়ে ওঠেন দ্বীনের প্রচারক এবং শিক্ষক। কিন্তু তাদের মাঝে কয়েকজন ছিলেন গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। পৃথিবীবাসী যাদের সূতন্ত্রভাবে সমীহ করে। কলেবর বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় এই সাহাবিদের থেকে মাত্র কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত জীবনলেখ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে।

অধিকাংশ সাহাবি ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাবিয়রা তাদের থেকে উপকৃত হয়েছেন। তারপরও দেখা গেছে, যোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তার কারণে কয়েকজন সাহাবি উম্মতের কাছে অনুসরণীয় হয়ে উঠেছিলেন। সবাই কোনো রকম সংকোচ ছাড়াই ফিকহের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করতে থাকে। তাদের ছাত্ররাও নিজেদের উস্তাযের মাযহাব প্রচার শুরু করে দেন। এ ব্যাপারে ইমাম বুখারি  এর উস্তাদ আলি ইবনুল মাদিনি  লিখেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, যায়দ ইবনু সাবিত এবং আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ছাড়া সাহাবাদের মাঝে এমন কোনো আলিম ছিলেন না—যার মাযহাবের অনুসরণ তার ছাত্ররা করতেন এবং যার ফতোয়া অনুসারে তারা ফতোয়া দিতেন এবং যার বাতলানো পদ্ধতিতে আমল করতেন।'<sup>[২]</sup>

এই সংক্ষিপ্ত কথাটির চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন আল্লামা ইবনুল কাইয়িম । তিনি লিখেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, যায়দ ইবনু সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনু উমর এবং আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস -এর ছাত্রদের মাধ্যমেই পৃথিবীতে দ্বীন, ফিকহ এবং ইলম বিস্তার লাভ করেছে। এই চারজনের ছাত্রই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ইলমের উৎস। মদীনার লোকেরা যায়দ ইবনু সাবিত এবং আবদুল্লাহ ইবনু উমর -এর মাধ্যমে ইলম পেয়েছে। মক্কাবাসীরা ইলম পেয়েছে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস -এর ছাত্রদের মাধ্যমে। আর ইরাকবাসীরা পেয়েছে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ -এর ছাত্রদের মাধ্যমে।'<sup>[৩]</sup> অর্থাৎ এই চারজন সাহাবির ফিকহি মাযহাবই মৌলিকভাবে উম্মতের মাঝে প্রচলিত

[১] জামিউ বায়ানিল ইলম: ১/১২১।

[২] ইলালুল হাদীস ওয়া মারিফাতুর রিজাল: ৪৩।

[৩] ইলালুল মুওয়াফ্ফিয়ীন: ১/১৬।



হয়েছে। তাদের তুলনায় অন্যান্য সাহাবিদের অবদান উম্মতের মাঝে এতটা প্রসারিত হয়নি।

নববি ইলমের ধারক বাহক যেসব সাহাবি ছিলেন, তাদের অনেকেই রাসূলের যুগে এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে বিভিন্ন যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। যারা বেঁচে ছিলেন তাদের কেউ কেউ শাসন, বিচারকার্য এবং তালিম দানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মুসলিম জনপদে ছড়িয়ে পড়েন। কেউ কেউ নিজের গোত্রের থেকে যান। আনুষ্ঠানিকভাবে তালিম প্রদানের রীতি চালু হওয়ার আগেই অনেক সাহাবির ইন্তেকাল হয়ে যায়। এ কারণে মদীনায় থেকে যাওয়া বা বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরিত সাহাবিরাই ছিলেন নববি বিদ্যাপীঠের উদ্যোক্তা এবং প্রতিষ্ঠাতা। তাদের মাধ্যমেই মদীনাসহ অন্যান্য মুসলিম নগরীগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হয় বিভিন্ন বিদ্যাপীঠ।

সাহাবিদের মধ্যে কয়েকজন কারী<sup>[১]</sup> এবং শিক্ষকদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন নবি ﷺ। তাদের থেকে ইলম অর্জন করার জন্য ফরমানও জারি করেছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর সেইসব সাহাবিরাই ইলম প্রচারের জন্য বিদ্যাপীঠ গড়ে তুলেছিলেন। তাদের বড় একটি অংশ মদীনায় থেকে শিক্ষাদানের কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। এর বাইরে আরেকটি বৃহৎ অংশ মক্কা, কুফা, শাম মিসর-সহ তৎকালীন মুসলিম জাহানের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ইলমের প্রসার ঘটাতে থাকেন। সবারই ইলমের উৎস ছিল মসজিদে নববির শিক্ষাকেন্দ্র।

## উবাই ইবনু কাব রা.

উবাই ইবনু কাব ؓ ছিলেন ওহিলেখক, কুরআন-সংকলক এবং কারীদের প্রধান। আকাবায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বাইয়াতে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদর-সহ সব যুদ্ধে রাসূল ﷺ এর সাথে শরিক ছিলেন তিনি। তাকে সম্বোধন করে নবি ﷺ বলেছিলেন, ‘আবুল মুনযির, ধন্য তোমার ইলম!’<sup>[২]</sup>

তাঁর থেকে কুরআন শেখার নির্দেশ দিয়ে নবি ﷺ বলেছেন, ‘তোমরা চার ব্যক্তি থেকে কুরআন শিক্ষা করো—আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, সালিম, মুআয

[১] কুরআনের বাহক যেসব সাহাবি স্বয়ং নবি ﷺ থেকে কুরআন সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় শিখেছিলেন বা সরাসরি নবি ﷺ থেকে যারা শিখেছেন তাদের থেকে শিখেছেন, তাদেরকে সে যুগে কারী বলা হতো।

[২] মুসলিম, ৮১০।

এবং উবাই ইবনু কাব।<sup>[১]</sup>

নবি ﷺ একবার উবাই ইবনু কাব ﷺ-কে বলেছিলেন, তোমাকে কুরআন পড়ে শোনানোর জন্য আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। উবাই ইবনু কাব ﷺ তখন বললেন, আল্লাহ কি আপনার কাছে আমার নাম উল্লেখ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ তোমার নাম উল্লেখ করেছেন। একথা শুনে উবাই ইবনু কাব ﷺ কাঁদতে লাগলেন। এরপর নবিজি তাকে সূরা বাইয়্যিনাহ পড়ে শোনালেন।<sup>[২]</sup>

উমর ﷺ মসজিদে নববিতে ২০ রাকাত তারাবি পড়ানোর জন্য উবাইকেই দায়িত্ব দিয়েছিলেন। উমর ﷺ তার খিলাফতকালে উবাই ﷺ এর সাথে গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল বিষয়াদি নিয়ে পরামর্শ করতেন। কখনো তাকেই সিদ্ধান্তদাতা এবং বিচারক বলে মেনে নিতেন।

উবাই ﷺ জাহিলি যুগ থেকেই পড়ালেখা জানতেন। নবিজির জীবদ্দশায় আসহাবুস সুফফার সদস্য এবং মদীনায় আগত প্রতিনিধিদের কুরআন শেখানোর দায়িত্ব ছিল আবু বকর, উবাই ইবনু কাব এবং সাদ ইবনু উবাদা ﷺ-এর ওপর। গামিদ গোত্রের প্রতিনিধি ছিল ১০ সদস্য বিশিষ্ট। জান্নাতুল বাকিতে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তারা উবাই ﷺ এর শরণাপন্ন হলে তিনি তাদের কুরআন শেখান। বনু হানীফা গোত্রে রজ্জাল ইবনু উনফুওয়ানা নামে একজন সদস্য ছিলেন। উবাই ﷺ এর কাছে তিনি কুরআন শিখেছিলেন। উবাই ইবনু কাব ﷺ বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন শিক্ষা দিলে সে আমাকে একটি ধনুক উপহার দেয়। আমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালে তিনি বললেন, 'তুমি এটি গ্রহণ করলে (জানবে যে,) জাহান্নামের একটি ধনুক গ্রহণ করেছে।' উবাই ﷺ বলেন, তখন আমি সেটা ফিরিয়ে দিলাম।<sup>[৩]</sup>

উমর ﷺ এর খিলাফতকালে মসজিদে নববিতে অনেকগুলো ইলমি মজলিস হতো। দূর দূরান্ত থেকে অনেক শিক্ষার্থীও সেসবে অংশগ্রহণ করত। সে বৈঠকগুলোর একটি হতো উবাই ﷺ এর। সাধারণত ভিনদেশী শিক্ষার্থীরাই তাতে যোগদান করতেন। জুনদুব ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইলম শেখার জন্য আমি মদীনায় গিয়েছিলাম। মসজিদে নববিতে প্রবেশ করে দেখি, শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন স্থানে গোল হয়ে বসে হাদীস আলোচনা করছে। আমি একটি মজলিসের সামনে এসে দেখি, একজন চিন্তামগ্ন লোক সেখানে বসে আছেন।

[১] বুখারি, ৪৯৯৯।

[২] বুখারি, ৪৯৬০।

[৩] ইবনু মাজাহ, ২১৫৮।



যার পরনে ছিল দুটি কাপড়। দেখে মনে হচ্ছিল তিনি সবেমাত্র সফর থেকে ফিরেছেন। তিনি বলছিলেন, ‘আসহাবুল উকদাহ ধ্বংস হয়ে গেছে। কাবার রবের কসম! তাদের নিয়ে আমার কোনো দৃষ্টিভঙ্গি হয় না।’ এ কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন।

তার বৈঠকে আমি বসলাম। তিনি হাদীস বর্ণনা করে উঠে গেলেন। এরপর সেখানে থাকা কয়েকজনের কাছে তার পরিচয় জানতে চাইলে তারা বললেন, উনি মুসলিমদের নেতা উবাই ইবনু কাব। তখন তার পিছু পিছু আমি তার ঘরে গেলাম। দেখলাম, নিতান্তই সাদামাটা তার বাড়ি। তিনি একজন দুনিয়াবিরাগী ইবাদতগুজার। আমি সালাম দিলে তিনি উত্তর দিয়ে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। বললাম, আমি ইরাক থেকে এসেছি। তিনি বললেন, আমার বৈঠকে যারা থাকে, তাদের মধ্যে তুমিই বেশি প্রশ্ন করে থাকো।

এ কথা শুনে আমি মর্মাহত হলাম। তখনই কিবলামুখী হয়ে এ দুআ করলাম, ‘হে আল্লাহ! আপনার কাছেই নালিশ করছি। ইলম অর্জনের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করি। শরীরকে করি ক্লান্ত। বাহনের ওপর আরোহণ করি। কিন্তু এই লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করলে তারা আমাদের প্রতি ভ্রক্ষেপ করেন না। উপরন্তু নানান কথা শোনান।’

আমার দুআ শুনে তিনি কেঁদে ফেললেন। এরপর আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বললেন, ‘হে আল্লাহ! আমি ওয়াদা করছি—আগামী জুমুআ পর্যন্ত আপনি যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন, তাহলে রাসূল ﷺ থেকে আমি যা কিছু শুনেছি সব বর্ণনা করব। এ ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করব না।’

জুনদুব ﷺ বলেন, এরপর আমি জুমুআর দিনের অপেক্ষা করতে লাগলাম। বৃহস্পতিবারে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, মদীনার অলিগলি লোকে লোকারণ্য। কী হয়েছে জানতে চাইলে তারা বলল, তুমি মনে হয় নতুন এসেছো! তুমি কি জানো না, মুসলমানদের নেতা উবাই ইবনু কাব ইন্তেকাল করেছেন?

বিগত মত অনুসারে উবাই ইবনু ﷺ ২২ হিজরিতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

## উবাদা ইবনুস সামিত রা.

আকাবায় অনুষ্ঠিত বাইয়াতে উবাদা ﷺ ছিলেন নিজ গোত্র খায়রাজের মুখপাত্র। বদরসহ পরবর্তী সব যুদ্ধে রাসূল ﷺ এর সাথে তিনি ছিলেন। তিনি ছিলেন

কুরআন সংকলকদের অন্যতম।

মহামারি থেকে পলায়ন প্রসঙ্গে একবার উবাদা রা এর সাথে মুআবিয়া রা এর আলোচনা হয়। মুআবিয়া রা মত ছিল পলায়ন করা বৈধ হবে। অবশেষে মুআবিয়া রা আসরের নামাজের পর মিসরে দাঁড়িয়ে বলেন, উবাদা আমাকে যে হাদীস বলেছেন, সেটাই আসলে ঠিক। তাঁর গভীর জ্ঞান আছে। সেখান থেকে তোমরা আহরণ করো। আমার চেয়েও বড় ফকিহ তিনি।

সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করার ব্যাপারে উবাদা রা কারো পরোয়া করতেন না। তিনি ছিলেন ফিলিস্তিনের প্রথম বিচারক।<sup>[১]</sup> উবাই রা এর মতো উবাদা রা-ও আসহাবুস সুফফার সদস্যদের এবং আগত প্রতিনিধিদের তালিম দিতেন। রাসূল স থেকে তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

শামের গভর্নর ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফইয়ান একবার উমর রা এর কাছে পত্র লিখেন, ‘শামে এমন একজন আলিম দরকার যার কাছে লোকেরা কুরআন এবং শরীয়ত শিখতে পারবে।’ উমর রা তখন মুআয ইবনু জাবাল, উবাদা ইবনুস সামিত এবং আবুদ দারদা রা-কে শামে পাঠালেন। তাদের মাঝে উবাদা ইবনুস সামিত রা ফিলিস্তিনে অবস্থান করতে থাকেন।<sup>[২]</sup>

জুনাদা ইবনু আবী উমাইয়া রা বলেছেন, ‘উবাদা ইবনুস সামিত রা এর কাছে আমি উপস্থিত হলাম। আল্লাহ তাকে বিপুল ইলম দিয়েছিলেন।’

অনেক সাহাবিও তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু উমামা বাহিলি, আনাস ইবনু মালিক, জাবির ইবনু আবদিল্লাহ এবং ফাদালা ইবনু উবাইদ রা ছিলেন তাদের অন্যতম। এছাড়াও আবু ইদরিস খাওলানি, আবু মুসলিম খাওলানি, আবদুর রহমান ইবনু উসাইলা, হিত্তান রাক্কাসি, আবুল আসআস সানআনি, জুনাদা ইবনু আবী উমাইয়া এবং জুবাইর ইবনু নুদাইর রা-এর মতো বড় বড় তাবিয়িরা ছিলেন তাঁর ছাত্র। ৩৪ বা ৪৫ হিজরির কাছাকাছি সময়ে বাইতুল মাকদিসে তিনি ইন্তেকাল করেন।<sup>[৩]</sup>

## আবু হুরায়রা রা.

আবু হুরায়রা রা ছিলেন সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবি। উলামায়ে

[১] তবাকাতু ইবনি সাদ: ৫/৫২০; আল ইসাবাহ: ৪/২৭।

[২] আল ইসাবাহ: ৩/২৮।

[৩] আল ইসাবাহ: ৪/১০০, ১০১।



কেরামের ভাষ্যমতে তিনি ৫৩৭৪টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং খাইবার যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে তিনি নাজরান থেকে নবি ﷺ এর কাছে আগমন করেন। তিনি ছিলেন আসহাবুস সুফফার অন্যতম প্রধান সদস্য এবং ব্যবস্থাপক।

আবু হুরায়রা র. বলেন, লোকে বলে, ‘আবু হুরায়রা বেশি বেশি হাদীস বর্ণনা করে। (জেনে রাখো,) নিচের আয়াত দুটি কুরআনে না থাকলে আমি একটি হাদীসও বর্ণনা করতাম না।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ  
مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ  
اللَّهُ عُنُونًا ۗ إِنَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ  
عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ আমি মানুষের জন্য নাযিল করেছি কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তাদের অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারিগণও তাদেরকে অভিশাপ দেয়। কিন্তু যারা তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয় আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, ওরাই তারা, যাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।<sup>[১]</sup>

(আসল ঘটনা হচ্ছে,) আমার মুহাজির ভাইয়েরা বাজারে কেনাবেচায় মশগুল থাকত এবং আমার আনসার ভাইয়েরা থাকত জমি-জিরাতের কাজে মশগুল। আর আবু হুরায়রা খেয়ে না খেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে লেগে থাকত। তাই অন্যরা যখন উপস্থিত থাকত না তখন সে উপস্থিত থাকত এবং সবাই যা মুখস্থ করত না তা সে মুখস্থ রাখত।<sup>[২]</sup>

অন্য বর্ণনামতে তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু আমর এ ক্ষেত্রে আমার চেয়ে এগিয়ে আছেন। তিনি হাদীস লিখতেন; আমি লিখতাম না।

তাঁর অপূর্ব স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, একবার আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার কাছ থেকে বহু হাদীস শুনি; কিন্তু ভুলে যাই।

[১] সূরা বাকারা, ২: ১৫৯-১৬০।

[২] বুখারি, ১১৮

তিনি বললেন, 'তোমার চাদর বিড়িয়ে দাও।' আমি চাদর বিছালান। দু'হাত মুঠো করে তাতে কিছু ঢেলে দেওয়ার মতো করে তিনি বললেন, 'এটা মিলিয়ে নাও।' আমি তা বুকের সাথে লাগিয়ে নিলাম। এরপর থেকে আমি আর কিছুই ভুলিনি।<sup>[১]</sup>

উমর রা প্রথম দিকে আবু হুরায়রা রা কে হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর তাকওয়া দেখে অনুমতি দেন। উসমান রা ও তাকে বেশি বেশি হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেন। সাযিব ইবনু ইয়াজিদ রা বলেছেন, উসমান আমাকে আবু হুরায়রা রা এর কাছে এ কথা বলতে পাঠালেন যে, 'তুমি বেশি হাদীস বর্ণনা করো না। তাহলে তোমাকে দাওন পাহাড়ে পাঠিয়ে দেবো।'<sup>[২]</sup>

যায়দ ইবনু সাবিত রা এর কাছে এক ব্যক্তি কোনো মাসআলা জানতে চাইলে তাকে আবু হুরায়রা রা এর কাছে যেতে বললেন। এরপর তিনি বললেন, একবার আবু হুরায়রা, আমি এবং তৃতীয় একজন মসজিদে বসে দুআ করছিলাম। এমন সময় রাসূল সা সেখানে এলে আমরা চুপ হয়ে গেলাম। নবি সা তখন আমাদের দুআ চালিয়ে যেতে বললেন। আমরা দুআ করছিলাম আর নবিজি আমিন আমিন বলছিলেন। আমি আর তৃতীয় ব্যক্তিটি দুআ করার পরে আবু হুরায়রা রা দুআ করলেন। তিনি সেসময় এ দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! আমার সাথে দুজন যে দুআ করেছেন আমিও সে দুআ করছি। আমাকে এমন ইলম দান করুন, যা ভুলে যাওয়ার নয়।'

নবি সা তখন আমিন বললেন। আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমিও এ দুআ করি। নবিজি সা বললেন, 'দাউস গোত্রের এই যুবক তোমার চেয়ে আগে বেড়ে গেছে।'

আবু হুরায়রা রা হাদীস লেখার পক্ষে ছিলেন না। তিনি বলতেন, 'আমরা নিজেরা লিখি না আবার অন্যকেও লেখাই না।' পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের অভ্যাস পরিবর্তন করেছেন। অনেকগুলো লিখিত সংকলন তাঁর কাছেও জমা হয়।

হাসান ইবনু আমর রা বলেন, আবু হুরায়রা রা এর সামনে আমি একটি হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বললেন, 'আমি এটা জানি না।' আমি বললাম, 'এই হাদীসটি তো আমি আপনার থেকেই শুনেছি।' তিনি বললেন, 'তুমি এই হাদীসটি

[১] বুখারি, ১১৯

[২] তবাকাতু ইবনু সাদ: ২/৪৬২-৪৬৩



আমার থেকে শুনে থাকলে এটা অবশ্যই আমার কাছে লেখা থাকবে।’ এই বলে আমার হাত ধরে তিনি নিয়ে গেলেন তার বাড়িতে। সেখানে অনেকগুলো হাদীসের গ্রন্থ দেখালেন। অবশেষে সেই হাদীসটি পেয়ে গেলে তিনি বললেন, ‘বলেছিলাম না, হাদীসটি আমি বর্ণনা করলে অবশ্যই সেটা লেখা থাকবে।’<sup>[১]</sup>

আবু হুরায়রা রাঃ এর ছাত্ররা তার থেকে শোনা হাদীস গ্রন্থাকারে সংকলন করেছেন। সেই সংকলন থেকে তারা হাদীস বর্ণনা করতেন। আবু হুরায়রা রাঃ এর তিনজন ছাত্রের সংকলন বেশি প্রসিদ্ধ। তাবিয়ীরা তো বটেই, তাবি-  
তাবিয়িন এবং এবং পরবর্তী তিন প্রজন্মের লোকেরাও সেখান থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। পরবর্তীকালে হাদীস সংকলনের যুগ শুরু হলে সে সংকলনের হাদীসগুলো গ্রন্থে যুক্ত হয়। সংকলন তিনটি ছিল, (ক) আবদুর রহমান ইবনু হুরমুজ আল আরাজের সংকলন, (খ) আবদুর রহমান ইবনু ইয়াকুব জুহানির সংকলন এবং (গ) হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহের সংকলন।

মসজিদে নববিতে আবু হুরায়রা রাঃ এর মজলিস হতো মিস্রের পাশে। নবিজির হুজরার কাছাকাছি। অত্যন্ত আবেগ নিয়ে দরস শুরু করা ছিল তার অভ্যাস। যেমন তিনি বলতেন, চির সত্যবাদী, পরম বিশুদ্ধ, আবুল কাসিম, আল্লাহর রাসূল সঃ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা বলবে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।’<sup>[২]</sup>

কখনো-বা নবিজির হুজরার দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলতেন, এই হুজরাওয়ালা চির সত্যবাদী, পরম বিশুদ্ধ আল্লাহর রাসূল সঃ-কে আমি বলতে শুনেছি।<sup>[৩]</sup>

আবু হুরায়রা রাঃ বেশি বেশি হাদীস যেমন বর্ণনা করতেন, তেমনি দ্রুতও বলে যেতেন। আয়িশা রাঃ একদিন তার ভাগ্নে উরওয়া ইবনুয যুযায়র রাঃ-কে বললেন, ‘তোমার কি অবাক লাগে না যে, আবু হুরায়রা আমার ঘরের সামনে বসে আমাকে শুনিye শুনিye হাদীস বলেন—আর সেসময় আমি নামাজ এবং তাসবীহতে মশগুল থাকি? তিনি তো আমার তাসবীহ শেষ হওয়ার আগেই উঠে যান। তাকে পেলে আমি এত তাড়াহুড়া করতে বারণ করতাম। আল্লাহর রাসূল সঃ তো এত তাড়াহুড়া করে কথা বলতেন না।’<sup>[৪]</sup>

আয়িশা রাঃ একদিন আবু হুরায়রা রাঃ-কে বললেন, আপনি তো এমন সব

[১] জামিউ বায়ানিল ইলম: ১/৭৪।

[২] আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল: ৫৫৪।

[৩] আল ইসাবাহ: ৭/২০৫।

[৪] আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল: ৪০০।

হাদীস বর্ণনা করেন, যা আমি কখনো শুনিনি। উত্তরে আবু হুরায়রা রা বললেন, 'আম্মাজান! আয়না আর সুরমাদানি আপনাকে ব্যস্ত রেখেছিল। আর আমি ব্যস্ত ছিলাম হাদীসের খোঁজে। অন্য কিছুর নেশা আমাকে ব্যস্ত রাখতে পারেননি।'।<sup>[১]</sup>

একদা আবু হুরায়রা রা জানাযা সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করলেন। নবীজির বরাত দিয়ে বললেন, 'যে ব্যক্তি জানাযায় শরিক হবে, সে এক কিরাত পরিমাণ সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি দাফনে শরিক হবে, সে দুই কিরাত সওয়াব পাবে। পরিমাণের দিক থেকে এক কিরাত উল্লেখ পাহাড় থেকেও বেশি।' এই হাদীস সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা-এর মনে সংশয় দেখা দিল। তিনি বললেন, 'আবু হুরায়রা! চিন্তা করে বলুন।' এ কথায় আবু হুরায়রা রা রাগ করলেন। সাথে সাথে তিনি আয়িশা রা-এর কাছে গিয়ে বললেন, 'আমি কসম করে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, 'আপনি কি রাসূলুল্লাহ স থেকে এক কিরাত সম্পর্কিত হাদীস শুনেছেন?' আয়িশা রা বললেন, 'হ্যাঁ, আমি শুনেছি।' তারপর আবু হুরায়রা রা বললেন, 'রাসূলুল্লাহ স-এর যুগে আমি না কোনো ক্ষেত্রে খামারে কাজ করতাম, আর না বাজারে গিয়ে কেনাবেচা করতাম। আমি তে রাসূলুল্লাহ স-এর দরবারে পড়ে থাকতাম। আমার একটিই কাজ ছিল, রাসূলুল্লাহ স-এর বাণী মুখস্থ করে নেওয়া। খাওয়ার জন্য যেটাই মিলত, তাতেই আমি তুষ্ট থাকতাম।' তখন আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা বললেন, 'নিঃসন্দেহে আমানের মধ্যে আপনিই রাসূলুল্লাহ স-এর কাছে বেশি থাকতেন এবং হাদীস সম্পর্কে আপনিই অধিক জ্ঞাত।'।<sup>[২]</sup>

বড় বড় সাহাবিরাও আবু হুরায়রা রা এর প্রখর ধীশক্তি এবং হাদীস বর্ণনার সত্যায়ন করেছেন। আমার ইবনু হাযম রা এর নাতি ছিলেন মুহাম্মদ ইবনু উমরাহ রা। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা রা এর বৈঠকে আমি বসতাম। সেখানে দশজনেরও বেশি প্রবীণ সাহাবিকে আমি বসতে দেখেছি। আবু হুরায়রা রা এর বর্ণিত কোনো হাদীসের ব্যাপারে তাদের সন্দেহ হলে তারা নিজের আলোচনা করে তাকে আশ্বস্ত করতেন। এভাবে অসংখ্যবার আবু হুরায়রা রা এর বর্ণিত হাদীসকে তারা সত্যায়ন করেছেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম, হাদীসের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী হলেন আবু হুরায়রা রা।<sup>[৩]</sup>

আবু হুরায়রা রা একদিন বাজারে গিয়ে উপস্থিত লোকদের বললেন,

[১] জামিউ বায়ানিল ইলম: ২/১২১।

[২] তবাকাতু ইবনি সাদ: ২/৩৬৩।

[৩] তবাকাতু ইবনি সাদ: ২/৩৬২; আল মুহাদিসুল ফাসিল: ৫৫৫; আত তারীখুল কাবীর: ১/১৮৬।



তোমরা বঞ্চিত হচ্ছে কেন? লোকেরা বলল, কী হয়েছে? তিনি বললেন, রাসূল ﷺ এর মিরাস বণ্টন করা হচ্ছে, আর তোমরা এখানে! লোকেরা বলল, সে কী! কোথায় হচ্ছে? তিনি বললেন, মসজিদে। এ কথা শুনে কিছু লোক দৌড়ে মসজিদে গেল। ফিরে এসে বলল, কোথায়? কিছু তো বণ্টন করতে দেখলাম না! আবু হুরায়রা রضى الله عنه বললেন, কী দেখে এসেছো? তারা বলল, কিছু লোক নামাজ পড়ছে, কিছু লোক কুরআন পড়ছে। আবার কিছু লোক হালাল-হারাম নিয়ে আলোচনা করছে। আবু হুরায়রা রضى الله عنه বললেন, আরে বোকা! সেটাই তো নবিজির মিরাস।<sup>[১]</sup>

কিছু বর্ণনা থেকে জানা যায়, আবু হুরায়রা রضى الله عنه হাবশি এবং হিব্রু ভাষা জানতেন। আরবের সাথে হাবশার সম্পর্ক তো প্রাচীনকাল থেকেই। সেজন্যই সাহাবিরে হাবশায় হিজরতও করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের আগে কাব আহবার রضى الله عنه ছিলেন ইহুদিদের বড় পণ্ডিত। একবার আবু হুরায়রা রضى الله عنه এর সাথে তাওরাত নিয়ে আলোচনা করেন। তারপর বলেন, তাওরাত না পড়েও আবু হুরায়রা সে সম্পর্কে বেশি জ্ঞান রাখেন। এ ব্যাপারে তার চেয়ে বেশি জ্ঞানী কাউকে আমি দেখিনি।<sup>[২]</sup>

উমাইয়া খিলাফতের সময় গভর্নরদের সাথে আবু হুরায়রা রضى الله عنه এর বেশ সুসম্পর্ক ছিল। মারওয়ান ইবনুল হাকাম একবার নিজের অনুপস্থিতির সময় আবু হুরায়রা রضى الله عنه-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন। আবু হুরায়রা রضى الله عنه ছিলেন মজার মানুষ। সে দিনগুলোতে তিনি লাকড়ির বোঝা মাথায় নিয়ে বাজার পাড়ি দেওয়ার সময় বলতেন, বাচ্চারা! সরে যাও। মদীনার গভর্নরকে পথ করে দাও।

দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন আবু হুরায়রা রضى الله عنه। একবার তার মেয়ে তার কাছে সোনার গহনা বানিয়ে দেওয়ার আবদার করলে তিনি অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, ‘সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতেই আমি বেশি পছন্দ করি।’

একদিন মারওয়ান ইবনুল হাকাম ১০০ দিনার আবু হুরায়রার কাছে পাঠালেন। কিন্তু পরের দিনই মারওয়ান আবার লোক পাঠিয়ে জানালেন, ‘আমার লোকটি ভুলক্রমে দিনারগুলি আপনাকে দিয়ে এসেছে। আসলে ওগুলি আমি আপনাকে দিতে চাইনি; বরং অন্য এক ব্যক্তিকে দিতে চেয়েছিলাম।’

[১] জামউল ফাওয়াইদ: ১/৩৭।

[২] তাযকিরাতুল হুফফায়: ১/৩৪।

একথা শুনে আবু হুরায়রা লজ্জা ও বিস্ময়ের সাথে বললেন, 'আমি তো সেগুনি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে ফেলেছি। আগামীতে বাইতুল মাল থেকে যখন আমার ভাতা দেওয়া হবে, সেখান থেকে কেটে রেখে দেবেন।'

৫৭ হিজরিতে মদীনার অদূরে কাসবা নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন আবু হুরায়রা রাঃ।

## আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাঃ ছিলেন প্রাথমিক যুগের মুসলিম। তিনি নিজে বলেছেন, 'ইসলাম কবুলকারীদের মাঝে আমি ষষ্ঠতম। রাসূল সঃ-এর মুখ থেকে শুনে শুনে ৭০টিরও বেশি সূরা আমি মুখস্থ করেছি।<sup>[১]</sup>

তিনিই সর্বপ্রথম উঁচু আওয়াজে কুরআন পড়েছিলেন। আবু বকর রাঃ এবং উমর রাঃ বলেন, নবি সঃ বলেছেন, কুরআন যেভাবে নাযিল হয়েছে কেউ যদি যেভাবে তিলাওয়াত করতে চায়, সে যেন ইবনু মাসউদের কিরাত মোতাবেক তিলাওয়াত করে।<sup>[২]</sup>

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে নবি সঃ এর ইন্তেকাল পর্যন্ত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাঃ নবিজির খিদমত করে গেছেন। নবিজির খাদেম হওয়ায় তার উপাধি ছিল—নবিজির জুতা, মিসওয়াক এবং বালিশের দায়িত্বশীল। ইবনু মাসউদ রাঃ এবং তার মা অনায়াসে রাসূল সঃ এর ঘরে যাতায়াত করতেন। বহিরাগত লোকজন তাদেরকে নবি-পরিবারের সদস্য মনে করত।

উমর রাঃ নিজ খিলাফতকালে তাকে কুরআনের শিক্ষক বানিয়ে কুফার পাঠিয়েছিলেন। উসমান রাঃ খলিফা হওয়ার পরে তাকে মদীনা ফিরিয়ে আনেন। সেসময় কুফাবাসীরা তাকে ধরে রাখতে চাইল। আবদুল্লাহ রাঃ তখন বললেন, উসমানের আনুগত্য করা আমার ওপর আবশ্যিক। আমি ফিতনার প্রথম দরজা হতে চাই না।<sup>[৩]</sup>

ইবনু মাসউদ রাঃ বলেছেন, 'প্রতিটি আয়াত নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট আমার জানা আছে। যদি আল্লাহর কিতাবের বড় কোনো আলিম সম্পর্কে জানতে পারি, তাহলে ইলম অর্জনের জন্য আমি অবশ্যই তার দ্বারস্থ হবো।<sup>[৪]</sup>

[১] বুখারি, ৫০০০।

[২] ইবনু মাজাহ, ১৩৮।

[৩] আল ইসাবাহ: ৪/১৩০।

[৪] আল ইসাবাহ: ৪/১২৯।



যে তিনজন ফকিহ সাহাবির মাযহাব পৃথিবীতে আজও ছড়িয়ে আছে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা হচ্ছেন তাদের অন্যতম। অপর দুজন হচ্ছেন যায়দ ইবনু সাবিত এবং আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা। এ ব্যাপারে ইবনু মাসউদ রা এর সমস্ত ছাত্র ভূমিকা রাখলেও অগ্রগামী ছিলেন ছয়জন। তারা হলেন আলকামা ইবনু কায়স, আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ, মাসরুক ইবনু আজদা, উবাইদা সালমানি, হারিস ইবনু কায়স এবং আমর ইবনু শুরাহবিল রাহিমাহুমুল্লাহ। পরবর্তীকালে তাদের ইলমের বাহক হয়ে উঠেছিলেন ইবরাহীম নাখায়ি রা। তারপর আমাশ এবং আবু ইসহাক রাহিমাহুমুল্লাহ। এরপর সুফইয়ান সাওরি রা আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা এর ফিকহি মাযহাবকে এগিয়ে নিয়ে যান। এভাবেই কুফা নগরীতে ইবনু মাসউদ রা এর ফিকহি মতাদর্শ বিস্তার লাভ করে। [১]

ইবনু জারীর রা বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ-ই ছিলেন একমাত্র সাহাবি, যার ফিকহি মতাদর্শ এবং ফতোয়া তার ছাত্ররা লিখে রেখেছিলেন। এছাড়া অন্য কোনো সাহাবির ফিকহি মতাদর্শ তার ছাত্ররা লিখে রাখেননি।

মাসরুক ইবনু আজদা রা বলেছেন, ‘সাহাবিদের পরখ করে আমি বুঝতে পেরেছি যে, তাদের সবার ইলম ছয়জন সাহাবির মাঝে আছে। তারা হচ্ছেন— আলি ইবনু আবী তালিব, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, উমর ইবনুল খাত্তাব, যায়দ ইবনু সাবিত, আবুদ দারদা এবং উবাই ইবনু কাব রা। আবার এই ছয়জনের ইলম আছে দুজনের মাঝে। তারা হচ্ছেন আলি ইবনু আবী তালিব এবং আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা।’ [২]

হিজরতের পর নবি সা মুহাজিরদেরকে মসজিদে নববির কাছাকাছি জমি প্রদান করেন। সেই ধারাবাহিকতায় আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ এবং তার ভাই উতবা ইবনু মাসউদ রা একটুকরা জমি পেয়েছিলেন। সেখানে তারা ঘর তৈরি করে নেন। সেই বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হতো ইবনু মাসউদ রা এর পাঠচক্র। বাড়িটিকে ‘দারুল কুররা’ নামে সবাই চিনত। উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদের সময় মসজিদে নববির সম্প্রসারণ করা হলে সে ঘরের একাংশ মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আব্বাসি খলিফা মাহদির জামানায় মসজিদে নববির সম্প্রসারণ করার ফলে সেই ঘরের বাকি অংশও মসজিদের আওতাভুক্ত হয়ে যায়। [৩]

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইবনু মাসউদ রা ভীষণ সতর্কতার পরিচয় দিতেন। সঠিক শব্দে হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে খুব কঠোর ছিলেন। আবু আমর

[১] কিতাবু ইলালিল হাদীস ওয়া মারিফাতুর রিজাল: ৪৪।

[২] ইলানুল মুওয়াক্কিযীন: ১/১১-১২।

[৩] ওয়াফাউল ওয়াফা: ২/৭২৮; কিতাবুল মানাসিক: ৩৭১।

শাইবানি রাঃ বলেন, আমি বছরের পর বছর আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের মজলিসে বসেছি। তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ‘রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন’ এমনটা সাধারণত বলতেন না। কখনো বলে ফেললে তার শরীর কাঁপতে থাকত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলতেন, আল্লাহ চাহেন তো, রাসূল সঃ এমন বলেছেন, বা এর কাছাকাছি বলেছেন, বা অনুরূপ বলেছেন।<sup>[১]</sup>

আমর ইবনু মাইমুন রাঃ বলেন, প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে ইবনু মাসউদ রাঃ-এর নিকট উপস্থিত হতে আমার ভুল হতো না। কিন্তু আমি কখনো তাকে ‘রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন’ এভাবে কিছু বলতে শুনিনি। এক রাতে তিনি বললেন, ‘রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন’—তারপর তিনি মাথা নত করে রাখলেন। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তার জামার বোতাম খোলা, চোখ দুটি অশ্রুসজল এবং তার রং ফুলে আছে। এরপর তিনি বললেন, ‘নিবি সঃ এই এই বলেছেন, অথবা এর বেশি বা কম বলেছেন। কিংবা এর কাছাকাছি বা অনুরূপ বলেছেন।’<sup>[২]</sup>

তামীম ইবনু হারাম রাঃ বলেন, ‘রাসূল সঃ এর অনেক সাহাবির মজলিসে আমি বসেছি। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের মতো দুনিয়াবিমুখ, আখিরাতমুখী, তাকওয়াবান এবং সততাপরায়ণ কাউকে দেখিনি।’ আবু মুসা রাঃ বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের একটি মজলিসে বসতে পারা আমার কাছে এক বছরের আমল থেকেও উত্তম।’<sup>[৩]</sup>

একদিন আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাঃ ছাত্রদের নিয়ে মজলিসে বসে আছেন। তখন এক গ্রাম্য লোক এসে জানতে চাইল, ‘এ লোকগুলো এভাবে জড়ো হয়ে কী করছে?’

‘রাসূল সঃ এর রেখে যাওয়া সম্পদ নিজেদের মাঝে ভাগ করে নিচ্ছে।’—জবাব দিলেন আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ।<sup>[৪]</sup>

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাঃ-কে উমর রাঃ দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য কুফা নগরীতে পাঠিয়েছিলেন। কুফাবাসীর উদ্দেশ্যে লেখা পত্রে তিনি বলেন, ‘আম্মার ইবনু ইয়াসিরকে আপনাদের গভর্নর এবং ইবনু মাসউদকে আপনাদের শিক্ষক বানিয়ে পাঠাচ্ছি। তারা দুজনই শীর্ষস্থানীয় সাহাবি এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ আপনাদের রাষ্ট্রীয় কোষাগারের

[১] তাযকিরাতুল হুফায: ১/১৫।

[২] ইবনু মাজাহ, ২৩।

[৩] আল ইসাবাহ: ৪/১৩০; ইলামুল মুওয়াক্কিযীন: ১/১৪।

[৪] শারাহু আহলিল হাদীস: ৪৫।



বিষয়টিও তত্ত্বাবধান করবেন। আপনারা সবাই তার কাছ থেকে ইলম অর্জনের সাথে সাথে তার অনুসরণও করবেন। ইবনু মাসউদকে আপনাদের কাছে পাঠিয়ে মূলত আমার নিজের ওপর আপনাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছি।<sup>[১]</sup>

ইমাম শাবি رحمہ اللہ বলেছেন, কুফা নগরীতে যতজন সাহাবি এসেছেন তার মধ্যে ইবনু মাসউদ رحمہ اللہ এর মাধ্যমেই এই অঞ্চলের মানুষ বেশি উপকৃত হয়েছে। সাহাবিদের পর তার ছাত্রদের চেয়ে বড় জ্ঞানী, দূরদর্শী এবং শান্ত স্বভাবের আর কাউকেই দেখিনি।<sup>[২]</sup>

আবদুর রহমান ইবনু ইয়াজিদ رحمہ اللہ বলেন, অন্যান্যদের তুলনায় ইবনু মাসউদ رحمہ اللہ নফল রোজা কম রাখতেন। এর কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বলতেন, ‘রোজা রাখলে নামাজে দুর্বলতা চলে আসে। এজন্য আমি (নফল) রোজা কম রাখি।’

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ رحمہ اللہ ৩২ হিজরিতে মদীনাতে ইন্তেকাল করেন। উসমান رحمہ اللہ তার জানাযার নামাজ পড়িয়েছিলেন। তার অসিয়ত অনুসারে রাতের বেলা জান্নাতুল বাকিতে উসমান ইবনু মাযউন رحمہ اللہ-এর কবরের কাছে তাকে দাফন করা হয়। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে আবু মুসা এবং আবু মাসউদ رحمہ اللہ একে অপরকে বলতে থাকেন, হায়! ইবনু মাসউদ কি তার সমকক্ষ কাউকে রেখে গেছেন? যেখানে আমাদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হতো, তিনি সহজেই সেখানে ঢুকে পড়তেন। আমরা অনুপস্থিত থাকলেও তিনি হাজির থাকতেন।<sup>[৩]</sup>

## আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.

উম্মাহর মহাজ্ঞানী, কুরআনের মুখপাত্র আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস رحمہ اللہ ছিলেন সাহাবায়ে কেরামের মাঝে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। বিভিন্ন বিষয়ে তার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। বিশেষত কুরআনের তাফসীর, ফিকহ এবং শরীয়তের অন্তর্নিহিত হিকমত আহরণের ব্যাপারে সূর্যং নবি ﷺ তার জন্য দুআ করেছিলেন।<sup>[৪]</sup>

রাসূল ﷺ এর ইন্তেকালের সময় তিনি ১৫ বছরের কিশোর। চলুন, তার কাছ থেকেই তার ইলম অর্জনের কাহিনি শোনা যাক। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর আমি একজন আনসারি সাহাবিকে বললাম, নবি ﷺ এর

[১] তাযকিরাতুল হুফফায়: ১/১৫।

[২] তবাকাতু ইবনি সাদ: ৬/৭-১১।

[৩] তবাকাতু ইবনি সাদ: ৩/১৬০।

[৪] আল ইসতীআব: ৩/৬৭।

তো ইন্তেকাল হয়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত অনেক প্রবীণ সাহাবি জীবিত আছেন। চলো, তাদের কাছ থেকে তালিম গ্রহণ করি। আনসারি সাহাবিটি বললেন, 'এই প্রবীণ সাহাবিরা জীবিত থাকতে লোকেরা কি তোমার কাছে মাসআলা জানতে আসবে!' এই বিষয়ে তিনি হিম্মত করলেন না। অগত্যা আমি নিজেই মাসআলা জানতে মশগুল হয়ে গেলাম। কারো সম্পর্কে যদি জানতে পারতাম যে, অনুক সাহাবি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুখ থেকে অনুক হাদীসটি শুনেছেন, তবে তার কাছে ছুটে যেতাম। সেই হাদীস যথাযথভাবে শুনে নিতাম। মদীনায়ে থাকাকালীন আনসারি সাহাবাদের সূত্রে আমি অনেক মাসআলা জেনেছি। কোনো সাহাবির সম্মানে গিয়ে জানতে পারতাম, তিনি বিশ্রাম করছেন। তখন তার দুরারের সামনেই চাদর বিছিয়ে অপেক্ষা করতাম। বাতাসে উড়ে আসা ধূলাবালিতে আমার চেহারা আর শরীর মলিন হয়ে যেত। কিন্তু আমি সেখানেই বসে থাকতাম। এরপর উক্ত সাহাবি জেগে উঠলে তাকে প্রশ্ন করে জেনে নিতাম। এই অবস্থা দেখে প্রবীণ সাহাবি বলতেন, 'তুমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাতো ভাই। তুমি কেন এইভাবে কষ্ট করছো। আমাদের ডেকে পাঠাতে।' আমি বলতাম, আমি তো ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে এসেছি। তাই আমারই হাজির হওয়া উচিত। অনেক সাহাবি ঘর থেকে বেরিয়ে আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করতেন, তুমি কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছো? আমি বলতাম, অনেকক্ষণ। তারা বলতেন, এটা ঠিক করোনি। আমাদের ডেকে পাঠাতে। আমি বলতাম, আমার কারণে আপনি নিজের প্রয়োজন ফেলে চলে আসবেন, এতে আমার মন সায় দেয় না। একপর্যায়ে এমন পরিস্থিতি দেখা দিল যে, লোকেরা ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে আমার কাছে আসতে লাগল। তখন সেই আনসারি সাহাবির আফসোস হলো। তিনি বললেন, এই যুবক তো আমাদের চেয়েও বেশি সচেতন ছিল! (ইবনু মাসউদের বক্তব্য সমাপ্ত)

আবু রাফে ছিলেন রাসূল ﷺ এর আজাদকৃত দাস। ইবনু আব্বাস রা. তার কাছে গিয়ে জানতে চাইতেন, রাসূল ﷺ কোন দিন কী আমল করেছেন। আবু রাফে রা. যা যা বলতেন, ইবনু আব্বাস রা. এর সাথে থাকা লেখক তা লিখে নিতেন।[১]

উমর রা. প্রবীণ বদরি সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করার সময় আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-কেও সাথে রাখতেন। এ কারণে কারো কারো মনে প্রশ্ন তো আমাদের সন্তানের বয়সী! উমর রা. বললেন, এর কারণ তো আপনারাও

[১] আল ইসাবাহ: ৪/৯০-৯৪।



জানেন।

একদিন তিনি ইবনু আব্বাস রা-কে প্রবীণ সাহাবিদের সাথে বসালেন। তারপর অন্যান্য সাহাবিদের বললেন, সূরা নাসর-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে আপনারা কে কী বলেন? তখন কেউ কেউ বললেন, আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় লাভ করলে তাঁর প্রশংসা এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই সূরায়। কেউ কেউ কিছু না-বলে চুপ থাকলেন। এরপর উমর রা ইবনু আব্বাস রা-কে বললেন, ইবনু আব্বাস! তুমিও কি তাই মনে করো? তিনি বললেন, না। উমর রা বললেন, তাহলে তুমি কী বলতে চাও? উত্তরে তিনি বললেন, এ সূরাতে আল্লাহ তাঁর রাসূল স-কে ইন্তেকালের সংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন, আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসলে এটাই হবে আপনার মৃত্যুর আলামত। তখন আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা ও তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করবেন। তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবেন। তিনি তো তাওবা কবুলকারী। এ কথা শুনে উমর রা বললেন, তুমি যা বলছো, আমিও সেটাই জানি।<sup>[১]</sup>

ইবনু আব্বাস রা ছিলেন সেই তিন ফকিহ সাহাবিদের অন্যতম, যাদের ছাত্রদের মাধ্যমে তাদের ফিকহি মতাদর্শ বিস্তার লাভ করেছে। অপর দুজন হচ্ছেন যায়দ ইবনু সাবিত এবং আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা। আলি ইবনুল মাদীনি রা এর মতে ইবনু আব্বাস রা এর ছয়জন বিশিষ্ট শাগরেদ এর পেছনে ভূমিকা রেখেছেন। তারা হচ্ছেন আতা ইবনু আবী রাবাহ, তাউস ইবনু কাইসান, মুজাহিদ ইবনু জাবর, জাবির ইবনু যায়দ, ইকরিমা এবং সাদ্দ ইবনু জুবাইর রাহিমাহুমুল্লাহ। এদের মধ্যে সাদ্দ ইবনু জুবাইর রা ছিলেন ইলমের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়। এই ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং তাদের ছাত্রদের মাধ্যমেই মক্কায় আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা এর মতাদর্শ বিস্তার লাভ করেছে।<sup>[২]</sup>

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা ছিলেন কুরআন, হাদীস, ফিকহ, ফতোয়া, সিরাত, মাগাযি, আরবের ইতিহাস এবং আরবি কবিতায় বিশেষ পারদর্শী। সাধারণত মসজিদে নববিত্তেই তার মজলিস হতো। উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী উতবা বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা একদিন শুধু ফিকহ এবং ফতোয়ার ওপর দরস দিতেন, অন্যদিন শুধু তাফসীরের ওপর। একদিন পাঠ দিতেন মাগাযির, অন্যদিন আরবি কবিতার। আরেকদিন শোনাতেন কেবল আরব জাতির ইতিহাস। এই শাস্ত্রগুলোতে তিনি এতটাই পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন

[১] বুখারি, ৪৯৭০।

[২] কিতাবু ইলালিল হাদীস ওয়া মারিফাতুর রিজাল: ৪৮-৪৯।

যে, প্রতিটি শাস্ত্রের বিজ্ঞ আলিমরাও তার আলোচনা শুনে নিজেকে তৃপ্ত ভাবতেন। বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তি যে-কোনো প্রশ্ন করলে, তিনি জুতসই উত্তর দিতেন।'

আতা ইবনু আবী রাবাহ رحمہ اللہ বলেছেন, 'আমার দেখা লোকদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ছিলেন সর্বাধিক শ্রদ্ধাভাজন এবং গাভীর্যপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁর বৈঠকগুলো ফিকহি গবেষণা, আল্লাহভীতি এবং নম্রতায় ভরপুর থাকত। ফিকহশাস্ত্রের প্রতি আগ্রহীরা তার বৈঠকে যেমন আসত, তেমনি আসত কুরআনের শিক্ষার্থীরাও। আরবি কবিতার প্রতি আগ্রহীরা থাকত তার পাঠচক্রে। প্রতিটি শাস্ত্রের পিপাসু ব্যক্তিই তার কাছে অফুরন্ত ভাণ্ডারের সন্ধান পেত।' [১]

ইকরিমা رحمہ اللہ বলেন, ইবনু আব্বাস رحمہ اللہ এর আলোচনার ধরন এতটাই হৃদয়গ্রাহী হতো যে, তার অনুমতি থাকলে আমি তার কপালে চুমু দিতাম।

ইবনু আবী মুলাইকা رحمہ اللہ বলেন, একদিন আলোচনার সময় আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস رحمہ اللہ বললেন, 'আজকে আমি খুব উদ্যমতা অনুভব করছি। তোমরা আমাকে সূরা ইউসুফ এবং সূরা বাকারা সম্পর্কে প্রশ্ন করো।'

তাউস ইবনু কাইসান رحمہ اللہ-কে লাইস ইবনু সালিম একদিন বললেন, প্রবীণ সাহাবিদের ছেড়ে এই কিশোর (আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস) এর কাছে তুমি কেন পড়ে আছো? উত্তরে তাউস বললেন, 'আমি সত্তরজন সাহাবিকে দেখেছি, কোনো মাসআলায় মতভেদ হলে তারা ইবনু আব্বাস رحمہ اللہ এর সিদ্ধান্ত মেনে নিতেন।'

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস رحمہ اللہ কে বেশি প্রশ্ন করা হত কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে। উত্তরে তিনি আরবি কবিতা দিয়ে দলিল দিতেন। কোনো মাসআলা জানতে চাওয়া হলে তিনি সাধারণত প্রথমে কুরআনে সেটার উত্তর খুঁজতেন। এরপর হাদীস নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। কুরআন হাদীসে সেটার উত্তর না পেলে আবু বকর এবং উমর رحمہ اللہ-এর কথা এবং কাজ দেখতেন। সেখানেও না পেলে নিজস্ব ইজতিহাদের মাধ্যমে সমাধান দিতেন। [২]

আলি رحمہ اللہ নিজের খিলাফতকালে ইবনু আব্বাস رحمہ اللہ-কে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেন। আলি رحمہ اللہ এর শাহাদাতের পর আবদুল্লাহ ইবনু হারিসকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে তিনি ফিরে আসেন হিজাজে। বসরার গভর্নর থাকাকালীন সেখানেই ইলমি পাঠচক্রের আয়োজন করতেন। বিশেষত রমজান মাসে গুরুত্বের

[১] তবাকাতু ইবুন সাদ: ২/৩৬৮।

[২] তবাকাতু ইবনি সাদ: ২।



সাথে তাফসীর এবং ফিকহ পড়াতেন। বসরার লোকেরা দলে দলে তার থেকে তালিম গ্রহণ করত। হাফিজ ইবনু হাজার رحمہ اللہ লিখেন, ইবনু আব্বাস رحمہ اللہ বসরায় থাকাকালীন রমজানে তাফসীরের আয়োজন করতেন। দেখা যেত—মাস শেষ হওয়ার আগেই শ্রোতাদের তিনি ফিকহে পারদর্শী বানিয়ে ফেলেছেন।<sup>[১]</sup>

শেষ জীবনে মদীনা, বসরা এবং মক্কাতেও তিনি শিক্ষা বৈঠকের আয়োজন করেছেন। ৭৩ হিজরিতে আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর رحمہ اللہ এর শাহাদাতের পর মক্কার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তিনি মসজিদুল হারামে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেন। জমজম কূপের পাশে বসে তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন এবং তালিম দিতেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তার বৈঠক জমে ওঠে। সেই বৈঠক থেকেই গড়ে উঠেছেন বিখ্যাত অনেক ফকিহ এবং মুহাদ্দিস, যাদের মাধ্যমে মক্কায় ইবনু আব্বাস رحمہ اللہ এর ফিকহি মতাদর্শ ছড়িয়ে পড়ে।

সাদ্দ ইবনু জুবাইর رحمہ اللہ বলেছেন, ইবনু আব্বাস رحمہ اللہ এর মজলিসে আমি হাদীস লিখতাম। আমার কাছে থাকা সমস্ত কাগজ ভরে গেলে বাধ্য হয়ে আমার পাদুকা দুটির ওপরে লিখে রাখতাম। একসময় সেখানেও জায়গার সংকট হয়ে যায়। ইবনু আব্বাস رحمہ اللہ এর কাছে আমি ৩০ বার কুরআন পড়েছি।

ইবনু নাদিম رحمہ اللہ তার *আল ফিহরিস্ত* গ্রন্থে ইবনু আব্বাস رحمہ اللہ এর দুটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি মুজাহিদ رحمہ اللہ এর বর্ণনায় কুরআনের তাফসীর গ্রন্থ। দ্বিতীয়টি ইকরিমা رحمہ اللہ এর বর্ণনায় কুরআনের নাযিল-সংক্রান্ত গ্রন্থ।<sup>[২]</sup>

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি رحمہ اللہ লিখেছেন, তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনু আব্বাস رحمہ اللہ এত বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা গণনা করাও কঠিন। সেগুলোর সনদ, তরুক এবং রিওয়াযাতের মাঝেও ভিন্নতা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রিওয়াযাত করেছেন আলি ইবনু আবী তালহা হাশিমি। ইমাম আহমাদ رحمہ اللہ বলেছেন, মিশরে আলি ইবনু আবী তালহা হাশিমির বর্ণনার একটি সংকলন আছে। সেই গ্রন্থটির জন্য বাগদাদ থেকে যাওয়া কোনো ব্যাপারই নয়।<sup>[৩]</sup>

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস رحمہ اللہ ছিলেন সুদর্শন যুবক। আল্লাহ তাকে বিস্তর জ্ঞানের পাশাপাশি সুঠাম দেহ দান করেছিলেন। দুজন মানুষের সমান জায়গা লাগত তার একার। মাসরুক ইবনু আজদা رحمہ اللہ বলেন, ইবনু আব্বাস رحمہ اللہ এর

[১] আল ইসাবাহ: ২/৯৪।

[২] আল ফিহরিস্ত: ৫০-৫৭।

[৩] আল ইতকান: ২/১৮৮।

দিকে তাকালে আমি বলতাম, সবচেয়ে সুন্দর মানুষ। তার কথা শুনলে বলতাম, সর্বাধিক প্রমিতভাষী। তার হাদীস বর্ণনা শুনলে বলতাম, তিনি সবচেয়ে জ্ঞানী।

ইবনু আব্বাস রা ৬৮ হিজরিতে তায়িফে ইন্তেকাল করেন। আলি রা এর ছেলে মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়াহ রা তার জানাযার নামাজ পড়ান। কবরে মাটি দেওয়ার সময় তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর কসম! এই উম্মতের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ব্যক্তিটি আজ মারা গেছেন।

## উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রা

আয়িশা রা ছিলেন ফিকহ জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। হাদীস, ফিকহ, ফতোয়া, চিকিৎসা, আরবের বংশধারা এবং আরবি কবিতাশাস্ত্র সম্পর্কে তিনি জ্ঞান রাখতেন। এসব ক্ষেত্রে মানুষ তার শরণাপন্ন হতো। মুহাম্মাদ ইবনু শিহাব যুহরি রা বলেন, আয়িশা রা এর ইলমের সাথে অন্য সব উম্মুল মুমিনীনের ইলম তুলনা করা হলে তার ইলমই বেশি এবং উত্তম বলে বিবেচিত হবে। উরওয়া ইবনু যুহাইর রা বলেছেন, ‘ফিকহ, চিকিৎসা এবং কবিতার ক্ষেত্রে আয়িশা রা এর চেয়ে বিজ্ঞ কাউকে আমি দেখিনি।’ উরওয়া রা নিজেও কবিতা সম্পর্কে জ্ঞানী ছিলেন। একদিন কবিতা প্রসঙ্গে আলোচনা উঠলে তিনি বলেন, আয়িশা রা এর তুলনায় আমার জ্ঞান নিতান্তই তুচ্ছ। তার সামনে কোনো প্রসঙ্গে আলোচনা উঠলেই তিনি সে প্রসঙ্গে কবিতা গুনিয়ে দিতেন।

আবু হুরায়রা রা বলেন, ‘কোনো মাসআলায় জটিলতার সম্মুখীন হয়ে সে ব্যাপারে আয়িশা রা এর কাছে জানতে চাওয়া হলে, তার কাছে মূল্যবান ইলম পাওয়া যেত।’ মাসরুক ইবনুল আজদা রা বলেছেন, ‘আমি প্রবীণ সাহাবিদের দেখেছি যে আয়িশা রা এর কাছে তারা ফারায়েয সম্পর্কে জানতে চাইতেন।’ আতা ইবনু আবী রাবাহ রা বলেন, ‘সাধারণ বিষয়ে আয়িশা রা ছিলেন শ্রেষ্ঠ ফিকহ, সবচেয়ে জ্ঞানী এবং সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে ছিলেন সর্বোত্তম।’

আয়িশা রা এর ভতিজা কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ রা বলেছেন, ‘উমর এবং উসমান রা-এর যুগে এমনকি তাদের পরবর্তী যুগেও আয়িশা রা ফতোয়া দিতেন। এককথায় সারাজীবনই তিনি ফতোয়া দিয়েছেন। আমি তার খেদমত করতাম। পাশাপাশি ইবনু আব্বাস, ইবনু উমর এবং আবু হুরায়রা রা-এর মজলিসেও অংশ নিতাম। তাদের সবার থেকেই আমি অনেক ইলম হাঙ্গল করেছি।’

মাহমুদ ইবনু লাবীদ রা বলেছেন, ‘উম্মুল মুমিনীনদের সবাই অনেক হাদীস



মুখস্থ রেখেছিলেন। কিন্তু আয়িশা এবং উম্মু সালামা রা ছিলেন সবার চেয়ে এগিয়ে। উমর এবং উসমান রা-র যুগেও আয়িশা রা ফতোয়া দিতেন। তাঁরা দুজনই লোক পাঠিয়ে বিভিন্ন হাদীস এবং সুন্নাহ সম্পর্কে জানতে চাইতেন।<sup>[১]</sup>

আয়িশা রা এর পাঠদানের পদ্ধতি ছিল বর্তমানে প্রচলিত রীতি থেকে ভিন্ন। তিনি নিজের কক্ষেই থাকতেন। সাহাবি এবং তাবিয়ীগণ তার মাহরামদের মাধ্যমে প্রশ্ন পাঠাতেন। প্রশ্ন পৌঁছানোর এই দায়িত্ব সাধারণত পালন করতেন তার ভাগ্নে, ভাতিজা, সেবিকা এবং অন্যান্য মাহরামরা। আয়িশা বিনতু তালহা বলেন, ‘আয়িশা রা থেকে আমি তালিম নিয়েছি। ইলম অনুেষণকারীরা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তার দুয়ারে হাজির হতো। যাদের মাঝে থাকা অনেক বয়স্ক ব্যক্তি হাদীস, ফিকহ এবং মাসআলা জানার জন্য আমাকে পালাক্রমে পাঠাতে থাকতেন। কমবয়সী শিক্ষার্থীরা আমাকে খুশি করার জন্য হাদিয়া দিত। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকার জ্ঞানী লোকেরা আমার কাছে চিঠি লিখে আয়িশা রা থেকে তালিম নিতেন। আমি তাকে জানাতাম, এটা অমুকের চিঠি আর এটা তার পাঠানো হাদিয়া। উত্তরে তিনি বলতেন, তুমি আমার পক্ষ থেকে জবাব লেখো এবং তার হাদিয়ার বিনিময়ে হাদিয়া দিয়ে দাও। তোমার কাছে হাদিয়া দেওয়ার মতো কিছু না থাকলে আমিই দিয়ে দিচ্ছি। এই বলে তিনি হাদিয়া দেওয়ার মতো জিনিস আমাকে দিতেন।’<sup>[২]</sup>

অনেক পুরুষ এবং মহিলা আয়িশা রা থেকে তালিম নিয়েছেন। পুরুষদের মধ্যে তার ভাতিজা কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ, আর ভাগ্নে উরওয়া ইবনু যুবাইর এবং মহিলাদের মাঝে উমরা বিনতু আবদির রহমানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উমরা বিনতু আবদির রহমান ছোটকাল থেকেই আয়িশা রা এর কাছে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। আয়িশা রা এর হাদীসের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার তার কাছেই ছিল। আয়িশা রা এর হাদীসগুলো সংকলনের জন্য উমর ইবনু আবদিল আযীয রা তাকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এছাড়া বড় বড় অনেক সাহাবিও আয়িশা রা থেকে ফিকহের তালিম নিয়েছেন এবং হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমার ইবনুল আস, আবু মুসা আশআরি, যায়দ ইবনু খালিদ জুহানি, আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস, রাবীআ ইবনু আমর, সায়িব ইবনু ইয়াজিদ, হারিস ইবনু আবদিল্লাহ রা তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য। আবার শীর্ষস্থানীয় তাবিয়ীদের মাঝে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব,

[১] তবাকাতু ইবনি সাদ: ২/৩৭৫; আল ইসাবাহ: ৮/১৪০; ইলামুল মুওয়াক্কিযীন: ১/১৭; তাহযীবুত তাহযীব: ১২/৪৩৫; তাযকিরাতুল হুফফায: ১/৩৭।

[২] আল আদাবুল মুফরাদ, ১১১৮।

৭৮ • ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস

আলকামা ইবনু কায়স, আমর ইবনু মাইমুন, মাসরুক ইবনুল আজদা এবং আসওয়াদ ইবনু ইয়াজিদ নাখায়ি رضي الله عنه-সহ অনেকেই ছিলেন তার ছাত্র।

৫৮ হিজরিতে উম্মুল মুমিনিন আয়িশা رضي الله عنها ইন্তেকাল করেন। আবু হুরায়রা رضي الله عنه তার জানাযার নামাজ পড়িয়েছিলেন। জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।



## তাবিয়ীদের যুগে জ্ঞানচর্চা

তাবিয়ীদের যুগের জ্ঞানচর্চার পদ্ধতি রাসূল ﷺ এবং সাহাবীদের যুগের মতোই ছিল। তবে অবস্থা এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে সতর্কতার পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছিল। হিজরি প্রথম শতকের শেষ এবং দ্বিতীয় শতকের প্রথম ভাগে নানারকম গোমরাহ ফেরকা আত্মপ্রকাশ করে। ইসলামের মাঝে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে অনারব চিন্তাধারা। বিকৃতমনা গোষ্ঠীগুলো তখন জাল হাদীস তৈরির সূচনা করে। এর ফলে উলামায়ে কেরাম তখন হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যাচাই বাছাই করা শুরু করেন। কুফার জামে মসজিদে আলি ﷺ ঘোষণা দিয়েছিলেন, ‘তোমরা কার থেকে ইলম গ্রহণ করছ সেটা যাচাই করে নিয়ো। কারণ এই ইলমই তোমাদের দীন।’

মুসলিমের ভূমিকাতে ইবনু সীরিন রাহিমুল্লাহ এর একটি বাণী উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি বলতেন, ‘এই ইলম হচ্ছে দীন। সুতরাং তোমরা দেখে নিয়ো যে কার থেকে সেটা গ্রহণ করছ।’<sup>[১]</sup>

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাহিমুল্লাহ শেষ বয়সে বলতেন, একটা সময় ছিল যখন কেউ ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন’ বললেই আমরা সেদিকে লক্ষ করতাম। দ্রুত মনোযোগ দিতাম। কিন্তু বর্তমানে লোকেরা ঠিক-বেঠিকের পরোয়া না করে ইচ্ছেমতো হাদীস বর্ণনা করে বেড়াচ্ছে। তাই আমরা কেবল নির্ভরযোগ্য আলিমদের থেকেই বর্ণনা করব।’<sup>[২]</sup>

আবদুর রহমান ইবনু আবদিল্লাহ ছিলেন মদীনার বিখ্যাত ফকীহ। তিনি বলেন, ‘মদীনাতে এমন একশজন আলিম আমি পেয়েছি, যাদের প্রত্যেকেই ছিলেন বিশ্বস্ত। তা সত্ত্বেও তাদের কারো কারো কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করা

[১] মুসলিম: ১/১৪।

[২] জাওয়াহিরুল উসূল: ৪; আল মাজরুহূনা মিনাল মুহাদ্দিসীন: ১/২৮।

হতো না। বলা হতো, সে যোগ্যতা তাদের নেই।<sup>[১]</sup>

আসলে তাবিয়ীদের যুগে কিছু আলিমের জীবনে অলসতা আর উদাসীনতা দেখা দেয়। এজন্য অপরাপর আলিমরা তাদের গ্রহণযোগ্য মনে করতেন না। তাই তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ পরিহার করা হয়। এ সম্পর্কে মুগীরা বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তির কাছে ইলম শিখতে গেলে আমরা সবার আগে তার চালচলন এবং নামাজ লক্ষ্য করতাম। এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হলে তবেই তার থেকে ইলম শিখতাম।'<sup>[২]</sup>

মোটকথা, দু কারণে যাচাই-বাছাই করে ইলম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। প্রথমত, লোকদের দীনদারি, ইলমচর্চা এবং জীবনযাপনে ইসলামি আদর্শ বাস্তবায়ন মানসম্মত হচ্ছিল না। দ্বিতীয়ত, নিজেদের দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নের জন্য বিকৃতমনা লোকেরা জাল হাদীস তৈরি করছিল।

ইলম এবং দ্বীনের ব্যাপারে ছড়িয়ে পড়া এসব ফিতনা নির্মূল করা লক্ষ্য শেষ বয়সে উপনীত হয়ে সাহাবায়ে কেরাম ভীষণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এমনকি সত্যতা যাচাই করতেন সমবয়সীদের থেকে বর্ণিত হাদীসগুলোকেও। যদিও তাদের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কারোরই ভিন্নমত ছিল না।<sup>[৩]</sup>

সাহাবিদের যুগে বানোয়াট হাদীসের বিষয়টি ছিল অকল্পনীয়। তবে বার্বাক্যের কারণে তাদের কারও কারও স্মৃতিবিভ্রাট ঘটত। দেখা দিত বিস্মৃতি বা তথ্যজটের মতো স্বাভাবিক অসুবিধা। কিন্তু তাবিয়ীদের এবং তাদের পরবর্তীদের যুগে বানোয়াট হাদীস সম্পর্কিত ফিতনার উদ্ভব ঘটলে সে যুগের আলিমগণ হাদীস সংরক্ষণ এবং বর্ণনা যাচাই করতে মনোযোগী হন। এ ব্যাপারে তারা বর্ণনাকারীদের জীবনবৃত্তান্ত খতিয়ে দেখতেন। এভাবে সূচনা ঘটে 'জারহ ওয়া তাদীল' শাস্ত্রের। যাতে খতিয়ে দেখা হয় হাদীস বর্ণনাকারীদের চারিত্রিক এবং নৈতিক অবস্থান। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ, সালিম ইবনু আবদিল্লাহ, আলি ইবনুল হুসাইন, খারিজা ইবনু যায়দ এবং উরওয়া ইবনু যুবাইর রাহিমাহুমুল্লাহ ছিলেন এই শাস্ত্রের অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

এসব ফিতনা দমনের জন্য সনদের গুরুত্ব সামনে আসে। বর্ণনাকারীদের প্রত্যেকের ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য এই সনদের দরকার পড়ে। এ ব্যাপারে ইবনু সীরিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এক সময় (অর্থাৎ প্রাথমিক যুগে) লোকেরা সনদ

[১] মুসলিম: ১/১৫।

[২] আল মাজরুহুনা মিনাল মুহাদ্দিসীন: ১/১৬।

[৩] আত তারীখুল কাবীর: ২/৪৩৮ এবং ৩৪৯।



সম্পর্কে জানতে চাইত না। কিন্তু পরে যখন ফিতনা (তথা হাদীসের নামে জালিয়াতি) দেখা দিল, তখন লোকেরা হাদীস বর্ণনাকারীদের বলল—যাদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন, আমাদের কাছে তাদের নাম বলুন। এ কথা তারা এজন্য জানতে চাইত, যাতে পরখ করা যায় তারা সুন্নাহর অনুসারী কি না। তেমনটা হলে তাদের হাদীস গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে বিদআতি হলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না।<sup>[১]</sup>

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রা বলেছেন, ‘সনদ হচ্ছে দ্বীনের অংশ। সনদ না থাকলে (দ্বীনের ব্যাপারে) লোকেরা যাচ্ছেতাই বলে বেড়াত।’<sup>[২]</sup>

সনদের সাহায্যে বর্ণনাকারীদের জীবনের মান অবগত হওয়া যায়। ফলে কোনো ব্যক্তি থেকে হাদীস গ্রহণ বা বর্জন করা সহজ হয়। হাদীস সংরক্ষণের জন্য এটা একটা নিরাপদ পদ্ধতি। এজন্য তৎকালীন আলিমগণ ‘আসমাউর রিজাল’ নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র উদ্ভাবন করেন। এই শাস্ত্র উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য গৌরবের বিষয়।

## মদীনার ইলম এবং আলিমগণের শ্রেষ্ঠত্ব

ইলম অর্জনের জন্য সাহাবিদের দেশে দেশে সফর করার প্রয়োজন হয়নি। তাবিয়ীদের সময় হাদীসের মান নির্ণয়ের প্রয়োজন পড়লে মূলত তখনই বৈশ্বিক সফরের গুরুত্ব দেখা দেয়। বিশেষত মদীনার ফকিহ এবং মুহাদ্দিসগণ ছিলেন তৎকালীন মুসলিম জাহানের কেন্দ্রবিন্দু। তাই তাবিয়ীগণ সেখানে গিয়েই আশুস্ত হতেন।

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা বলেন, ‘উদ্ভূত পরিস্থিতিতে লোকেরা যদি মদীনাবাসীর কাছে সমাধান চায় এবং তাদের দেওয়া সম্মিলিত সমাধান যদি মেনে নেয়, তাহলে সবকিছু ঠিক থাকবে। কিন্তু অবস্থা এমন হয়েছে যে, কাকের মতো ডাকা মাত্রই লোকেরা তার পেছনে ছুটে বেড়ায়।’<sup>[৩]</sup>

আবু বকর ইবনু উমর ইবনি হাযাম রা বলেছেন, ‘কোনো ব্যাপারে মদীনাবাসীদের ঐক্যমত্য হতে দেখলে, সে বিষয়ে তোমার মনে কোনো খটকা রেখো না।’

অবশ্য সনদের মান বাড়ানো এবং হাদীস অনুসন্ধানের জন্য তাবিয়ীরা

[১] মুসলিম: ১/১৫।

[২] প্রাগুক্ত।

[৩] তারতীবুল মাদারিক: ১/৬১।

মদীনার মতো অন্যান্য দেশেও সফর করতেন। এমনটা যারা করেছেন সাদ্দিন ইবনুল মুসাইয়িব, শাবি, মাসরুক, হাসান বসরি, ইবনু শিহাব যুহরি, আওয়ালি এবং সুফইয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন তাদের অন্যতম।

সে যুগে মদীনার আলিমরা ছিলেন দু'নি এবং দু'নিয়াবি প্রত্যেক বিষয়ে মুসলিম জাহানের কেন্দ্রস্থল। শাসকরাও তাদের পরামর্শ এবং ফতোয়া অনুযায়ী চলতেন। খিলাফতের কাজ পরিচালনার সুবিধার্থে উমর রা এর একটি শূরা কমিটি ছিল। সেসব উপদেষ্টা ছাড়াও প্রতিটি স্তরের আলিম এবং কারীদের থেকে তিনি পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম যুহরি রা বলেন, 'উমর রা এর মজলিসে যুবক এবং বয়স্ক লোকদের অনেক ভিড় হতো। তিনি অনেক সময় তাদের মতামত জানতে চাইতেন।'

ইমাম যুহরি রা আরও বলেন, 'কোনো জটিল সমস্যা সামনে এলে উমর রা যুবকদের ডেকে তাদের মতামত জানতে চাইতেন। এভাবে তাদের তীক্ষ্ণ মেধার মূল্যায়ন করতেন।'<sup>[১]</sup>

মারওয়ান ইবনুল হাকাম ৪২ হিজরিতে প্রথমবারের মতো মদীনার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিছুদিন পর পুনরায় গভর্নর নিযুক্ত হন। দু'বারের শাসনামলেই তিনি নিজ মজলিসে সাহাবিদের আমন্ত্রণ জানাতেন। তাদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করতেন। ইবনু সাদ রা লিখেছেন, 'মারওয়ান মদীনার গভর্নর থাকাকালীন রাসূল সা এর সাহাবিদের একত্র করে পরামর্শ চাইতেন এবং তাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতেন।'<sup>[২]</sup>

উমর ইবনু আবদিল আজিজ রা ৮৬ হিজরি থেকে ৯৩ হিজরি পর্যন্ত মদীনার গভর্নর ছিলেন। এই সময়টাতে মদীনায় থাকা ফকিহ এবং কুরআন-গবেষকদের পরামর্শ ছাড়া তিনি কাজ করতেন না। মদীনায় এসে তিনি প্রথমে যোহরের নামাজ আদায় করেন। তারপর দশজন ফকীহকে আমন্ত্রণ জানান। আমন্ত্রণপ্রাপ্ত সেই ফকীহরা হলেন—উরওয়া ইবনু যুবাইর, উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনি উতবা, আবু বকর ইবনু হারিস, আবু বকর ইবনু সুলায়মান, কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ, সুলায়মান ইবনু ইয়াসার, সালিম ইবনু আবদিল্লাহ, আবদিল্লাহ ইবনু আমির এবং খারিজা ইবনু যায়দ রাহিমাহুল্লাহ। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, 'সওয়াব এবং ন্যায়ের অংশীদার হতে পারবেন এমন একটি কাজের জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনাদের মতামত

ছাড়া আমি দেখলে কিং অবহিত কর

তখন স ফিরে গেলে

৯১ হিজ মসজিদে ন খিলাফতকা যুগে মসজিদ আজিজ রা জুবাইর, উ ইবনু যায়দ মসজিদের করেন।'<sup>[৩]</sup>

মদীনার :

সাহাবিদের যুগে উদ্ভূত একত্র হতে মতবিনিময়ে সবাই মে ফতোয়া জ 'মদীনার ( এলে তারা বিচারকও

তাদের তবে প্রয়ে সাবিত রা

[১] জামিউ বায়ানিল ইলম: ১/১৬০।

[২] তবাকাতু ইবনি সাদ: ৫/৪৩।

[১] তবাকাতু

[২] ইমাম

[৩] তাহযী



ছাড়া আমি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব না। আপনারা কাউকে জুলুম করতে দেখলে কিংবা আমার অধীনস্থ কেউ জুলুম করলে, আল্লাহর ওয়াস্তে তৎক্ষণাৎ অবহিত করবেন।’

তখন সবাই উমর ইবনু আবদিল আজিজের জন্য দুআ করে নিজের মতো ফিরে গেলেন।<sup>[১]</sup>

৯১ হিজরিতে খলিফা ওয়ালিদের নির্দেশে উমর ইবনু আবদিল আজিজ   মসজিদে নববি পুনর্নির্মাণ করেন। এর আগে উমর এবং উসমানও নিজ নিজ খিলাফতকালে মসজিদে নববির সম্প্রসারণ করেছিলেন। ফলে নবি   এর যুগে মসজিদের সীমা কতটুকু ছিল, তা অস্পষ্ট হয়ে যায়। উমর ইবনু আবদিল আজিজ   তখন কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ, সালিম ইবনু আবদিল্লাহ, নাফে ইবনু জুবাইর, উবাদুল্লাহ ইবনু আবদিল্লাহ এবং আবদুল্লাহ ইবনু আমির এবং খারিজা ইবনু যায়দ রাহিমাহুমুল্লাহর কাছে খবর পাঠান। তারা নববি যুগে বিদ্যমান মসজিদের প্রকৃত সীমানা বলে দিলে ইবনু উমর   সেমতে নকশা প্রস্তুত করেন।<sup>[২]</sup>

## মদীনার সাত ফকিহ

সাহাবিদের পরে সাতজন ফকিহ মদীনার কর্ণধার বলে বিবেচিত হন। সে যুগে উদ্ভূত মাসআলা বা নতুন কোনো জটিলতা সামনে আসলে সেই সাতজন একত্র হতেন। কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরামের কর্মপন্থা এবং পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে তারা সমাধান বের করতেন। তাদের রায় এবং ফতোয়া সবাই মেনে নিত। এমনকি বিচারকও আদালত থেকে তাদের রায় অনুসারে ফতোয়া জারি করতেন। এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক   বলেছেন, ‘মদীনার (প্রসিদ্ধ) ফকিহ ছিলেন সাতজন। কোনো (নতুন) মাসআলা সামনে এলে তারা সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন। তারা রায় দেওয়ার আগ পর্যন্ত বিচারকও সে ব্যাপারে কোনো কথা বলতেন না।’<sup>[৩]</sup>

তাদের এই গবেষণা সভা সাধারণত মসজিদে নববিতে অনুষ্ঠিত হতো। তবে প্রয়োজনবোধে অন্যত্রও হতো। এই সাত ফকিহ ছিলেন যায়দ ইবনু সাবিত   এর ছাত্র এবং তার ফিকহি মতাদর্শের প্রচারক:

[১] তবাকাতু ইবনি সাদ: ৫/৩৩৪।

[২] ইমাম হারবির কিতাবুল মানাসিক: ৩৬৬।

[৩] তাহযীবুত তাহযীব: ৩/৪৩৭।

- » ১. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব ؓ (মৃ. ৯৪ হি.),
- » ২. উরওয়া ইবনু যুবাইর ؓ (মৃ. ৯৪ হি.),
- » ৩. আবু বকর ইবনু আবদির রহমান ؓ (মৃ. ৯৪ হি.),
- » ৪. উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদিলাহ ؓ (মৃ. ৯৮ হি.),
- » ৫. খারিজা ইবনু যায়দ ইবনি সাবিত ؓ (মৃ. ১০০ হি.),
- » ৬. কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি আবী বকর ؓ (মৃ. ১০৭ হি.) এবং
- » ৭. সুলায়মান ইবনু ইয়াসার ؓ (মৃ. ১০৭ হি.)।

## শিক্ষার মজলিস

এ যুগে মদীনার আলিমগণ নিজ নিজ রুচিবোধ আর ঝোঁক অনুসারে ইলমি বা সাহিত্য মজলিস করতেন। হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ও ফতোয়া, নবিজির যুদ্ধাভিযান, কবিতা ও সাহিত্য এবং আরবের ইতিহাস ছিল এ যুগের চিত্তাকর্ষক বিষয়। এসব বিষয় নিয়েই স্বতন্ত্র পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হতো। সর্বস্তরের আলিম এবং গুণীজনেরা এসব বৈঠকে আলোচনা করতেন। মসজিদে নববিত্তে 'উসতু-ওয়ানা তুল উফূদ' নামে একটি খুঁটি আছে। প্রতি রাতে সেই খুঁটির কাছে 'মাজলিসুল কিলাদাহ' নামে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো। সাহাবায়ে কেরামসহ বনেদী শ্রেণি এবং অভিজাত আলিমরাও সে বৈঠকে অংশগ্রহণ করতেন। মুআবিয়া ؓ শামে চলে যাওয়ার পরেও সেই বৈঠকের কথা স্মরণ করে বলতেন, 'মাজলিসুল কিলাদাহ যতদিন রইবে, মদীনা ততদিন আবাদ হতে থাকবে।'<sup>[১]</sup>

জ্ঞানচর্চার মজলিসগুলোতে আলিম, ফকিহ, বুজুর্গ-সহ সমকালীন ব্যক্তির অংশ নিতেন। তারা নানান বিষয়ে গবেষণা এবং বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতেন। এছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক বৈঠকও অনুষ্ঠিত হতো। সাহাবায়ে কেরামের ছাত্র তাবিয়ির সেখানে তালিম দিতেন। এ ব্যাপারে আবু হাতিম ؓ লিখেছেন, 'তাবিয়ির সাহাবায়ে কেরামের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। দ্বীন কায়েম করা, দ্বীনের ফরয বিধান, তার সীমানা, আল্লাহর আদেশ নিষেধ, বিধানাবলি, রাসূল ؐ এর হাদীস এবং সুন্নাহ হেফাজতের জন্য তাদেরকে আল্লাহ নির্বাচন করেছিলেন। ফলে তাবিয়ির রাসূল ؐ এর সেসব বিধানাবলি, হাদীস এবং সুন্নাহ মুখস্থ করেন, যার প্রচার প্রসার সাহাবির ঘটিয়েছিলেন। তারা সুনিপুণভাবে সেসব শিখে অর্জন করেন দ্বীনের গভীর চেতনা। দ্বীন ইসলাম এবং আল্লাহর

[১] কিতাবুল মুনায্বাক: ৪৪৫-৪৪৯।



আদেশ নিষেধের রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে তারা সেই স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন যার ব্যাপারে সূর্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

যারা একনিষ্ঠতার সাথে তাদের (অর্থাৎ সাহাবিদের) অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।<sup>[১]</sup>

মোটকথা, দ্বীনি এবং ইলমি ক্ষেত্রে অসমান্য অবদান রাখার মাধ্যমেই তাবিয়িরা মর্যাদার এমন স্তরে নিজেদের উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তারা ছিলেন সব ধরনের সন্দেহ সংশয়ের উর্ধ্বে। তাদের কয়েকজনের পরিচয় আমরা সামনে তুলে ধরব। তবে দ্বীনি জ্ঞান, সমঝ, মেধা এবং আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে সে যুগের কিছু কিছু আলিম নিজেদেরকে সেই স্তরে উন্নীত করতে সক্ষম হননি। সেজন্যই তাদের ব্যাপারে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন।

তাবিয়ীদের ছাত্ররা উস্তাদদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। উস্তাদদের অনুসরণ করে তারাও অসংখ্য মজলিসের আয়োজন করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবিয়ীদের মজলিসের যেই মান ছিল, সেটা ধরে রাখতে তারা সর্বাত্মক চেষ্টা করে গেছেন। সেই সাথে চিন্তাগত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কারণে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে তারা ছিলেন সদা তৎপর।

## সাদ্দ ইবনুল মুসাইয়িব রাহ.

সাদ্দ ইবনুল মুসাইয়িব ؓ এর উপাধি ছিল সাইয়িদুত তাবিয়িন তথা তাবিয়ীদের সর্দার। ৯৪ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার ইলমের পরিধি এতটাই বিস্তৃত ছিল যে, আবদুল্লাহ ইবনু উমর ؓ পর্যন্ত তার কাছে নিজের পিতার মতামত এবং চিন্তাধারার কথা জানতে চাইতেন। বড় বড় সাহাবিদের থেকে তিনি ইলম অর্জন করেছেন। মসজিদে নববিতে তার মজলিস হতো। তিনি দু রাকআত নামাজ পড়ে মজলিসে বসতেন। আনসার এবং মুহাজিরদের সন্তানেরা তার কাছে এসে জড়ো হতো। তিনি নিজে কথা শুরুর আগে কেউ তাকে প্রশ্ন করার সাহস পর্যন্ত করত না। কোনো আগন্তুক এসে সাদ্দদের কাছে কিছু জানতে চাইলে সবাই মনোযোগ দিয়ে তার জবাব শুনত।<sup>[২]</sup>

[১] আল জারহু ওয়াত তাদীলের ভূমিকা: ৮-৯; আয়াতটি সূরা তাওবা (৯) এর ১০০ নং আয়াত।

[২] আদাবুল ইমলা ওয়াল ইসতিমলা সামআনি: ৩৬।

উমর ইবনু আবদিল আজিজ ؓ মদীনার গভর্নর থাকাকালীন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব ؓ এর কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে কাজ করতেন। একবার তিনি কোনো ব্যাপারে পরামর্শ চেয়ে লোক পাঠালে সাঈদ ؓ নিজেই উপস্থিত হয়ে গেলেন। ইবনু উমর ؓ তখন কৈফিয়ত দিয়ে বললেন, ‘আসলে লোক পাঠিয়েছিলাম আপনার থেকে জেনে আসতে।’

সাঈদ ؓ এর মজলিসে সর্বস্তরের আলিমরা অংশগ্রহণ করতেন। এ ব্যাপারে মাকহুল শামি ؓ লিখেছেন, ‘সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িবের মজলিসে অংশগ্রহণ করতে কেউ অপছন্দ করত না। মুজাহিদ ؓ-কে এ কথা বলতে শুনেছি—সাঈদ যতদিন থাকবেন, ততদিন মানুষের মাঝে কল্যাণ থাকবে।’

খলিফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান তার দুই ছেলে ওয়ালিদ এবং সুলায়মানের জন্য সবার থেকে বাইয়াত গ্রহণ করছিলেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব ؓ তখন বাইয়াত দেবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিলেন। সেসময় মদীনার গভর্নর ছিল হিশাম ইবনু ইসমাজিল মাখযুমি। সে সাঈদ ؓ-কে ত্রিশটি বেত্রাঘাত করে এবং বাজারে বাজারে ঘুরায়। সেই কঠিন সময়ে সাঈদ ؓ একাই মজলিসে বসতেন। কারণ কঠোরভাবে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল, কেউ যেন তার মজলিসে না বসে।

## উরওয়া ইবনু যুবাইর রাহ.

অনেক পুরুষ এবং নারী সাহাবিদের থেকে তিনি ইলম অর্জন করেছিলেন। আয়িশা ؓ-এর ভাগ্নে হওয়ার সুবাদে তার থেকেও তিনি ইলম হাসিল করেছিলেন।

তার মজলিসের জায়গাটি ‘কুতাবু উরওয়া’ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এটির অবস্থান ছিল আবু হুরায়রা এবং আশ্মার ইবনু ইয়াসির ؓ-এর বাড়ির পাশে মসজিদুল গামামার কাছে। সেখানেই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠদান করতেন।

প্রতি রাতে নফল নামাজে তিনি কুরআনের এক চতুর্থাংশ তিলাওয়াত করতেন। তবে একবার ফোঁড়ার কারণে তার পা কাটতে হয়েছিল। সে রাতেই কেবল আমলটি করতে পারেননি।

ইবনু সাদ ؓ বলেন, ‘তিনি ছিলেন আস্থাভাজন। অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য আলিম ও বিশুদ্ধ ফকিহ।’

তার ছেলে হিশাম বলেছেন, আব্বার কাছে গেলে তিনি প্রথমে হাদীস



বর্ণনা করতেন। এরপর তালাক, খোলা তালাক, হজ, কুরবানি-সহ অন্যান্য বিষয়ের ওপর তালিম দিতেন। শেষে আমাদের আবার পড়া ধরতেন। আমি যথাযথভাবে মুখস্থ করতাম বলে আমার প্রতি তিনি খুশি হতেন। আল্লাহর কসম, তার কাছে থাকা হাদীসের ভাণ্ডারের একাংশও আমরা নিতে পারিনি। আমাকে এবং আমার ভাইদের ডেকে তিনি বলেছিলেন, ‘শিক্ষার্থীদের সাথে বসে আমার সামনে ভিড় করবে না। যখন আমি একাকী থাকি, তখন আমার কাছে জানতে চাইবে।’

তিনি আরও বলতেন, ‘তোমরা বেশি বেশি ইলম অর্জন করো। একসময় আমরা হিলাম জাতির সর্বকনিষ্ঠ প্রজন্ম। কিন্তু আজ আমরা শীর্ষস্থানে পৌঁছে গেছি। তোমরা যদিও আজ খুদে প্রজন্ম, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তোমরাই নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হবে। তবে শর্ত হচ্ছে ইলম হাসিল করতে হবে। তাহলেই জাতি তোমাদের প্রতি মুখাপেক্ষী হবে।’<sup>[১]</sup>

## কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ রাহ.

কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ   ছিলেন আবু বকর   এর নাতি এবং আয়িশা   এর ভতিজা। হিজরি ১০৭ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। শীর্ষস্থানীয় সাহাবি এবং তাবিয়ীদের থেকে তিনি ইলম অর্জন করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হতো যে আয়িশা   থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের ব্যাপারে তিনি সবচেয়ে বেশি জানেন। নবিজির রওজা এবং মিন্বরের মাঝামাঝি জায়গাতে ‘খওখাতু উমর’ এর পাশে তার মজলিস বসতো। সে জায়গাতেই অন্য সময় দরস দিতেন সালিম ইবনু আবদিল্লাহ  । কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ   এর মজলিস হতো ইশার নামাজের পর। আর সালিম ইবনু আবদিল্লাহ   দরস দিতেন দিনের বেলা।


ইবনু সাদ   লিখেছেন, মসজিদে নববিতে একই জায়গাতে কাসিম এবং সালিমের মজলিস হতো। তাদের ইন্তেকালের পর সেখানে তালিম দিতেন আবদুর রহমান ইবনু কাসিম এবং উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদিল্লাহ। তাদের ইন্তেকালের পর মালিক ইবনু আনাস সেখানেই দরস দিয়েছেন। জায়গাটি ছিল ‘খওখাতু উমর’ এর সামনে। রওজা এবং মিন্বরের মধ্যবর্তী স্থান।<sup>[২]</sup>

কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ   সকালে মসজিদে নববিতে বসে থাকতেন। লোকেরা তার কাছে মাসআলা জানতে চাইত। এ প্রসঙ্গে আবদুর রহমান

[১] আত তরীখুল কাবীর: ৪/৩২; জামিউ বায়ানিল ইলম: ১/১১৭।

[২] তবাকাতু ইবনু সাদ: ৫/১৮৮-১৮৯।






ইবনু আবিল মাওয়াল رحمہ اللہ লিখেছেন, ‘কাসিম ইবনু মুহাম্মাদকে দিনের শুরুতে মসজিদে এসে দু রাকআত নামাজ পড়তে দেখতাম। তিনি লোকদের মাঝে বসলে তারা নানান বিষয়ে সওয়াল করত।’

তার ছেলে আবদুর রহমান তো বাবার স্থানেই দরসের করতেন। তিনি ছিলেন পিতার যোগ্য উত্তরসূরি। এ সম্পর্কে ইমাম মালিক  বলেছেন, 'আবদুর রহমান ছাড়া কেউ তার বাবার মজলিসের যথাযথ উত্তরসূরি হয়নি।'


সালিম ইবনু আবদিল্লাহ রাহ.

সালিম ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ ছিলেন উমর ﷺ এর নাতি। নিজের সন্তানদের মাঝে উমর ﷺ এর সাথে সবচেয়ে বেশি মিল ছিল আবদুল্লাহর। আবার আবদুল্লাহ ﷺ এর সাথে পুত্র সালিমের মিল ছিল সবচেয়ে বেশি। সালিম ﷺ ১০৭ হিজরিতে ইস্তিকাল করেন।

ইমাম মালিক رحمہ اللہ বলেছেন, ‘জ্ঞান, শ্রেষ্ঠত্ব, আল্লাহভীতি এবং দুনিয়াবিমুখতার ক্ষেত্রে সালিম ছিলেন পূর্বসূরিদের নমুনা। এসব বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য।’<sup>১১</sup>

আবদুল্লাহ ইবনু উমর, উম্মুল মুমিনিন আয়িশা, আবু হুরায়রা, রাফে ইবনু খাদীজ  এবং রাসূল  এর দাস সাফীনা থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার গায়ের রং ছিল কিছুটা কালো। আচরণে কিছুটা গ্রাম্য ভাব ছিল। সাদামাটা জীবন যাপন করতেন। চালচলনে এতটাই বিনয় ছিল যে, তিনি মোটা কাপড় পরতেন, উটকে নিজের হাতে খাওয়াতেন। আবদুল্লাহ  তার এই ছেলেকে খুবই পছন্দ করতেন। সালিম  এর মজলিসের কথা পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে। সালিমের ভাই ছিলেন উবাইদুল্লাহ । তিনিই সালিমের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন।

ইবনু শিহাব যুহরি রাহ.

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনি উবাইদিল্লাহ ইবনি আবদিল্লাহ ইবনি শিহাব যুহরি। ইবনু শিহাব যুহরি নামে তিনি পরিচিত। হিজায় এবং শামের শ্রেষ্ঠতম আলিম ছিলেন। যায়দ ইবনু সাবিত  এর ইলম এবং ফিকহের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতেন। পাশাপাশি হাদীসশাস্ত্রেও তিনি ছিলেন স্বীকৃত

[১] তাসহীফুল ক্বাশী

[১] তাহযীবুত তাহযীব: ৩/৪৩৭।



ইমাম। উমর ইবনু আবদিল আজিজ ؓ এর নির্দেশে হাদীস সংকলন এবং বিন্যাসের কাজ করেছিলেন। পরবর্তীকালে মদীনা থেকে শামে চলে যান। ১২৪ হিজরিতে তার ইন্তেকাল হয়।

মদীনাতে তার ঘর ছিল বানুর রীল নামক স্থানে। সেখানেই তার মজলিস অনুষ্ঠিত হতো। মামার ইবনু রাশিদ ؓ এর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ইবনু শিহাব যুহরি থেকে আপনি কীভাবে হাদীস গুনেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, ‘আমি ছিলাম বনু তাহিয়া গোত্রের দাস। তারা আমাকে কাপড় বিক্রি করার কাজ দিয়েছিল। কাজের সূত্রে মদীনায় এসে দেখলাম, একজন বয়স্ক মানুষের কাছে অনেক লোক হাদীস পড়ছে। তখন আমিও তাদের সাথে বসে গেলাম।’<sup>[১]</sup>

মা’মার ؓ বলেছেন, ‘আমরা মনে করতাম যে যুহরি ؓ থেকে আমরা অনেক ইলম শিখেছি। কিন্তু খলিফা ওয়ালিদ ইবনু আবদিল মালিকের মৃত্যুর পর তার রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে যুহরির এত এত রচনাবলি বেরিয়ে এসেছিল যে, অনেকগুলো বাহনের ওপর চাপিয়ে সেগুলো নিয়ে আসতে হয়েছিল।’<sup>[২]</sup>

## রবীআতুর রায় রাহ.

রবীআ ইবনু আবদির রহমান ؓ ছিলেন আনাস ইবনু মালিক ؓ, সাযিব ইবনু ইয়াজিদ, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, কাসিম ইবনু মুহাম্মাদের ছাত্র। রবীআতুর রায় নামে তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ। মসজিদে নববিতে তার মজলিস অনুষ্ঠিত হতো। অভিজাত লোকদের অনেকেই তার মজলিসে বসতেন। তাযকিরাতুল হুফফায় গ্রন্থে এসেছে, তিনি ছিলেন মদীনার মুফতি। সমাজের গণ্যমান্য লোকেরা তার মজলিসে বসতেন। ইমাম মালিক ؓ তার থেকেই ফিকহ শিখেছিলেন।<sup>[৩]</sup>

ইবনু হাজার ؓ লিখেছেন, ‘কয়েকজন সাহাবি এবং বড় বড় তাবিয়ীদের দেখা তিনি পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মদীনার মুফতি। মদীনার অভিজাত শ্রেণী তার মজলিসে অংশগ্রহণ করত।’<sup>[৪]</sup>

দরসগাহে আসার আগে দীর্ঘদিন তিনি ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। এরপর মজলিসের আয়োজন শুরু করেন। ফলে অপূর্ব প্রজ্ঞা এবং চমৎকার ধীশক্তির মাধ্যমে শিক্ষকতা করতে পেরেছিলেন। তার ছাত্রদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে

[১] তারতীবুল মাদারিক: ১/১২০।

[২] তাযকিরাতুল হুফফায়: ১/১০২।

[৩] তাযকিরাতুল হুফফায়: ১/১৪৯।

[৪] তাহযীবুত তাহযীব: ২/২৫৮।

বড় বড় ইমামে পরিণত হন। দান-সদাকা এবং বদান্যতার ক্ষেত্রেও তিনি পিছিয়ে ছিলেন না। মজলিসে অংশগ্রহণকারী এবং ছাত্রদের পেছনের তিনি ৪০ হাজার সুর্ণমুদ্রা খরচ করেছিলেন।

১৩৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন রবীআ ইবনু আবদির রহমান ؓ।

### নাফে রাহ.

নাফে ؓ ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু উমর ؓ এর আজাদকৃত দাস। তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় ফকিহ তাবিয়ি। তাকে নিয়ে আবদুল্লাহ ইবনু উমর ؓ গৌরব বোধ করতেন। তিনি বলতেন, 'নাফের মাধ্যমে আল্লাহ আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন।'

মুহাদ্দিসদের মতে, ইবনু উমরের সূত্রে নাফে থেকে ইমাম মালিকের বর্ণনা হচ্ছে সর্বাধিক বিশ্বস্ত সনদ।

মসজিদে নববিতে সকালবেলা নাফে ؓ এর মজলিস বসত। শেষবয়সে তিনি দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েন। তখন জান্নাতুল বাকির দিকে থাকা নিজের বাড়িতে বসে তালিম দিতেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক ؓ বলেন, 'নাফের মজলিসে যখন বসতাম, তখন আমি ছিলাম অল্পবয়স্ক। আমার সাথে একজন খাদেম থাকত। নাফে ؓ সামনের দিকে ঝুঁকে হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি সকালবেলা মসজিদে নববিতে বসে থাকতেন। তখন তার কাছে কেউ থাকত না। সূর্যোদয়ের পর তিনি উঠে যেতেন। সালিম ؓ এর জীবদ্দশায় তিনি ফতোয়া দিতেন না। তখন একটি কালো চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতেন। কারো সাথে কথাবার্তা বলতেন না। তিনি ছিলেন ছোটোখাটো গড়নের মানুষ।'<sup>[১]</sup>

নাফে ؓ শব্দে শব্দে হাদীস বর্ণনা করতেন। শাদ্দিক বর্ণনার বিষয়টি তিনি কঠোরভাবে মেনে চলতেন। তবে অনারব বংশীয় হওয়ার কারণে আরবি ব্যাকরণের ব্যাপারে মাঝে মাঝে ভুল করে ফেলতেন। হাদীস এবং সুন্নাহ শেখানোর জন্য উমর ইবনু আবদিল আজিজ ؓ তাকে মিশরে পাঠিয়েছিলেন। ১১৭ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

### ইকরিমা রাহ.

তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ؓ এর দাস। আলি ؓ এর খিলাফতকালে

[১] তায়কিরাতুল হুফফাজ: ১/৯৪।



ইবনু আব্বাস ؓ ছিলেন বসরার গভর্নর। হুসাইন ইবনু আবিল হুস তখন তার কাছে ইকরিমাকে হাদিয়া পাঠান। ইবনু আব্বাস ؓ এর ইন্তেকালের পর তার ছেলে আলি ؓ তাকে মুক্ত করে দেন।

ইকরিমা ؓ ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ؓ এর ইলমের বাহক এবং মুখপাত্র। বিশেষত তাফসীর এবং মাগাযি সম্পর্কে তার জ্ঞানের প্রসিদ্ধি ছিল। ইবনু আব্বাস ؓ এর জীবদ্দশাতেই তার নির্দেশে তিনি ফতোয়া প্রদান করতেন। তিনি বলতেন, ‘ইবনু আব্বাস ؓ আমার পায়ে বাঁধন পরিয়ে কুরআন এবং সুন্নাহ শেখাতেন। ৪০ বছর যাবৎ তার কাছে আমি ইলম শিখেছি।’

মাগাযি তথা নবিজির যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে ইবনু আব্বাস ؓ এর ছাত্রদের মাঝে তিনি ছিলেন সেরা। এ প্রসঙ্গে আলোচনা উঠলে ছাত্রদের সামনে তিনি পুরো মানচিত্র তুলে ধরতেন। সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা ؓ বলেন, ‘ইকরিমা ؓ মাগাযি বিষয়ে আলোচনা করলে শ্রোতাদের মনে হতো, তিনি যেন দেখে দেখে বর্ণনা দিচ্ছেন।’

মুসলিম জাহানের অনেকগুলো অঞ্চল তিনি সফর করেছিলেন। সেখানে তালিমও দিয়েছিলেন। ইবনু আবি হাতিম ؓ ইকরিমার ছাত্রদের একটি লম্বা তালিকা দিয়েছেন। মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা, ওয়াসিত, মিশর, জাযিরা, সিজিস্তান, খোরাসান, জুরজান, সমরকন্দ ইত্যাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন তারা।

ইকরিমা ؓ মৃত্যুবরণ করেন ১০৫ হিজরিতে।

## ইবনু আবী যিব রাহ.

পুরো নাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদির রহমান ইবনি মুগীরা ইবনি হারিস ইবনি আবী হিশাম। ইবনু আবী যিব নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। তৎকালীন মদীনার ফকিহ, মুফতি এবং শাইখ ছিলেন। জ্ঞানে, গুণে, দুনিয়াবিমুখতায়, আল্লাহভীতিতে এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে তিনি সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। সারা রাত ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। একদিন পরপর রোজা রাখতেন। সত্যকথনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নিভীক। তার সরলতা এমন ছিল যে, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সর্বাবস্থায় একটি আলখাল্লা এবং টুপি পরেই কাটিয়ে দিতেন।

মসজিদে নববিতে তার মজলিস অনুষ্ঠিত হতো। একবার খলিফা মাহদি হজের পরে মদীনায় গেলেন। উপস্থিত সবাই খলিফাকে স্বাগত জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইবনু আবী যিব নিজের মজলিসে ছিলেন অনড়। কেউ

তাকে দাঁড়াতে বললে তিনি এ আয়াত পড়লেন,

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

| সেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে।<sup>[১]</sup>

এ খবর খলিফার কানে গেলে তিনি বললেন, ‘তার পেছনে পড়ো না। তার প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে আমার মাথার সমস্ত চুল খাড়া হয়ে গেছে।’<sup>[২]</sup>

কোনো ছাত্র মজলিসে টানা অনুপস্থিত থাকলে তার ব্যাপারে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, ‘তোমাদের সাথে কোথায়?’ তারা অজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি খুব রাগ করতেন। বলতেন, ‘তোমরা কোন কাজের? তোমাদের সাথে লোকটা মজলিসে বসে, অথচ তার খবর রাখো না! অসুস্থ হলে খবর নাও না! অভাবী হলে সাহায্য করো না!’ তবে ছাত্ররা তার সন্ধান দিতে পারলে তিনি বলতেন, ‘আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো। কাছে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেবো, তার খোঁজখবর নেবো।’<sup>[৩]</sup>

ইবনু আবী যিব ১৫৯ সালে ইন্তেকাল করেন।

## আবু হানীফা রাহ.

আবু হানীফার আসল নাম নুমান ইবনু সাবিত তাইমি কুফি। হিজরি ৮০ সালে তিনি কুফাতে জন্মগ্রহণ করেন। ফিকহের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ চার ইমামের মাঝে কেবল তিনিই তাবিয়ি হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। আনাস ইবনু মালিক ৷-কে তিনি যে একাধিকবার দেখেছেন, এ কথা তার জীবনীকারদের সবাই উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আরও অনেক সাহাবির সময়কাল তিনি পেয়েছেন এবং কয়েকজন থেকে হাদীসও শুনেছেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনিল জুয, আবদুল্লাহ ইবনু আবী আওফা, সাহল ইবনু সাদ সায়িদি এবং আবুত তুফাইল আমির ইবনু ওয়াসিলা ৷<sup>[৪]</sup>

আবু হানীফা ৷ সে যুগের হাদীস এবং ফিকহের বিখ্যাত আলিমদের থেকে ইলম শিখেছেন। তার শিক্ষকদের তালিকায় করা হলে চার হাজার জনের নাম পাওয়া যায়। শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ ৷ উকূদুল জুমান গ্রন্থে

[১] সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩: ৬।

[২] তাযকিরাতুল হুফায: ১/১৮০।

[৩] আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাফিহ: ২/১১৯।

[৪] তাযকিরাতুল হুফায: ১/৮৫; আল ইবার ফী খবারি মান গবার: ১/১২; ওয়াফাতুল আয়ান: ২/২৯৪; আল ফিহরিস্ত: ২৮৪; মানাকিবু আবী হানীফা ওয়া সাহিবাইহি: ৮।



আরবি বর্ণমালার ধারাক্রম অনুসারে ২৮০ জনেরও বেশি উস্তাদের নাম উল্লেখ করেছেন।<sup>[১]</sup> আবু হানীফা رحمہ اللہ ফিকহ শিখেছেন হাম্মাদ ইবনু আবী সুলায়মান رحمہ اللہ এর মজলিস থেকে। ইমাম শাফিয়ি رحمہ اللہ হাম্মাদকে ‘সব মাযহাবের ইমামদের ইমাম’ বলেছেন।

ইবরাহীম নাখায়ি رحمہ اللہ এর ইন্তেকালের পর হাম্মাদ ইবনু আবী সুলায়মান رحمہ اللہ তার স্থলাভিষিক্ত হন। হাম্মাদ رحمہ اللہ ছিলেন ইবরাহীম নাখায়ির বিশিষ্ট শাগরেদ। হাম্মাদের ইন্তেকাল হলে আবু হানীফা رحمہ اللہ উস্তাদের মজলিস সচল রাখেন। এ সময় হাম্মাদের আরও কয়েকজন ছাত্রকে দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ করা হয়েছিল। তারা অক্ষমতা প্রকাশ করলে সম্মিলিতভাবে আবু হানীফাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। অসংখ্য আলিম এবং তালিবুল ইলম তার মজলিসে অংশগ্রহণ করতেন। যাদের প্রত্যেকেই ছিলেন নিজ নিজ শাস্ত্রের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব।

আবু হানীফা رحمہ اللہ এর অভ্যাস ছিল যে, অতি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাগুলো নিয়ে তিনি বছরের পর বছর গবেষণা করতেন। সেই মাসআলার প্রতিটি দিক স্পষ্ট হওয়ার পরই ছাত্রদের সামনে তা তুলে ধরতেন। তার ছাত্ররাও মজলিসে অংশগ্রহণ করে ফিকহি মাসআলা নিয়ে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করতেন। কোনোদিন আদিয়া ইবনু ইয়াজিদ আওদি অনুপস্থিত থাকলে আবু হানীফা رحمہ اللہ বলতেন, ‘আদিয়া আসার আগ পর্যন্ত যুক্তি-তর্ক স্থগিত রাখো।’ অবশেষে আদিয়া এসে সহমত পোষণ করলে আবু হানীফা رحمہ اللہ তখন মাসআলাটি নথিভুক্ত করার নির্দেশ দিতেন।

ছাত্রদের কল্যাণকামিতা, অনুপ্রাণিত করা এবং সার্বিক প্রয়োজন পূরণের প্রতি খেয়াল রাখা ছিল আবু হানীফার মজলিসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি নিজে ছিলেন আর্থিকভাবে সচ্ছল। বদান্যতার ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকতেন সবসময়। ছাত্রদের সার্বিক খোঁজখবর নিতেন। তার ছাত্র হাসান ইবনু যিয়াদের বাবা ছিলেন খুবই দরিদ্র। হাসানের বাবা নিজের অসচ্ছলতার কথা তুলে ধরলে ইমাম সাহেব নিজের পক্ষ থেকে ছাত্র হাসানের জন্য ভাতা চালু করলেন। তদ্রূপ আবু ইউসুফ رحمہ اللہ এর পরিবারের কথা জানতে পেরে ১৭ বছর যাবৎ তাদের পৃষ্ঠপোষণ করেছেন।

আবু হানীফার ছাত্রসংখ্যা কয়েক হাজার। সে যুগের কোনো ফকিহ বা মুহাদ্দিসের তুলনায় তার ছাত্র ছিল বেশি। আবুল হাজ্জাজ মিয়যি رحمہ اللہ তাহযীবুল কামাল গ্রন্থে আবু হানীফা رحمہ اللہ এর ১০০জন শীর্ষ ছাত্রের নাম উল্লেখ করেছেন।

[১] উকৃদুল জুমান: ৬২-৮৭।

উকদুদ জুমান গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে ৮০০ ছাত্রের নাম।

## মদীনার দ্বীন, ইলমি এবং সাহিত্য মজলিস

সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবিয়িরা দ্বীন শেখা এবং শেখানোর জন্য সাধারণভাবে বৈঠকের আয়োজন করতেন। এর বাইরেও তারা নানান সময় নানান স্থানে বিশেষভাবে তালিমের ব্যবস্থা করতেন। সমমনা এবং সমরুচির আলিমগণ, বিভিন্ন শাস্ত্রের পারদর্শীরা সেসব মজলিসে পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করতেন। দ্বীনকে আলোচনার কেন্দ্র বানিয়ে তারা কুরআন, সুন্নাহ, ফিকহ, ফতোয়া, মাগাযি, কবিতা, সাহিত্য এবং আরবের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করতেন। মদীনা ছিল অনারব চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কুফা-বসরার মতো চিন্তাগত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জটিলতা সেখানে ছিল না। মদীনাবাসীদের মানসিকতা ছিল সম্পূর্ণ দ্বীনমুখী। সেই সাথে তাদের মধ্যে ছিল শরীয়তের গণ্ডিতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখার চমৎকার অভিরুচি, জীবনযাপনের বৈচিত্র্য এবং সুস্থ অন্তরের গুণাবলি। এজন্যই তাদের মজলিসগুলো হতো সাফসুতরা, বরকতবিশিষ্ট এবং চিত্তাকর্ষক। এছাড়া সচ্ছলতা এবং সুখের দিনগুলোও শুরু হয়ে গিয়েছিল। জীবনযাত্রার মানও বেড়ে গিয়েছিল। সমাজের সচ্ছল ব্যক্তিদের হাতখোলা মনোভাব এবং মুজাহিদদের অব্যাহত বিজয়ের কারণে মানসিক সুস্থি এবং চারিত্রিক শান্তির সুবাতাস বয়ে চলছিল। এজন্য যে-কোনো বিষয়ে খোলামেলা আলোচনার সুযোগ ছিল।

এই মজলিসগুলো সাধারণত মসজিদে নববির বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় অনুষ্ঠিত হতো। আবার মদীনার আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চলেও হতো। বিশেষ করে আকীক উপত্যকার বিভিন্ন প্রাসাদ এবং ভবনে কয়েকদিন-ব্যাপী ইলমি মজলিস এবং সাহিত্যের আসর বসত। এসব জায়গার চোখজুড়ানো প্রাকৃতিক দৃশ্য কবি সাহিত্যিকদের মন রাঙিয়ে তুলত।

মজলিসের আলোচনাগুলো মলাটবদ্ধ করা এবং দুর্লভ তথ্যাবলি নোট করার রীতি তখন পর্যন্ত চালু হয়নি। তাই এসব মজলিসের বিবরণ, আলোচনার সারকথা এবং চুম্বকাংশের খোঁজ বইয়ে পাতায় মেলা দুষ্কর। যুবাইর ইবনু বাক্বারের কিতাবু নাওয়াদিরিল মাদানিয়্যিন, আবু আলি যাকারিয়্যার কিতাবুল আকীক ওয়া আখবারিহা এবং কিতাবুন নাওয়াদিরি ওয়াত তালিকাত গ্রন্থে এসব মজলিসের বিরল তথ্যাদি পাওয়া যায়। তবে এসব সুলভ নয়। আবুল ফারাজ আসফাহানির কিতাবুল আগানি এবং আবু আলি কালির কিতাবুল আমালি সহ



কিছু গ্রন্থে মদীনার কবি সাহিত্যিকদের বিরল তথ্যাবলির সন্ধান মিলে। এখানে আমরা মদীনার এবং আকীক উপত্যকার কয়েকটি মজলিসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরছি।

## ✽ মাজলিসুল কিলাদাহ

সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবিয়ীদের যুগে মদীনায় অনেকগুলো জ্ঞানচর্চামূলক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক মজলিস হতো। নানান বিষয়ের ওপর সেখানে উন্মুক্ত আলোচনা হতো। আলিম, ফকিহ, মুহাদ্দিস এবং অভিজাত শ্রেণির লোকেরা সেখানে অংশ নিয়ে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করতেন। সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং উদ্ভূত মাসআলা প্রসঙ্গেও আলোচনা উঠে আসত। সাধারণত এসব মজলিস হতো ইশার নামাজের পর। মসজিদে নববির বিভিন্ন অংশে। এছাড়া শহরের বিভিন্ন স্থানেও আলিম এবং সাহিত্যিকরা আসর জমাতেন। হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, মাগাযি, কবিতা এবং সাহিত্য নিয়ে সেখানে আলোচনা হতো।

তেমনই একটা মজলিসের নাম ছিল মাজলিসুল কিলাদাহ। মসজিদে নববিতে উফূদ স্তম্ভের কাছে প্রতি রাতে ইশার পরে অনুষ্ঠিত হতো এই সভা। বিভিন্ন গোত্র থেকে আগত প্রতিনিধিদলের সাথে নবি ﷺ কথা বলতেন এই স্থানেই। হিজরি ১৯৯ সনে প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনু হাসান জাবালা মাদানি সংকলন করেন তারীখুল মাদীনাহ। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘ওই মজলিসকে “মাজলিসুল কিলাদা” বলা হতো। প্রথম যুগে নেতৃস্থানীয় লোকেরা সে মজলিসে অংশগ্রহণ করতেন।’

‘মাজলিসুল কিলাদাহ’ শব্দের অর্থ গলার মালার বৈঠক। আল্লামা মাজদুদ্দীন আল মাগানিম গ্রন্থে লিখেছেন, ‘সে মজলিসে বনু হাশিমসহ অন্যান্য গোত্রের অভিজাত শ্রেণির লোকেরা অংশ নিতেন বলেই তার নাম হয়ে যায় ‘মাজলিসুল কিলাদাহ’।<sup>[১]</sup>

শীর্ষস্থানীয় সাহাবি, তাবিয়ি, কুরাইশের অভিজাত শ্রেণি, আনসার এবং মুহাজিরদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা সে মজলিসে নিয়মিত অংশ নিতেন। ফলে এটি আভিজাত্যের ক্ষেত্রে মদীনার অন্যান্য ধর্মীয় এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈঠকের গলার হারের ন্যায় রূপ ধারণ করে। মুহাম্মাদ ইবনু হাবীব বাগদাদি رحمه তার সংকলিত কিতাবুল মুনাম্মাক গ্রন্থে এমনটাই মত ব্যক্ত করেছেন।<sup>[২]</sup>

[১] ওয়াফউল ওয়াফা: ১/৪৪৯-৪৫০।

[২] কিতাবুল মুনাম্মাক: ৪৪৫।

মুআবিয়া রা মদীনায় থাকাকালীন সময়ে এই মজলিসে নিয়মিত হাজিরা দিতেন। শামে থাকাকালীন এই মজলিসের কথা স্মরণ হলে তিনি ব্যথিত হয়ে পড়তেন। মদীনা থেকে কেউ তার কাছে গেলে তিনি এই মজলিসের তথ্য জানতে চাইতেন। বলতেন, ‘মাজলিসুল কিলাদা যতদিন রইবে, মদীনা ততদিন আবাদ হতে থাকবে।’

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস, হাসান ইবনু আলি, উবাইদুল্লাহ ইবনু আদি, আবদুর রহমান ইবনু আবদিল্লাহ, আবু ইয়াসার ইবনু আবদির রহমান, মুসা ইবনু তালহা এবং আবদুর রহমান ইবনু আবদি কারী রা ছিলেন সেই মজলিসের অন্যতম নক্ষত্র। কিন্তু এর জ্ঞানতাত্ত্বিক, ধর্মীয় এবং সাহিত্যিক বিরল তথ্যগুলো সংকলন করা হয়নি।

### ❖ ফকীহ সপ্তকের বৈঠক

মদীনার প্রসিদ্ধ সাত ফকীহর কথা ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে। এ কথাও বলা হয়েছে যে, তারা ছিলেন যায়দ ইবনু সাবিত রা এর ফিকহি মতাদর্শের অনুসারী। সে যুগে উদ্ভূত মাসআলা বা নতুন কোনো জটিলতা সামনে এলে, ওই সাতজন একত্র হতেন। কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের কর্মপন্থার আলোকে তারা সমাধান বের করতেন। আমরা পূর্বে এ কথাও বলেছি যে, তাদের মজলিস সাধারণত মসজিদে নববিতে অনুষ্ঠিত হতো। তবে প্রয়োজনবোধে হতো অন্যত্রও।

### ❖ আসহাবুশ শূরা তথা উপদেষ্টা কমিটির মজলিস

সাত ফকিহ-সহ আরও কজন শীর্ষস্থানীয় আলিম, ফকিহ এবং পরামর্শদাতার সমন্বয়ে দশ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। খিলাফত, প্রশাসন এবং প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে পরামর্শ দান করা ছিল সেই কমিটির দায়িত্ব। তাদের বৈঠক হতো গভর্নর এবং অভিজাত শ্রেণির এলাকায়।

গভর্নরের দায়িত্ব পাওয়ার পর উমর ইবনু আবদিল আজীজ রা দশজন মনীষীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এ ঘটনা আমরা উল্লেখ করেছি। সেই দশজনই ছিলেন উপদেষ্টা কমিটির সদস্য।

### ❖ মাগাযি সম্পর্কে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের মজলিস

মাগাযি তথা নবিজির যুদ্ধশাস্ত্র সম্পর্কে প্রাজ্ঞ একদল আলিম সে যুগে



মদীনায় থাকতেন। উরওয়া ইবনু যুবাইর, আবান ইবনু উসমান, আসিম ইবনু আমর, শুরাহবিল ইবনু সাদ, ইবনু শিহাব যুহরি, আবদুল্লাহ ইবনু আবী বকর, ওয়ালিদ ইবনু কাসির, মুসা ইবনু উকবা, আবদুল্লাহ ইবনু জাফর এবং মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক রাহিমাহুমুল্লাহ ছিলেন তাদের অন্যতম। এই ব্যক্তির মাগাযি সংক্রান্ত মজলিসের আয়োজন করতেন। সেখান থেকে অনেক শ্রোতা এবং ছাত্ররা উপকৃত হতেন। যাদের অন্যতম ছিলেন এ শাস্ত্রের বিখ্যাত সংকলক আবু মাশার নাজিহ ইবনু আবদির রহমান সিন্দি رحمہ اللہ। ১৭০ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।<sup>[১]</sup>

### ✽ যাইনুল আবিদীন এবং উরওয়ার মজলিস

প্রতিদিন ইশার পরে মসজিদে নববির কোনায় বসে তারা আলোচনা করতেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের মাঝে আলোচনা হতো। অনেক সময় চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং উমাইয়া খলিফাদের কর্মকাণ্ড নিয়েও তারা মতবিনিময় করতেন।

### ✽ ভাষা-সাহিত্যের মজলিস

মসজিদে নববিতে ভাষা এবং সাহিত্য নিয়েও আলোচনা হতো। সেখানকার কবি-সাহিত্যিক এবং অনলবর্ষী বক্তাদের আলোচনা থেকে উপস্থিত শ্রোতারা উপকৃত হতেন। এ শাস্ত্রে যুবাইর رحمہ اللہ এর পরিবার অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করে। আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর رحمہ اللہ এর ছেলে সাবিত رحمہ اللہ ছিলেন বদান্যতা, সাহসিকতা, বাগ্মিতা এবং অলঙ্কারশাস্ত্রে পুরো কুরাইশ গোত্রের মুখপাত্র। তার মুখনিসৃত সাহিত্য শুনতে মদীনার লোকেরা ছুটে আসতেন।

পরবর্তীকালে তার যোগ্য উত্তরসূরিতে পরিণত হয়েছিলেন তারই নাতি আবদুল্লাহ ইবনু মুসআব رحمہ اللہ। তিনি ছিলে অনলবর্ষী বক্তা এবং তুখোড় আলোচক।

### ✽ আকীক উপত্যকার মজলিস

মদীনার দক্ষিণ-পশ্চিমে কয়েক মাইল জায়গা জুড়ে আকীক উপত্যকার অবস্থান। এ অঞ্চলটি বেশ দীর্ঘ। প্রায় ছয় সাত মাইল হবে। আকীক উপত্যকাকে নবি ﷺ বরকতময় উপত্যকা বলে অভিহিত করেছিলেন। অত্যন্ত

[১] তারীখু বাগদাদ: ১৩/৪২৮।

সবুজ শ্যামল এই উপত্যকার পানি সুপেয় এবং স্বাস্থ্যকর। চারিদিকে সবুজ ক্ষেত, খেজুর বাগান, বিভবানদের আলিশান ভবন, কুয়া এবং ঝরনার আধিক্য মনের মাঝে প্রফুল্লতা সৃষ্টি করে। সাহায্যে কেরাম, তাবিয়িন এবং তাবি-তাবিয়িনের অনেক জমি-জিরাত ছিল এই এলাকায়। উরওয়া ইবনু যুবাইরের বাসস্থান, আসিম ইবনু আমরের মহল, মুগিরা ইবনু আবিল আসের প্রাসাদ, আশ্বাসা ইবনু আমর এবং আশ্বাসা ইবনু সাদ্দের প্রাসাদ, আবু বকর ইবনু আবদিল্লাহর মহল, আবদুল্লাহ ইবনু আবি বকরের বাসভবন, ইবরাহীম ইবনু হিশামের প্রাসাদ, খারিজার মহল, সাদ্দ ইবনুল আসের দালান ইত্যাদি ছিল সেখানকার বিখ্যাত ভবন।

আকীক উপত্যকা যে শুধু বিভবানদের নিবাস ছিল, তা নয়। মদীনার গুণী কবি-সাহিত্যিক এবং সৌখিন লোকদের মিলনমেলাও এখানেই অনুষ্ঠিত হতো। এখানে অনেক দ্বীনি, ইলমি এবং সাহিত্যিক আসর বসত। মজলিসের সদস্যরা এই চমৎকার স্থানটিতে বিভিন্ন বিষয়ে দিনের পর দিন আলোচনা করে কাটিয়ে দিয়েছেন। এই স্থানের গুরুত্ব এবং মহত্ব সম্পর্কে কয়েকজন আলিম গ্রন্থ রচনা করেছেন। যুবাইর ইবনু বাক্কার এবং আবু আলি হারুন ইবনু যাকারিয়ার কিতাবুল আকীকি ওয়া আখবারুহা অনেক প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ।

### ✽ উরওয়ার কূপস্থ মজলিস

আকীক উপত্যকায় উরওয়া ইবনু যুবাইর ؓ এর জমি-জিরাত এবং খেজুর বাগান ছিল। এই বিস্তৃত জমির মাঝ বরাবর ছিল তার বাসভবন এবং কূপ। এলাকাটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্যান্য প্রাসাদ এবং কূপের তুলনায় ছিল স্বতন্ত্র। পানির স্বাদ, শীতলতা এবং আধিক্যের কারণে কূপটি ছিল বিখ্যাত। এই পানি বোতলে ভরে রাক্বা নগরীতে খলিফা হারুনুর রশিদের জন্য উপহারস্বরূপ পাঠানো হতো।

উরওয়া ইবনু যুবাইর ؓ এখানকার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি মুসলমানদের কল্যাণে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। তার ছেলে হিশাম ইবনু উরওয়ার দায়িত্ব ছিল এসবের দেখভাল করা। এই কূপটির পাশেই বসত ইলমি, দ্বীনি এবং সাহিত্য মজলিস। এসব শাস্ত্রে পারদর্শী রুচিশীল ব্যক্তিরা তাতে অংশগ্রহণ করতেন।



## ❖ বানুল মাওলার মজলিস

কুবা ছিল মুহাজিরদের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র। এর বাইরে তারা কুলসুম ইবনুল হিদম ؓ এর ভিটাতে অবস্থান করতেন। যাকে ‘বাইতুল উযযাব’ বলা হতো। কুবাতে ‘মাজলিসু বনিল মাওলা’ নামে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো। আল মাগানিমুল মাত্বাবা গ্রন্থে আল্লামা মাজদুদ্দীন ؓ এই বৈঠকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেন, কুবাতে আমর ইবনু আওফ গোত্রটি বানুল মাওলার বৈঠক এবং গোসলখানার মাঝে ‘বাহরাজ’ নামে একটি দুর্গ তৈরি করেছিল। এর মালিক ছিল আজিজ ইবনু মালিক। বনু আমর ইবনু আওফ ‘শুনাইফ’ নামে আরেকটি দুর্গ তৈরি করে। এটির অবস্থান ছিল সুফইয়ান ইবনুল হারিসের ঘর ‘আহজারুল মির’ এবং বনুল মাওলার মজলিসের মাঝামাঝি। এটার মালিক ছিল বনু দবীআহ ইবনু যায়দ।<sup>[১]</sup>

হয়তো দুর্গ দুটির লোকেরাই সে মজলিসে অংশগ্রহণ করতেন। অন্যান্য মজলিসের মতো এখানেও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো। আমর ইবনু আওফ গোত্রে অনেক প্রসিদ্ধ সাহাবি, তাবিয়ি-সহ অনেক জ্ঞানীপুণী ছিলেন। তারা ছিলেন এই মজলিসের শোভা।

[১] আল মাগানিমুল মাত্বাবা: ৫১ এবং ২০৯।

দ্বিতীয় অংশ

# ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার বিতর্কিত

[ড. আহমাদ শালাবী কর্তৃক লিখিত]



## কৃতজ্ঞ যাদের কাছে

আমি কায়রো ইউনিভার্সিটির কাছে ঋণী। ঋণী মিশর সরকারের কাছেও। কারণ তারাই আমাকে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের সুনামধন্য ইউনিভার্সিটিতে ডক্টরেট সম্পন্ন করার জন্য মনোনীত করেছেন। সুযোগ করে দিয়েছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা শহর ঘুরে এ বুদ্ধিবৃত্তিক মিশনকে সফল করার। তাই বিশ্ববিখ্যাত কায়রো ইউনিভার্সিটির প্রতি আমি যারপরনাই কৃতজ্ঞ। মিশরের প্রতি রইল আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও সীমাহীন আস্থা।

যার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করলেই নয়, তিনি হলেন আমার শিক্ষক প্রফেসর আর্থার আর্বেরি। তিনিই এই টপিক আমার জন্য নির্বাচন করেছেন। আমাকে তা প্রস্তুত করতে উৎসাহ দিয়েছেন। সত্য কথা হলো, এই বই রচনার পেছনে প্রফেসর আর্বেরির নির্দেশনা, প্রস্তাবনা, গঠনমূলক সমালোচনা ও প্রেরণাদায়ক পর্যবেক্ষণের বিরাট অবদান রয়েছে।

এটা ছিল গবেষণার উদ্দেশ্যে করা (একটি থিসিস)। এই বুদ্ধিবৃত্তিক অভিযাত্রায় এবং এ লিখনী প্রস্তুত করার কাজে অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমি বিপুল সমাদর ও আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি। এক্ষেত্রে আমি আমার আরব সঙ্গীদেরকে সবার চেয়ে এগিয়ে রাখব। দামিশক, আলেক্সো, বৈরুত, বাগদাদ, নাজাফ ইত্যাদি নগরে তাঁরা সবসময় পাশে থেকে আমার কাজ সহজ করে দিয়েছেন। তা ছাড়া ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, স্পেন, কায়রো, ইস্তাম্বুলের অনেক জ্ঞানী, গবেষক ও রচনা-বিভাগের অভিজ্ঞজনদের অবদানও ভুলে যাওয়ার মতো নয়। তাঁদের সকলের প্রতি রইল গভীর কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ভালোবাসা।

আহমাদ শালাবী

## ড. আর্থার আবেরিংর ভূমিকা

বিশ্ব মানবতার কল্যাণে ইসলাম ধর্মের রয়েছে বিরাট অবদান, যা সত্যিই অবাক-করার মতো। যা শুনলে সত্যিই কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হয়। আমাদের সংগ্রহে আছে এমন অনেক গ্রন্থ ও রচনা যাতে উল্লেখ আছে রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, শিক্ষা ও শিষ্টাচার অঙ্গনে মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতির চমৎকার সব বিবরণ। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শিক্ষাগ্রহণ ও পাঠদান বিষয়ে মুসলিমদের ছিল সীমাহীন আগ্রহ। তা না হলে এ জ্ঞানগত উন্নতির চূড়ায় তারা আরোহণ করতে পারত না। এ উচ্চাভিলাষ মুসলিম-জাতিকে তাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে অনন্য আসন দান করেছে। তাই তো তাদের রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুগ যুগ ধরে মুসলিম নারী পুরুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছে জ্ঞান ও তত্ত্বের ময়দানে।

এ কারণেই মুসলমানদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষারীতি নিয়ে গবেষণা একদিকে যেমন খুবই গুরুত্বপূর্ণ; অন্যদিকে তা খুব স্পর্শকাতর। কিন্তু আমার বন্ধুবর ও আমার সাবেক ছাত্র ড. আহমাদ শালাবী তাঁর গবেষণা ও থিসিসের জন্য এ বিষয়টিই বেছে নিয়েছেন। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই গবেষণাপত্র উপস্থাপন করে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন। গ্রন্থের প্রতিটি পাঠক একটি বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, এ গবেষণাপত্র শক্তিশালী প্রমাণে ভরপুর; যা বইটির গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। গবেষক তাঁর তথ্যের প্রমাণ-স্বরূপ অনেক মূল সূত্র উল্লেখ করেছেন বইটিতে। বিশেষ করে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের নানা দেশ সফরকালে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন করেছেন। সেগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এসব তথ্যসূত্র ঘাঁটতে গিয়ে, উপাত্ত নির্বাচন করতে গিয়ে এবং গবেষণার কাজ আঞ্জাম দিতে গিয়ে ড. শালাবীর যে মেধা ও প্রতিভার বিচ্ছুরণ হয়েছে, যে সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ, গবেষণা, কঠোর পরিশ্রম, বিষয়বস্তুর গভীরতা, নিষ্ঠা, সাহসিকতা ও অনন্যতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন, সমস্যার মূলে ঢুকে যেভাবে তা স্পষ্ট করেছেন, সাবলিল উপস্থাপনা ও উত্তম বিন্যাসের যে নজির



তিনি সৃষ্টি করেছেন—তা এক কথায় অসাধারণ। আমি মনে করি, গ্রন্থটি মাধ্যমে ইসলামি শিক্ষার ইতিহাস বিষয়ের একটি প্রয়োজনীয় দিক আজ পূর্ণত পেল। তা ছাড়া গ্রন্থটি খুবই চমৎকার ও আকর্ষণীয় ভাষায় রচিত।

তিনি এ গবেষণাপত্র বই আকারে ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছেন যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি। লেখকের এই কঠোর পরিশ্রমের ফসল পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে নিজের ভেতর সীমাহীন পুলক অনুভব করছি।

# ভূমিকা

পল মোনরি তার বিখ্যাত গ্রন্থ The Educational Renaissance of the Sixteenth century-তে লেখেন, 'প্রাচীন যুগের শিক্ষা-কার্যক্রম সম্পর্কে সূক্ষ্ম তথ্য খুঁজে বের করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বিশেষত তা যদি হয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের খুঁটিনাটি সম্পর্কে, (তাহলে তো আর কথাই নেই)।'

প্রাচীন ইউরোপের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত খুঁজতে গিয়ে পল মোনরির এ কথার সত্যতা আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। একই সমস্যায় পড়েছি পূর্বযুগের মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য খুঁজতে গিয়ে। এ কারণেই এ থিসিস সম্পন্ন করতে গিয়ে আমাকে কঠোর ও নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম করতে হয়েছে। আমার মনে আছে, অনেক সময় আমি একটি তথ্য খুঁজতে গিয়ে দীর্ঘ কলেবরের গ্রন্থ পড়ে ফেলেছি, কিন্তু কাজক্ষিত তথ্য না পেয়ে হতাশ হয়েছি। এর কারণ হলো, মুসলিম ইতিহাসবিদগণ তাঁদের লেখায় খলিফা, বাদশাহ ও মহান বীরপুরুষদের রাজনৈতিক ও যুদ্ধবিষয়ক ঘটনাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষা-বিষয়ক সংস্কার নিয়ে আলোচনা তাঁদের লেখায় সেভাবে প্রাধান্য পায়নি। যেমন ধরুন, তাঁরা বিখ্যাত নিজামুল মুলকের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাগুলোর আলোচনা করেছেন মাত্র কয়েক লাইন। অপরদিকে নিজামুল মুলকের অর্থনৈতিক সংস্কার ও সামরিক বিজয়ের কথা বলেছেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। আরও অবাক-করা বিষয় হলো, আল-মাহাসিনুল ইউসুফিয়া নামে বীর সালাহুদ্দীন আইয়ুবির জীবনচরিত লিখেছেন কাযি ইবনু শাদাদ। কিন্তু আইয়ুবি রাজবংশের এ মহান স্থপতির শিক্ষাসংস্কার বিষয়ক অবদানের প্রতি সামান্য ইঙ্গিতটুকুও তিনি করেননি। অথচ সালাহুদ্দিন আইয়ুবির ছোট-বড় অন্যান্য সকল ঘটনা তাতে উল্লেখ আছে। তাঁর জন্ম, বেড়ে ওঠা, তাঁর চরিত্র, তাঁর যুদ্ধজীবন ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা, শিক্ষাসংস্কার, শিক্ষাপদ্ধতি—এ সম্পর্কে কিছুই লেখা নেই। শুধু তাই নয়; এ বিষয়ে ইবনু জামাআ, ইবনু সাহনুন, যারনুজি ও আমিলির মতো বিখ্যাত লেখকদের বই পড়েও এ যুগের গবেষকদের তৃপ্তি মিলবে না। কারণ, সেগুলোতে এ বিষয়ের



আলোচনা খুবই সংক্ষিপ্ত। অনেক বইতে একই আলোচনা পুনরাবৃত্তি হয়েছে। আপনি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের চরিত্র ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা পড়ছেন, তো হঠাৎ স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর উপকরণ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। বিস্মৃতি থেকে নিষ্কৃতির বিবরণ আরম্ভ হয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আলোচনার এ বিন্যাস বিগত কালে গ্রহণযোগ্য হলেও এ যুগে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, বর্তমান কালের গবেষক এ কথা বিশ্বাস করতে চাইবে না যে, নির্দিষ্ট ওজিদ্ধা পাঠ করলে স্মৃতিশক্তি শানিত হয়। কবরের নামফলক পড়লে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। আর তাই, এসব গ্রন্থ উপকারী হলেও বর্তমান গবেষকদের গবেষণার ক্ষেত্রে খুব একটা কাজে আসবে না।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা তুলে ধরা প্রয়োজন। আর তা হলো, এ গ্রন্থের প্রতিটি পরিচ্ছেদের জন্য দরকার ছিল—এক অধ্যায়ের তথ্যসূত্র অপর অধ্যায় থেকে ব্যতিক্রম হওয়া। শুধু তাই নয়; বরং অধ্যায়ের ভেতরে আরও যেসব অনুচ্ছেদ থাকে, সেই অনুচ্ছেদগুলোতে আলোচিত তথ্যসূত্র অপর অনুচ্ছেদ থেকে আলাদা হওয়া। যেমন দরকার ছিল প্রতিটি লেখকের আলোচিত গ্রন্থে জ্ঞানীদের বাড়ি, সাহিত্যের আসর, মসজিদ, মাদরাসা ইত্যাদি আলোচনার তথ্যসূত্রগুলো বিশেষ বিশেষ ও সুতন্ত্র প্রকৃতির হওয়া। যার কারণে এ গ্রন্থ রচনা এবং বিষয়বস্তুর নানা দিক নিয়ে আলোচনা স্পষ্ট করতে আমাকে অনেক বই, হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, দলিল-দস্তাবেজ ঘাঁটতে হয়েছে। যে কারণে আমাকে সফর করতে হয়েছে দীর্ঘদিন। সেই ভ্রমণে আমি প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগার ও হল্যান্ডের লাইডেন লাইব্রেরিতে গিয়েছি। স্পেনের ইন্সকোরিয়াল লাইব্রেরি ঘুরে দেখেছি। এরপর পাড়ি জমিয়েছি মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশে। মিশর, সিরিয়া, ইরাক, লেবানন, ফিলিস্তিন ও তুরস্কের বহু গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেছি। মধ্যপ্রাচ্যের এসব দেশ ভ্রমণকালে আমি এমন কিছু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দেখেছি, যেগুলো মধ্যযুগের সেই শিক্ষারীতি আজও অনেকাংশে ধরে রেখেছে। এগুলো পরিদর্শনে ব্যক্তিগতভাবে আমি বিরাট উপকৃত হয়েছি।

এ বিষয়ের আলোচনা এখানে যেভাবে বিন্যাস করেছি, তা আগে কখনো করা হয়নি। বরং আগেকার লেখকদের লিখনীতে এ বিষয়ের যৎসামান্য অনুচ্ছেদ বা কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত পাবেন। তা ছাড়া আমি এ বিষয়বস্তুকে সম্পূর্ণ নতুন সংকলন বলব। উপযুক্ত প্রমাণ ও তথ্যসূত্র দিয়ে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ করতে পেরেছি। আমার ধারণা, এ বিষয়ে ইতিপূর্বে যা কিছু লেখা হয়েছে, তা উপযুক্ত অনুলিপি ও তথ্যসূত্র দ্বারা এতটা সমৃদ্ধ ছিল না।

এ থিসিস সম্পন্ন করতে যে তথ্যসূত্রগুলো আমাকে সহায়তা করেছে,

সেগুলোকে মৌলিকভাবে চারটি ভাগে ভাগ করা যায় :

১. প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো এবং ঐতিহাসিক চিত্র
২. শিক্ষা-বিষয়ক লিখনীসমূহ
৩. সাধারণ সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক রচনাসমগ্র
৪. ইতিহাসের গ্রন্থসমূহ

## ১. প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো এবং ঐতিহাসিক চিত্র

এ গবেষণা-পত্রের প্রধান ও মূল্যবান উপজীব্য। বিশেষত দামিশকে আমার দেখা মধ্যযুগের ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ। মধ্যযুগীয় ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত বেশ কিছু মাদরাসা নিয়ে গবেষণার সুযোগ হয়েছে আমার। বিশেষত ষষ্ঠ শতকে নুরুদ্দিন জেনিগর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা। তা ছাড়া সেসব মাদরাসার শিক্ষা-পরিকল্পনার বিন্যাসগুলো হাতে নিয়ে দেখারও সুযোগ হয়েছে। সবশেষে আমার কাছে মনে হয়েছে, আবাসিক ব্যবস্থাপনা তখনকার প্রতিটি মাদরাসার অপরিহার্য অনুষঙ্গ ছিল। তেমনি মাদরাসার রান্নাঘর, খাবার সংগ্রহের জায়গা ইত্যাদি সম্পর্কেও বিস্তারিত ধারণা লাভ করেছি। অনেক ঐতিহাসিক চিত্রও প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছে। এর মধ্যে কিছু কিছু এ বইতেও স্থাপন করেছি। আমার গবেষণার কাজে সেগুলো থেকেও সংগ্রহ করেছি বিপুল তথ্য। বিশেষত শিক্ষা-বিষয়ক ওয়াকফ ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে। এসব প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন না করেই ইতিহাস রচনার ফলে কিছু কিছু ইতিহাসবিদের লেখায় যেসব ভুল তথ্যের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সেগুলো সংশোধন করে দিয়েছি।

## ২. শিক্ষা-বিষয়ক লিখনীসমূহ

যেসব রচনাসমগ্র থেকে আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো,

- » ইবনু জামাআ রচিত *তায়কিরাতুস সামি ওয়াল মুতাকাল্লিম*
- » ইবনু শাদ্দাদ রচিত *আল-আলাকুল খাতীরা*
- » নুআইমি রচিত *আদ-দারিসু ফি তারিখিল মাদারিস*
- » ইবনু আবদুন রচিত *রিসালাতু ইবনি আবদুন* (Journal Asiatique 1934)
- » জাহিয় রচিত *রিসালাতুল মুআল্লিমিন* (মুসেলে লিখিত)
- » কাবিসি রচিত *আল-ফাযালাহ*
- » কাতমুনি রচিত *তারগিবুন নাস ইলাল ইলম* (ইস্তাম্বুলে হস্তলিখিত)



- » ইবনু সাহনুন রচিত আদাবুল মুআল্লিমিন
- » জইনক লেখক রচিত মিনহাজুল মুতাআল্লিম (আলেপ্পোতে হস্তলিখিত, তবে লেখকের নাম এখনো জানা যায়নি)
- » জইনক ছাত্রকে সম্বোধন করে ইমাম আবু হানিফার রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা (ইস্তাম্বুলে হস্তলিখিত)
- » ওয়ালিদ ইবনু বিকর রচিত আল-ভিজায়া ফি আহকামিল ইজায়া (বাগদাদে লিখিত)
- » যারনুজি রচিত তালিমুল মুতাআল্লিম
- » শহীদ রচিত আল-মুনিয়া (নাজাফে লিখিত)
- » তশ কুবরি যাদাহ রচিত রিসালাতুন ফি ইলমিল আদাব (বাগদাদে লিখিত)
- » অর্মিলি রচিত আদাবুল মুফিদ ওয়াল মুস্তাফিদ

এসব রচনাসমগ্র থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছি, এক কথায় সেগুলো খুবই মূল্যবান। যেমন: ইবনু জামার গ্রন্থ থেকে পেয়েছি তৎকালীন পাঠশালার বিবরণ, আবাসিক ছাত্রদের নিয়ম ও রুটিন, শিক্ষার্থীদের বয়স, গ্রন্থাগার থেকে কিতাব ধার-করার নিয়ম ইত্যাদি। কারণ, আমার জানামতে এসব বিষয় ইবনু জামাআ ছাড়া আর কেউ তেমন গভীরভাবে আলোচনা করেননি। আর মিনহাজুল মুতাআল্লিম গ্রন্থটি একটি হস্তলিখিত মূল্যবান রচনা। আলেপ্পোয় তালাবদ্ধ ব্যক্তির ভেতর হস্তলিখিত বিভিন্ন গ্রন্থ খুঁজতে গিয়ে আমি তা পেয়েছি। আমার কাছে মনে হয়েছে, বিশেষ বিশেষ কিছু তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বইটি একটি দুর্লভ গ্রন্থ। কারণ তাতে আছে শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাইয়ের পদ্ধতি: স্মৃতিশক্তি, বোঁক, প্রবণতা ও বুদ্ধির বিচারে ছাত্রদেরকে নানা ক্লাসে বিভক্তকরণ। বাগদাদের বিখ্যাত আইন গবেষক উস্তায় আব্বাস উযযাভীও আমাকে বেশ কিছু হস্তলিখিত গ্রন্থের সন্ধান দেন, যার মধ্যে আল-ভিজায়া ফি সিহহাতিল কাওলি বি আহকামিল ইজায়া অন্যতম। সে যুগে শিক্ষকগণ ছাত্রদেরকে কেমন সার্টিফিকেট প্রদান করতেন, সে বিষয়ে গ্রন্থটি এটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ইমাম জাহিযের রচিত রিসালাতুল মুআল্লিমিন (অনেকে ভেবেছিলেন গ্রন্থটি বিলুপ্ত) ও অন্যন্ত উপকারী। বিশেষত তৎকালীন শিক্ষকদের সামাজিক অবস্থান ও মূল্যায়নের চিত্র উপস্থাপনের দিক থেকে। ইবনু সাহনুনের রচিত আদাবুল মুআল্লিমিন গ্রন্থটি (ইবনু খালদুন ভুলবশত এ গ্রন্থটি মুহাম্মাদ বিন যাইদের রচিত বলেছেন) বইটিও গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎস। এ বইয়ে উল্লেখ আছে যে, সে কালে

মেয়েরা বিশেষ রুমে বসে ক্লাস করত। ছেলেদের সঙ্গে একই কক্ষে বসে ক্লাস করত না। অথচ আরবি টেক্সট না বুঝে অনেক লেখক বলে বসেছেন যে, সে যুগে ছেলেমেয়েরা একসাথে ক্লাস করত! নুআইমির রচনা থেকে দামিশকের মাদরাসাগুলো সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছি। বাস্তব কথা হলো, উল্লিখিত সবগুলো গ্রন্থই আমার গবেষণার কাজে কোনো-না-কোনোভাবে অবদান রেখেছে।

### ৩. সাধারণ সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক রচনাসমগ্র

এথেকেও আমি নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, আরবি ভাষায় এ বিষয়ক বিপুল গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আরবি ভাষার গ্রন্থাগার ইসলামি শিক্ষা, ইসলামি ঐতিহ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ। যখনি আরবি ভাষার কোনো গবেষক সময় নিয়ে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এ বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত হবেন, ভরপুর সফলতা তাকে হাতছানি দেবে। এসব রচনাসমগ্রকে নিচের কয়েকটি প্রকারে ভাগ করা যায় :

ক) পর্যটক ও ভূগোলবিদদের গ্রন্থসমূহ :

- » ইয়াকুবি রচিত *কিতাবুল বুলদান*
- » ইবনুফ ফকিহ রচিত *আল-বুলদান*
- » মাকিদিসি রচিত *আহসানুত তাকাসীম*
- » ইবনু হাওকাল রচিত *আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক*
- » ইবনু জুবাইর রচিত *আর-রিহলাহ*
- » ইয়াকুত রচিত *মুজামুল বুলদান*
- » ইবনু বাতুতা রচিত *তুহফাতুন নাযযার*

এসব গ্রন্থ নানা উপকারী তথ্য-উপাত্তে ভরপুর। কারণ গ্রন্থকারগণ ইসলামি বিশ্বের নানা জায়গায় ঘুরে-ফিরে নিজেদের দেখা সকল স্থানের বিবরণ উল্লেখ করেছেন নির্ভরযোগ্য লোকদের বরাতে। যেমন : দামিশকের মসজিদের বিবরণ, মসজিদের কাঠামো তৈরির খরচ ইত্যাদি। এ তথ্যটি আমি পেয়েছি *আল-বুলদান* গ্রন্থ থেকে। তেমনি মাকদিসির রচিত *আহসানুত তাকাসীম* থেকে আমি সংগ্রহ করেছি শিক্ষকদের পোশাকের তথ্য। বিশেষত ইবনু জুবাইরের সফরনামা থেকে আমি প্রচুর উপাদান পেয়েছি। যেমন : ওয়াকফ ব্যবস্থাপনা ও গ্রন্থাগারের বিবরণ, পাঠশালার বিবরণ ইত্যাদি।

খ) জীবনীগ্রন্থ : Von Grunebaum তার বিখ্যাত *The Journal of General*



Education গ্রন্থে লেখেন: 'মুসলিম মনীষীদের নিয়ে মুসলমানদের লেখা জীবনীগুলো পড়লে সত্যিই বিস্ময় জাগে। বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ এবং সূক্ষ্ম নীতির আলোকে সেগুলো লেখা! তা ছাড়া এগুলোতে রয়েছে চমৎকার বিষয়বস্তু। সেই তুলনায় মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্যের লেখকদের বলার মতো কিছুই নেই। এ ময়দানে তারা আরবদের সঙ্গে কোনোভাবেই পেরে ওঠেননি।' বাস্তবেই জীবনীগ্রন্থসমূহ আরবি সাহিত্য ভাণ্ডারের প্রাচুর্যের প্রতিনিধিত্ব করে। বিপুল পরিমাণ গ্রন্থের পাশাপাশি সেগুলো খুব সুন্দর গোছালো। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের জন্য রয়েছে সমৃদ্ধ পৃথক জীবনী। সাহিত্যিক ও মনীষীদের জন্য আলাদা সমৃদ্ধ জীবনকথা। কবি, বিদ্বান, ধর্মতাত্ত্বিকদের জন্য স্তর ও চরিত্রভেদে পৃথক সমৃদ্ধ গ্রন্থ। আরও আছে: আদ-দুরারুল কামিনাহ ফি আয়ানিল মিআতিস সামিনা, আদ-দাওউল লামি ফি আয়ানিল কারনিত তাসি, আল-কাওয়াকিবুস সাযিরাহ ফি তারাজিমি উলামাইল মিআতিল আশিরাহ, খুলাসাতুল আসার ফি তারাজিমি উলামাইল কারনিল হাদি আশার, সিলকুদুরার ফি যিকরি আয়ানিল কারনিস সানি আশার.. ইত্যাদি ইত্যাদি।

যে যুগের মনীষীদের নিয়ে আমার গবেষণা, সেই মনীষীদের জীবনী নিয়ে আমি একটি মূল্যবান নির্যাস আলোচনা করেছি, যা এ গ্রন্থেই আছে। এরই ধারাবাহিকতায় পাঠক এই গ্রন্থের অধিকাংশ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত উৎসগুলোর উদ্ধৃতি পাবেন:

- » আবুল ফারাজ আসফাহানী রচিত আল-আগানী
- » ইবনুন নাদিম রচিত আল-ফিহরিস্ত
- » আবয়ারি রচিত তাবাকাতুল উদাবা
- » খতিব বাগদাদী রচিত তারিখু বাগদাদ
- » ইব্রাকুত রচিত মুজামুল উদাবা
- » ইবনু খাল্লিকান রচিত ওয়াফায়াতুল আয়ান
- » ইবনু শাকির কুতবি রচিত ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত
- » নাকদি রচিত আল-ওয়াফী (দারুল কুতুব আল-মিশরিয়্যায় লিখিত)
- » কিকতি রচিত আখবারুল হুকামা
- » ইবনু আবি উনাইবিআ রচিত উয়ুনুল আনবা
- » নূরকি রচিত তাবাকাতুশ শাফিয়িয়া
- » নাকররী রচিত নাকররত তীব

» ইবনু কাযি শাহবা রচিত মানাকিবুশ শাকিয়া ওয়া আসহাবিহি (দামিশকে লিখিত)

» সুয়ুতি রচিত আখবারুন নিসা (দামিশকে লিখিত)

কারণ আল-আগানী গ্রন্থটি সাহিত্যের আসর সংক্রান্ত আলোচনায় একটি মৌলিক উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তেমনি মেয়েদের শিক্ষার বিষয়েও। একেবারে শেষের অধ্যায়ের আলোচনায় সুয়ুতির লেখা গ্রন্থটিও অত্যন্ত উপকারী সাব্যস্ত হয়েছে। তা ছাড়া ইয়াকুত, ইবনু খাল্লিকান, কিফতি, ইবনু আবি উসাইবিয়ার রচনাগুলোও গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে অবদান রেখেছে। যেমন মসজিদ-ভিত্তিক পাঠশালা, শিক্ষকদের বৈশিষ্ট্য ও তাঁদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা, ক্লাসে শিক্ষার্থীর সংখ্যা, শিক্ষার জন্য দূরদেশে পাড়ি জমানো, ইলম অন্বেষণে ছাত্রদের কঠোর পরিশ্রম ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ইত্যাদি।

গ) আল-হিসবাহ (সংকাজের আদেশ ও অসং কাজে নিষেধ) সংক্রান্ত কিতাব: এ সকল কিতাবে ‘শিক্ষকদের ওপর নজরদারি’ সংক্রান্ত আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। সেসব অধ্যায়ের অনুচ্ছেদে শিশুদের কুরআন শিক্ষা দেওয়ার বিষয়, শিক্ষকগণ ছাত্রদের কতটুকু শাস্তি দিতে পারবেন ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে। এ কারণেই আল-হিসবাহ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো আমাকে অধ্যয়ন করতে হয়েছে:

» শাইযারি রচিত নিহায়াতুর রুতবা

» কারশি রচিত মাআলিমুল কুরবা

» আবদুর রাযযাক হাসসান রচিত আল হিসবাহ

ঙ) বিক্ষিপ্ত শিরোনামে থাকা আরও কিছু গ্রন্থ:

» ইবনু আবদি রাব্বাহি রচিত আল-ইকদুল ফারিদ

» জাহিয় রচিত আল-বায়ান ওয়াত তিবয়ান এবং আত-তাজ ফি আখলাকিল মুলুক

» আবু হাইয়ান তাওহিদি রচিত আল-ইমতাউ ওয়াল মুআনাসা, আল-মুকাবাসাত, আস-সদাকা ওয়াস সাদিক

» ইবনু সিনা রচিত আল-কানুন

» ইবনু আবদিল বার রচিত জামিউ বায়ানিল ইলম

» সাবি রচিত রুসুমু দারিল খিলাফাহ (বাগদাদে হস্তলিখিত)

» কাশাজিম রচিত আদাবুন নাদিম



- » গাযালি রচিত আল-ইহইয়া
- » আবদারি রচিত আল-মাদখাল
- » সুবকি রচিত মুফিদুন নিআম
- » ইবনু খালদুন রচিত আল-মুকাদিমা
- » মাকরিযি রচিত আল-খুতাত
- » সুয়ুতি রচিত হুসনুল মুহাযারা
- » কালাকশান্দী রচিত সুবহুল আ'শা

এসব গ্রন্থ থেকে প্রচুর তথ্য দিয়ে এ গবেষণাকে আমি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছি। জ্ঞানীদের স্তর ও মর্যাদা সংক্রান্ত বিশেষ অধ্যায়ের আলোচনায় আমি ভরসা রেখেছি আবু হাইয়ানের গ্রন্থসমূহের ওপর। শিশুদের গড়ে তোলা সংক্রান্ত বিষয়ে আল-ইহইয়া গ্রন্থ থেকে ইমাম গাযালির মতামত নিয়েছি। আর জাহিযের গ্রন্থগুলো মূল্যবান সব তথ্য উপাত্তে ভরপুর। বিচিত্র সব জ্ঞান ও রহস্য সমৃদ্ধ। তাঁর এসব গ্রন্থ থেকেই খলিফা ও বাদশাহদের সন্তানদের জন্য তৈরি করা বিশেষ পাঠ্যক্রম, শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা, সাহিত্য গ্রন্থসম্ভারের মূল্য, সাহিত্য আসরগুলোতে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া ব্যক্তিদের সাহিত্যিকতার মানদণ্ড ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করেছি। শেষোক্ত বিষয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছে কাশাজিম রচিত আদাবুন নাদিম এবং আস সাবি রচিত রুসুম দারিল খিলাফাহ। আর হস্তলিপি ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা সংক্রান্ত তথ্যের ব্যাপারে ইবনু দিকমাকের রচনাগুলো মিশরের মাদরাসাগুলোর বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে।

#### ৪. ইতিহাসের গ্রন্থসমূহ

এ থিসিসের চাহিদামতো ইতিহাসবিষয়ক আলোচনায় ইতিহাসের গ্রন্থ থেকে বিরাট উপকার পেয়েছি। হোক সেটি ইসলামি বিশ্বের সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ; যেমন: তাবারি, ইবনুল আসির, আল-ইবার। অথবা হোক ইসলামি বিশ্বের নির্দিষ্ট কোনো অংশের আলোচনা সংক্রান্ত; যেমন: তারিখু আলি সালজুক, তারিখুল উমামিল মুনকাতিআ (ব্রিটিশ জাদুঘরে পাওয়া হস্তলিখিত), আর-রাওয়াতাইন, মুফাররিজুল কুরুব ফি আখবারি বানি আইয়ুব (ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে পাওয়া হস্তলিখিত) এবং ইত্তিআজুল হনাফা প্রভৃতি। তবে আবু শামার লেখা আর-রাওয়াতাইন গ্রন্থটির কথা বিশেষভাবে বলতেই হয়। কারণ এই গ্রন্থের ভূমিকায় যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও উপকারী বিশ্লেষণ রয়েছে, তা অন্যান্য গ্রন্থে বিরল। বিশেষত সুলতান সময়ের রাজত্বকালে

নুরুদ্দিন জেনগি যে বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব সাধন করেছিলেন, সে বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার কারণে।

বর্তমান সময়ের লেখা অনেক গ্রন্থও সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে আমার এ গবেষণায়। Lammens এর লেখা *Etuds sur le Renge du Calife Omaiade Moawia ler* গ্রন্থটি মহান ও সম্ভ্রান্ত লোকদের সন্তানদের শিক্ষা-পদ্ধতি সংক্রান্ত অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করেছে। পাশাপাশি চতুর্থ শতকের ইসলামি সভ্যতার বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ, ধর্মীয় জ্ঞানসমূহ, ফিকহি মাযহাব ও বিচারপতিদের নিয়ে Adam Mez-এর রচনা থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছি। সে যুগের গ্রন্থাগার, শিক্ষকদের পোশাক, খলিফাদের সন্তানদের রাজপ্রাসাদেই প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে। তা ছাড়া Lane Poole এর রচিত *Saladin – Cairo Egypt in the Middle Ages* গ্রন্থটিও আমাকে দারুণ সহায়তা করেছে। বিশেষত মিশরের অবৈতনিক ও আবাসিক শিক্ষাব্যবস্থার বিষয়ে। তেমনি স্যার Gibb এর লেখা *Arabic Literature and Muhammadanism* গ্রন্থটিও নানা বিষয়ে বিরাট উপকারী একটি বই। বিশেষ করে আরবি সাহিত্য আসরের বিবরণ সংক্রান্ত বিষয়ে। তা ছাড়াও এ গবেষণায় আরও যেসব সমকালীন লেখকের গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

- » Richard Coke এর রচিত *Baghdad: The City of Peace*
- » Palmar রচিত *Harun Al Rashid*
- » Nicholson রচিত *A Literary History of the Arabs*
- » Browne এর রচিত *A Literary History of the Parsia*
- » Khuda Bukhsh রচিত *Islamic Civilization*
- » Amir Ali রচিত *A Short History of the Saracens*
- » Barthold রচিত *Muslim Culture*
- » Stern রচিত *Marriage in Early Islam*
- » Hitti রচিত *The History of the Arabs*
- » কুরকিস আওয়াদ রচিত *খায়াইনুল কুতুব ফিল ইরাক*
- » আহমাদ আমিন রচিন *ফাজরুল ইসলাম ও দোহাল ইসলাম*

তা ছাড়া অনেক বুদ্ধিবৃত্তিক ম্যাগাজিনও আমাকে এ গবেষণার কাজে সহায়তা করেছে। এর মধ্যে : *Islamic Culture, Journal of Education, The Nineteenth Century* ইত্যাদি। এ গ্রন্থের নানা জায়গায় পাঠক এসব ম্যাগাজিনের



উদ্ধৃতি পাবেন।

এ গবেষণার কাজে বেশ কিছু বিষয়কে ঐতিহাসিকভাবে উপস্থাপন করার দরকার ছিল। পাশাপাশি আরও কিছু বিষয় ছিল যেগুলো মৌলিক নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ফলে সেগুলো তেমন ঐতিহাসিক উপস্থাপনের দরকার ছিল না। দরকার ছিল কেবল তা সাব্যস্ত করা ও তার পক্ষে প্রমাণ পেশ করা।

প্রথমোক্ত বিষয় অর্থাৎ কিছু আলোচনা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিক করতে হয়েছে। সেগুলো হলো, মসজিদ ও শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা। আর কিছু বিষয় বর্ণনা করার পর একটা সময় এসে তা স্থিতিশীল হয়ে যায়। ফলে সে বিষয়ে আর গবেষণার দরকার পড়েনি। যেমন, শিক্ষকদের পোশাকের ধরণ। পোশাকের ধরণ উন্নত হতে হতে শেষ পর্যন্ত ইমাম আবু ইউসুফ একটি সুসজ্জল নীতি প্রণয়ন করেন। সেই নীতিই পরবর্তীকালে অনুসরণ করা হয়েছে। তা ছাড়া প্রত্যায়নপত্রের (সার্টিফিকেট) ব্যাপারেও একই কথা। আর দ্বিতীয় বিষয়ের মধ্যে পড়বে শিক্ষাক্ষেত্রে শাস্তি, দণ্ড, পুরস্কার, প্রতিদান, শিক্ষক-সমিতি ইত্যাদি। এসব বিষয়ের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করার দরকার পড়েনি। শুধু দরকার হয়েছে তা সাব্যস্ত করার এবং তখনকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে তার কার্যকারিতা প্রমাণের।

\*\*\*

কোনো বিষয়কে ইতিহাসের আলোকে উপস্থাপন করার সময় চতুর্থ শতকের ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে আমি উপলব্ধি করেছি যে, এ শতাব্দীতে মিশরের ইতিহাসকে আলাদা গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, সে শতকে মিশর ছিল ইসলামি বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র। সেই গুরুত্বের দৃষ্টিকোণ থেকেই গবেষণার একেবারে শেষদিকে মিশর ও ফাতিমি যুগের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তা ছাড়া একই গুরুত্বের কারণে ফাতিমিদের বিকল্প ও উত্তরাধিকার হিসেবে উঠে আসা আইয়ুবি সাম্রাজ্যের শিক্ষা-পদ্ধতিও স্থান পেয়েছে। কারণ তারাই ফাতিমিদের শিক্ষা সংস্কৃতির (বিকল্প) উত্তরাধিকারী। এরপর নিজামুল মুলক সেই বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের ধারাবাহিকতা ধারণ করে তাকে আরও উন্নত করেছেন। সেলজুকদের থেকে তা ধারণ করেছেন নুরুদ্দিন জেনগি। তাঁর পরে সেটিকে আরও উন্নত করেছেন সালাহুদ্দিন। ফলে আব্বাসীয় আমলের ঐতিহ্য ও ফাতিমিদের সভ্যতা—এ দুটিই একাকার হয়েছে মিশরে, আইয়ুবি শাসনামলে। আর সে কালে সকল মুসলমানদের দৃষ্টি ছিল মিশরের দিকে। তাই তো মিশর তার গুরুদায়িত্ব পালনে সফলতার সাক্ষর

রেখেছে। ৬৪৮ হিজরিতে আইয়ুবি শাসন পতনের পর থেকে দীর্ঘ কাল পর্যন্ত মিশর আইয়ুবীদের রেখে যাওয়া ইসলামি শিক্ষা আরও উন্নত করেছে। তবে এ গবেষণায় তা স্থান পায়নি।



## আরবি অনুবাদের ভূমিকা

গবেষণার কাজে কিছু আরব ও ইউরোপীয় দেশ ভ্রমণ করেছি। সে সময় আমি অনেক বিদ্যানুরাগী ও ইসলামি শিক্ষা নিয়ে গবেষণারত অনেক গবেষকের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তাঁদের অধিকাংশই আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। সাধ্যমতো তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আমার কাজ সহজ করেছেন। তাঁরা আশায় বুক বেঁধেছিলেন, কবে এই গবেষণার কাজ শেষ হবে। কবে সেটি গ্রন্থ আকারে তাঁদের হাতে আসবে।

যতই দিন যাচ্ছিল, ততই এই গবেষণা ও বিষয়বস্তুর প্রতি আমার টান বাড়ছিল। গবেষণা সমাপ্তির পর একপর্যায়ে এটি আমার হৃদয়ের একটি অংশ হয়ে যায়। আর আমিও হয়ে যাই তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ গবেষণার ফলাফল দেখে আমি অত্যন্ত পুলকিত। ইসলামি যুগে শিক্ষা-সভ্যতা এত উন্নত ছিল, তা স্পষ্ট করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমার শিক্ষক প্রফেসর আর্বেরি খুব করে চাচ্ছিলেন—গবেষণাটি যেন দ্রুত প্রকাশিত হয়। শেষ পর্যন্ত তা প্রকাশ পেয়েছে। এর জন্য তিনি সুন্দর ও গঠনমূলক একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন এবং দ্রুত ছাপানোর ও বই আকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করেছেন। সেই অনুরোধে তাঁর অনুপম চরিত্র এবং শিষ্যদের প্রতি তাঁর মনোযোগ ও দরদেব বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে—তাঁর সঙ্গে কাজ করার সময়েও এবং তাঁর কাছ থেকে চলে আসার পরেও।

ডক্টরেট সম্পন্ন করার পর উপলব্ধি করলাম যে, আমার কাজ এখনো শেষ হয়নি। আর তখন থেকেই এটি আমি ইংরেজি, আরবি ও অন্যান্য ভাষায় প্রকাশের উদ্যোগের কথা ভাবতে লাগলাম। এরপর ইংরেজি ভাষায় এটি প্রকাশের সুন্দর একটি সুযোগও পেয়ে গেলাম। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে বইটি ছাপানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছিল। ঠিক সে সময় বৈরুতের দারুল কাশশাফ প্রকাশনীর পরিচালক উস্তায মুস্তাফা ফাতহুল্লাহ বিশেষ কারণে কায়রোতে এসে উপস্থিত হন। বহু আগেই তিনি এ গ্রন্থের কথা শুনেছিলেন। এরপর কায়রোতে অবস্থানকালেই ইংরেজি ভাষায় প্রকাশের

জন্য আমার সঙ্গে চুক্তি করেন। লক্ষ্য ছিল, পাশ্চাত্যের বিভিন্ন রাষ্ট্র, ভারত, পাকিস্তান ও অনারব ইসলামি দেশসমূহের ইসলাম অনুরাগী পাঠকদের কাছে তা উপস্থাপন করা। কারণ, তারা ইসলামি বিষয়বস্তু নিয়ে পড়াশোনার জন্য উৎসুক ছিল। কয়েক সপ্তাহ পর কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বইটি ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিলেও উস্তায মুস্তাফা ফাতহুল্লাহর সঙ্গে চুক্তি করে ফেলায় আমি তাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করি। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সিদ্ধান্তের ছবিও প্রকাশ পেয়েছে। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্টদের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এরপর বাকি রইল গ্রন্থটি আরবি ভাষায় প্রকাশের। এরপর তা আরবি ভাষায় রূপান্তরের কাজে হাত দিই। কেবল যদি ইংরেজি থেকে আরবি অনুবাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকতাম, তবে কাজটি অনেক সহজ ছিল আমার জন্য। কিন্তু তা না করে আমি আমার গবেষণার ফাইল ও ডকুমেন্টগুলো আবার পড়লাম। মূল সূত্র থেকে তথ্য খুঁজে পেতে উৎস হিসেবে ব্যবহৃত গ্রন্থগুলো আবার অধ্যয়ন করলাম। যেন আরব লেখকদের বক্তব্য নানা সূত্র থেকে প্রমাণ-স্বরূপ কোনোরকম পরিবর্তন করা ছাড়াই ছবছ পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে পারি। তা ছাড়া ইংরেজি গবেষণাপত্র লেখার সময় আমার সীমাবদ্ধতা ছিল। কারণ সাহিত্য বা ইতিহাস বিষয়ক থিসিসের জন্য ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনূর্ধ্ব ষাট হাজার শব্দের শর্ত ছিল। কিন্তু আরবি ভাষান্তরের সময় আমার সামনে কোনো সীমাবদ্ধতা ছিল না। তাই ইংরেজি সংস্করণে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা বিষয়গুলো আমি এখানে সবিস্তারে বর্ণনা করতে পেরেছি। ওখানে যা সংক্ষেপিত ছিল, তা এখানে ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরতে পেরেছি। পাশাপাশি পরবর্তী সময় আরও নিত্যনতুন গবেষণা এবং পুরোনো কিছু গ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে আরবি সংস্করণে নতুন অনেক তথ্য যোগ হয়েছে।

আমি বলব, আরবি গ্রন্থটি ইংরেজি সংস্করণের তুলনায় অনেক পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধ। কারণ ইংরেজি সংস্করণ ও আরবি সংস্করণ প্রকাশের মাঝে লম্বা একটি সময় পার হয়েছে। যার ফলে কিছু কিছু জায়গায় পূর্ণ পরিবর্তন করতে হয়েছে। যেমন শিক্ষকদের সমিতি বিষয়ক আলোচনায়। আর কিছু বিষয় সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে নানা আলোচনায় অনেক কিছু যোগও করতে হয়েছে।

গ্রন্থের শেষদিকে আমি একটি নির্ঘণ্ট দিয়েছি, যা পাঠকদের প্রয়োজনীয় বিষয় খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। এই মুহূর্তে আমার প্রধান কর্তব্য, অদম্য পরিশ্রমী ব্যক্তিত্ব উস্তায মুস্তাফা ফাতহুল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কারণ ইংরেজি সংস্করণের মতো আরবি সংস্করণটিও প্রকাশের উদ্যোগ তিনি



নিয়েছেন।

আমার এই গবেষণা মুসলমানদের জন্য, ইসলামি গবেষকদের জন্য এবং আরবি ভাষানুরাগীদের জন্য সহায়ক হবে, তাদের পথচলার পাথেয় হবে—সবসময় এই আশা করি।

আহমাদ শালাবী

## প্রথম অধ্যায়

# শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ

৪৫৯ হিজরি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয়ে মুসলমানদের কাছে একটি যুগান্তকারী সাল। এ বছরই অন্যান্য পরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল মাদরাসার মতো বাগদাদের ঐতিহাসিক মাদরাসার পথচলা শুরু হয়। এটা প্রতিষ্ঠিত হয় তৎকালীন মহান সেলজুক উজির নিজামুল মুলকের উদ্যোগে। এসব সুবিন্যস্ত মাদরাসা অতি দ্রুত পুরো ইসলামি সাম্রাজ্যের ছোট বড় শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি নানা অঞ্চলের রাজধানীগুলোতেও ছিল বড় বড় মাদরাসা। এরপর নিজামুল মুলকের দেখানো পদ্ধতিতে অন্যান্য রাজ্যের শাসক ও খলিফাগণও মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। এ ব্যাপারে সামনে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

এসব মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের আগে শিক্ষা-কার্যক্রমের কোনো প্রতিষ্ঠানিক রূপ ছিল না। সুপরিকল্পিত কোনো রীতি মেনে পাঠশালা পরিচালিত হতো না। বরং তখন পাঠদান হতো মসজিদে, আলিমদের বাড়িতে, বই বিতানে, ইত্যাদি বিচিত্র জায়গায়। এরপর যখন মাদরাসার পরিকল্পিত রূপায়ন আবিষ্কার হয়, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য আরও সুন্দর পরিবেশে সুশৃঙ্খল ও উন্নত পদ্ধতিতে পাঠদানের পরিবেশ সৃচিত হয়, তখন দক্ষ শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়া হয়। বিপুল শিক্ষার্থীদের পড়ার জায়গা করে দেওয়া হয়। এই সুবিন্যস্ত শিক্ষাক্রম শুরু হওয়ার পর পুরোনো রীতিতে পরিচালিত অন্যান্য পাঠশালায় শিক্ষার্থীদের ভিড় হ্রাস পেতে থাকে। পরবর্তী কালে সেগুলো নিজ নিজ স্বকীয়তা ধরে রাখতে সক্ষম হলেও, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে যায়। সেসব পাঠশালা ও তাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে গেলেও সেগুলো নিজ নিজ জায়গায় বিদ্যমান ছিল।

এর ওপর ভিত্তি করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আলোচনাকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে চাই :



১. মাদরাসা-ভিত্তিক শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে প্রচলিত পাঠশালা
২. মাদরাসা বা বিদ্যালয়

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বিষয়ক গবেষণায় আমরা ৪৫৯ হিজরি পূর্ব পাঠশালা-কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা এড়িয়ে যাব না। কারণ মাদরাসা-ভিত্তিক শিক্ষাকার্যক্রম আবিষ্কার ও প্রসারের পরও এসব প্রতিষ্ঠান ও পাঠশালা নিজ নিজ কার্যক্রম খুব ভালোভাবেই আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছিল।

১ম ভাগ

# মাদরাসা শুরু হওয়ার আগে প্রচলিত পাঠশালা

---



## ১. পঠন ও লিখন শিক্ষায় ক্ষুদ্রে পাঠশালা

এত প্রচার ও ব্যাপ্তি না পেলেও ক্ষুদ্রে পাঠশালাগুলো ইসলাম-পূর্ব যুগে প্রচলিত ছিল। মক্কাবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম আরবি লেখা শিখেন সুফিয়ান বিন উমাইয়া বিন আবদি শামস এবং আবু কাইস বিন আবদি মানাফ বিন যাহরাহ বিন কিলাব। উভয়ে এ শিক্ষা গ্রহণ করেন হায়রা অঞ্চল থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত উস্তায-বিশর বিন আবদুল মালিক থেকে।<sup>[১]</sup> ইবনু খালদুন লেখেন: ‘হায়রা অঞ্চল থেকে লিখন শিক্ষা গ্রহণ করেন সুফিয়ান বিন উমাইয়া। কেউ বলেন হারব বিন উমাইয়া। আর তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন আসলাম বিন সিদরাহ থেকে।’<sup>[২]</sup>

মক্কাবাসী এই ব্যক্তিবর্গ ব্যবসার উদ্দেশে উন্নত দেশ ও শহর ভ্রমণ করে এসব শিক্ষা লাভ করেন। তবে লিখনশৈলীকে আরব উপদ্বীপে সর্বপ্রথম পেশা হিসেবে নেন ওয়াদিল কুরা অঞ্চলের এক লোক। তিনি সেখানে অবস্থান করে স্থানীয় লোকদের লিখনী শেখাতেন।<sup>[৩]</sup>

এভাবেই আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে লেখাপড়ার কার্যক্রম। তবে সেই কার্যক্রম ছিল যথেষ্ট ধীর গতির। কারণ ইসলাম আগমনের সময় কুরায়শ গোত্রে পড়াশোনা জানা লোকদের সংখ্যা ছিল মাত্র সতেরো জন।<sup>[৪]</sup> তবে এ ধর্মের আবির্ভাব এবং তার ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট মানুষকে দারুণভাবে পড়ালেখা শিখতে আগ্রহী করে তোলে। কারণ পড়া ও লেখা—এ দুটি বিষয় তখন অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত যারা ইতিহাস সৃষ্টিকারী নতুন এ যুগে বড় বড় সরকারি পদ ও উন্নত আসনের আগ্রহী ছিলেন, তাদের জন্য। তা ছাড়া আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস বর্ণনায় আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্যও জরুরি ছিল পড়ালেখা করা। কারণ পড়ালেখা না-জানা মুহাদ্দিসদের ‘গায়রে সিকা রাবী’ (অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী) হিসেবে গণ্য করা হতো। পড়ালেখা জানা ছিল তখন হাদিসের শব্দ বর্ণনায় শুদ্ধতা ও সূক্ষ্মতা নির্ণয়ের মাপকাঠি।<sup>[৫]</sup> এভাবে যখন ইসলামের যুগ সামনে অগ্রসর হতে থাকে, আবদুল মালিক বিন মারওয়ান ও তাঁর পুত্র ওয়ালিদের শাসনামলে নানা শাস্ত্রের বিদেশী গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। তখন শিক্ষিত লোকদের প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি হয়। এরপর জন্ম নেন জাহিযের

[১] বালায়ুরি: ফুতুহুল বুলদান: পৃ ৪৫৭।

[২] আল মুকাদ্দিমা: পৃ ২৯৩।

[৩] বালায়ুরি: পৃ ৪৫৭।

[৪] প্রাপ্ত তথ্যসূত্র।

[৫] আন নাওয়াভী: তাহযিবুল আসমা: পৃ ৭৩।

মতো বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক। যারা পঠন ও লিখনশৈলীকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যান, মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে বসান—তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। রিসালাতুল মুআল্লিমিনে তার ভাষায় শুনুন: ‘লিখন-পদ্ধতি না থাকলে পূর্ববর্তী কালের লোকদের ইতিহাস বিলুপ্ত হয়ে যেত। বিগত মানবগোষ্ঠীর পদচিহ্ন মুছে যেত। মুখ ও বাকশক্তি হলো তোমার ভিতরকার সাক্ষী। আর কলম হলো তোমার পূর্ব ও পরের সুপ্ত বিষয়ের সংবাদদাতা। তাই কলমের উপকার অনেক ব্যাপক। লেখালেখি ও রচনার প্রয়োজন অত্যধিক। মধ্যস্থতা গ্রহণ করে চলতে অভ্যস্ত শাসক লিখনী যোগ্যতা ছাড়া কখনো তার আশপাশের এলাকার উন্নয়ন করতে পারবে না। দেশের ঘাটতি পূরণ করতে পারবে না। নিজ সাম্রাজ্যে আইনকানুন প্রয়োগ করতে পারবে না। লিখন-পদ্ধতি না থাকলে কোনো কিছুই ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হতো না। কোনো কিছুই সঠিকভাবে পরিচালনা করা যেত না। আমরা দেখেছি, কেবল হিসাব ও লিখন-পদ্ধতির মাধ্যমেই দীন ও দুনিয়ার সকল বিষয়ের ভারসাম্য রক্ষা হয় এবং সবকিছুর ভিত্তি সুরক্ষিত থাকে।’<sup>[১]</sup>

এসব কারণেই মানুষ পড়ালেখার প্রতি মনোযোগী হয়। ইসলামের সূচনাকাল থেকেই আরম্ভ হয় এই শিক্ষাবিপ্লব। এরপর যতই দিন গড়াচ্ছিল, ততই নতুন নতুন কারণ ও চাহিদাকে কেন্দ্র করে সেই শিক্ষার সৃজনশীল পদ্ধতি উন্নতি হচ্ছিল।

ইসলামের একেবারে সূচনালগ্নে পড়ালেখা জানা মুসলিমদের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এঁদেরকে তাঁর সামনে লেখালেখির কাজে নিযুক্ত করেন।<sup>[২]</sup>

এ কারণেই মুসলিম ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা শেখানোর দায়িত্ব নেন অমুসলিম নাগরিকগণ। বদর-যুদ্ধে মক্কাবাসী অনেক কাফির যুদ্ধবন্দি হয় মুসলিমদের হাতে। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মুক্তিপণ হিসেবে নির্দিষ্ট সংখ্যক মুসলিম ছেলেদের পড়ালেখা শেখানোর দায়িত্ব দেন।<sup>[৩]</sup> এভাবেই পড়ালেখা শেখানোকে পেশা হিসেবে নেওয়ার বিষয়টি কাফিরদের কাছে একটি প্রসিদ্ধ ও পরিচিত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।<sup>[৪]</sup> তখন কেবল শিক্ষকদের বাড়িতেই শিক্ষাদান কার্যক্রম সম্পন্ন হতো। অনেক শিক্ষক নিজ বাড়িতেই

[১] হস্তলিখিত পাতা: ৮।

[২] বালাযুরি: ১৪৭, ৪৫৯।

[৩] মুবাররিদ: আল কামিল: Weight ছাপা, পৃ ১৭১।

[৪] বালাযুরি: প্রাগুক্ত তথ্যসূত্র। আরও দেখুন: Lammens পৃ ৩৬১।



একটি কক্ষ আলাদা করে রাখতেন শিক্ষার্থীদের জন্য। এ ধরনের পাঠশালা ছিল অন্যান্য পাঠশালা থেকে একেবারে স্বতন্ত্র প্রকৃতির। কুরআন ও ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি শিক্ষাদানের জন্য অন্যান্য পাঠশালার কথা আমরা সামনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

এক্ষেত্রে অনেক গবেষক এ দুই ধরনের পাঠশালার মাঝে কোনো তারতম্য না করে এ দুটিকে এক করে ফেলেছেন। তাদের দাবি, সে যুগে কেবল একমুখী শিক্ষাব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল, যেখানে পঠন ও লিখন শেখানো হতো, কুরআন মুখস্থ করানো হতো এবং ধর্মীয় জ্ঞানের পাঠ দেওয়া হতো। যেসব গবেষক এমন দাবি করেন, তাদের একজন হলেন ডক্টর ফিলিপ। তিনি এও বলেছেন: 'প্রথম প্রথম পাঠশালাগুলোতে শুধু কুরআন শিক্ষা দেওয়া হতো। শেখানোর বই হিসেবে কুরআনকেই বেছে নেওয়া হতো। ছাত্ররা কুরআন পড়ে পড়ে আরবি পড়া শিখত। এরপর কুরআন থেকে নির্বাচিত অংশ লিখে লিখে তারা লিখন-পদ্ধতি শিখত। এই পড়ালেখার পাশাপাশি তারা আরবি ভাষার ব্যাকরণ, নবিদের ঘটনা, বিশেষত রাসূল মুহাম্মাদের হাদিস শিখে নিত।'<sup>[১]</sup>

উস্তায মুহাম্মাদ আমিনও একই মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, 'কিছু কিছু পাঠশালা ছিল প্রাথমিক পঠন, লিখন ও কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আর কিছু পাঠশালাতে ভাষাসহ অন্যান্য বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া হতো।'<sup>[২]</sup> তবে আমি আমার গবেষণার তথ্য-উপাত্ত দ্বারা বুঝেছি যে, এসব পাঠশালা অন্যসব পাঠশালা থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ও স্বতন্ত্র পদ্ধতির ছিল। বিশেষ করে প্রাচ্যের দেশগুলোতে। আমি আমার মতের পক্ষে অনেক প্রমাণও পেশ করব। এসব প্রমাণ নানা যুগে ও নানা প্রেক্ষাপটে ধারাবাহিক ছিল। যার দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষার এ দ্বৈত পদ্ধতি যুগ যুগ ধরে প্রচলিত।

» এক. সর্বপ্রথম প্রমাণটি প্রথম ইসলামি যুগের সাথে সম্পৃক্ত। পঠন ও লিখন শিক্ষাদান ছিল তখন বদর-যুদ্ধে বন্দি হয়ে আসা কাফিরদের কর্ম। আর সুভাবিকভাবেই অমুসলিমদের সাথে কুরআনের বা ইসলাম ধর্মের কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না, যা আমি ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি। এর পরবর্তী দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এ কথা প্রসিদ্ধ ও লোকমুখে প্রচলিত ছিল যে, পঠন ও লিখনী শিক্ষাদান মূলত অমুসলিম নাগরিকদের কাজ। অপরদিকে পঠন ও লিখনশৈলী আয়ত্বকারী মুসলিমগণ এ পেশার মাঝে পড়ে থাকত না। কারণ, এরচেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল,

[১] History of the Arabs, P ৪০৮।

[২] দোহা ইসলাম ২: ৫০।

যার বিবরণ সামনে আসবে।

» দুই. এ বিষয়ে আন্দালুসের বিদ্বান মনীযী আবু বকর ইবনুল আরাবির (মৃত্যু ৫৪২ হি:) বক্তব্য আরও স্পষ্ট। তিনি বলেন, ‘শিক্ষাদান বিষয়ে মুসলিমদের পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত চমৎকার। সেটি হলো, তাদের সমাজে শিশুরা যখন সামান্য বড় হতো, তখন লিখনী, গণিত ও আরবি ভাষা শিখতে তাদের প্রাথমিক পাঠশালায় পাঠানো হতো। এরপর যখন কিছু বুদ্ধিগুদ্বি হতো বা বালগ হতো, তখন তাদের পাঠানো হতো কারী সাহেবদের কাছে। কারী সাহেবগণ মৌখিকভাবে তাদের কুরআন শেখাতেন। এভাবে মৌখিকভাবে শুনে শুনে তারা প্রতিদিন তিন পৃষ্ঠা, পাঁচ পৃষ্ঠা বা দশ পৃষ্ঠা করে হিফজ করত।’<sup>[১]</sup>

» তিন. এরপর আমি উল্লেখ করব মহান পর্যটক ইবনু জুবাইরের (মৃত্যু ৬১৪ হি:) উক্তি, যা তিনি তার আর-রিহলাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— ‘প্রাচ্যের এসব দেশে বাচ্চাদের কুরআন শেখানো হতো মৌখিকভাবে। আর লিখন-বিদ্যা তারা শিখত কবিতা ও অন্যান্য বিষয় দিয়ে। কারণ কুরআনের আয়াত লিখলে বাচ্চারা তা বারবার মুছবে, খেলাচ্ছলে যত্রতত্র তা ফেলে দিলে কুরআনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। দেশভেদে অধিকাংশ পাঠশালায় মৌখিক শিক্ষাদানের একেক রকম পদ্ধতি চালু ছিল। এভাবে মৌখিক শিক্ষার পাঠশালা ও লিখন শেখার পাঠশালা ছিল পৃথক পৃথক। এটি খুব ভালো একটি পদ্ধতি। এভাবেই তারা নানা বিষয় শেখার সৌভাগ্য পেয়েছিল। কারণ এক পাঠশালার শিক্ষক অন্য কোনো বিষয়ে মনোযোগী হতেন না। সবসময় তিনি তার কর্ম ও মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতেন বাচ্চাদের এক বিষয়ের শিক্ষাদানে। আর বাচ্চারাও মনোযোগ নিবদ্ধ রাখত কেবল এক বিষয়ের শিক্ষা গ্রহণে।’<sup>[২]</sup>

» চার. একই রকম বক্তব্য ইবনু বাতুতার<sup>[৩]</sup> (মৃত্যু ৭৭৯ হি:)। তিনি বলেন, ‘লেখা শেখানোর শিক্ষক ছিলেন কুরআনের শিক্ষক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। লিখনী-শিক্ষক কবিতা ও অন্যান্য বই থেকে ছাত্রদের লেখালেখি শেখাতেন। কুরআনের পবিত্রতা রক্ষার্থে কুরআনের আয়াত তারা ফলক বা কাঠে লিখতেন না। এভাবে (মৌখিকভাবে কুরআন পড়া শেষে) ছাত্ররা লিখনীর ক্লাসে চলে যেত। কারণ লিখনী-শিক্ষক অন্য কিছু শেখাতেন না।’

[১] আহকামুল কোরআন ২: ২৯১।

[২] আর-রিহলাহ, পৃ ২৭১।

[৩] তুহফাতুন নাযযার ১: ২১৩।



» পাঁচ. ইবনু খালদুন (মৃত্যু ৮০৮ হি:) বলেন, 'প্রাচ্যে লিখনী শিক্ষাদানের এক বিশেষ রীতি চালু ছিল। অন্যান্য বিদ্যা ও শিল্পের মতো সে জন্য শিক্ষকও ছিলেন বিশেষ ও সূতন্ত্র। তারা বাচ্চাদের ক্ষুদে পাঠশালায় আসতেন না। আর যখন তারা বাচ্চাদের জন্য কাঠে লিখে দিতেন, তখন অত্যধিক সুন্দর করে লিখতেন না। কারণ তখন লিখন-বিদ্যার সমাদর ছিল। বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে প্রচুর কষ্ট ও পরিশ্রম করে আগ্রহীদের লিখনী শিক্ষা শিখতে হতো।'<sup>[১]</sup>

এসব বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে, এ প্রাথমিক ও ক্ষুদে পাঠশালাগুলো ছিল ইসলামি বিশ্বের সর্বপ্রথম বিদ্যালয়। আরবি শব্দটি হচ্ছে كُتَاب 'কুতাব' যা মূলত الكُتَيْب (লিখন ও লেখানো) থেকে এসেছে। অর্থাৎ এ ক্ষুদে পাঠশালাগুলোর প্রধান দায়িত্ব ছিল লেখা শেখানো। লিসানুল আরব অভিধানে শব্দটির অর্থও এ রকম দেওয়া হয়েছে: 'কুতাব হলো যেখানে লেখা শেখানো হয়।'<sup>[২]</sup> আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনাও এর সমর্থক। কারণ, কুতাবে শুধু লিখন ও পঠন শিক্ষা দেওয়া হতো। যেহেতু শিশুরা এসব কুতাবে প্রাথমিক পড়ালেখা শেষ করে বড় হয়ে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কুরআন ও ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করত, তাই বিশেষায়িত এসব প্রতিষ্ঠানের গায়েও কুতাব নাম পড়ে যায় (আমাদের উপমহাদেশে একে মক্তব বলা হয়)। এরপর এ পরিভাষাটি ব্যাপক প্রচার পায়। এভাবেই বাচ্চাদের কুরআন এবং পড়ালেখা শেখার জন্য নির্দিষ্ট সব রকম পাঠশালার নাম হয়ে যায় কুতাব (বা মক্তব)। এ কারণেই লিসানুল আরব রচয়িতা মুবাররিদ মাকতাবের অর্থ করেন 'শিক্ষাকেন্দ্র'।<sup>[৩]</sup> তবে এর দ্বারা তখনকার স্বাভাবিক পাঠশালার চিত্র ফুটে ওঠে না। উভয় পাঠশালা একাকার হয়ে একই পদ্ধতির পাঠশালা হয়ে গেছে—এ কথা বোঝায় না।

## ২. কুরআন ও মৌলিক জ্ঞান শিক্ষার পাঠশালা

ধর্ম ও নীতি বিষয়ক আলোচনায় মুসলমানদের প্রাথমিক যুগের শিক্ষা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন গোল্ড যিহার (Goldziher)। সেই প্রবন্ধে তিনি এ কথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, কুরআন ও ইসলাম ধর্মীয় মৌলিক

[১] আল মুকাদ্দিমা: ৩৯৮।

[২] লিসানুল আরব ২: ১৯৩।

[৩] লিসানুল আরব ২: ১৯৩।

বিষয়াদি শিক্ষার পাঠশালা পদ্ধতি অনেক আগে থেকেই প্রচলিত। ইসলাম ধর্মের সূচনা কাল থেকেই তা চলে আসছে। তিনি তার মতের সমর্থনে একাধিক সনদভিত্তিক বর্ণিত দলিল পেশ করেন।

» ক. আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা একবার এক ক্ষুদ্রে পাঠশালার শিক্ষকের কাছে লোক পাঠিয়ে কিছু ছাত্র তলব করেন। পশমের জোট ছাড়াতে ও সুতা কাটার কাজে তাঁকে সহায়তা করতে।

» খ. উমর বিন মাইমুন অন্যদের চোখের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য কিছু দুআ মুখস্থ করেন। তিনি বলেন, বিখ্যাত সাহাবি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সন্তানদের দুআটি শিক্ষা দিতেন। একজন শিক্ষক যেভাবে ছাত্রদের লিখিয়ে শিক্ষা দেন, তেমনি সন্তানদের জন্য তিনি দুআটি লিখে দিতেন।

» গ. একবার ইবনু উমর ও আবু উসাইদ কোনো এক কাজে একটি ক্ষুদ্রে পাঠশালার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আর পাঠশালার ছাত্ররা এ দুজনের দিকে তাকিয়ে ছিল।

» ঘ. লেখার কাজে ব্যবহৃত বিশেষ ফলক বা কাঠের প্রচলনও বহু আগে থেকেই ছিল। উম্মু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি এ ধরনের ফলকে বিদ্যার কিছু বাক্য লিখেন দিতেন। যে ছাত্রকে তিনি পড়ালেখা শেখাতেন, সে যেন তা দেখে বারবার পড়তে ও লিখতে পারে।<sup>[১]</sup>

এই হলো বিশিষ্ট জ্ঞানী গোন্ড যিহারের পেশ করা প্রমাণসমূহ। তিনি উভয় রকম পাঠশালার মাঝে তারতম্য দেখেননি। তাই তো কোনো গ্রন্থে ফলক বা কুতাব উল্লেখ থাকলেই তাকে ইসলামের প্রারম্ভিক যুগ থেকে শুরু হওয়া কুরআন শিক্ষার পাঠশালার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। তবে আমি মনে করি, কুরআনের পাঠশালা শুরু হয়েছে আরও পরে। গোন্ড যিহারের উল্লেখ করা ঘটনাসমূহের দ্বারা পঠন ও লিখন শিক্ষার পাঠশালা উদ্দেশ্য। কারণ দ্বিতীয় ও চতুর্থ ঘটনা দ্বারা সে রকমই ইঙ্গিত মেলে। সেখানে লিখনী শিক্ষা এবং জ্ঞানকথা ও নীতিবাক্যের সাহায্যে লেখা প্রশিক্ষণের কথা বোঝানো হয়েছে।

কুরআন শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ ক্ষুদ্রে পাঠশালা (মক্তব) চালু হয়েছে অনেক পরে। আমার এমন ধারণার পেছনে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কারণ

[১] Encyclopaedia of Religions and Ethics v P. ১৯৯।



কুরআনের পাঠশালা কুরআনের হাফিজদের উপস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করা খুব জরুরি। সেটি হলো, ইসলামের একেবারে সূচনালগ্নে পুরো কুরআনের হাফিজ সংখ্যা ছিল দুই। ইবনুল আরাবি বলেন, 'সাহাবি শিক্ষার্থীদের মধ্যে অধিকাংশরা কুরআন হিফজ ফিকহ ও হাদিস শিক্ষা করেছেন দেরিতে। অনেক সময় দেখা গেছে, একজন সাহাবি মসজিদে ইমামতি করছেন অথচ তিনি হাফিজ নন। কোনো ইমানকে আমি কুরআন মুখস্থ করতে দেখিনি। কোনো ফকিহকে মুখস্থ করতে দেখিনি।<sup>[১]</sup> তখনকার শিক্ষার্থীগণ কুরআন হিফজের চেয়ে কুরআন বোঝা ও আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। কারণ কুরআন বলছে:

كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِّيَذَكِّرَ الَّذِينَ يَتَذَكَّرُونَ أُولَٰئِكَ

الْأَنْبِيَاءُ (١١)

‘এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যেন মানুষ এর আয়াতসূহ লক্ষ করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে।’<sup>[২]</sup>

তারা উপলব্ধি করেছিলেন, এ আয়াতের দ্বারা কুরআন হিফজ করা উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করা। কুরআনের দেখানো পথে চলা। ইমাম সুয়ুতি বলেন, ‘সাহাবীগণ অল্প অল্প করে কুরআন হিফজ করতেন। দশ আয়াত মুখস্থ করে এর মর্ম ভালো করে অনুধাবন করে আমল করতেন। এরপর পরবর্তী আয়াত হিফজ করতেন।’<sup>[৩]</sup> তাই তো কেবল সূরা বাকারা হিফজ করতে ইবনু উমরের লেগে গিয়েছিল আট বছর। আল-মাসাহিফ গ্রন্থে ইবনু আশতাহ সহিহ সনদে বর্ণনা করেন: মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন বলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণাঢ্য জীবন শেষ করে মৃত্যুবরণ করলেন, কিন্তু তিনি পুরো কুরআন একত্র করেননি। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণাঢ্য জীবন শেষ করে শহীদ হলেন, তিনিও পুরো কুরআন একত্র করেননি। ইবনু আশতাহ বলেন, কেউ কেউ বলেছেন, এখানে কুরআন একত্র করেননি বলতে পুরো কুরআন হিফজ করেননি উদ্দেশ্য।<sup>[৪]</sup> ইবনু হাম্বল

[১] আহকামুল কুরআন ২: ২৯১।

[২] সূরা সোয়াদ ৩৮: ২৯।

[৩] আল ইতকান ফি উলুমিল কুরআন ২: ২০৮।

[৪] আল ইতকান ফি উলুমিল কুরআন ২: ২০৮।

তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন : ‘আমাদের সময় কেউ যদি সূরা বাকারা ও আলে ইমরান পড়ত, তখন সেটি আমাদের মাঝে বিরাট কৃতিত্ব বলে ধরা হতো।’<sup>[১]</sup>

সাহাবিদের মধ্যে যারা কুরআন মুখস্থ করেছিলেন, তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল বাচ্চাদের পড়ানোর চেয়ে আরও বড় ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ইবনু খালদুন বলেন, ‘আর সব সাহাবি ফতোয়া দেওয়ার যোগ্য ছিলেন না। আর সবার থেকে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণও করা হতো না। বরং কুরআনের শিক্ষা কেবল কুরআনের বিশেষ ধারক-বাহকদের থেকেই গ্রহণ করা হতো—যাঁরা কুরআনের নাসিখ, মানসুখ, মুহকাম, মুতাশাবিহ স’<sup>১</sup>। কেরে জ্ঞান রাখতেন। কুরআনের কোন আয়াত দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে, তা মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বা পূর্ববর্তী অভিজ্ঞ কোনো সাহাবি থেকে সরাসরি জেনে সে সম্পর্কে পুরো অবগত ছিলেন। এ কারণেই তাদেরকে ‘কারী’ বা কুরআনের নিবিষ্ট পাঠক বলে ডাকা হতো। কারণ, আরব-জাতি ছিল পড়ালেখা না-জানা (উম্মি) সম্প্রদায়। তাদের মাঝে পাঠকদের সংখ্যা দুর্লভ ছিল বলে কুরআনের বাহকদের তারা ‘কারী’ বলে সম্বোধন করত। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এভাবেই চলছিল। এরপর যখন ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে, উম্মি উপাধির আবরণ থেকে বেরিয়ে আরব-জাতি পড়াশোনায় মনোনিবেশ করে, নানা বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত হয়। ফিকহ পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে একটি শিল্প ও বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। তখন ‘কারী’ উপাধির পরিবর্তে তারা আলিম ও ফকিহ লকব ব্যবহার শুরু করে।’<sup>[২]</sup>

উপর্যুক্ত আলোচনার ফলাফল দাঁড়াল, এ ধরনের কুরআনি পাঠশালা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে শুরু হয়নি। বরং সে যুগে শিশুরা কুরআনের পাঠ নিত বড়দের সঙ্গে মসজিদ-কেন্দ্রিক কুরআনের আসরে বসে। আলি ইবনু আবি তালিব ও আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম এভাবেই কুরআন শিখেন। তা ছাড়া অধিকাংশ শিশু-কিশোর কুরআনের পাঠ নিত পিতা, বয়স্ক অভিভাবক বা বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের কাছ থেকে। এখানে একটি বাস্তবতা তুলে ধরা প্রয়োজন। শিশু-শিক্ষা বিষয়ক যেসব নির্দেশনা তখন জারি করা হয়, সেগুলো এই ক্ষুদ্রে পাঠশালার শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং সেগুলো ছিল পিতা ও বিশেষজ্ঞ উস্তাযদের উদ্দেশ্যে। তৎকালীন শাসক শ্রেণীর পক্ষ থেকে পিতা ও শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে জারি করা সেসব নির্দেশনার দ্বারা তেমনটাই বোঝা

[১] মুসনাদ, খণ্ড ৩ পৃ ১২০।

[২] আল মুকাদ্দিমা: ৩১৩।



যায়। এর কিছু নমুনা আমরা সামনে উল্লেখ করব।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এসব ক্ষুদ্রে কুরআনের পাঠশালা যদি ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে শুরু না হয়ে থাকে, তবে কখন থেকে শুরু হলো? এসব পাঠশালা দৃশ্যত আনুমানিক ইতিহাস বের করার চেষ্টা করেছি আমি এ গ্রন্থে। শেষ পর্যন্ত এ ফলাফলে উপনীত হতে পেরেছি যে, রাজপ্রাসাদে শাসক ও বিভবান শ্রেণীর সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া হিসেবে এসব ক্ষুদ্রে পাঠশালা সর্বপ্রথম সুশৃঙ্খল শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এসব শিক্ষাকেন্দ্রের মান উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের অন্যতম রূপকার ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষক (এরপর শাসক) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। আমি যতটুকু জেনেছি—হাজ্জাজ নামের সঙ্গে কোথাও মুআল্লিমুল কুতাব (মক্তবের শিক্ষক) ব্যবহৃত হয়নি। বরং মুআল্লিমুস সিবয়ান (শিশু-শিক্ষক) ব্যবহৃত হয়েছে। তাই তো তখনকার সময়ের ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে দেখি—সব জায়গায় মুআল্লিমুস সিবয়ান লেখা। এ থেকে আমি অনুমান করেছি যে, এসব কুতাব বা ক্ষুদ্রে পাঠশালা তখনো বিদ্যমান ছিল না। আর শিশু-শিক্ষার সঙ্গে হাজ্জাজের সম্পৃক্ততার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কাযভিনি। তিনি বলেন, ‘শুরুতে হাজ্জাজ ছিলেন আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের উজির সুলাইমান বিন নুআইমের সন্তানদের শিক্ষক। এরপর হাজ্জাজকে আবদুল মালিকের রাজপ্রাসাদের শিক্ষক হিসেবে মনোনীত করেন উজির সুলাইমান। সেখান থেকে তিনি ধাপে ধাপে উন্নতি করতে করতে ...’ [১]

এ থেকে বোঝা যায়, হাজ্জাজ ছিলেন একজন আদব বিভাগের শিক্ষক। তবে কেবল বিশিষ্টজনদের সন্তানদের গৃহশিক্ষক হিসেবে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং তাদের অনুসারীদেরও শিক্ষক ছিলেন তিনি। অন্যান্য শিক্ষকের মতো একজন বা দুজন লোকের মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ থাকেননি। বরং অনেক শিক্ষার্থী ও অনুসারী পরিচালনা করতেন। তবে স্বতন্ত্র পাঠশালা বা শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন তখনো অনুভূত হয়নি। এভাবেই আমরা নানা ইতিহাস-গ্রন্থের বিচিত্র সব বর্ণনার মাঝে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমতায় পৌঁছতে পারব।

আবুল কাসিম বালখির পাঠশালার বিবরণও আমাদের মতের সমর্থক। কারণ তাঁর পাঠশালায় একসঙ্গে তিন হাজার ছাত্র শিক্ষাগ্রহণ করত। এই বিরাট সংখ্যক শিক্ষার্থীর উপস্থিতি আমাদের জানান দেয় যে, সে সময় এ রকম পাঠশালার (হিজরি প্রথম শতকের শেষ ও দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে) সংখ্যা ছিল খুব অল্প। যা খুব বেশি প্রচার-প্রসার পায়নি। অতি অল্প সংখ্যক থাকার কারণে একই পাঠশালায় এত অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর উপস্থিতি দেখা

[১] আখবারুল বিলাদ ওয়া আসারুল ইবাদ: পৃ ৬০।

যায়।

করা  
মসজিদ  
হলে  
করি

শিশু  
আলা  
রাখা  
ছাড়া  
বিপা

করা  
শিক্ষ  
কক্ষ  
নির্দে

পড়া  
শিশু  
কুরত  
উল্লে

পাঠ  
পাঠ  
ঘরে

করে  
হই।

[১]

[২]

[৩]

[৪]

[৫]

যায়।

এবার আসি এ ধরনের ক্ষুদে (বাচ্চাদের) পাঠশালার আয়োজন কোথায় করা হতো, সেই প্রসঙ্গে। অধিকাংশ নিরীক্ষণের দ্বারা বোঝা যায়, এগুলো মসজিদে হতো না। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘মসজিদে ক্ষুদে পাঠশালার আয়োজনকে আমি জায়েয মনে করি না। কারণ শিশুরা নাপাক থেকে পবিত্রতা রক্ষা করতে পারে না।’<sup>[১]</sup>

আল-হিসবাহ গ্রন্থের বিবরণও এর সমর্থক। সেখানে বলা হয়েছে: ‘মসজিদে শিশুদের শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করা জায়েয নয়। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাচ্চাদের ও পাগলদের উৎপাত থেকে মসজিদকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ তারা মসজিদের দেয়াল নোংরা করবে। তা ছাড়া তারা পবিত্রতা রক্ষা করতে পারে না। বরং পাঠশালার জন্য পথের ধারের বিপণি-বিতান ও বাজারের পার্শ্ববর্তী কোনো জায়গা নির্দিষ্ট করা হতো।’<sup>[২]</sup>

হাসসান আরও যোগ করেছেন: ‘মসজিদে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করা থেকে শিক্ষকদের বারণ করা হতো।’<sup>[৩]</sup> এত বারণ ও নিষেধাজ্ঞার পরও শিক্ষকগণ মসজিদের কোনো-এক জায়গাকে অথবা মসজিদ-সংলগ্ন কোনো কক্ষকে পাঠদানের জন্য নির্দিষ্ট করতেন। কারণে অকারণে এসব সুস্পষ্ট নির্দেশনাকে তারা অবজ্ঞা করতেন। ইবনু জুবাইর ও ইবনু বাতুতার সফরনামা পড়লে আপনি এমন অনেক বর্ণনা পাবেন যেখানে বলা হয়েছে: মসজিদে শিশুরা একজন শিক্ষকের পাশে গোল হয়ে বসে আছে। আর তিনি তাদের কুরআন শেখাচ্ছেন। ইবনু হাওকাল এ ধরনের পাঠশালার আরও কিছু নমুনা উল্লেখ করেছেন।<sup>[৪]</sup>

মসজিদ বা মসজিদ-সংলগ্ন এসব পাঠশালার পাশাপাশি এমন অনেক পাঠশালার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা একেবারে আলাদা ছিল। এমনই এক পাঠশালার আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম শাফিয়ি বলেন, ‘আমি আমার মায়ের ঘরে ইয়াতিম হিসেবে পালিত হই। তিনি আমাকে একটি পাঠশালায় ভর্তি করেন...। এরপর যখন কুরআন পড়া শেষ করি, তখন মসজিদের ক্লাসে উন্নীত হই।’<sup>[৫]</sup>

[১] আত তা‘লিম ইনদাল কাবিস: ৬৭ (লিখিত)।

[২] শাইরাযি: নিহায়াতুর রুতবা পৃ ১০৩, আল কুরাশি: মাআলিমুল কুরবা: পৃ ১৭০।

[৩] আল হিসবাহ: পৃ ১২৪।

[৪] কুন্তাবু সুরাতিল আরদি: ১২১, ১২৭।

[৫] ইবনু আবদিল বার: জামিউ বায়ানিল ইলম ১: ৯৮।



এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠশালার আলোচনা না করলেই নয়, যা সম্পর্কে একটু আগে আমি সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছি। সেটি হলো, আবুল কাসিম বালখির পাঠশালা। যেখানে তিন হাজার শিক্ষার্থী একসাথে শিক্ষাগ্রহণ করত। ইয়াকুতের বর্ণনা অনুযায়ী<sup>[১]</sup> : এ পাঠশালা একদিকে যেমন ছিল মসজিদ থেকে পৃথক। তেমনি ছিল বিরাট প্রশস্ত। ফলে বিপুল সংখ্যক ছাত্র অনায়াসে সেখানে পড়তে পারত। পায়ে হেঁটে এত অধিক সংখ্যক ছাত্রের পড়াশোনা তদারকি করতে কষ্ট হওয়ায় গাধায় চেপে তিনি পাঠশালার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতেন। ইতিহাসে আরও একজন বালখির নাম পাওয়া যায়। তিনি হলেন আহমাদ বিন সাহল (মৃত্যু : ৩২২ হিজরি)। তিনিও ছিলেন প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ বিদ্বান মনীষী। তিনি তাঁর গ্রন্থসমূহে দার্শনিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেও সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর বেশি মিল পাওয়া যায়। তিনিও বাচ্চানের শিক্ষক ছিলেন। এরপর তাঁর অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য তাঁকে আরও উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে।<sup>[২]</sup> ... হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়ে এসব পাঠশালা ও শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এত দ্রুত তার প্রসার ও বিস্তার ঘটে যে, প্রতিটি গাঁয়ে তখন একটি বা একাধিক ক্ষুদ্রে পাঠশালা ছিল। ইবনু হাওকালের বর্ণনামতে, সিসিলির পালের্মোর মতো এক শহরেই তিন শ' মতো শিক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন তিনি।<sup>[৩]</sup>

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে শিক্ষা-পদ্ধতির রূপরেখা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় শহরবাসীর উদ্দেশ্যে জারি করা খলিফা উমর ইবনুল খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রজ্ঞাপন থেকে। তাতে তিনি বলেন, 'পরসমাচার এই যে, আপনার আপনাদের সন্তানদের সাঁতার ও ঘোড়ায় চড়া শেখান। সুন্দর প্রবাদ ও চমৎকার কবিতা তাদের কাছে বর্ণনা করুন।'<sup>[৪]</sup> ইবনুত তাওআম বলতেন : 'সন্তানদের স্বাস্থ্যগত সুরক্ষা ও পরিবেশগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে পিতাদের উচিত, সন্তানদের লিখনী-বিদ্যা, গণিত ও সাঁতার শেখানো।'<sup>[৫]</sup>

এরপর যখন ব্যাপকহারে পাঠশালা গড়ে উঠতে থাকে, কুরআনের হাফিজগণ সেখানে পাঠদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন প্রাথমিক শিক্ষায় কুরআনুল কারীম হয়ে যায় শিক্ষার মূল উৎস। এর পাশাপাশি পাঠ্যক্রমে অন্যান্য

[১] মু'জামুল উদাবা ৪: ২৭২।

[২] প্রাগুক্ত তথ্যসূত্র ১: ১৪১-১৫২।

[৩] কুত্তাবু সুরাতিল আরদি ১: ১২৬।

[৪] আল বায়ান ওয়াত তিবয়ান ২: ৯২।

[৫] আল বায়ান ওয়াত তিবয়ান: পৃ ২০।

বিষয়ও ছিল। তাই ইমাম গাযালি রাহিমাছল্লাহ মক্তবে বাচ্চাদের কুরআন, নির্বাচিত কিছু হাদিস, নেককার লোকদের ঘটনা এবং কিছু ধর্মীয় মাসআলা শিক্ষা দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কবিতার মধ্যে যেগুলোতে আল্লাহর প্রেম ও আল্লাহ-ওয়ালাদের কথা উল্লেখ আছে, সেগুলো মুখস্থ করানোর ওপর জোর দেন।<sup>[১]</sup> এক্ষেত্রে ইবনু মাসকুওয়াই প্রাথমিক গণিত, প্রাথমিক আরবি ব্যাকরণের কথা যোগ করেন।<sup>[২]</sup> আল-জাহিয় এক্ষেত্রে বিস্তারিতভাবে পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রমের আলোচনা করেন। এখানে তার সামান্য অংশ তুলে ধরছি: 'যতটুকু ব্যাকরণ শিখলে শিশুরা তাদের লেখায়, কবিতায় বা রচনায় সাধারণ ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাবে, ততটুকু ব্যাকরণ তাদের শেখাতে হবে। এরচেয়ে বেশি নয়। এরচেয়ে বেশি ব্যাকরণ শেখানো হলে তার থেকেও অধিক গুরুত্ব বহন করা কুরআন, হাদিস ও চমৎকার বাগ্মিতা থেকে তা তাদের বিমুখ করে তুলবে। তা ছাড়া শিশুরা জটিল ও কঠিন প্রকৌশলবিদ্যা না শিখে অল্প কিছু গণিতের পাঠ নেবে। সাবলিল ভাষায় লেখার ও বলার অভ্যাস করতে তারা রচনাশৈলী শিখবে। কোনো রকম চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। শব্দ নয়; বরং অর্থ ও ভাব থেকে উপকৃত হতে অলংকারশাস্ত্র-বিদদের বই পাঠ করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করা হবে।'<sup>[৩]</sup>

ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা খুঁজতে গেলে অনেক গবেষক এ কথার উল্লেখ করেন যে, সাহিত্য ছিল বাচ্চাদের শিক্ষাদানের প্রধান বিষয়বস্তু। এর ফলে অনেকে ক্ষুদে পাঠশালাকে সাহিত্যের আসর বলতেও ছাড়েননি। আর্নস্ট ডিয়েজ (Earnst Diez) এ কথার সূত্র উল্লেখ করতে গিয়ে আল-আগানী গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তব কথা হলো আল-আগানী গ্রন্থের সেই বিবরণ দ্বারা কোনোভাবেই সাহিত্যের আসর উদ্দেশ্য নয়। সেখানে হুসাইন বিন আবদুল্লাহ বিন জাবালার বলা একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে তিনি বলেন: 'আমার দাদার সন্তান ছিল অনেক। তাদের মাঝে সবার ছোট ছিলেন আলি। বয়োবৃদ্ধ দাদা তাকে খুব আদর করতেন। একবার গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়ে আলির এক চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তখন তাকে ক্ষুদে পাঠশালায় ভর্তি করা হয়। কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি হওয়ার পর একদিন তাকে একটি বাহনে উঠিয়ে তার ওপর বাদাম ছুড়ে মারা হয়। একটি বাদাম গিয়ে চোখে পড়লে ভালো চোখটিও তার নষ্ট হয়ে যায়। তখন তাদের উদ্দেশ্যে দাদা বললেন, তোমরা রাজদরবার থেকে

[১] আল গাযালি: আল ইহইয়া ৩: ৫৭।

[২] তাহযিবুল আখলাক: পৃ ২০।

[৩] রিসালাতুল মুআল্লিমিন: লিখিত: পৃ ১৩, ১৪।



ভাতা পেয়ে থাকো। তোমরা যদি এই অন্ধ শিশুর পক্ষে আমাকে সহায়তা না করো, তবে তোমাদের ভাতা থেকে কিছু অংশ কেটে তাকে দিয়ে দেব। তখন আমরা বললাম, আপনি কী ধরনের সহায়তা চান? তিনি বললেন, তোমরা রোজ তাকে সাহিত্যিকদের আসরে নিয়ে যাবে। ক্ষুদ্রে পাঠশালায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ার পর আলি বিন জাবালা সাহিত্যের আসরে যোগ দেন। সেটি হলো ক্ষুদ্রে পাঠশালায় পড়ালেখা শেষ করার পর অন্য একটি স্তর।'

বাচ্চাদের যে পাঠ্যক্রমের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করেছি, সর্বত্র সেটাই ছিল সাধারণ শিক্ষাক্রম। তবে স্থানভেদে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে হয়তো কোথাও কোথাও এর মাঝে সামান্য ব্যতিক্রম ঘটেছে, যা ইবনু খালদুন তাঁর আল-মুকাদ্দিমা গ্রন্থের একটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন।<sup>[১]</sup> এর শিরোনাম হলো: 'শিশু-শিক্ষা ও ইসলামি বিশ্বের নানা প্রান্তে এর বিচিত্র পদ্ধতি'। আলোচনার সারমর্ম এই: শিশুদের কুরআন শিক্ষাদান হলো ধর্মের অন্যতম একটি প্রতীক, যা মুসলিমগণ ধারণ করেছেন এবং তাদের বিজিত অঞ্চলের সকল প্রান্তে তা অনুসরণ করেছেন। কারণ, কুরআনের শিক্ষার মাধ্যমেই হৃদয়ে ঈমান মজবুত হয়। কুরআনের আয়াত ও হাদিসের অংশ পাঠের মাধ্যমে অন্তরে ঈমানি চেতনা ও ইসলামি আকিদা বদ্ধমূল হয়। এভাবেই কুরআন হয়ে ওঠে প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু ও ভিত্তি, যার ওপর নির্ভর করবে পরবর্তী শিক্ষার সকল ধাপ। শিশুদের কুরআন শেখানোর পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। পাশ্চাত্যে শিক্ষারীতি ছিল শুধু কুরআন শিক্ষা দেওয়া। পাশাপাশি তা লিপিবদ্ধ করা। সেখানকার কুরআনের বাহকদের শিক্ষাদান পদ্ধতিও ছিল বিচিত্র। তাদের পাঠশালায় কুরআনের ক্লাসকে হাদিস, ফিকহ, কবিতা বা আরব্যাকথার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হতো না।

আন্দালুসে কুরআন ও লিখন একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হতো। কেবল কুরআনের মাঝে সীমাবদ্ধ না থেকে এর সঙ্গে সঙ্গে কবিতা আবৃত্তি, রচনা, আরবি ব্যাকরণ ও সুন্দর হস্তলিপির শিক্ষাও বাচ্চাদের দেওয়া হতো। সারাক্ষণ কেবল কুরআনের ওপরই তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকত না। বরং লিখনী শিক্ষার ওপর তাদের গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি। অপরদিকে আফ্রিকা অঞ্চলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুদেরকে কুরআনের পাশাপাশি হাদিস, ধর্মীয় জ্ঞান ও জরুরি মাআসলাও শিক্ষা দেওয়া হতো। তবে তাদের মনোযোগ ও গুরুত্ব বেশি ছিল কুরআন শিক্ষার ওপর। কুরআন মুখস্থ করা, নানা রিওয়াযাত ও বিচিত্র কিরাতে কুরআন পাঠের ওপর তারা বেশি আগ্রহী ছিলেন। দ্বিতীয় স্তরে

[১] পৃ ৩৯৭-৩৯৯।

তাদের আগ্রহ ছিল লিখনী শিক্ষার ওপর। প্রাচ্যেও শিশুদের জন্য এ রকম মিশ্র শিক্ষারীতির প্রচলন ছিল। অপরদিকে শিক্ষকগণ মেয়েদেরকে সূরা নূর মুখস্থ করানোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।<sup>[১]</sup>

এ বিষয়ের আলোচনা শেষ করব কয়েকজন বিদ্বান ও বিরল প্রতিভাবান শিক্ষকদের নাম স্মরণ করে, যারা শিশু-শিক্ষক হিসেবে পেশাজীবন শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে তাঁরা হয়ে ওঠেন ইসলামি সমাজের উজ্জ্বল তারকা। বিপুল মর্যাদার অধিকারী হওয়ায় ইতিহাসে তাদের নামগুলো অমর হয়ে আছে:

- » যাহহাক বিন মুযাহিম (মৃত্যু : ১০৫ হিজরি)
- » কুমাইত বিন যাইদ (মৃত্যু : ১২৬ হিজরি)
- » আবদুল হামিদ আল-কাতিব (মৃত্যু : ১৩২ হিজরি)

### ৩. রাজপ্রাসাদ-কেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ এবং আগামী দিনে দেশ বিনির্মাণে যোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই মুসলিমদের শিক্ষারীতি প্রণীত হতো। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে এটাই ছিল মুসলমানদের একটি উজ্জ্বল রীতি ও ঐতিহ্য।<sup>[২]</sup> এই চিন্তার আলোকে খলিফা ও অভিজাত লোকদের রাজপ্রাসাদে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন পাওয়া যায়। ভবিষ্যতের গুরুদায়িত্ব বহনের জন্য যোগ্য করে তুলতে যা দরকার, তাই এসব পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হতো। এসব পাঠশালা পূর্বের আলোচিত সাধারণ পাঠশালার মতোই ছিল অনেকাংশে। কারণ উভয় পাঠশালার উদ্দেশ্যই ছিল শিশুদেরকে জ্ঞান ও শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে তোলা। তবে রাজপ্রাসাদের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। সেখানকার পিতাগণ তাদের পুত্রদের জন্য মানানসই ও উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। সেখানকার শিক্ষকদের মুআল্লিমুস সিবয়ান বলাে সম্বোধন করা হতো না। বরং তাদের ডাকা হতো মুআদ্বিব বলে। শব্দটি আদব থেকে বেরিয়েছে। আরবিতে আদব শব্দের এক অর্থ সাহিত্য অপর অর্থ শিষ্টাচার। রাজকুমারদের শিক্ষকদের এ নামে ডাকার কারণ হলো, তারা সাহিত্যের পাশাপাশি উপযুক্ত আদবকেতাও শিক্ষা দিতেন খুব গুরুত্বের সঙ্গে।<sup>[৩]</sup> এসব রাজপাঠশালার শিক্ষার্থীগণ পড়ালেখা শেষ করে পরবর্তী মসজিদ বা মাদরাসা-কেন্দ্রিক শিক্ষাস্তরে উন্নীত হতেন।

[১] আল বায়ান ওয়াত তিবয়ান ২: ৯২।

[২] ইবনু আবদি রাব্বাহি: আল ইকদুল ফারিদ ১: ২৬৩।

[৩] রিসালাতুল মুআল্লিমিন: জাহিয়: লিখিত পাতা ১১।



এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো : বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজপ্রাসাদের শিক্ষকের জন্য প্রাসাদের ভেতরে রুম বরাদ্দ করা হতো। যেন ভবিষ্যৎ শাসকদের ওপর তিনি আরও নিপুণভাবে নজর রাখতে পারেন। একেবারে কাছ থেকে তাদের চরিত্র গঠন করতে পারেন। আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আবুল আব্বাস সালাব বলেন, বিখ্যাত শাসক মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনু তাহির আমাকে নিয়োগ দিলেন তাঁর পুত্র তাহিরের শিক্ষক হিসেবে। তাঁর বিশাল বাড়িতে আমার জন্য থাকার জায়গা বরাদ্দ করলেন। আমার জন্য বেতন ভাতা ঠিক করলেন। ফলে আমি রোজ তাঁর সঙ্গে চার বার বসতাম। এরপর তাঁর খাবারের সময় হলে আমি চলে আসতাম। আমার এ আচরণের কথা তিনি তার পিতাকে বললেন। এরপর তিনি রুমটি আরও সাজিয়ে উজ্জ্বল করে দিলেন। আরও বিচিত্র বর্ণ দিয়ে ঘর রঙ করে দিলেন। আরও উন্নত খাবারের ব্যবস্থা করলেন। এরপর পড়াশেষে আবার যখন চলে আসার সময় হলো, আমি চলে আসলাম। এটাও তিনি তার পিতাকে বললেন। এরপর তিনি আমার জন্য নিযুক্ত সেবককে বললেন, আমি খবর পেয়েছি আহমাদ বিন ইয়াহইয়া খাবারের সময় উঠে চলে যায়। প্রথমে ভাবলাম, তাঁর জন্য আমাদের ব্যবস্থাপনা হয়তো পর্যাপ্ত নয়। তাঁর কাছে ভালো লাগছে না বলে তিনি উঠে চলে যাচ্ছেন। এ কথা ভেবে আমি তাঁর জন্য আরও দ্বিগুণ ও উন্নত ব্যবস্থাপনার নির্দেশ দিলাম। এরপরও শুনলাম তিনি খাবারের সময় উঠে চলে যাচ্ছেন। তাঁকে বলো, আপনার ঘর কি আমাদের ঘরের চেয়েও বেশি শীতল? নাকি আপনার খাবার আমাদের খাবারের চেয়ে বেশি সুস্বাদু? ... খাদেমের মুখ থেকে এ কথা শোনার পর আর কখনো আমি উঠে চলে আসিনি। এভাবেই আমি সেখানে তেরো বছর কাটিয়েছি।<sup>[১]</sup>

রাজা-বাদশাহরা কেন তাদের সন্তানদের শিক্ষকদেরকে তাদের কাছে থাকার জন্য উৎসাহিত করতেন, তা খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের উপদেশ থেকেই বোঝা যায়। আবদুল মালিক বিন মারওয়ান তার সন্তানের শিক্ষকের উদ্দেশে বলেন, 'যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে তাকে কুরআন শেখাবেন ঠিক ততটুকু গুরুত্ব সহকারে তাকে সত্যবাদিতা শেখাবেন। নীচু ও অলস ব্যক্তিদের থেকে তাকে দূরে রাখবেন। কারণ এরা হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ। তাদের আদব-লেহাজ কম। রাগ করা থেকে তাদের দূরে রাখবেন। কারণ, রাগ তাদের জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর। চুল ছোট করে রাখবেন। তাহলে তাদের স্কন্ধ মজবুত হবে। তাদের মাংস খেতে দেবেন। তাহলে তারা শক্তিশালী হবে। তাদেরকে

[১] ইব্রাহিম, ফরিদ রিফাঈর ছাপা ৫: ১২৫-১২৬।



কবিতা শেখাবেন। তাহলে তারা সম্ভ্রান্ত ও পরিপক্ব হবে। আড়াআড়ি দাঁত মিসওয়াব করতে বলবেন। ওপর থেকে ঢেলে নয়; বরং চুমুক দিয়ে পানি পান করতে বলবেন। তাদের কোনো নৈতিক বিচ্যুতির কথা আমাকে বলতে হলে সবার অগোচরে বলবেন। কোনোভাবেই যেন তা ফাঁস না হয়। ফাঁস হলে সবাই তাকে খোঁচা দেবে। অপমান করবে।<sup>[১]</sup>

এই অভিজাত শ্রেণীর শিক্ষাক্রম মৌলিকভাবে সাধারণ শিশুদের পাঠ্যক্রমের মতোই ছিল। তবে পিতার নির্দেশনামতো তাতে সংযোজন-বিয়োজন হতো। তাদেরকে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্য করে তুলতে সহায়ক অনেক কিছু যোগ করা হতো। রাজন্যগণ তাদের রাজপুত্রদের শিক্ষকদের জন্য যে শিক্ষারীতি বা নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন, তার কিছু নমুনা নিচে তুলে ধরা হলো:

» ক. স্বীয় সন্তানের শিক্ষকের উদ্দেশ্যে আমার বিন উতবা বলেন, ‘আমার সন্তানদের সংশোধন করার আগে অবশ্যই নিজেকে ভালো করে সংশোধন করে নেবেন। কারণ, তাদের চোখ সবসময় আপনার প্রতি নিবদ্ধ থাকবে। আপনি যা করবেন, তা তারা ভালো মনে করবে। আর যা বর্জন করবেন, তা তারা মন্দ মনে করবে। তাদেরকে আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দেবেন। কুরআন পড়াতে গিয়ে তাদের বিরক্ত করে তুলবেন না। বিরক্ত হয়ে গেলে তারা কুরআনকে বর্জন করবে। পাশাপাশি তাদের সামনে কুরআনের পাঠ অবহেলা করবেন না। তাহলে তারা কুরআন পাঠ ছেড়ে দেবে। উত্তম কথা ও ঘটনা তাদের কাছে বলুন। শ্রেষ্ঠ কবিতা তাদের কাছে বর্ণনা করুন। ভালো করে আত্মস্থ না করা পর্যন্ত এক বিদ্যা থেকে অপর বিদ্যায় যাবেন না। কারণ অন্তরে বাক্যের জট লেগে গেলে বুঝতে বড় কষ্ট হয়। জ্ঞানী ও বিদ্বান লোকদের অবস্থা ও ঘটনা তাদের জানান। নারীদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া থেকে তাদের বারণ করুন। তাদের অভিযোগের কারণে আমার কাছে আপনাকে অজুহাত পেশ করতে হবে, এ রকম ভয় করবেন না। আমি আমার পক্ষ থেকে আপনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলাম।<sup>[২]</sup>

» খ. খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালিক নিজের পুত্রের শিক্ষক হিসেবে সুলাইমান আল-কালবীকে নিয়োগ দিয়ে বলেন, ‘এ সন্তান আমার নয়নের মণি। তার চরিত্র গঠনের দায়ভার আপনার হাতে তুলে দিলাম। তাই সর্বপ্রথম আপনার কর্তব্য হলো: আল্লাহকে ভয় করুন। এই অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করুন। সর্বপ্রথম আমি আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহর

[১] ইবনু কুতাইবা: উয়ুনুল আখবার ২: ১৬৭।

[২] আবু ইকদুল ফারিদ ১: ৩৬৩।



কিতাব ধারণ করুন। এরপর তার কাছে উত্তম কবিতা বর্ণনা করুন। এরপর তাকে আরবের নানা প্রান্তে নিয়ে যান। সেখান থেকে শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রহণ করুন। হালাল হারাম, বক্তৃতা ও শ্রেষ্ঠ বচন তাকে শিক্ষা দিন।<sup>[১]</sup>

» গ. খলিফা হারুনুর রশিদ তার শাহজাদা ও পরবর্তী খলিফা আল-আমিনের শিক্ষকের উদ্দেশে যে নির্দেশনা প্রদান করেন, তাও একটি শ্রেষ্ঠ গঠনমূলক নির্দেশনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষকের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'হে আহমার, আমি রুল মুমিনিন আপনার কাছে তার কলিজার টুকরাকে সোপর্দ করেছে। তাই আপনার সম্পূর্ণ মনোযোগ তার ওপর নিবদ্ধ করুন। দু-হাত খুলে তাকে জ্ঞানে-গুণে সমৃদ্ধ করুন। আপনার আদেশ মানা তার প্রধান কর্তব্য। আমি রুল মুমিনিন আপনাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তার সদ্যবহার করুন। তাকে কুরআন পড়ান। তাকে ইতিহাস শিক্ষা দিন। তার কাছে কবিতা বর্ণনা করুন। তাকে হাদিস শেখান। কথার মাধুর্য সম্পর্কে তাকে অবহিত করুন। উপযুক্ত সময় ছাড়া তাকে হাসতে মানা করুন। বনি হাশিম গোত্রের বয়স্ক ও গুণীজনেরা তার কাছে এলে তাঁদেরকে সম্মান করতে বলুন। তার কাছে সেনাপ্রধানরা এলে তাঁদের মর্যাদা রক্ষা করতে বলুন। সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগান। প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে তাকে উত্তম কিছু শিক্ষা দিন। তাকে বিব্রত করবেন না। তাহলে তার মনোযোগ নষ্ট হয়ে যাবে। আর অতিমাত্রায় ক্ষমা করতে থাকবেন না। তাহলে সে অবকাশ ও ছুটির পেছনে পড়ে থাকবে। কাছে ডেকে নম্রতার সাথে সাধ্যমতো তাকে গঠন করুন। তাতে যদি কাজ না হয়, তবে কড়াকড়ি ও কঠোরতা আরোপ করুন।'<sup>[২]</sup>

ফাতিমি রাজবংশীয়গণ এক্ষেত্রে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে উন্নত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তারা তাদের প্রাসাদে বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। যেখানে অভিজাত ও ধনীদের সন্তানরা পড়াশোনা করত। আর শিক্ষকগণ তাদেরকে বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতেন। ভবিষ্যতের জন্য তাদের প্রস্তুত করতে খলিফাদের সেবায় তাদের পাঠিয়ে দিতেন। অথবা খিলাফার ভূখণ্ডের যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দায়িত্বের জন্য তাদের মনোনীত করতেন।<sup>[৩]</sup>

রাজপ্রাসাদে শিক্ষকতার পদগুলো ছিল অত্যন্ত লোভনীয়। যারাই এ পদ লাভ করত, তাদের মান-মর্যাদা ও অভিজাত্য বেড়ে যেত। সম্ভ্রান্ত পোশাক

[১] আল আসফাহানী: মুহাযারাতুল উদাবা ১: ২৯।

[২] আল মুকাদ্দিমা: ৩৯৯, বায়হাকি: আল মাহাসিন ওয়াল মাসাভী. ৬১০।

[৩] মাকরিযি: ১/৪৪৩-৪৪৪।

তাদের গায়ে শোভা পেত। এত সম্মান ও প্রাপ্তির সম্ভাবনা সত্ত্বেও কোনো কোনো জ্ঞানী রাজকীয় শিক্ষকতাকে বুড়ো আঙুল দেখাতেন। ইবনুল আনবারি বর্ণনা করেন: একবার আহওয়ায অঞ্চলের শাসক সুলাইমান বিন আলি তার সন্তানের শিক্ষকতার প্রস্তাব দিয়ে খলিল বিন আহমাদের কাছে লোক পাঠান। প্রস্তাব শুনে খলিল রাজদূতের দিকে একটি শুকনো রুটি ছুড়ে মেরে বলেন, এটি খাও। এ ছাড়া আর কিছু আমার কাছে নেই। আর যতদিন আমার কাছে এই শুকনো রুটি আছে, ততদিন সুলাইমানের কাছে ধরনা দেওয়ার প্রয়োজন নেই আমার। তা শুনে দূত জিজ্ঞেস করল, আমি শাসককে গিয়ে কী বলব? উত্তরে তিনি বললেন, সুলাইমানকে গিয়ে বলবে, আমি সুখে আছি। আমি প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। তবে আমার খুব বেশি অর্থ নেই। আর বাদশাহ তো জানে, অর্থের ধনী আসল ধনী নয়; বরং মনের ধনী আসল ধনী। প্রাচুর্য মূলত বাস করে হৃদয়ে, অর্থ নয়।<sup>[১]</sup>

বিখ্যাত জ্ঞানী আবদুল্লাহ বিন ইদরিসের ব্যাপারেও এমন একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। বাদশাহ হারুনুর রশিদ তাঁর পুত্র মামুনকে ব্যক্তিগতভাবে হাদিস পড়াতে অনুরোধ করলে আবদুল্লাহ বিন ইদরিস সোজা বলে দেন: ‘যদি অন্য সবার মতো সে আমাদের দরসে উপস্থিত হতে পারে, তবেই আমি তাকে হাদিস পড়াব।’<sup>[২]</sup>

## ৪. বই-বিক্রেতাদের দোকান

ইসলামপূর্ব জাহিলিয়াত যুগে আরবের বিখ্যাত কিছু বাণিজ্যমেলার কথা আপনারা হয়তো শুনেছেন: ওকায, মাজান্না ও যিল মাজায। এসব মেলায় আরবের বড় বড় বণিকরা সমবেত হয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করত। গোটা আরব থেকে মানুষ এসব মেলায় এসে কেনাকাটা করত। আরবের নানা গোত্রের মানুষের এ সম্মেলনকে তারা সাহিত্যচর্চা ও প্রচারের শ্রেষ্ঠ সুযোগ মনে করত। এসব মেলায় তারা কবিতা আবৃত্তি, বিতর্ক অনুষ্ঠান ও জ্বালাময়ী বক্তৃতা উপস্থাপন করে নিজেদের প্রতিভার প্রচার করত।<sup>[৩]</sup> ইসলাম আগমনের এক শতাব্দী পার হতে না হতেই জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের বিকাশে ঠিক একই ভূমিকা নিয়েছিল আরবের কিতাবখানাসমূহ। এসব লাইব্রেরি খোলা হয়েছিল মূলত বই বিক্রির উদ্দেশ্যে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে যেসব বইবিতানের

[১] তাবাকাতুল উদাবা: ৫৭-৫৮।

[২] ইবনু জামাআ: পৃ ২১১ (টীকায়)।

[৩] আল আগানী ৪: ৩৫, আবুল ফিদা ২: ২৩০।



লাগাম ছিল জ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের হাতে। সেগুলো হয়ে ওঠে বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংলাপের কেন্দ্রবিন্দু। এসব বইবিতানকে তারা তাদের মিলনায়তন ও গবেষণাগার হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। এসব কিতাবখানা ছিল ইসলামপূর্ব আরব বাণিজ্যমেলা থেকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে। কারণ জাহিলিয়াতের সেই বাণিজ্যমেলাগুলো বসতো বছরে এক কী দুই বার। আর এসব লাইব্রেরিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হতো রোজ।

আব্বাসীয় শাসনামলের সূচনাকাল থেকেই এসব বইবিতানের প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে।<sup>[১]</sup> এরপর খুব দ্রুত সেগুলো ইসলামি বিশ্বের নানা শহর ও রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়ে। কোন শহরে কয়টি বইবিতান আছে, তা নিয়ে এক শহরবাসী অন্য নগরবাসীর ওপর গর্ব করত। বাগদাদের উন্নতি ও উৎকর্ষের আলোচনা করতে গিয়ে ইয়াকুবি বলেন, ‘... এরপর আমিরুল মুমিনিনের আবাসভূমি ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হতে থাকে...। সে সময় সেখানে এক শ’র বেশি কুতুবখানা ছিল।’<sup>[২]</sup> তলুনীয় ও ইখশিদি রাজবংশের শাসনামলে মিশরে বই-বিক্রেতাদের বিরাট বাজার ছিল। সেখানে বিক্রির জন্য বইয়ের পসরা সাজানো হতো। অনেক সময় সেসব দোকানে বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্ক অনুষ্ঠান হতো।<sup>[৩]</sup> মাকরিযি তাঁর আল-খুতাত গ্রন্থের অনেক স্থানে এসব বিষয় সবিস্তারে তুলে ধরেছেন।<sup>[৪]</sup>

এসব বইবিতানের দায়িত্বশীলগণ কেবল মুনাফার আশায় থাকা সাধারণ বিক্রেতা ছিলেন না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ছিলেন সুসাহিত্যিক, জ্ঞানে-গুণে সমৃদ্ধ। প্রতিনিয়ত তারা নতুন নতুন জ্ঞানের স্বাদ পেতে উৎসুক ছিলেন। আর এই মহান পেশা ছিল তাদের জন্য জ্ঞানের স্বাদ পাওয়ার মহান সুযোগ। বইবিতানে সারাক্ষণ অবস্থান করে নানা বিষয়ের গ্রন্থ অধ্যয়নের অব্যাহত সুযোগ মিলত তাদের। আর মূল্যবান গ্রন্থের সন্ধানে শহরের জ্ঞানীগুণীরা তাদের বইবিতানে আসত। কিছু কিছু বই-বিক্রেতার নাম শুনলে সত্যিই অবাক হতে হয় : আল-ফিহরিস্ত গ্রন্থকার ইবনুন নাদিম<sup>[৫]</sup>, ইবনু কাউজাক নামে খ্যাত আলি বিন ঈসা (ইয়াকুতের ভাষ্যমতে তিনিও বই-বিক্রেতা ছিলেন)<sup>[৬]</sup>, তিনি

[১] Hitti: History of the Arabs P. ৪১৪।

[২] আল বুলদান: পৃ ১৭।

[৩] ইবনু যুলান: আখবারু সিবাওয়াই আল মিশরী ৩৩, ৪৪।

[৪] ১: ৩৬১, ২: ৯৬, ১০২।

[৫] ইয়াকুত: মু‘জামুল উদাবা: ৬: ৪০৮।

[৬] মু‘জামুল উদাবা ৫: ১৭৯।

ছিলেন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। বেশকিছু গ্রন্থও রচনা করেন। এমনকি মু'জামুল উদাবা ও মু'জামুল বুলদান গ্রন্থকার ইয়াকুতও ছিলেন লাইব্রেরিয়ান।<sup>[১]</sup>

আব্বাসীয় শাসনামলে বই বিক্রয়ের পেশা কেবল ব্যবসা ও গ্রন্থ সরবরাহের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং সে সময় তা ছিল মহা গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও সংস্কৃতি বিষয়ক দায়িত্ব। কারণ বই-বিক্রেতাগণই গুরুত্বপূর্ণ বইগুলোকে লিপিবদ্ধ করে জ্ঞানপিপাসু ও বিদ্যানুরাগীদের সামনে পেশ করত। সে জন্য তারা খুব বেশি মুনাফা নিত না। গড়ে প্রতিটি কিতাবের বিনিময়ে এক দিনার করে গ্রহণ করত।<sup>[২]</sup> বিখ্যাত লেখক ও গবেষক জাহিয় (যেমনটি বর্ণনাকারী আবু হাফফান বলেছেন :) বই-বিক্রেতাদের দোকানগুলো ভাড়া নিয়ে নিতেন। গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য কিতাবখানায় রাত যাপন করতেন।<sup>[৩]</sup> পাশাপাশি এসব বইবিতান ছিল জ্ঞান ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবরণকারী এক অপূর্ব মিলনমেলা। সেখানে তারা নানা বিষয় নিয়ে পরস্পর বোঝাপড়া করত। সংলাপ, পর্যালোচনা ও প্রশ্নোত্তর করত। ওপরে সে বিষয়ে আমি কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছি। কয়েকটি উদাহরণ পেশ করে আমি তা আরও স্পষ্ট করতে চাই :

» ১. ইয়াকুত আল-হুমাভী বই বিক্রি করতেন। বড় বড় বইবিতানে গিয়ে বইয়ের পসরা সাজাতেন। তিনি আলি বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধী ছিলেন। খারিজিদের লেখা কিছু বই পড়ে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে তিনি মনে মনে ক্ষিপ্ত ছিলেন। ৬১৩ হিজরিতে তিনি দামিশকে এসে দামিশকের স্থানীয় বাজারে নিজের ভীত মজবুত করেন। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুসারীদের সঙ্গে তিনি বিতর্ক অনুষ্ঠান করেছেন...<sup>[৪]</sup>

» ২. ইবনুল জাওযি (মৃত্যু : ৫৯৭ হি) সমকালীন বাগদাদের বইবিক্রির বাজারের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, 'সেটি ছিল বিরাট বড় বাজার। অপরদিকে তা ছিল জ্ঞানীপুণী ও কবিদের বিচরণস্থল।'<sup>[৫]</sup>

» ৩. মিশরে কিতাবীদের বাজার সম্পর্কে মাকরিযির দেওয়া বিবরণ আমরা সংক্ষিপ্তভাবে এখানে উল্লেখ করব : 'সাগা ও মাদরাসাতুস সালিহিয়ার মাঝামাঝি জায়গায় ছিল এ বাজারের অবস্থান। আমার ধারণা সেটি ৭০০ হিজরির কথা...। এর আগে বই বাজার ছিল জামে আমর মসজিদের

[১] ইবনু খাল্লিকান ২: ৩১১-৩১২।

[২] Ameer Ali: A short History of the Saracebs P. ৪৬০।

[৩] ইয়াকুত ৬: ৫৬।

[৪] ইবনু খাল্লিকান ২: ৩১১।

[৫] ইবনুল জাওযি: মানাকিবু বাগদাদ পৃ ২৬।



পূর্বপ্রান্তে...। এই বাজারে সবসময় জ্ঞানীদের বিচরণ ছিল। তাঁদের পদচারণায় সারাক্ষণ মুখরিত থাকত গ্রন্থালয়।

তখনকার সমাজে এসব বইবিতানের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। শুধু তাই নয়; সেই প্রভাব তাঁদের পরিবারকে পর্যন্ত সিক্ত করেছিল। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ গ্রানাডার নিকটবর্তী ওয়াদিল হুন্মা এলাকায় বাসিন্দা বিখ্যাত বই-বিক্রেতা যাইদের দুই কন্যা যায়নাব ও হামদা। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সাধনায় তাঁরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। সে যুগের বড় বড় বিজ্ঞানী ও মনীষীদের সমপর্যায়ে ছিল এই দুই বিদুষী কন্যা।<sup>[১]</sup>

এই তাত্ত্বিক বিপ্লব কেবল বই-বাজারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং অন্যান্য দোকানেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক আবুল আতাহিয়া ছিলেন চীনামাটি ও পোড়ামাটির তৈজসপত্রের দোকানদার। সাহিত্যানুরাগী অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীরা তার দোকানে ভিড় করত। আর তিনি তাদের জন্য কবিতা আবৃত্তি করতেন। শিক্ষার্থীরা দোকানের ভেতর পড়ে থাকা মাটির ভাঙা পাতের টুকরা নিয়ে তাতে সেই কবিতা লিখে রাখত।<sup>[২]</sup> আবু বকর আস-সাবগী (মৃত্যু : ৩৪৪ হি) নিজেই রঙ তৈরি করে তাঁর দোকানে সেগুলো বিক্রি করতেন। তিনি ছিলেন শাফিয়ি মাযহাবের বিখ্যাত ফকিহ। প্রচুর হাদিস তিনি শুনছেন এবং বর্ণনা করেছেন। তাঁর দোকানটি ছিল হাদিসের হাফিজ ও মুহাদ্দিসদের মিলনমেলা। আবদুল্লাহ বিন ইয়াকুব এই দোকানের দরজায় বসে মানুষের কাছে হাদিস বর্ণনা করতেন।<sup>[৩]</sup>

নিজের শাইখদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আবুল হাজ বলেন, এক লোক জ্ঞানের খোঁজে বাগদাদ এল। এরপর নির্দিষ্ট সময় সেখানে অবস্থান করে জ্ঞান আহরণ করল। এরপর একটা সময় নিজ দেশে ফিরে যাওয়া ইচ্ছায় একটি জন্তু ভাড়া করল। এরপর বাগদাদ ত্যাগের উদ্দেশ্যে সে জন্তুর ওপর চড়ে বসল। কোনো এক প্রয়োজনে পশুচালক শহরের এক জায়গায় দাঁড়াল। তখন ওই জায়গার পাশেই এক দোকানে দুজন জ্ঞানীর মাঝে চলতে থাকা চমৎকার বিজ্ঞানের সংলাপ শুনতে পেল পশুর ওপর বসে থাকা ওই শিক্ষার্থী। ওই বিজ্ঞানময় সংলাপে মুগ্ধ হয়ে শিক্ষার্থী বলল, আমাকে আবার বাগদাদে নিয়ে চলুন। যে শহরের বিজ্ঞানমনস্কতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা এত উন্নত, সে শহর ছেড়ে যাওয়া

[১] সাইয়েদ আমির আলি ৫৬৯ (টিকায়)।

[২] আল আগানী: ৩: ১২৯।

[৩] আবাকাতুশ শাফিয়িয়া: . .

সমীচীন নয়।<sup>[১]</sup>

## ৫. জ্ঞানী লোকেদের বাড়ি

মুসলমানগণ ঘর-বাড়িকে কখনোই গণশিক্ষার উপযুক্ত স্থান ভাবেননি। কারণ ঘরের ভেতর পড়ালেখার পরিবেশ করা হলে একদিকে তা ঘরওয়ালাদের জন্য সুস্তির বিষয় নয়; অন্য দিকে শিক্ষার্থীদের জন্যও তা পরিবেশবান্ধব নয়। পড়ালেখা ও শিক্ষার্থীদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশের জন্য যে কর্মতৎপরতা দরকার, তা ঘরোয়া পরিবেশে বিধান করা অসম্ভব। কুরআনুল কারীমে ঘরোয়া পরিবেশের মান রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ  
إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا  
طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذِكُّكُمْ كَانَ  
يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَعِزُّ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِزُّ مِنَ الْحَقِّ

‘হে মুমিনগণ! তোমরা নবির ঘরে প্রবেশ করো না, তবে যদি তোমাদেরকে খাবারের অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে (প্রবেশ করো) খাবারের প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে। আর যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে তখন তোমরা প্রবেশ করো এবং খাবার শেষ হলে চলে যাও আর কথাবার্তায় মশগুল হয়ো না। কারণ এটা নবির জন্য কষ্টদায়। সে তোমাদের বিষয়ে সংকোচ বোধ করে; কিন্তু আল্লাহ সত্য প্রকাশে সংকোচ বোধ করেন না।’<sup>[২]</sup>

আল-মাদখাল গ্রন্থে এই বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে বিখ্যাত লেখক আবদারি বলেন, ‘পাঠদানের সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হলো মসজিদ। কারণ শিক্ষাদানের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে কোনো সুনাহকে প্রতিষ্ঠা করা অথবা কোনো বিদআতকে নিশ্চিহ্ন করা। অথবা আল্লাহর বিধানসমূহ থেকে কোনো কিছু শেখা। আর এ কাজের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত জায়গা মসজিদ। কারণ মসজিদ গণজমায়েতের স্থল। ছোট-বড়, ধনী-গরিব, জ্ঞানী-মূর্খ সবাই মসজিদে আসে।

[১] আল আলিফ বা লিল আলিব্বা ১৪৭ (হস্তলিখিত)।

[২] সূরা আহযাব: ৩৩: ৫৩।



কিন্তু ঘরে এমনটি হয় না। অনুমতি ছাড়া কারও ঘরে সবার প্রবেশাধিকার থাকে না। প্রবেশের অনুমতি দিলেও ঘরের সম্মান রক্ষা করতে হয়।<sup>[১]</sup> অন্যত্র আবদারির আরেকটি মত লক্ষ করা যায়: 'তবে জরুরি প্রয়োজনের সময় বাড়িতে পাঠদান করা যেতে পারে।' সেই জরুরি প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে এবং নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতির শিকার হয়ে অনেক সময় ঘরোয়া পরিবেশে পাঠদান সূচিত হয়েছে:

» ইসলামের একেবারে প্রাথমিক যুগে ইসলামি শিক্ষা ঘরেই সম্পন্ন হতো। মসজিদ প্রতিষ্ঠার আগে আরকাম ইবনু আবিল আরকামের বাড়িকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে নির্বাচন করেন। সেখানেই তিনি তাঁর সাহাবিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তাঁদেরকে দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি শিক্ষা দিতেন। কুরআনুল কারীমের সদ্য নাযিল হওয়া আয়াতগুলো তাঁদের পড়ে শোনাতেন। তেমনি ইসলাম অনুরাগী মানুষদেরও তিনি এ বাড়িতেই সুাগত জানাতেন। ঐশী শিক্ষা ও আসমানি দীক্ষায় তাঁদের অন্তরগুলো সিক্ত করতেন। এরপর রাসূলের মূল্যবান বাণী শুনে তাঁরা দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করতেন। মুসলমানদের কাতারে शामिल হতেন।<sup>[২]</sup>

» দারুল আরকামের পাশাপাশি মক্কার নিজ বাড়িতেও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিতেন। সেখানে মুসলমানগণ তাঁর পাশে গোল হয়ে বসতো। তিনি তাঁদের ধর্মের বাণী শোনাতেন। তাঁদের পরিগুরু করতেন। উপর্যুক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত এভাবেই ইসলামি শিক্ষা-কার্যক্রম চলে আসছিল। আয়াতটি নাযিল হয়েছিল মসজিদ প্রতিষ্ঠার পর। নবিজির কাছে সারাক্ষণ উৎসুক মানুষের ভিড় লেগে থাকত। গণজমায়েতের কারণে প্রায়ই তিনি বিশ্রাম ও পরিবারকে সময় দেওয়ার ফুরসত পেতেন না। এই আয়াত নাযিল করে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়নবির জন্য সামান্য বিশ্রামের সুযোগ করে দেন। ওপরের আয়াতে সরাসরি আল্লাহর রাসূলের ঘরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ কথা সুস্পষ্ট। ঘরোয়া পরিবেশকে একেবারে নিষেধ করা হয়নি। তাই তো মসজিদের প্রচার-প্রসার সত্ত্বেও বিশেষ কারণে ছাত্র-শিক্ষকের মিলনমেলা ও বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে কিছু কিছু বাড়ি।

» সেসব মহান বাড়ির তালিকায় সবার চেয়ে এগিয়ে থাকবে ইবনু সিনার

[১] আল-মাদখাল, ১: ৮৫।

[২] আত তাবারী: ৩: ২৩৩৫।

বাড়ি। তাঁর অন্যতম শিষ্য জুযজানী বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা প্রতি রাতে ইবনু সিনার বাড়িতে সমবেত হতো। আমি তাঁর সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যা পড়তাম। মাঝে মাঝে অন্যদের আইনবিদ্যাও পড়াতেন তিনি। দিনের বেলায় তিনি বাদশাহ শামসুদ্দৌলার খেদমতে নিয়োজিত থাকতেন। তাই রাতে এই পাঠদান সম্পন্ন হতো। এভাবেই আমরা নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত তাঁর কাছে পড়াশোনা করি।’<sup>[১]</sup>

» হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দশকে ইন্তেকাল করা আবু সুলাইমান সাজিস্তানীর (মুহাম্মাদ বিন তাহির বিন বাহরাম) এক চোখ অন্ধ ছিল। তাই তিনি মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরে অবস্থান করতেন। ফলে তাঁর কাছে শিক্ষার্থী ও বিদ্যানুরাগী ছাড়া আর কেউ আসত না। তাঁর বাড়ি ছিল প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানে আগ্রহীদের মিলনমেলা।<sup>[২]</sup> আবুল হাসান আবদুল্লাহ মুনায্জিমের জীবনীতে কিফতী উল্লেখ করেন:<sup>[৩]</sup> আবুল হাসান ছিলেন আবু সুলাইমানের বন্ধু ও সতীর্থ। প্রায়ই তিনি বড় বড় জ্ঞানীদের দল নিয়ে আবু সুলাইমানের বাড়িতে সমবেত হতেন। সেখানে নানা বিষয়ে তাত্ত্বিক সংলাপ ও বিতর্ক হতো। কার কথা ঠিক আর কথা ভুল—আবু সুলাইমানই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত দিতেন। এই চমৎকার জ্ঞানের আসরে যারা সমবেত হতেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন আবু মুহাম্মাদ মাকদিসি, আবুল ফাতাহ নুশাজানী, আবু যাকারিয়া সুমায়রী, আবু বকর কাওমাসী, যুহালের গোলাম, আবু হাইয়ান তাওহিদী। আবু হাইয়ান তাওহিদী বলেন<sup>[৪]</sup>, এখানে যারা সমবেত হতেন তাঁরা সবাই নিজ নিজ জ্ঞানে ছিলেন অনন্য। একদিন তাঁদের মধ্যকার সংলাপের বিবরণ দিতে আবু হাইয়ান তাওহিদীর কাছে অনুরোধ করেন উজির ইবনু সাদান। সেই অনুরোধের প্রেক্ষিতে তিনি আবু সুলাইমানের বাড়িতে সংঘটিত তাত্ত্বিক সংলাপের বিবরণ তুলে ধরেন। সেখানকার সিদ্ধান্তগুলো তাঁকে অবহিত করেন।<sup>[৫]</sup> প্রায়ই সেই মজলিসে আলোচিত নানা বিষয়ের কথাবার্তা ও সিদ্ধান্তের কথা তিনি এই উজিরকে শোনাতে।<sup>[৬]</sup> সেখানে তাঁরা প্রাচীন দার্শনিকদের অভিমতগুলো তুলে ধরতেন। তা নিয়ে আলোচনা, গবেষণা, বিশ্লেষণ সহকারে—হয় তাদের সঙ্গে একমত হতেন,

[১] তাবারী: ৩/২৩৩৫।

[২] আল কিফতী: আখবারুল হুকামা: ২৮২-২৮৩।

[৩] প্রাগুক্ত তথ্যসূত্র।

[৪] আল মুকাবাসাত: ১২০।

[৫] আল ইমতাউ ওয়াল মুআনাসা ১/৪০।

[৬] দেখুন: ২/১৮-২৪-৪৩, ৪/৯৯-১২৪-১২৫।



না হয় দ্বিমত পোষণ করতেন।<sup>[১]</sup> 'গভীর বোধ থেকেই উৎপত্তি হয় চমৎকার কথা'—সক্রেটিসের এ বাণীর সঙ্গে একমত পোষণ করে আবু সুলাইমান তাঁর একটি ব্যাখ্যায় অপর দার্শনিকের বলা একটি কথা তুলে ধরেন: অসুস্থ ব্যক্তি ডাক্তারকে দেখে পুলকিত হয়। ডাক্তারের পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করে। কারণ সে জানে, এই ডাক্তার তার রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে অবগত। কিন্তু কোনো মূর্থ ব্যক্তি জ্ঞানীর সঙ্গে এমন আচরণ করে না। জ্ঞানীকে দেখে পুলকিত হয় না। কারণ জ্ঞানীর কাছে থাকা জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে সে অবগত নয়।<sup>[২]</sup> অপরদিকে 'জ্ঞান হলো হৃদয়ের হারিকেন (আলো)'—প্লেটোর এই কথা যখন আলোচনা হলো, তখন আবু সুলাইমান বললেন: সেই হারিকেনের কাচ যদি সূচ্ছ ও পরিষ্কার হয়, তখন সেটা কত সুন্দর হয়ে ওঠে! এরপর যখন 'যে ব্যক্তি শাসকের সংস্পর্শে যায় সে শাসকের অবিচার থেকে নিস্তার পায় না। ঠিক যেমন ডুবুরি সাগরের লোনা পানি থেকে রক্ষা পায় না'—প্লেটোর এ কথা আলোচনা হলে আবু সুলাইমান বললেন, উপকারের চেয়ে এ কথার অপকারের দিক বেশি। বক্তা তার এ কথাকে সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন ঠিক। তবে উদাহরণ যেমন সত্যের সঙ্গে যায়, তেমন মিথ্যার সঙ্গেও যায়। আর যখন কোনো শাসক অবিচারে লিপ্ত হয়, তখন তার পতন ঘনিয়ে আসে।<sup>[৩]</sup> আল-ইমতাউ ওয়াল মুআনাসা গ্রন্থের মতো আল-মুকাবাসাত গ্রন্থটিও এসব তাত্ত্বিক আলোচনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংলাপে ভরপুর।<sup>[৪]</sup>

» যেসব বাড়িতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণ সমবেত হয়ে উপকৃত হতেন, তার অন্যতম হলো ইমাম গায়ালির (মৃত্যু: ৫০৪ হি) ঘর। যে সফরে হজ সম্পন্ন করে দামিশকের জামে উমাইতে বসে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন রচনা করেন, সেই সফরের পর নিশাপুরের নিজামিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা থেকে তিনি অব্যাহতি নেন। তাঁর এ অবসর যাপনকালে ছাত্ররা তাঁর বাড়িতে ভিড় করত।<sup>[৫]</sup>

» আলি বিন মুহাম্মাদ আল-ফুসাইহির (মৃত্যু ৫১৬ হি) ওপর শিয়া ধর্ম অবলম্বন করার অপবাদ দেওয়া হলে তিনি তা অস্বীকার করেননি। ফলে

[১] আল ইমতাউ ওয়াল মুআনাসা খণ্ড: ২: ৪৩:৪৯।

[২] ২: ৪৪।

[৩] ২: ৪৫।

[৪] এ রকম আরও তাত্ত্বিক সংলাপ পড়তে দেখুন: ১২০-১৩৮-২৯২-৩০১, ৩১৯-৩২৭, ৩৫৫-৩৫৮।

[৫] ইমাম গায়ালির জীবনী পড়তে এ গ্রন্থের সূচনা দেখুন: পৃ ৩।

তাকে নিজামিয়া মাদরাসা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন নিজামিয়া মাদরাসার সুনামধন্য শিক্ষক। ফলে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ চালু রাখতে শিক্ষার্থীরা দলে দলে তাঁর বাড়িতে গমন করত।<sup>[১]</sup>

» ফাতিমি রাজবংশের শাসক আযিয বিল্লাহর বিখ্যাত উজির ইয়াকুব বিন কালিস ইসমাইলি মতাদর্শ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। ইসমাইলি ফিকহের ওপর তিনি একটি বিশাল কলেবরের গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে মুইয ও আযিয থেকে শোনা সকল কথা লিপিবদ্ধ করেন। এই কিতাবসহ আরও অন্যান্য কিতাব তাঁর কাছে পড়তে তাঁর বাড়িতে প্রতিদিন জ্ঞানী ও শিক্ষার্থীদের সমাগম হতো।<sup>[২]</sup>

» বিখ্যাত সালাফি মনীষী আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আবু তাহির (মৃত্যু : ৫৭৬ হি) ছিলেন অন্যতম বিদগ্ধ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন দরিদ্র। নানা শহর ও নগর ঘুরে অবশেষে আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে থিতু হন। সেখানে এক ধনী নারীকে বিয়ে করে ওই বাড়িকে তিনি জ্ঞানের কেন্দ্র বানিয়ে নেন। তাঁর মুত্তাখাবাতের তৃতীয় খণ্ডে আবুল হাসান আলি বিন ইবনুল মুশরিফের শ্রুতির মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনায় তিনি বলেন, ‘এর শুরু থেকে আমি পড়েছি ও শুনেছি। তখন আহমাদ বিন মুসা আল-মারুফানীর দুই পুত্র ইসহাক ও হামাদও আমার সঙ্গে ছিল। আর তা আলেকজান্দ্রিয়ায় আমার নিজ বাড়িতেই সম্পন্ন হয়।’

এই ছিল জ্ঞানীদের ঘরে পাঠদান কার্যক্রমের কয়েকটি নমুনা মাত্র। ইতিহাস ও সাহিত্যের গ্রন্থগুলো এসব ঘটনায় ভরপুর। এগুলো প্রমাণ করে যে, সে সময় জ্ঞানীদের বাড়িগুলো সভ্যতার উন্নতি ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। বিশেষত মাদরাসা-ভিত্তিক শিক্ষাকার্যক্রম সূচনার প্রাক্কালে।

আর যেহেতু ঘর হলো মানুষের একান্ত বসবাসের স্থান; তাই বাইরের শিক্ষার্থীরা এখানে এসে যেন একাকিত্ব ও অস্বস্তি বোধ না করেন, সে জন্য শিক্ষক হাসিমুখে স্বাগত জানিয়ে তাদের বরণ করে নিতেন। এর ব্যতিক্রম হলে তা ছাত্রদের অনুপস্থিতির কারণ হতো।<sup>[৩]</sup> ঘরকেন্দ্রিক পাঠদানের গুরুত্ব ও উপকার কমে যেত।

[১] ইয়াকুত: ৫: ৪১৫।

[২] আল-খুতাত: ২: ৩৪১।

[৩] আল আবদারি: ২: ৯৭-৯৮।



## ৬. সাহিত্যের আসর

আমার কাছে মনে হয়েছে, উমাইয়া শাসনামলে সাহিত্যের যেসব আসর একেবারে সাদাসিধে রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং আব্বাসীয় শাসনামলে যা চমৎকারভাবে আলো ছড়িয়েছে, তা মূলত খুলাফায়ে রাশিদিন আমলের আসরসমূহের একটি উন্নত রূপায়ন। ইসলাম ধর্মে খলিফার দায়িত্ব ছিল পার্থিব সকল কাজ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করা এবং ধর্মীয় বিষয়ে সমাধান দেওয়া। এ কারণেই জ্ঞান ও ইজতিহাদের যোগ্যতা থাকা ছিল খলিফা বা শাসক হওয়ার অন্যতম শর্ত।<sup>[১]</sup> এরই ধারাবাহিকতায় শারঈ পদ্ধতিতে মনোনীত খলিফাগণ মসজিদে বা প্রাসাদের বাইরে বসে জনগণের সমস্যাগুলো কাছ থেকে গুনে সেগুলোর সমাধান দিতেন। আর খলিফা নিজে কোনো সমাধান খুঁজে বের করতে না পারলে সঙ্গীদের ডেকে তাদের পরামর্শ নিতেন। সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে তাদের মতামতকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতেন।

সাহিত্যের আসর ও খুলাফায়ে রাশিদিনের বৈঠকসমূহ একই সূত্রে গাঁথা। কারণ, উভয় মজলিসের উদ্দেশ্য ছিল মানবতার কল্যাণ সাধন, সভ্যতার উন্নয়ন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসার। তা ছাড়া উভয় প্রকার আসরের মাঝে ছিল বিস্তর ফারাক। কারণ গণবৈঠকে স্বাধীনভাবে যখন ইচ্ছা সবার অংশগ্রহণের সুযোগ থাকত। সে সময় খলিফাকে সুনামে বা 'হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা' বলে সম্বোধন করা হতো, যা পরবর্তী কালে আমিরুল মুমিনিন উপাধিতে রূপ নেয়। খলিফার সামনে উপস্থিত লোকজন অত্যন্ত সাদামাটা গালিচা অথবা চাটাইয়ের ওপর বসতেন। মাঝে মাঝে শুধু মাটির ওপরও বসে পড়তেন।<sup>[২]</sup>

অপরদিকে সাহিত্য আড্ডার জন্য বিশেষায়িত আসরগুলোতে অনারব রীতির দেখা পাওয়া যায়, যা আরব শাসকগণ তাদের বিজয় করা দেশসমূহ থেকে গ্রহণ করেছেন। এসব আসরকে জাঁকজমকপূর্ণ ও জমকালো করে তোলা হতো। এসব আড্ডা ও আসরের কথা ইবনু আবদি রাব্বাহি<sup>[৩]</sup>, মাকাররী<sup>[৪]</sup> ও মাকরিযির<sup>[৫]</sup> লেখায় উঠে এসেছে। এসব আসরে সব শ্রেণীর লোকদের প্রবেশাধিকার ছিল না। কেবল নির্দিষ্ট শ্রেণীর লোকদেরকেই সেখানে ঢুকতে

[১] আল মাওয়ারদি: আল আহকামুস সুলতানিয়া পৃ ৫, আল ফাখরি ২০-২১।  
[২] আত তামাদ্দুনুল ইসলামি: ৫: ১৩১।  
[৩] আল ইকদুল ফারিদ: ৪: ১০১, ১০৮।

[৪] নাফহত তীব: ২: ১১২৮।

[৫] আল-খুতাত: ১: ৩৮৫-৩৮৬।

দেওয়া হতো।<sup>[১]</sup> আর সেখানে কখন ঢুকবে আর কখন বের হবে, সেটিও নির্দিষ্ট ছিল। যখন-তখন কেউ ঢুকতে পারত না। একটি নির্দিষ্ট সময়ে সবাই সেখানে উপস্থিত হতো। আর খলিফার বিশেষ ইশারা পেলে সবাই বেরিয়ে যেত। খলিফাভেদে তাদের ইশারা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। দরবারের লোকজন তা ভালোভাবেই বুঝতে পারত। আমিরে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন বলতেন ‘রাত শেষ হয়ে গেছে’ তখন গল্পকার ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ উঠে যেত। আবদুল মালিক যখন লাঠি ফেলে দিতেন, তখন সবাই উঠে যেত। আর ওয়ালিদ যখন الله أستودعكم বলতেন, তখন সবাই বেরিয়ে যেত। হাদী যখন আস-সালামু আলাইকুম বলতেন তখন উপস্থিত লোকেরা চলে যেত। হারুনুর রশিদ যখন ‘সুবহানাকাল্লাহ ওয়া বিহামদিকা’ বলতেন তখন তাঁর সঙ্গীরা উঠে যেত। আর মুতাসিম যখন তাঁর জুতার দিকে তাকাতে, তখন সবাই উঠে পড়ত। ওয়াসিক বিল্লাহ যখন তার দুই গাল স্পর্শ করে হাই তুলতেন তখন সবাই উঠে পড়ত..<sup>[২]</sup> এসব আসরে খলিফা বা শাসক ছাড়া আর কেউ আলোচনা শুরু করতে পারত না।<sup>[৩]</sup> ইবনু খাল্লিকান লেখেন : আহমাদ বিন দাউদ সর্বপ্রথম খলিফাদের সঙ্গে আলোচনা সূচনা করেন। খলিফা কথা শুরু না করলে অন্য কেউ কথা বলত না। আর এসব সাহিত্য ও জ্ঞানের আসরে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা, সংলাপ, বিতর্ক হতো তা খুলাফায়ে রাশিদিনের মজলিসসমূহ থেকে আরও ব্যাপক ছিল।<sup>[৪]</sup>

## ✽ সাহিত্য আসরের কিছু নিয়মরীতি

এসব সাহিত্য আসরের বিশেষ কিছু নিয়ম ছিল, সেখানে প্রবেশাধিকার পাওয়া সবাইকে সেই নিয়মগুলো মানতে হতো। রুসুমু দারিল খিলাফাহ (হস্তলিখিত) গ্রন্থে আস-সাবি এবং আদাবুন নাদিম গ্রন্থে কাশাজিম এসব নিয়মের কথা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। উল্লেখ না করলেই নয় এমন কয়েকটি নিয়মের কথা আমি এখানে তুলে ধরিছি।

খলিফার সামনে অথবা সাহিত্যের আড্ডায় প্রবেশকারীকে অবশ্যই বেশভূষায় পরিচ্ছন্ন ও গাভীর্যের অধিকারী হতে হবে। চলনে-বলনে সতর্ক হতে হবে। উন্নত সুগন্ধি মেখে আসতে হবে। সুলতান যা অপছন্দ করেন তা সবসময়

[১] জাহিয়: আত তাজ: পৃ ২১।

[২] আত তাজ: ১১৯-১২০।

[৩] আত তাজ: ৪৬-৫০।

[৪] আল ওয়াফায়াত: ১: ৩১।



এড়িয়ে চলতে হবে।<sup>[১]</sup> খলিফার দরবারে উপস্থিত হয়ে সর্বপ্রথম আস-সালামু আলাইকুম ইয়া আমিরুল মুমিনিন ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ বলতে হবে। আগন্তুক কোনো উজির বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হলে খলিফা তাঁর আস্তিনে ঢাকা হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিতেন চুমু গ্রহণের জন্য। তবে শাসনকর্তা, বনি হাশিম গোত্রের কেউ, কাযি (বিচারক) বা ফকিহগণ খলিফাদের হাতে চুমু খেতেন না। তাঁরা কেবল সালাম দিয়েই ক্ষান্ত থাকতেন।<sup>[২]</sup>

রাজদরবারে ঢুকে আগন্তুক যেখানে মানুষের বসা শেষ হয়েছে সেখানেই নীরবে বসে পড়তেন। খলিফা বিশেষভাবে কাছে না ডাকলে ঘাড় টপকে সামনে এগোতেন না। বারবার আশপাশে ও পেছনে তাকানো, হাত নাড়ানো বা শরীরের কোনো অঙ্গ নড়াচড়া করা বারণ ছিল। খলিফা ছাড়া অন্য কারও দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা নিষেধ ছিল। রাজবৈঠকে কারও সঙ্গে কানাকানি করা বা কারও দিকে ইশারা করা যেত না। খলিফার সামনে কোনো কিতাব বা কোনো চিঠি পড়া যেত না। তবে খলিফার সামনে চিঠি পড়ার দরকার হলে বা তিনি অনুমতি দিলে তখন পড়া যেত। কেউ খলিফার সঙ্গে কথা বললে বা তার মতের বিপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হলে অত্যন্ত নম্র ভাষায় ভদ্রতা বজায় রেখে পেশ করতে হতো। খলিফার সামনে হাস্যকর কিছু ঘটলেও সেখানে হাসা বারণ ছিল...।

মনে রাখা উচিত একজন মানুষ তার সঙ্গীর চোখে তখনি সম্মানিত ও মর্যাদাবান হিসেবে গণ্য হয়, যখন সে নীরব হয় এবং শক্তিশালী দেহের অধিকারী হয়। যার মুখ থেকে কখনো থুথু এবং নাক থেকে কখনো কফ বের হয় না। নিজের মুখকে পানাহার থেকে গুটিয়ে রাখে। তবে দ্বিতীয়টি ভাই-বেরাদার ও সঙ্গী-সাথীদের সাথে সম্ভব হলেও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সামনে তা একেবারেই নিষেধ। আর প্রথমটি সবার সামনে সবসময় নিন্দনীয়।<sup>[৩]</sup>

খলিফা জিজ্ঞেস না করলে বা অনুমতি না দিলে খলিফার মজলিসে নিজ থেকে কিছু উপস্থাপন করার অধিকার কারও ছিল না। আর আলোচনা করলেও তা নীচু ও বিনয়ী ভাষায় করতে হতো। যতটুকু উঁচু আওয়াজে বললে তিনি বুঝতে পারেন, তার চেয়ে বেশি আওয়াজে কিছু বলা বারণ ছিল।<sup>[৪]</sup> খলিফার সামনে কোনো হাস্যকর বা অবাস্তব ঘটনা বলা অথবা মানহীন শব্দ উচ্চারণ করা নিষেধ ছিল। খলিফা যখন কথা বলেন তখন সবাই শুনতে হতো, ভালো

[১] আস সাবি: ৪৬, ৪৭।

[২] রুসুম দারিল খিলাফাহ গ্রন্থের ৪৬ ও ৪৬ পৃষ্ঠার সারমর্ম।

[৩] রুসুম দারিল খিলাফাহ গ্রন্থের ৫০, ৫১ ও ৫২ পৃষ্ঠার সারমর্ম।

[৪] প্রাপ্ত তথ্যসূত্র: পৃ ৪৯।

করে বুঝতে হতো। যেন খলিফাকে তার কথার পুনরাবৃত্তি করতে না হয়। কারণ সেটি ছিল খলিফার সাথে আদবের খেলাফ।<sup>[১]</sup>

কাশাজিম<sup>[২]</sup> বলেন, সুন্দর কথা বলা যেমন শিখতে হয়, তেমন সুন্দর করে শ্রবণ করাও শিখতে হবে। কেউ কথা বললে শেষ না করা পর্যন্ত তার কথা শুনতে হবে। মুখ ও দৃষ্টি তার দিকে ফেরাতে হবে। মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনতে হবে। বক্তার কথার মাঝখানে অন্যত্র দৃষ্টি দেওয়া যাবে না। অন্য কাজে লিপ্ত হওয়া যাবে না। অন্য কিছু চিন্তাও করা যাবে না। শ্রোতা বিষয়টি আগে থেকেই জানেন এই ভেবে শুরু করা কথা বক্তার মুখ থেকে কেড়ে নেওয়া যাবে না। বরং এটি বললেই বক্তা শান্তি পাবে, এই ভেবে নীরবে শুনবে। তাকে বাহবা দেবে। তাহলে বক্তা বুঝবেন, বিষয়টি হয়তো তার অজানা ছিল। সে ভালোভাবেই কথা শুনতে পেয়েছে। কাশাজিম আরও যোগ করেন :<sup>[৩]</sup>

সংলাপের নিয়ম হলো, কাউকে ছোট করা যাবে না। কথা সংক্ষেপ করতে বাধ্য করা যাবে না। তাকে আক্রমণ করা যাবে না। এমন কোনো প্রসঙ্গ আনা যাবে না, যা তাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে। বক্তাকে অবশ্যই শ্রোতার চাহিদা ও অনুকূলে কথা বলতে হবে। যেন শ্রোতা তার কথা থেকে নিজের খোরাক পেয়ে যায়। লম্বা-চওড়া ভাষণ ও বিশাল বিশাল বাক্য পরিহার করতে হবে। দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট ও অসঙ্গতিমূলক শব্দ পরিহার করতে হবে। কারণ, মানুষ সবসময় সংক্ষিপ্ত কথা শুনতে পছন্দ করে।

কথা বলার নিয়ম হলো, কথক খুব বেশি হাসাহাসি করবে না। একবার নাজাহ বিন সালামাকে আড্ডায় বসার জন্য ডাকেন বাদশাহ মুতাওয়াঙ্কিল। তখন নাজাহ বাদশাহকে লক্ষ্য করে বলেন, আমার মাঝে কয়েকটি দোষ আছে, যে কারণে খলিফাদের সঙ্গে আড্ডায় বসা আমার সাজে না। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, কী সেগুলো? তিনি উত্তরে বললেন : ঘন ঘন প্রস্রাব আসে। কথা বলার সময় আমি অকারণে মুচকি হাসি। আর দুই ঢুকের বেশি পান করতে পারি না। তখন বাদশাহ বললেন : আপনি সত্য কথা বলেছেন। তাই এ বিষয়ে আমি আপনাকে ক্ষমাদৃষ্টিতে দেখব।<sup>[৪]</sup>

[১] প্রাগুক্ত তথ্যসূত্র: পৃ ৫৩।

[২] আদাবুন নাদিম: ৩২-৩৫।

[৩] আদাবুন নাদিম: ৩৩-৩৪।

[৪] কাশাজিম: আদাবুন নাদিম: পৃ ৩৫।



## ✽ খলিফাদের পদক্ষেপ

খলিফাগণ নিজেদেরকে জ্ঞানের ধারক বাহক ও রক্ষক মনে করতেন। তাই তো তারা সবসময় প্রত্যাশা করতেন, তাদের প্রাসাদগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা বিকাশের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠুক। সুসাহিত্যিক, বিদ্বান ও জ্ঞানীদের পদচারণায় সবসময় মুখরিত থাকুক। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, বাদশাহ মুতাসিদ বিল্লাহ যখন বাগদাদে তাঁর 'আশ-শুমাসিয়া' প্রাসাদ নির্মাণের ইচ্ছা করেন, তখন মূল ভবনের আশপাশে প্রচুর জমি ফাঁকা রাখেন। এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে জানা যায়, সেখানে তিনি অনেকগুলো ভবন নির্মাণ করতে চান। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার সূত্র চর্চার জন্য পৃথক পৃথক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে চান। সেজন্য প্রত্যেক বিষয়ের অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত লোকদের নিয়োগ করতে চান সেখানে। তাদের জন্য উপযুক্ত ভাতা বরাদ্দ করতে চান। যেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেকোনো শাখায় পড়াশোনা করতে আগ্রহী রাজ্যের প্রতিটি ব্যক্তি এখানে পড়াশোনা করার সুযোগ পায়।<sup>[১]</sup> আর এভাবেই রাজপ্রাসাদের সঙ্গে জুড়ে যায় সাহিত্যের আসরগুলোর ইতিহাস। বিশেষত খলিফাদের মহলগুলোতে। এরকম সাহিত্যের আসরের সূচনা ঘটে প্রথম উমাইয়া খলিফা মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রাসাদে। মাসউদি লেখেন:<sup>[২]</sup> একদিন মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মজলিসে আবদুল্লাহ বিন হাশিম উপস্থিত হলে খলিফা তাকে বলেন, কে আমাকে দানশীলতা, বীরত্ব ও মানবিকতার বিশ্লেষণ শোনাবে? তখন আবদুল্লাহ বলেন, হে আমিরুল মুমিনিন, দানশীলতা হলো অর্থ খরচ করা। চাওয়ার আগে দান করা। আর বীরত্ব হলো সবসময় সম্মুখপানে এগিয়ে চলা। আর পদস্থলনের সময় ধৈর্য ধারণ করা। আর মানবিকতা হলো নিজের দ্বীনকে নিষ্কলুষ রাখা, অবস্থা সংশোধন করা এবং প্রতিবেশীদের রক্ষা করা। আরবের ইতিহাস ও বীরত্বগাথা শুনতে, পারস্যের রাজা বাদশাহদের অতীত কাহিনী এবং প্রশাসনিক নিয়মনীতি সম্পর্কে অবগত হতে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সবসময় তাঁর দরবারে জ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের ডাকতেন।

আমিলী লেখেন:<sup>[৩]</sup> একদিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান তাঁর সভাসদদের নিয়ে বসা ছিলেন। তিনি বললেন, শরীরের অঙ্গের শব্দ দিয়ে সবগুলো আরবি অক্ষর কে বলতে পারবে? সে যা চাইবে আমি তাই দেব। তা শুনে সুওয়াইদ বিন গাফলা তাঁর দিকে উঠে গিয়ে বললেন, আমি বলতে পারব হে আমিরুল

[১] মাকরিযি: ২: ৩৬২-৩৬৩।

[২] মুরাওয়িজু যাহাব: খণ্ড ২ পৃ ৫৯।

[৩] প্রাগুক্ত তথ্যসূত্র: ৫: ৭৭-৭৮।

মুমিনি! খলিফা বললেন, ঠিক আছে বলো তাহলে! সুওয়াইদ বললেন,

أنف بطن ترقوة ثغر جمجمة حلق خد دماغ ...

খলিফার অপর সঙ্গী তখন দাঁড়িয়ে বলল, হে আমিরুল মুমিনি! আমি মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শব্দ দিয়ে দুইবার হরফে হিজা বলতে পারব। তখন সুওয়াইদ বলল, আমি তিন বার বলতে পারব! এভাবে তিনি সেগুলো বলতে লাগলেন। আরবি শব্দভাণ্ডার ও সাহিত্য পাণ্ডিত্যের প্রতি খুশি হয়ে আবদুল মালিক তাকে পুরস্কৃত করেন। নানান হাদিয়া দিয়ে তাকে খুশি করেন।<sup>[১]</sup>

আবুল ফারাজ আল-আসফাহানি লেখেন:<sup>[২]</sup> একবার আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের মজলিসে এক বেদুইন এসে উপস্থিত হয়। সেখানে কবি জারিরও উপস্থিত ছিলেন। খলিফা আবদুল মালিক ওই বেদুইনকে জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি?

- তামিম, আসাদ ও রবিআ গোত্র এবং ইয়েমেনের নিকটে অবস্থান করা এক সাধারণ বেদুইন।

- তাদের মধ্যে কোন গোত্রের তুমি?

- আপনার মামার গোত্র বনু আযরা থেকে।

- ওই গোত্রের লোকেরা তো মানুষের কল্যাণকামী হয়। তা, তোমার কি কাব্যজ্ঞান আছে?

- হে আমিরুল মুমিনি! আপনার যা ইচ্ছা হয় আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

- আরবের বলা সবচেয়ে প্রশংসনীয় কবিতা কোনটি?

- জারিরের এই কবিতা:

ألستم خير من ركب المطايا # وأندى العالمين بطون راح

বেদুইনের মুখে নিজের রচিত কবিতা শুনে জারির তার মাথা উঁচু করে তাকে দেখতে লাগলেন।

খলিফা : আরবের রচিত সবচেয়ে গৌরবময় কবিতা কোনটি?

বেদুইন : জারিরের এই কবিতা,

[১] আল কাশকুল: ১৫৫।

[২] আল আগানী: ৭: ৫৪-৫৫।



إذا غضبت عليك بنو تميم # حسبت الناس كلهم غضابا

তা শুনে জারির নড়েচড়ে বসল।

খলিফা : আরবের রচিত সবচেয়ে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা কোনটি?

বেদুইন : জারিরের এই কবিতা,

فغض الطرف أنك من غير # فلا كعبا بلغت ولا كلابا

তা শুনে জারির তার দিকে প্রাণভরে তাকিয়ে রইল।

খলিফা : আরবের রচিত সবচেয়ে প্রেমময় কবিতা কোনটি?

বেদুইন : জারিরের এই কবিতা,

إن العيوب التي في طرفه حور # قتلنا ثم لم يحين قتلنا

এ কবিতা শুনে জারির লজ্জায় পড়ে গেল। বিচলিত হয়ে উঠল।

খলিফা : উপমা প্রদানে আরবের সবচেয়ে সুন্দর কবিতা কোনটি?

বেদুইন : জারিরের এই কবিতা,

سرى نحوهم ليل كأن نجومه # قناديل فيهن الذبال المفتل

জারির : এ বেদুইনের জন্য আমার পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার আছে হে আমিরুল মুমিনিন!

খলিফা : রাজকোষ থেকেও তার জন্য উপহার বরাদ্দ করছি। আর তোমার জন্যও পুরস্কার আছে হে জারির। একটুও কম দেব না তোমাকে।

জারিরের পুরস্কার ছিল চার হাজার দিরহাম। সঙ্গে রাজকীয় উপহার ও মূল্যবান পোশাক। এরপর আযার গোত্রের ওই বেদুইন যখন বেরিয়ে যায়, তখন তার এক হাতে ছিল আট হাজার দিরহাম। অন্য হাতে নতুন পোশাকের বস্ত্র।

একবার শাসক বিশর বিন মারওয়ানের কাছে কবি জারির ও ফারযদাক মিলিত হন। বিশর দুজনকে লক্ষ করে বললেন, আপনারা কাব্যরচনায় একে অন্যকে পাল্লা দেন। হৃন্দের তালে তালে একে অন্যের ওপর গর্ব করেন। একে অন্যকে বিদ্রূপ করেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কোনো দরকার নেই আমার। আগে যা হওয়ার হয়েছে। এবার আমার সামনে আপনারা দুজন নিজেদের গৌরব প্রকাশ করুন। ফারযদাক আবৃত্তি করলেন :

نحن السنام والمناسم غيرنا # فمن ذا يساوي بالسنام المناسما  
এর উত্তরে জারির আবৃত্তি করলেন :

وأنبأتمونا أنكم هام قومكم # ولا هام إلا تابع للخراطم  
ফারযদাক আবার আবৃত্তি করলেন :

فنحن الزمام القائد المقتدى به # من الناس، ما زلنا، ولسنا لهازما  
তা শুনে জারির আবৃত্তি করলেন :

فنحن بني زيد قطعنا زمامها # فتاهت، كاسر طائش الرأس عارم

তখন বিশর বললেন, উট নিয়ে গমন ও লাগাম কেটে দিয়ে আপনি তাকে পরাস্ত করে ফেলেছেন হে জারির। এরপর উভয়ের জন্যই তিনি উত্তম পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। আর জারিরকে বিজয়ী ঘোষণা করে দেন।<sup>[১]</sup>

বনু উমাইয়ার উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন আদী ইবনুর রিকা। তার কবিতা থেকে সবসময় ওই গোত্রের লোকদের প্রশংসা ও বন্দনা ঝরে পড়ত। বিশেষ করে খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের বন্দনা খুব বেশি রকম পাওয়া যেত। সালমা নামে তার এক কন্যা ছিল। সেও ছিল দারুণ কবি। একবার কাব্য চ্যালেঞ্জ নিয়ে একদল কবি তার বাড়িতে এল। তিনি তখন বাড়িতে অনুপস্থিত ছিলেন। সালমা তা টের পেয়ে তাদের কাছে এসে আবৃত্তি করলেন :

تجمعتم من كل أوب وبدلة # على واحد، لا زلتم قرن واحد

কবি কন্যার মুখে এ চমৎকার কবিতা শুনে তারা স্তব্ধ হয়ে গেল। ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের রাজদরবারে কবি আদীর নানা চমৎকার সব ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। একবার ওয়ালিদের দরবারে আদী ও জারির একত্র হলে জারিরকে লক্ষ করে ওয়ালিদ বললেন, তুমি কি তাকে চেনো?

জারির : না হে আমিরুল মুমিনিন!

খলিফা : এ হলো আলি ইবনুর রিকা।

জারির : নোংরা ও ছেঁড়া কাপড়কে আমরা রিকা বলে থাকি। সে কোন পরিবারের?

খলিফা : আমিলা পরিবারের।

[১] আল আগানী: ৭ “ ৫২, ৫৩।



জারির : আমিলা সম্পর্কে মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلِي نَارًا حَامِيَةً

‘ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে।’ [১]

ওয়ালিদের রাজদরবারে একবার কবি কুসাইয়িরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে আদীর। কুসাইয়ির তার কবিতার সমালোচনা করে এ কথা আদী আগে থেকেই জানত। এরপর তার সামনে আদী খলিফার প্রশংসায় কবিতা রচনা করল। শেষ পর্যন্ত যখন এ লাইন পর্যন্ত এলো :

وقصيدة قد بت أجمع بينهما # حتى أقوم ميلها وسنادها

তা শুনে কুসাইয়ির বলল : তুমি যদি পণ্ডিত, সাহিত্যিক বা জ্ঞানী হতে, তবে এখানে ميل বা سناد এর প্রসঙ্গ এনে তা সোজা করার কথা বলতে না। এরপর তিনি আবৃত্তি করলেন :

نظر المثقف في كعوب قناته # حتى يقيم ثقافه منادها

আরও আবৃত্তি করলেন :

وعلمت حتى ما أسائل واحدا # عن علم واحدة لكي ازدادها

তখন কুসাইয়ির বললেন, ‘মসজিদুল হারামের প্রভুর শপথ! তুমি মিথ্যা বলেছ। আমি তোমার চেয়ে নির্বোধ ছিলাম না কখনো। তুমি নিজেই নিজেকে নির্বোধ ভাবছ।’ এ কথা শুনে ওয়ালিদসহ উপস্থিত সবাই হেসে উঠল। আদীকে আর কথা বলার সুযোগ দেওয়া হলো না। [২]

বনু উমাইয়্যার শাসনামলে এই ছিল কিছু সাহিত্য আসরের চিত্র। পরবর্তী সময়ের তুলনায় সে আমলের সাহিত্য খুব সাদামাটা মনে হয়। এরপর যখন আব্বাসীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন ইসলামি বিশ্বে এসব সাহিত্য আসর অত্যন্ত উজ্জ্বল ও পরিপক্ব রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলো। এসব সাহিত্য আড্ডা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্তুরের আসন লাভ করল। ওই শাসনামলে ইসলামি সভ্যতায় বিদেশী সভ্যতার প্রভাব দেখা গেছে প্রকটভাবে। বিশেষত পারসিক সভ্যতার। এসব সাহিত্য আসর নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হতো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খলিফা, শাসক, আমির উমরা ও অভিজাত লোকদের প্রাসাদে এসব আসর জমত। সে

[১] সূরা আল গাশিয়া: ৮৮: ৩-৪।

[২] দেখুন আল আগানী: আদীর বৃত্তান্ত: ৮: ১৭৯।

জন্য আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশ ও দামি আসবাবের ব্যবস্থা করা হতো। সেসব আসর ও অনুষ্ঠানে ফুটে উঠত তখনকার মুসলিমদের বিভ্র-বৈভব ও প্রাচুর্যের মাত্রা। এরপর ধীরে ধীরে এসব অনুষ্ঠান বিচিত্র ভাগে বিভক্ত হয়। ফলে সমসাময়িক সভ্যতার সঙ্গে মিল রেখে সাহিত্যের জন্য এক রকম অনুষ্ঠান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য আরেক রকম অনুষ্ঠান, নাসীদের জন্য অন্য রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। তবে জ্ঞান ও সাহিত্যের অনুষ্ঠান ছিল সবচেয়ে উন্নত, গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান আসর। আল-আগানী গ্রন্থে এরকমই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।<sup>[১]</sup> তাতে বর্ণিত আছে, গায়কদের সঙ্গে নয়; বরং কবি সাহিত্যিক ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে রাজদরবারে প্রবেশের জন্য বাদশাহ মামুনের কাছে অনুরোধ করেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ইসহাক আল-মুসিলী। তবে যখন গায়কদের প্রয়োজন হতো, তখন তাদেরও ডাকতেন। এরপর তিনি ফকিহদের নিয়ে দরবারে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলে বাদশাহ মামুন তাকে অনুমতি দিয়ে দেন।

### ✽ হারুনুর রশিদের শাসনামল

বাদশাহ হারুনুর রশিদের শাসনামলে (১৭০-১৯৩ হি) জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটে। কারণ সেই আমলে খলিফা নিজেই উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক বাহক ছিলেন। অপরদিকে রাষ্ট্র বিনির্মাণে যে ঘাত প্রতিঘাত সামনে এসেছিল, তা পেরিয়ে ইসলামি সাম্রাজ্য একটি স্থিতিশীল ও নিরাপদ অবস্থান লাভ করেছিল। বাদশাহ রশিদের রাজবৈঠকে কবি ও ফকিহদের মাঝে বিতর্ক অনুষ্ঠান হতো। নানা জ্ঞান ও সাহিত্যের পণ্ডিত লোকদের মাঝে প্রতিযোগিতার আসর বসতো।

বাগদাদ নগরীতে বাদশাহ রশিদের বলয় ছিল খ্যাতিমান জ্ঞানীদের দ্বারা সমৃদ্ধ। জ্ঞান-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ লোকদের তিনি নিজের আশপাশে জড়ো করতে সক্ষম হন। তাদের নাম বলতে গেলে কবিদের মাঝে: আবু নাওয়া, আবুল আতাহিয়া, দাবাল, মুসলিম ইবনুল ওয়ালিদ, আব্বাস ইবনুল আহনাফ। গায়কদের মধ্যে: ইবরাহিম আল-মুসিলি ও তার পুত্র ইসহাক। ভাষাবিদদের মাঝে: আবু ওবায়দা, আল-আসমাই, আল-কাসাই। এরপর বক্তাদের মাঝে ইবনুস সিমান, ইতিহাসবিদ হিসেবে আল-ওয়াকিদিসহ আরও অনেকে এ তালিকায় আসবে।<sup>[২]</sup>

বাদশাহ রশিদের রাজদরবারে সংঘটিত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ভাষা-বিতর্কটি

[১] খণ্ড ৫ পৃ ৬০।

[২] Nicholson: A Literary History of the Arabs p: ২৬১।



ঘটেছিল সিবাওয়াই ও কিসাইর মাঝে। ওই বিতর্কে কিসাইর দাবি ছিল যে আরবের লোকেরা বলে থাকে:

كَمْ أَطْلُ أَنْ الزَّيْبُورُ أَشَدَّ لِسْعًا مِنَ النَّحْلَةِ فَإِذَا هُوَ إِيَّاهَا

তা শুনে সিবাওয়াই বললেন, না। সঠিক বাক্যটি হবে *إِذَا هُوَ إِيَّاهَا*। এরপর দীর্ঘ সময় বাগবিতণ্ডা চলার পর, শহরের মিশ্র ভাষা থেকে দূরে অবস্থানকারী খাঁটি আরবিভাষী লোকের শরণাপন্ন হতে তারা একমত হন। আর কিসাইর খলিফার শিক্ষক ছিলেন বিধায় তাকে অনেক মূল্যায়ন করা হতো। ফলে তিনি একজন খাঁটি আরবিভাষী লোককে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন। আরবিভাষী লোকটি সিবাওয়াইর উক্তিমতো বাক্যটি বলল। তখন বাদশাহ তাকে বললেন, আমরা চাই তুমি কিসাইর মতো করে বাক্যটি বলো। তখন আরবিভাষী লোকটি বলল, আমাদের ভাষা ওটা সমর্থন করে না। আমাদের ব্যবহৃত খাঁটি আরবিতে ওই বাক্যটিই সঠিক। এরপর তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, রাজদরবারে এক লোক ঘোষণা করে জিজ্ঞেস করবে যে, ওই বিষয়ে সিবাওয়াইর এই মত আর কিসাইর ওই মত। কার মতটি সঠিক? তখন আরবিভাষী লোকটিকে বলতে হবে যে, কিসাইর মতটি সঠিক। বাদশাহর এই সিদ্ধান্তে আরবিভাষী লোকটি রাজি হয়ে বলল, হ্যাঁ এটা আমি বলে দিতে পারব। এরপর উভয়ের জন্য আবার রাজকীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। ভাষাবিদ বিশিষ্ট লোকদের জমায়েত করা হলো সেখানে। ওই আরবিভাষী লোককেও সেখানে এনে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সজোরে ঘোষণা করে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, কিসাইর মতটিই সঠিক। ওটাই আরবদের ব্যবহৃত বাক্য। বাদশাহ ও দরবারি লোকেরা মিলে যে লোকটিকে এ কথা বলতে বাধ্য করেছে, সেটা টের পেয়ে যান সিবাওয়াই। এরপর রাগে-ক্ষোভে বাগদাদ থেকে বেরিয়ে যান তিনি।<sup>[১]</sup>

বাদশাহ রশিদের দরবারে সংঘটিত আরেকটি বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কের ঘটনা হলো ফকিহ আবু ইউসুফ ও ব্যাকরণবিদ কিসাইর মাঝে সংঘটিত ঘটনা। সেখানে আবু ইউসুফ দাবি করেন যে, কিসাইর আরবিভাষার কিছু বিন্যা আয়ত্ত্ব করেছেন মাত্র। তার কৃতিত্ব এতটুকুই। এরচেয়ে বেশি কিছু নয়। তা শুনে কিসাইর বললেন, যে ব্যক্তি জ্ঞানের কোনো একটি শাখায় পারদর্শী হয়, ওই জ্ঞান তাকে সকল জ্ঞানের পথ দেখায়। তা শুনে আবু ইউসুফ বললেন, সাহেব! সিজদায় যে ব্যক্তি ভুল করে, সে কি আরেকটি সাহেব সেজদা করবে? উত্তরে কিসাইর বললেন, না। আবু ইউসুফ জিজ্ঞেস করলেন, কেন? কিসাইর বললেন,

[১] ইবনু খাল্লিকান: ১: ৫৪৯।

ব্যাকরণবিদগণ বলে থাকেন—একবার তাসগির করা শব্দ দ্বিতীয়বার আর তাসগির হয় না।<sup>[১]</sup>

একই যুগের ইয়াহইয়া বিন খালিদও ছিলেন বিশিষ্ট গবেষক। তাঁর মজলিসেও সকল শ্রেণীর ধর্মতত্ত্ববিদদের সমাবেশ ঘটত। আমার ধারণা, এসব অনুষ্ঠান ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং অত্যন্ত উঁচু মানের। সেখানে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিচিত্র গবেষণা নিয়ে আলোচনা হতো। মাসউদির বিবরণ থেকে এমনটিই বোঝা যায়। কোনো এক অনুষ্ঠানে একবার ইয়াহইয়া উপস্থিত বিশিষ্টজনদের উদ্দেশে বলেন, অস্তিত্ব ও প্রকাশ, আদি তত্ত্ব ও অনাদি তত্ত্ব, সীমাত সাব্যস্ত করা ও বাতিল করা, আন্দোলন ও নীরবতা, স্পর্শ ও অস্পর্শ, বিদ্যমানতা ও শূন্যতা, আকৃতি ও অনাকৃতি, পরিমার্জন ও সংশোধন, পরিমাণ ও পরিমাপসহ বিতর্ক-তত্ত্বের সকল খুঁটিনাটি নিয়ে আপনারা গবেষণা ও লেখালেখি করেন। এবার প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে কিছু বলুন। তখন আলি ইবনুল হাইসাম বলেন, হে সম্মানিত উজির! প্রেম ভালোবাসা হলো মিলনের ফল। দুটি আত্মা একত্র হওয়ার প্রমাণ...। তখন খারিজি গোষ্ঠীর আবু মালিক হাদরামী বলেন, প্রেম হলো জাদুমন্ত্র। আর তা জ্বলন্ত অঙ্গার থেকেও বেশি যন্ত্রণাদায়ক।<sup>[২]</sup>

### ❖ বাদশাহ মামুনের শাসনকাল

অপরদিকে (হুগাসের বর্ণনামতে)<sup>[৩]</sup> বাদশাহ মামুনের শাসনকাল ছিল মুসলিম বিশ্বের সভ্যতা বিকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল মুহূর্ত। কারণ তখন খলিফা নিজেই ছিলেন সে যুগের অন্যতম বিজ্ঞানী। তাই তো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল দেশ থেকে বেছে বেছে সকল বিষয়ের শ্রেষ্ঠ ও পণ্ডিত লোকদের তিনি তাঁর রাজ্যে জড়ো করেন। তা ছাড়াও তাঁর শাসনামলে স্থানীয়ভাবেও বাগদাদ ছিল প্রাজ্ঞ, উপদেষ্টা, অনুবাদক, গবেষক, চিন্তাবিদদের দ্বারা পরিপূর্ণ। তাঁরাও ছিলেন বাদশাহ মামুনের প্রাসাদ ও রাজ্যের অন্যতম শোভা। সৈয়দ আমির আলি যোগ করেন:<sup>[৪]</sup> বাদশাহ মামুনের রাজদরবার ছিল বিপুল সংখ্যক জ্ঞানী, সাহিত্যিক, কবি, চিকিৎসাবিদ, দার্শনিক ও প্রাজ্ঞ লোকদের সমাগমস্থল। সারাবিশ্বের নানা অঞ্চল থেকে বাছাই করে বাদশাহ মামুন তাদের একত্র করেন। গোত্র, বংশ ও দেশ যাই হোক, সবাইকে তিনি খুব মূল্যায়ন করতেন।

[১] ইবনু খাল্লিকান: ১: ৪৬৯।

[২] আল মাসউদি: মুরাওয়িজুয যাহাব ২: ২৮৩-২৮৪।

[৩] Hugas, Dictionary of Islam ২৯৫-২৯৬।

[৪] A Short History of the Saracens, p: ২৭৮।



রাজদরবারের নানা বিতর্ক অনুষ্ঠানে প্রায় সময় তিনি নিজেই সভাপতির ভূমিকা পালন করতেন। বাদশাহ মামুন একবার ধর্মবিষয়ক অনুষ্ঠানে আলি রেজাকে জিজ্ঞেস করলেন, কীসের ভিত্তিতে তোমরা এ দাবি করো? তিনি উত্তর দিলেন: মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আলি এবং ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর আত্মীয়তাকে কেন্দ্র করে। তখন বাদশাহ বললেন, দাবির ভিত্তি যদি কেবল আত্মীয়তাই হয়, তবে তো আহলে বাইতের মাঝে আলির থেকেও বেশি কাছের ও তাঁর সমপর্যায়ের আত্মীয় ছিল। আর ফাতিমার সঙ্গে যদি আল্লাহর রাসূলের আত্মীয়তার কারণে এ কথা বলে থাকো, তবে ফাতিমার পরে হাসান ও হুসাইনের (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) অধিকার আরও বেশি। তাঁরা জীবিত থাকতে এ ব্যাপারে আলির কোনো অধিকার থাকতে পারে না। তাই যদি হয়, তবে ধরে নেওয়া হবে যে, এ দুজন জীবিত থাকতে আলি তাঁদের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছেন! অনাধিকার চর্চা করেছেন! বাদশাহর এ যুক্তি শোনার পর আলি রেজা আর কোনো উত্তর দিতে পারেননি।<sup>[১]</sup>

এসব বুদ্ধিবৃত্তিক আসর যুগের চাহিদা অনুযায়ী সমকালীন বিজ্ঞান ও অনুবাদশিল্পের উৎকর্ষে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। পাশাপাশি দরবারের সমাদর পাওয়ায় তা খুব দ্রুত বিস্তৃত ও বিকশিত হয়। ধর্মীয় ও ভাষা-জ্ঞানের ব্যাপারেও একই কথা।

সে সময় বাদশাহ মামুন মুতাযিলাদের মতাদর্শ গ্রহণ করায় তাদের হাতে চলে যায় তৎকালীন জ্ঞান-গবেষণা ও নানাবিধ অনুষ্ঠানের কর্তৃত্ব। সবকিছুতে তাদের সিদ্ধান্তই হয়ে উঠে চূড়ান্ত।<sup>[২]</sup> বাদশাহ মামুনের যোগদান ছিল তাদের মাযহাবের জন্য এক নতুন অধ্যায়। যার ফলে পুরো রাষ্ট্রই তাদের অধীনে চলে যায়। তাদের কথাই বিবেচিত হতে থাকে সবসময়। তারা বাদশাহর ওপর ভরসা করার চেয়ে তর্কশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, বিতর্কের ক্ষমতা ও শক্তিশালী প্রমাণের ওপর বেশি নির্ভর করত। আর যখন তাদের পক্ষের তর্কিক বিতর্ক চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য না থাকার পরও বিরোধী পক্ষের মত অগ্রাহ্য করতে চাইত, তখন তাদের ওপর শাস্তি প্রয়োগ করা হতো। কারণ বাদশাহ মামুনের নীতি ছিল, যুক্তি ও কথায় যে সোজা হয় না, তাকে সোজা করবে সুলতানের ক্ষমতা। আর যেহেতু বিবাদ ও বিতর্কই ছিল মুতাযিলা সম্প্রদায়ের একমাত্র ভরসা, তাই গবেষণা ও বিতর্ক পরিচালনায় তারা কিছু মূলনীতি আবিষ্কার করেছিল।

বর্ণিত আছে: একবার দুজন বক্তা একসঙ্গে হওয়ার পর তাদের একজন

[১] উয়ুনুল আখবার: দ্বিতীয় গ্রন্থ: ৮৪০-১৪১।

[২] আল খিয়াতুল মুতাযিলি: আল ইনতিসার ওয়ার রাদ্দু আলা ইবনির রাওয়ানদি পৃ ৭২।

অপরজনকে বললেন, আপনি কি বিতর্ক করতে প্রস্তুত? অপরজন বললেন, হ্যাঁ! তবে কিছু শর্ত আছে—রাগ করা যাবে না। অহমিকা দেখানো যাবে না। বিশৃঙ্খলা করা যাবে না। গোলযোগ তৈরি করা যাবে না। চূড়ান্ত রায় দেওয়া যাবে না। যতক্ষণ আমি কথা বলব, ততক্ষণ আপনার অন্য কারও দিকে মনোযোগ ফেরানো যাবে না। কোনো দাবিকে প্রমাণ হিসেবে নেওয়া যাবে না। কোনো আয়াতের ব্যাখ্যাকে স্ত্রীয় মতের পক্ষে টেনে নেওয়া যাবে না। যদি নাও, তবে অনুরূপ আমার মতের দিকেও সেটিকে টেনে নেওয়ার অধিকার দিতে হবে। এবং সত্যবাদিতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পরস্পরের পরিচয়কে সম্মান করতে হবে। মিথ্যা থেকে পলায়ন এবং সত্যের পথে আগমনের ইচ্ছা নিয়ে বিতর্ক করতে হবে।<sup>[১]</sup>

বাদশাহ মামুনের শাসনকাল ছিল মুতাযিলা সম্প্রদায়ের দাপট ও বিজয়ের কাল। শিয়া এবং দাহরি সানাভী নাস্তিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে এ সময় তাদের যে ক’টি বড় বাহাস অনুষ্ঠান হয়, অধিকাংশ বিতর্কে তারাই জয়লাভ করে। একবার সালিহ বিন আবদুল কুদ্দুস একজন আলিমের ব্যাপারে মন্তব্য করলেন যে, তিনি ‘আলো ও আঁধার’ এ দুটি আদি বিষয় থেকে এসেছেন। আলো ও আঁধার শুরুতে পৃথক পৃথক থাকলেও পরবর্তী সময় তা একাকার হয়েছে। আবুল হুযাইল আল্লাফের কাছে বিষয়টি যথার্থ মনে হয়নি বিধায় তিনি সালিহ’র সঙ্গে বিতর্কে বসলেন। আবুল হুযাইল প্রশ্ন করলেন, এ দুটো পদার্থ কি একসঙ্গে হয়েছে? নাকি এ ছাড়া আরও কিছু যুক্ত হয়েছে? তিনি বললেন, বরং আমার বক্তব্য হলো, দুটি স্বতন্ত্র পদার্থ একই সময়ে যুক্ত ও পৃথক রূপ হয়, যদি তার মাঝে অন্য কোনো অর্থের মিশ্রণ না থাকে। আর যদি এ দুটি কেবল নিজের অর্থ বহন করে তবে তা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ কথা বলে তিনি কবিতা আবৃত্তি করলেন :

أبا الهذيل جزاك الله من رجل # فأنت حقا لعمرى مفصل جدل

পরবর্তী এক সময় এই সালিহের পুত্র ইন্তেকাল করলে শোকবার্তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আবুল হুযাইল গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন তাঁর সঙ্গে নিজামও ছিলেন। নিজাম তখন অল্পবয়স্ক কিশোর। গিয়ে দেখেন পুত্র বিয়োগের শোকে তিনি মুহ্যমান। এরপর তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনার এই দুশ্চিন্তার কোনো কারণ তো আমি দেখছি না। কেননা আপনার বক্তব্য অনুযায়ী মানুষ হলো মৌসুমি ফসলের মতো। এর উত্তরে সালিহ বললেন, না!

[১] মুহাযারাতুল উদাবা: আসফাহানি: ১: ৪৫।



পুত্র বিয়োগে আমি কাঁদছি না। বরং সে কিতাবুশ শুকুক পড়েনি, তাই কাঁদছি। জিজ্ঞেস করলেন, কিতাবুশ শুকুক কী? উত্তর দিলেন, আমার লেখা একটি গ্রন্থ। কোনো কিছুর অস্তিত্ব নিয়ে যাদের সন্দেহ আছে, এ কিতাব পড়লে তার সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। তার মনে হবে এটির অস্তিত্ব কখনোই ছিল না। আর কোনো অনস্তিত্বের বিষয়ে যাদের সন্দেহ আছে, এ কিতাব পড়লে তার সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। তার মনে হবে এটি সবসময় অস্তিত্বে ছিল। তখন আবুল হুযাইল বললেন, তাহলে এবার আপনি আপনার মৃত পুত্রের ব্যাপারে সন্দেহ করুন। আর এভাবে মনে মনে ভাবুন যে সে মরেনি; যদিও সে মারা গেছে। অপরদিকে সন্দেহ করুন যে সে বইটি পড়েছে; যদিও বাস্তবে তা পড়েনি।<sup>[১]</sup>

তাঁর বিখ্যাত আল-ইত্তিসারু ওয়ার রাদ্দু আলা ইবনির রাওয়ান্দি গ্রন্থটি এ রকম চমৎকার সব আসর ও শিক্ষণীয় বিতর্ক অনুষ্ঠানের বিবরণে ভরপুর। সেগুলোতে সবসময় জয়লাভ করত মুতায়িলা সম্প্রদায়।<sup>[২]</sup> মুতায়িলাদের অনেক লোক গ্রিক দর্শন থেকে তাদের মতাদর্শের উপযোগী ও বিরোধী পক্ষের ওপর বিজয় লাভে সহায়ক নানা উপকরণ গ্রহণ করত। আবুল হুযাইল আল্লাফ ও ইবরাহিম নিজামও তাই করেন। তা ছাড়া ভুলত্রুটি ও দুর্বলতার দিকগুলো খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী নিজেদের প্রস্তুত করতে অন্যান্য মাযহাব ও মতাদর্শ নিয়েও তারা প্রচুর গবেষণা করেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিতি পান ওয়াসিল বিন আতা। ওয়াসিল সম্পর্কে আমার বিন উবাইদ বলেন, শিয়াদের ভ্রান্তি, খারিজিদের বিচ্যুতি, যিনদিক, দাহরি, মুরজিআ-সহ সকল বিরোধী সম্প্রদায়ের বক্তব্য ও তাদের দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে ওয়াসিলের চেয়ে বেশি আর কেউ জানত না।<sup>[৩]</sup>

বাদশাহ মামুনের যুগে সবচেয়ে বিতর্কিত ও স্পর্শকাতর বিষয় ছিল খালকুল কুরআনের মাসআলা। বাদশাহ মামুন এ ব্যাপারে মুতায়িলা সম্প্রদায়ের মতাদর্শ গ্রহণ করেন। সাধারণ মুসলমানদের জন্য এখানে যে-কোনো একটি মত বেছে নেওয়ার সুযোগ রাখা হয়নি। যারা খালকুল কুরআনে বিশ্বাসী নয়, তাদের ধর্ম-বিশুদ্ধতা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ছিল বিতর্কের মাধ্যমে বিরোধীপক্ষের লোকদের হারিয়ে দেওয়া। তা ছাড়া এই স্পর্শকাতর বিষয়ে তিনি প্রচুর সভা-সমাবেশ ও বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সাহিত্য ও ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে এসব বিতর্ক অনুষ্ঠানে হওয়া কিছু

[১] আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আল মুরতাযা: আল মুনিয়া ওয়াল আমাল পৃ ২৭।

[২] এগুলো পড়তে চোখ রাখুন উক্ত গ্রন্থের পৃষ্ঠা: ৩০-৩৬, ১৪৪-১৫২।

[৩] আল মুনিয়া ওয়াল আমাল: পৃ ১৮।

সংলাপের নমুনা পাওয়া যায়।<sup>[১]</sup> এই বিতর্ক শুধু মামুন নয়; তাঁর পরবর্তী মুতাসিম, ওয়াসিকের পুরো শাসনামল এবং মুতাওয়াক্কিল-যুগের প্রথম ভাগ পর্যন্ত চালু ছিল।<sup>[২]</sup>

## ❖ বাদশাহ মামুনের পরবর্তী যুগ

এবার আসুন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের সারথি বাদশাহ মামুনের শাসন থেকে পরবর্তী অন্যান্য আমলের আলোচনায়। বাদশাহ ওয়াসিক বিল্লাহর সময়ে এক বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কবি হিসেবে আবুল আতাহিয়া নাকি আবু নাওয়াস সেরা—এ নিয়ে তখন বিতর্কে বসেন মুখারিক ও হুসাইন বিন দাহহাক। যে হারবে, তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গুনতে হবে। এমন বাজিই ধরেন তারা। উক্ত কবিদের দুটি কবিতাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক করবেন বলে উভয়ে একমত হন। হুসাইন বিন দাহহাক আগে থেকেই আবু নাওয়াসের কবিতা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখতেন। তাই তিনি উঁচু মানের একটি কবিতা উপস্থাপন করলেন। অপরদিকে কবি আবুল আতাহিয়ার কবিতা সম্পর্কে খুব বেশি জ্ঞান রাখতেন না মুখারিক। তবে তাকে ভালো লাগত বলে তিনি তার পক্ষ নিয়েছিলেন। মুখারিকের বলা কবিতাটি ছিল তুলনামূলক দুর্বল ও প্রণয়সুলভ।

বাদশাহ ওয়াসিক বিল্লাহ এ দুজন থেকে কার কবিতাটি সেরা—তা নির্ণয় করতে আবু মিহলামকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেন। আবু মিহলাম সেরা হিসেবে অভিহিত করেন হুসাইন বিন দাহহাকের বলা কবিতাটি। তখন মুখারিক বললেন, ওরকম কাব্যজ্ঞান নেই বলে আমি খুব ভালো কবিতা নির্বাচন করতে পারিনি। এরচেয়ে আরও ভালো ও উৎকৃষ্ট কবিতা আবুল আতাহিয়ার আছে। হুসাইন বিন দাহহাকের কাব্যজ্ঞান বেশি থাকায় তিনি আবু নাওয়াসের কবিতা বলেই বিজয়ী হয়ে যাবেন, এটা হবে না। বরং আমরা দুজন কবিদের ব্যক্তিসত্তা নিয়ে বিতর্ক করব। এরপর ব্যক্তিসত্তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হলে আবু মিহলাম কবি আবু নাওয়াসের ব্যক্তিত্বকেই বিজয়ী ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, আবু নাওয়াসই সেরা কবি। তাঁর কাব্যজ্ঞান অধিক শ্রেষ্ঠ। তাঁর কাব্যপ্রতিভা অনন্য। এরপর বাদশাহ ওয়াসিক বিজয়ী হিসেবে হুসাইন বিন দাহহাককে পুরস্কার প্রদানের নির্দেশ দিলেন। মুখারিক পরাজয় বরণ করলেন।<sup>[৩]</sup>

[১] দেখুন তাবাকাতুশ শাফিয়িয়া: ১: ২০৫-২১৫।

[২] খালকুল কুরআনের ফিতনার ব্যাপ্তি ছিল ২১৮ -২৩৪ হিজরী।

[৩] আল আগানী: ৬: ১৮৬।



বাদশাহ ওয়াসিক বিল্লাহর ইস্তিকালের মধ্য দিয়ে বলিষ্ঠ, দাপুটে ও প্রভাবশালী শাসকদের যুগের সমাপ্তি ঘটে। শুরু হয় রাজনৈতিক ভাঙন ও অধঃপতনের আমল। তবে সে আমলেও সেনাপতি, আমির উমরা ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা লালন করতেন। জ্ঞানের বিকাশ, শাস্ত্র চর্চা এবং পূর্ববর্তী খলিফাদের আদলে নানা অনুষ্ঠান আয়োজনের মাঝেই তারা বেশি স্বাদ অনুভব করতেন। তাই আমরা বলতে পারি, একদিকে যেমন মুসলিম বিশ্বে রাজনৈতিকভাবে পতনের ঢেউ চলছিল। অপরদিকে চলছিল জ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন। একদিকে ক্রমেই ইসলামি বিশ্বের রাজধানী হচ্ছিল দুর্বল ও জরাগ্রস্ত। অন্যদিকে ক্রমেই বাগদাদের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল মুসলিম বিশ্বের একাধিক রাজধানী।

খোদা বখশ লেখেন : 'ইসলামি সাম্রাজ্য থেকে পূর্ণ স্বাধীন হওয়া বা আধা স্বাধীনতা পাওয়া অঞ্চলগুলোতে স্থানীয়ভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল নানা রাজবংশ ও শাসক শ্রেণি। তারা অঞ্চলভেদে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তার ধারক বাহকদের যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরস্পর পাল্লা দিয়ে এগোচ্ছিলেন। এভাবেই নানা ভূখণ্ডের নবজন্মা রাজধানীগুলোর রাজকীয় প্রাসাদসমূহ হয়ে ওঠে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার প্রাণকেন্দ্র।'<sup>[১]</sup> 'সেসব রাজপ্রাসাদ ও তাতে অনুষ্ঠিত জ্ঞানের মজলিসসমূহ শিক্ষাবিস্তার ও জ্ঞানচর্চায় হাল আমলের ইউনিভার্সিটির ভূমিকা পালন করত।'<sup>[২]</sup>

### ✽ জ্ঞানচর্চার বাদশাহি মজলিস

সবগুলো রাজধানীর আলোচনা করলে এবং সবক'টি প্রাসাদের ভূমিকা নিয়ে লিখলে গ্রন্থের কলেবর অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। এখানে শুধু কয়েকটি উদাহরণ লিখে দিচ্ছি :

আল-ইমতাউ ওয়াল মুআনাসা গ্রন্থে<sup>[৩]</sup> আবু হাইয়ান আত-তাওহিদি লেখেন : ৩২৬ হিজরিতে উজির (আবুল ফযল জাফর) ইবনুল ফুরাতের দরবারে একবার বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাতে উপস্থিত ছিলেন আবু সাইদ সাইরাফি, খালিদি, ইবনুল আখশাদ, কিতবী, ইবনু আবি বিশর, ইবনু রাবাহ, ইবনু কাব, কুদামা বিন জাফর, যুহদী, আলি ইবনু ইসা জাররাহ, ইবনু ফিরাস, ইবনু রুশাইদ, ইবনু আবদিল আযিয আল-হাশিমি, ইবনু ইয়াহইয়া

[১] Contribution to the History of Islamic Civilization p. ১৮৪।

[২] যাহকুল ইসলাম: ২৮৭।

[৩] বগু ১: পৃ ১০৮-১২৮।

আলভী, আবু বিশর মাতা, মিশর থেকে আগত ইবনু তাগাজের দূত এবং আলে সামানের সাথি মারযুবানী। উজির ইবনুল ফুরাত বললেন, যুক্তিবিদ্যায় মাতার সঙ্গে বিতর্ক করার মতো কেউ আছে এখানে? কারণ মাতার বক্তব্য হচ্ছে, যুক্তিবিদ্যা (ইলমুল মানতিক) ছাড়া হক-বাতির তারতম্য করা সম্ভব না। ভালো ও মন্দের মাঝে তফাত বোঝা যাবে না। প্রমাণকে সন্দেহ থেকে মুক্ত করা যাবে না। আর নির্দিষ্ট করা থেকে সন্দেহ দূর করা যাবে না।

এ কথা শুনে উপস্থিত সবাই নীরব হয়ে গেলেন। উজির ইবনুল ফুরাত বললেন, আল্লাহর কসম! আমি জানি মাতার সঙ্গে যুক্তি-বিনিময় ও বিতর্ক করার মতো যোগ্য লোক এখানে উপস্থিত আছেন। আমি আপনাদের প্রত্যেককে জ্ঞানের সমুদ্র মনে করি। তখন সাইরাফি বললেন, উজির মহোদয়, ক্ষমা করবেন! বক্ষে সংরক্ষিত জ্ঞান এবং এ মজলিসে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ও শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের সামনে উপস্থাপিত জ্ঞান এক রকম নয়। তখন ইবনুল ফুরাত বললেন, আপনিই পারবেন আবু সাইদ! আপনার অজুহাত পেশ করার অর্থই হলো আপনি নিজের ওপর বিজয়ী হয়েছেন। এবার সবার পক্ষ হয়ে আপনার বিজয় অর্জনের পালা। উজির মহোদয়ের অনুরোধে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন আবু সাইদ। এরপর সেখানে অনেক তাত্ত্বিক ও স্মরণীয় সংলাপ চলতে থাকে। সবগুলো সংলাপই আবু হাইয়ান তাওহিদি উল্লেখ করেছেন। একপর্যায়ে সেখানে আলোচিত শাখাগত একটি বিষয় আমি তুলে ধরতে চাই।

আবু সাইদ : زيد أفضل الإخوة এ বাক্য নিয়ে আপনার কী মন্তব্য?

মাতা : সঠিক বাক্য।

আবু সাইদ : আর যদি বলি زيد أفضل إخوته ?

মাতা : এটাও সঠিক!

আবু সাইদ : তাহলে বিশুদ্ধতা সত্ত্বেও এ দুটির মাঝে কী পার্থক্য?

এ প্রশ্ন শুনে মাতার চক্ষু চড়কগাছ। তিনি নিরুত্তর হয়ে গেলেন।

আবু সাইদ : আপনি না-বুঝে, অনুধাবন না-করে উত্তর দিয়েছেন। প্রথম বাক্যের ব্যাপারে আপনার দেওয়া উত্তর সঠিক হলেও কী কারণে সঠিক, তা আপনার জানা নেই। আর দ্বিতীয় বাক্যের ব্যাপারে আপনার উত্তর সঠিক নয়। তবে কী কারণে তা সঠিক নয়, সেটিও আপনার জানা নেই।

মাতা : তাহলে আপনিই বলে দিন!

আবু সাইদ : এটা পাঠশালা নয়। আপনি আমার ক্লাসে বসলে সেখান



থেকে জেনে নিতে পারবেন।

উজির ইবনুল ফুরাত : এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করে আমাদের জানিয়ে দিন। তাহলে সবাই একসঙ্গে উপকৃত হতে পারবে।

আবু সাইদ : زيد أفضل الإخوة বাক্যটি সঠিক। কারণ যাইদ আপন ভাইদের অন্যতম এবং তাদেরই একজন। ঠিক مارك أفره الحميم বাক্যের মতো। কিন্তু আপনি زيد أفضل إخوته বললে সেটি ভুল হবে। কারণ (তৃতীয় পক্ষ হিসেবে) যাইদ তার ভাইদের মধ্যে অন্যতম নয়। এ যেন ঠিক حمارك أفره البغال বাক্যের মতো।

সাহিত্য আসরের ইতিহাসে আরও একটি মজলিস ছিল খুব তাৎপর্যপূর্ণ। সেটি বুওয়াইহ রাজবংশের অন্যতম শাসক শামসামুদৌলার (মৃত্যু : ৩৭৫ হিজরি) উজির আবু আবদুল্লাহ হুসাইন বিন সাদানের মজলিস। একবার আবু হাইয়ান তাওহিদিকে নিজের মজলিসে সন্ধ্যা যাপনের অনুরোধ করেন ইবনু সাদান। এই অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিদিন তিনি রাজদরবারে হাজির হতেন। মানুষের জীবন, রূহের সুরূপ, সমকালীন মনীষীদের কীর্তি, অন্যান্য জাতির তুলনায় আরব-জাতির ভূমিকা ও অবদান, প্রভৃতি বিষয়ে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা ও মতবিনিময় হতো। বাদশাহ ও তার রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী করতে পত্র-লেখক বেশি সহায়ক নাকি হিসাবরক্ষক—এ নিয়ে কথাবার্তা হতো। যুক্তিবিদ্যার তুলনায় ভাষাজ্ঞান ও ব্যাকরণশাস্ত্র বেশি উপকারী, এ নিয়েও চলত তুমুল বিতর্ক।<sup>[১]</sup>

এই বিদ্যানুরাগী উজিরের মজলিস সবসময় সমকালীন বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের দ্বারা ভরপুর থাকত। যাদের মধ্যে ছিলেন আবু হাইয়ান, খ্রিস্টান দার্শনিক আবু যুরআ, তাহযিবুল আখলাক ওয়া তাজারিবুল উমাম গ্রন্থকার ইবনু মাসকুওয়াই, আবুল ওয়াফা মুহানদিস-সহ আরও অনেকে। এতসব বিদ্বান ও মনীষীকে কাছে পেয়ে মুহাল্লাবি, ইবনুল আমিদ, সাহিব ইবনু আব্বাদের মতো সমসাময়িক অন্যান্য উজিরের ওপর বেশ গর্ববোধ করতেন ইবনু সাদান। প্রায়ই তিনি বলতেন : বিশৃঙ্খলে আমার এই জ্ঞানসংঘের কোনো তুলনা হবে না। মুহাল্লাবির সঙ্গী সবাই মিলেও আমার একজন সঙ্গীর সমান হতে পারবে না। ইবনুল আমিদের সঙ্গীরা আমার সঙ্গীদের ন্যূনতম একজনকে হলেও কাছে পেতে উৎসুক থাকে। আর ইবনু আব্বাদের কথা আর কী বলব! তার আশপাশে

[১] Von Grunebaum: The journal of General Education vol. IV October ১৯৪৯।

যারা থাকে তারা সবসময় ঝগড়া-বিবাদ উসকে দেয়। শুধু শুধু হৈ-ছল্লোড় করে বেড়ায়।<sup>[১]</sup>

আবু হাইয়ানকে এসব আসরের ভালো-মন্দ, গোপনীয়-প্রকাশ্য ও রস-রসিকতাগুলো একত্র করার অনুরোধ করেন আবুল ওয়াফা মুহানদিস। আবু হাইয়ান তার অনুরোধ রক্ষার্থে যে গ্রন্থটি রচনা করেন, সেটিই তাঁর বিখ্যাত আল-ইমতাউ ওয়াল মুআনাস গ্রন্থ।<sup>[২]</sup> এসব সাহিত্য সংলাপের চমৎকার সব বিবরণে ভরপুর এ গ্রন্থ। বইটি যারা অধ্যয়ন করবে, তারা একদিকে যেমন এসব মূল্যবান বৈঠক থেকে নানা চিন্তা-ভাবনার খোরাক পাবে, অন্যদিকে পাবে বিস্ময়কর সব বিতর্কের ঘটনা। উজির ইবনুল ফুরাতের দরবারে আবু সাইদ সাইরাফি ও মাত্তার মাঝে সংঘটিত এমনই এক বিতর্কের ঘটনা একটু আগেই আমরা উল্লেখ করেছি।

এখানে আরও একটি প্রাসাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। সেই প্রাসাদের মহান কীর্তির ব্যাপারে বিখ্যাত কবি মুতানাব্বি ছাড়া কেউ যদি কথা নাও বলত, তবুও তার অমরত্ব ও উচ্চ মর্যাদা কমত না একটুখানি। সেটি হলো সাইফুদ্দৌলা হামদানির প্রাসাদ। জ্ঞানচর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এ প্রাসাদ সম্পর্কে প্রফেসর গিব বলেন, এরপর কয়েক বছরের জন্য আরবি সাহিত্যের প্রবাহ স্থানান্তরিত হয় উত্তর সিরিয়ায়। শিয়া মতাদর্শী হামদানি সাম্রাজ্যের রাজধানী আলেপ্পো হয়ে ওঠে আরবি সাহিত্যের প্রধান বিচরণস্থল। সাইফুদ্দৌলা তার এ ছোট্ট সাম্রাজ্যে নানান জ্ঞান-বিজ্ঞানের পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞদের একত্র করতে সক্ষম হন। তারা সবাই ছিলেন বিশেষ বিশেষ জ্ঞানে যুগের দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী। বাদশাহ সাইফুদ্দৌলার পৃষ্ঠপোষণ ও সমাদর দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিল সমকালীন সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী ও মনীষীদের। এভাবেই ছোট্ট এ সাম্রাজ্যের সুনাম ও সুখ্যাতি ইতিহাসের পাতায় তারা অমর করেছেন।<sup>[৩]</sup>

গয়নভী শাসকদের রাজপ্রাসাদগুলোর আলোচনা করতে গিয়ে নিকলসন লেখেন: মেধা ও প্রতিভার খুব মূল্যায়ন করতেন বিখ্যাত শাসক মাহমুদ গয়নভী। তাই তো তাঁর রাজপ্রাসাদ হয়ে ওঠে সমকালীন সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার প্রাণকেন্দ্র। সেখানে সমবেত হতেন যুগের খ্যাতিমান জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ।<sup>[৪]</sup>

[১] রিসালাতুস সদাকা ওয়াস সাদীক পৃ: ৩।

[২] আল ইমতাউ ওয়াল মুআনাস পৃ ৭।

[৩] Gibb, Arabic Literature p, ৬১।

[৪] Nicholson, A Literary History of the Arabs p, ২৬৯।



মাহমুদ গযনভীর বিদ্বান সাথিসঙ্গীর বিবরণ দিতে গিয়ে ফিলিপ হিটি লেখেন : যেসব মহামনীষীর উপস্থিতি মাহমুদ গযনভীর রাজদরবারকে সুশোভিত করেছিল, তাদের মাঝে বিখ্যাত হলেন—আরবি ইতিহাসবিদ উতবী, সুপ্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান লেখক আলবিরুনী এবং বিখ্যাত পারসিক কবি ফেরদৌসী।<sup>[১]</sup>

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ বদরুদ্দীন আইনী লেখেন : সুলতান মাহমুদ গযনভী জ্ঞান ও জ্ঞানীদের খুব পছন্দ করতেন, তাদের সীমহীন মূল্যায়ন করতেন, তাদেরকে সবসময় কাছে ডাকতেন, তাদেরকে নানাভাবে পুরস্কৃত করতেন। সুলতানের সামনেই অনেক ঐতিহাসিক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।<sup>[২]</sup>

বাগদাদ ও ইসলামি বিশ্বের অধিকাংশ এলাকা যখন সেলজুকদের নিয়ন্ত্রণে, তখন বিখ্যাত উজির নিজামুল মুলকের আবির্ভাব ঘটে। তিনি নিজে ফকিহ ও বিদ্বান ছিলেন।<sup>[৩]</sup> তাঁর সামনে অনেক বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো। একবার তাঁর সামনে ইমাম গাযালি অন্যান্য জ্ঞানী ও পণ্ডিতের সঙ্গে বিতর্ক করে তাদের পরাজিত করেন। তাঁর মতামতকে সবার মতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর জ্ঞান-প্রাচুর্যে মুগ্ধ হয়ে নিজামুল মুলক তাঁকে বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসায় অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেন।<sup>[৪]</sup> তা ছাড়া সুলতান নিজামুল মুলকের সামনে আবু ইসহাক শিরাজি এবং ইমামুল হারামাইন আবুল মালী জুওয়াইনির মাঝেও অনেক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।<sup>[৫]</sup>

এরপর সেলজুক সাম্রাজ্য ভেঙে গিয়ে আতাবেক ও শাহী রাজবংশের আবির্ভাব ঘটে। তখন সিরিয়ার অধিপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া নুরুদ্দিন জেনগির দরবারেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরাট সমাদর ছিল। বিশাল বিশাল জ্ঞানের মজলিস আয়োজন করা হতো। গবেষণা ও আলোচনার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে নিয়ে আসা হতো প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞজনদের।<sup>[৬]</sup>

এবার মিশর নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। তলুনি রাজবংশের শাসনামলে মিশরের রাজপ্রাসাদগুলোতে সাহিত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন শুরু হয়। আরবদের অধীনে আসার পর স্বাধীনভাবে মিশর শাসন করা প্রথম রাজবংশ হলো তলুনি রাজবংশ। ইবনু য়ুলামা লেখেন : তলুনি ও ইখশিদি রাজবংশের শাসনামলে

[১] History of the Arabs p. ৪৬৫।

[২] ইকদুল জুমান: ১৬: ২৯৭ (হস্তলিখিত)।

[৩] তাবাকাতুশ শাফিয়িয়া: ৩: ১৩৫-১৪৫।

[৪] আল ইহয়া: ১: ৩।

[৫] ইবনুল আসির ১০: ৮১।

[৬] মুফাররিজুল কুরব: ১৬৫ (হস্তলিখিত)।

স্বতন্ত্র কোনো বিদ্যালয় ছিল না। তখন আমির উমরা, উজির ও মনীষীদের প্রাসাদেই পাঠদান সম্পন্ন হতো।<sup>[১]</sup>

ইখশিদি শাসকদের প্রাসাদে রোজ সন্ধ্যায় ইতিহাস নিয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনা হতো। বিখ্যাত ইখশিদি শাসক আবুল মিস্ক কাফুর এই প্রাসাদেই বেড়ে ওঠেন। এরপর তার পদোন্নতি হয়। শেষ পর্যন্ত ইখশিদি তাকে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত করেন...<sup>[২]</sup> ক্ষমতা গ্রহণ করার পর কাফুর কবিদের মূল্যায়ন করেন। নানা হাদিয়া-তৌহফা দিয়ে তাদের সম্মানিত করেন। প্রতি রাতে তার দরবারে উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসকদের ইতিহাস ও শিক্ষণীয় ঘটনাসমগ্র পাঠ করা হতো।<sup>[৩]</sup> এভাবেই কাফুর হয়ে ওঠেন জ্ঞান ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সংরক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কথা হলো, বিশ্বকবি মুতানাব্বিও তার আসর অলংকৃত করতেন।

যাই হোক, ফাতিমি রাজবংশের বিখ্যাত মজলিসগুলোর সামনে তলুনি ও ইখশিদিদের মজলিসগুলো খুবই জীর্ণ ও দুর্বল দেখা যায়। সৈয়দ আমির আলি লেখেন : ফাতিমি শাসকগণ প্রায়ই উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। তাতে উপস্থিত হতেন বায়তুল হিকমার প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ। বৈশিষ্ট্য ও বিশেষজ্ঞতার বিচারে তাদেরকে নানা ভাগে ভাগ করা হতো। যুক্তি ও বিতর্কে পারদর্শীদগণ একদিকে, ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণ অপরদিকে, গণিতশাস্ত্রের অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ অন্যদিকে, চিকিৎসাবিদগণ আরেকদিকে.. এভাবে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তারা বসতেন। বর্তমান সময়ে ইউনিভার্সিটির স্কলারগণ যে ধরনের বিশেষ পোশাক পরেন, তাঁরাও বিশেষ পোশাক পরে সেসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতেন।<sup>[৪]</sup>

ইয়াকুব বিন কালিস সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার তার বাড়িতে জ্ঞানের মজলিস আয়োজন করতেন। সেখানে প্রাজ্ঞ, সাহিত্যিক, ফকিহ ও বিচারকদের জড়ো করতেন। তাদের মাঝে নানা বিষয়ে আলোচনা, মত বিনিময় ও বিতর্ক চলত। এরপর তাদেরকে নানাভাবে পুরস্কৃত করা হতো।<sup>[৫]</sup>

৪০৩ হিজরিতে একবার দারুল ইলম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একদল যুক্তিবিদ ও গণিতবিদ, একদল ফকিহ (যাদের মধ্যে আবদুল গনি বিন সাইদও ছিলেন),

[১] আখবারু সিবাওয়াই আল মিশরী: ১৯।

[২] ইবনু খাল্লিকান ১: ৬১৪।

[৩] ইবনু তাগরি বারদি: আন নুজুমুয যাহিরাহ: ৪: ৬।

[৪] A Short History of the Saracens p. ৬১৪।

[৫] আলমাকরিযি: আল-খুতাত ২: ৩৪১।



একদল চিকিৎসাবিদকে বিখ্যাত ফাতিমি শাসক হাকিম বিন আমরিল্লাহর কাছে উপস্থিত করা হয়। তারা সবাই শাসকের সামনে বিতর্ক করার জন্য আগমন করেন। এরপর পৃথক পৃথক ভাবে আবদুল গনি সব দলের সঙ্গে বিতর্ক করেন।<sup>[১]</sup>

প্রকৃত ক্ষমতা যখন ফাতিমিদের কাছ থেকে প্রতাপশালী উজিরদের হাতে চলে যায়, তখন উজিরগণও খলিফাদের থেকে কোনো অংশে কম যাননি। আল-মালিকুস সালিহ উপাধিতে ভূষিত তালাই বিন রুযাইকের প্রাসাদে তৎকালীন বড় বড় সাহিত্যিকের আড্ডা হতো। যাদের মধ্যে কাযি জালিস আবুল মাআলি আবদুল আযিয ইবনু হুবাব, মুওয়াফফিক ইবনুল হালাল, ইবনু কাদুস, মুহাযযাব ইবনুয যুবাইর প্রমুখ মনীষী অন্যতম। উমারা ইয়েমেনি লেখেন: এক্ষেত্রে যারাই শাসক হিসেবে এসেছেন, সবাই তাত্ত্বিক, মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে প্রচুর অবদান রেখেছেন। এখনো আমি তাদের রীতি অনুসরণ করে চলেছি। তাদের রেখে যাওয়া অভিজ্ঞতার আলোকে কাজ করে চলেছি।<sup>[২]</sup> ইবনু তাগরি বারদি লেখেন: আল-মালিকুস সালিহ'র দরবারে প্রতি রাতেই নামকরা লেখকদের উপস্থিতিতে সাহিত্য-আড্ডা হতো। তিনি নিজেই সেখানে কবিতা রচনা করতেন। তার কাব্য প্রতিভা দেখে লোকেরা অবাক হয়ে যেত।<sup>[৩]</sup>

অপরদিকে আইয়ুবি রাজবংশের শাসকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন প্রাজ্ঞ ও দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী। জ্ঞানে-গুণে ও মান-মর্যাদায় তারা বেশ অগ্রগামী ছিলেন। তাদের মধ্যে দামিশক ও ফিলিস্তিন অঞ্চলের শাসক আল-মালিকুল মুআযযাম এবং বিখ্যাত উজির কাযি ফাদিল অন্যতম। তারাও নিজ নিজ অঙ্গনে গুরুত্বের সাথে সাহিত্যের আসর ও নানা বুদ্ধিবৃত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। কাযি ফাদিলের দরবারে সবসময় তাজুদ্দিন কিনদি, ফারাখশাহ বিন শাহানশাহর মতো নামিদামি বিদ্বানদের আনাগোনা থাকত। এ রকম এক বৈঠকে তাজুদ্দিনের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে ফারাখশাহ তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। এটিই ছিল সেই বৈঠকের সবচেয়ে সুন্দর দিক।<sup>[৪]</sup>

মামলুক রাজবংশের শাসনামলেও এসব সাহিত্যের আসর বেশ দ্যুতি ছড়িয়েছে। সেগুলোর কোনো উদাহরণ এখানে টানার প্রয়োজন বোধ করছি না। শুধু এতটুকু বলব যে, ড. আবদুল ওয়াহাব আযযাম তাদের ঐতিহাসিক কীর্তিকলাপ নিয়ে একটি সুতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম মাজালিসুস

[১] আল-খুতাত: ১: ৪৫৯।

[২] আন নুকাতুল আসরিয়া: পৃ ৩৫।

[৩] আন নুজুমুয যাহিরাহ: ৫: ৩১৩।

[৪] মাহমুদ দিহান: আল মাকসুরাতুন নাজিয়া: পৃ ১১।

সুলতান আলগুরি।<sup>[১]</sup>

## ৭. মরুর পাঠশালা

জাহিলিয়াতের যুগে সাহিত্যের কবিতা, প্রবন্ধ ও বক্তৃতাকে কেন্দ্র করেই আরব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। কোনো ব্যক্তি রোমাঞ্চকর কবি, শক্তিমান প্রাবন্ধিক বা জ্বালাময়ী বক্তা হলেই তাকে সভ্য ও সুশিক্ষিত হিসেবে গণ্য করা হতো। মানুষের আবেগ নিয়ে খেলার প্রধান হাতিয়ার ছিল পাণ্ডিত্যপূর্ণ কবিতা। এসব উদ্দীপনামূলক কবিতা ও জ্বালাময়ী বক্তব্য দিয়ে মানুষকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তোলা হতো। তা ছাড়া সন্ধি-চুক্তি বা যুদ্ধ-বিরতির জন্যও আবেগপূর্ণ ভাষায় ক্ষমা ও ভ্রাতৃত্বের আহ্বান জানিয়ে রচনা করা হতো কবিতা। জাহিলিয়াত থেকে চলে আসা আরবের এই সাহিত্যানুরাগ ও কাব্যপ্রীতি ইসলাম আগমনের পর আরও পরিপক্ব রূপ ধারণ করে। কারণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ছিলেন আরবি। মহান আল্লাহ তাঁর ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য দিয়েছিলেন। এরপর কুরআনুল কারীম হলো আরবি অলংকার-শাস্ত্রের সর্বোচ্চ স্তরের ঐশী গ্রন্থ।

## ❖ বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশ

ইসলামের সূচনাকাল পর্যন্ত আরবি ভাষা ছিল খাঁটি, নির্জলা ও নির্ভেজাল। অন্য কোনো ভাষার সংমিশ্রণ তাতে ছিল না। তবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অনারবদের সঙ্গে যোগাযোগের কারণে কিছু কিছু অনারবি শব্দ ঢুকে পড়ে। তা ছিল নিতান্তই সামান্য। এসব বিদেশী শব্দের ব্যবহার ছিল আরবির মতো একটি সমৃদ্ধ ভাষার জন্য চরম লজ্জাজনক। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে একবার এক লোক ভুল শব্দ উচ্চারণ করলে তিনি সাহাবীদের বলেন, ‘তোমাদের ভাইকে সোজা পথ দেখাও। সে তো ভুল পথ ধরেছে।’

খলিফা উমর ইবনুল খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে অনারবদের সঙ্গে আরবদের ওঠাবসা বেড়ে যায়। কারণ, বিশ্বব্যাপী তখন ইসলামের বিজয় নিশান উড়ছিল। পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য চলে এসেছিল ইসলামের অধীনে। মুসলিম সেনাদল ছিলেন আরবিভাষী। কাজেই তাদের বিজয় মানে আরবি ভাষার বিজয়। এরপর ইসলামি সাম্রাজ্যের রাজধানীগুলো (প্রথমে মদিনা, এরপর দামিশক, এরপর বাগদাদ) হয়ে ওঠে সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রস্থল। সভ্যতা

[১] কায়রোর লাজনাতুত তালিফ থেকে প্রকাশিত ১৯৪১।



বিকাশের প্রাণকেন্দ্র। নানা জাতি-ধর্ম-বর্ণের মানুষ তাতে জড়ো হতে থাকে। কুফা ও বসরার মতো আরবি নগরে প্রচুর বিদেশী মানুষের আগমন ঘটে। বিশেষ করে ইরানী লোকেরা যুদ্ধবন্দী হয়ে এসে পরবর্তী কালে ইসলাম গ্রহণ করে।<sup>[১]</sup> তা ছাড়া আরবের লোকেরা তখন প্রচুর বিদেশী নারীদের বিয়ে করতে শুরু করে। হজের মৌসুমে নানা দেশ থেকে নওমুসলিমগণ আসতে থাকে আরবের। স্বাভাবিকভাবেই, ঘরে-বাইরে, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-রাজধানীতে অথবা হজের মৌসুমে—সর্বত্র প্রধান ভাষা ছিল আরবি। তবে কথা বলার সময় অনারব লোকেরা আরবি ভাষার সেই মান ও ব্যাকরণশৈলী রক্ষা করতে পারেনি। সঠিক ইরাব দিয়ে বাক্য ব্যবহার করতে সক্ষম হয়নি। এর ফলে আরবি ভাষা কলুষিত হয়ে নতুন এক ভাষার জন্ম নেয়। জাহিয় সে ভাষার নাম দেন নবজন্মা লোকদের ভাষা বা শহুরে ভাষা।<sup>[২]</sup> ভাষার এ ভুল ব্যবহার কেবল অনারবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, খোদ আরবদের মুখেও সেই ভুলের প্রচার হতে থাকে।

ভুলের সয়লাভ সত্ত্বেও আরবের লোকেরা ভুল ব্যবহারকে চরমভাবে ঘৃণা করত। নিজেদের জাতিসত্তার প্রতি চরম অপমানজনক মনে করত। বর্ণিত আছে, আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর একজন পত্র-লেখক ভুলে من أبو موسى লিখে ফেলে। এর জবাবে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু লেখেন : আমার প্রথম নির্দেশ হলো, তুমি তোমার পত্র-লেখককে চাবুক দিয়ে একটি আঘাত করবে।<sup>[৩]</sup> একবার এক বেদুইন বাজারে ঢুকে মানুষকে ভুল বাক্য ব্যবহার করতে শুনে বলল, সুবহানাল্লাহ! এরা ভুল বাক্য ব্যবহার করে লাভজনক ব্যবসা করছে। কিন্তু আমরা ভুল বাক্য ব্যবহারও করতে পারি না, লাভও করতে পারি না।<sup>[৪]</sup>

এমন আরও অনেক ঘটনা আছে। গ্রন্থের কলেবর দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার ভয়ে এখানে তা উল্লেখ করছি না।<sup>[৫]</sup> এরপর এসব ভুল যখন সাধারণ লোকদের গণ্ডি পেরিয়ে বিশেষ লোকদের ঘায়েল করতে থাকে, তখনি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি এসব ভুল থেকে রক্ষা পাননি বিখ্যাত শাসক ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, বিখ্যাত ফকিহ আবু হানিফা আন-

[১] Wellhausen: Arab Kingdom and its Fall P. ৭১।

[২] আল বায়ান: ১: ৬৮।

[৩] আল বায়ান: ৪, ১৩১১ হিজরী সনের ছাপা।

[৪] ইবনু কুতাইবা: উয়ুনুল আখবার ২: ১৫৯, ইবনু আবদিল বার: আদাবুল মুজালাসা (হস্তলিখিত) ৫৫।

[৫] দেখুন: আল বায়ান ২: ৫, ৬ ইবনু কুতাইবা, উয়ুনুল আখবার: ২: ১৫৮, ইবনু আবদিল বার: আদাবুল মুজালাসা: ৫৫, আল ইকদুল ফারিদ ২: ১৮।

নুমান, বিশর মুরাইসি, শাবিব বিন শাইবাসহ অনেক খলিফা ও মহান ব্যক্তিত্ব।<sup>[১]</sup> এ উদ্বিগ্ন আরও ভয়ানক রূপ লাভ করে, যখন এসব ভুল উচ্চারণ কুরআনুল কারীমের আয়াতের মাঝেও শুরু হয়। ইচ্ছাকৃত এ ভুল পাঠককে কুফুরি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। যেমন কুরআনের এ আয়াতে :

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

| তিনিই আল্লাহ তাআলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা।<sup>[২]</sup>

এখানে জনৈক পাঠক مصور শব্দের واو -তে যেরের পরিবর্তে ভুলে যবর দিয়ে পড়ে ফেলেন। যার অর্থ দাঁড়ায় : তিনিই আল্লাহ তাআলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, এবং যাকে রূপ দেওয়া হয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)!

আবার দেখা যায়, কুরআনের এক শিক্ষক এক বেদুইনকে নিচের এ আয়াত ভুলভাবে পড়ানো শুরু করেন :

أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ

| আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও।<sup>[৩]</sup>

এ আয়াতে ওই শিক্ষক رسوله শব্দের لام এ পেশের পরিবর্তে যের দিয়ে পড়ানো শুরু করেন। তখন অর্থ দাঁড়াবে : আল্লাহ মুশরিকদের থেকে এবং তাঁর রাসূল থেকে দায়মুক্ত! তখন ওই বেদুইন বলে ফেলে, আল্লাহ যদি তাঁর রাসূল থেকে দায়মুক্ত হন, তবে আমিও তাঁর থেকে দায়িত্বমুক্ত (নাউযুবিল্লাহ)।<sup>[৪]</sup>

আরবি ভাষায় ভুলের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইবনু খালদুন লেখেন : ভাষা হলো মানুষের মুখের একটি যোগ্যতা, যা এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্মের লোকেরা গ্রহণ করে থাকে। ঠিক যেমন আমরা আমাদের বাচ্চাদের ভাষা শিখিয়ে থাকি। এরপর ইসলাম আগমনের পর মুসলমানগণ যখন পৃথিবীর শাসনক্ষমতা গ্রহণের জন্য আরব উপদ্বীপ থেকে বেরিয়ে অনারবদের সঙ্গে মেশা শুরু করে, তখনি তাদের সেই যোগ্যতা পরিবর্তন হতে থাকে। নানা ভাষার মানুষের কথা শুনতে শুনতে তাদের সেই ভাষার স্বকীয়তা হ্রাস পেতে থাকে। আর মানুষ যা শুনে অভ্যস্ত, তাই বলতে থাকে। ফলে

[১] আল ইকদুল ফারিদ ২: ১৮-২০, ইবনু কুতাইবা ২: ১৫৯, আল বায়ান: ২: ৩-৫।

[২] সূরা আল হাশর: ৫৯: ২৪।

[৩] সূরা তাওবা: ৯: ৩।

[৪] আবাকাতুল উদাবা পৃ ৮।



অনারবদের ভাষা শুনতে শুনতে তাদের আরবি বলাতেও মিশ্রতা চলে আসে।<sup>[১]</sup>

## ❁ বিশুদ্ধ ভাষার আবাসস্থল

আরব-অনারব লোকদের সংমিশ্রণ হতো শহুরে পরিবেশে। তাই শহুরে মানুষের ভাষাতেই এসব ভুলের প্রবণতা ছিল বেশি। তবে সে তুলনায় মরুভূমিতে বা গ্রামাঞ্চলের মানুষের ভাষায় ভুলের পরিমাণ একেবারেই ছিল না। কারণ সেখানে আনাগোনা ছিল না অনারবদের। তাই তাদের ভাষাও ছিল বিশুদ্ধ ও নিষ্কলুষ। সিবাওয়াই ও কিসাইর মাঝে সংঘটিত ভাষা-বিতর্কের ঘটনা আমরা ইতিমধ্যে পড়ে এসেছি। সেখানে বিশুদ্ধ আরবি পরিভাষা যাচাই করার জন্য দূরবর্তী গ্রামের এক বেদুইনকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। কিসাইকে পরিকল্পিতভাবে বিজয়ী করার চেষ্টা করা হলে, বেদুইন খলিফার চাপে রাজি হয়েছিল ঠিক। তবে সে বলেছিল, আমার জবান এই ভুল উচ্চারণে অভ্যস্ত নয়। সঠিকটাই মুখ দিয়ে চলে আসে।<sup>[২]</sup> এভাবে গ্রামীণ ও মরু পরিবেশই হয়ে ওঠে ভাষা-শুদ্ধতার মাপকাঠি। মরুবাসীর কাছ থেকেই গ্রহণ করা হতো বিশুদ্ধ আরবি ভাষা। আর মরুবাসী লোকেরা এ সুযোগ লুফে নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে ও শহরে এসে ভাষা শিক্ষার পাঠশালা খুলে বসতো। শহরে এসে বেদুইন ভাষাবিদগণের পাঠদান এবং এ কাজকে তাদের পেশা হিসেবে গ্রহণের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ইবনুন নাদিম। এ প্রশংসনীয় উদ্যোগকে যারা পেশা হিসেবে নেন, তাদের অন্যতম হলেন আবুল বাইদা রিয়াহী<sup>[৩]</sup> এবং আবু জামুস সাওর বিন ইয়াযিদ। এই আবু জামুস থেকেই শুদ্ধভাষার শিক্ষা নেন বিখ্যাত ভাষাবিদ ও সুসাহিত্যিক আবদুল্লাহ ইবনুল মুকাফফা<sup>[৪]</sup>, আবুল আইসাল আবদুল খুলাইদ<sup>[৫]</sup> এবং আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আবি সুবহ<sup>[৬]</sup>।

ধূ-ধূ মরু থেকে গ্রামে বা শহরে আসা এসব শিক্ষকের কাছে অনেক শিক্ষার্থী ভিড় করত। তবে কিছু কিছু শিক্ষার্থী মূল উৎস থেকে ভাষা শেখার উদ্দেশ্যে একেবারে মরুপ্রান্তরে চলে যেত। যেন কাছ থেকে একেবারে মূল আরবদের ভাষা আয়ত্ত্ব করতে পারে। এ কারণেই আমরা দেখি, হিজরি প্রথম দুই শতকে

[১] আল মুকাদ্দিমা পৃ ৪০৩।

[২] ইবনু খাল্লিকান: ১: ৫৪৯।

[৩] আল ফিহরিস্ত: পৃ ৬৬।

[৪] আল ফিহরিস্ত: পৃ ৬৭।

[৫] আল ফিহরিস্ত: পৃ ৭২।

[৬] আল ফিহরিস্ত: পৃ ৭৩।

মরুপ্রান্তরের এসব ভাষার পাঠশালা বর্তমান যুগের ভাষা ইনস্টিটিউটের ভূমিকা পালন করেছে।<sup>[১]</sup> এ ব্যাপারে প্রফেসর ফিলিপ হিট্রি বলেন, সিরিয়ার মরুপ্রান্তর ছিল উমাইয়া শাহজাদাদের শিক্ষাস্থল। বিশুদ্ধ আরবি ভাষা, সাহিত্য ও কবিতা রচনা শেখার উদ্দেশ্যে তাদেরকে এসব মরুপ্রান্তরে পাঠানো হতো।<sup>[২]</sup>

## ✽ মরুর পানে শিক্ষার্থীরা

খলিফা মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পুত্র ইয়াযিদকে এমনই এক মরুপ্রান্তরে পাঠান। অপরদিকে যত্ন, প্রশান্তি ও আরামের ঘাটতির আশঙ্কায় আবদুল মালিকের ছেলে ওয়ালিদকে এসব ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়নি। ফলে তিনি ভাষাগত নিয়মকানুন তেমন আয়ত্ত্ব করতে পারেননি। প্রায়ই তিনি আরবি ভাষা উচ্চারণে ভুল করতেন।<sup>[৩]</sup> এ কষ্ট ও যাতনার কথা তাঁর পিতার মুখ থেকেই শোনা যাক: মায়া ও আদরের কারণে আমরা ওয়ালিদকে মরুর ইশকুলে পাঠাতে পারিনি।<sup>[৪]</sup>

উমাইয়া শাহজাদাদের মধ্যেই এ রীতি সীমাবদ্ধ ছিল না। বিখ্যাত আব্বাসী খলিফা হারুনুর রশিদের পুত্র মুতাসিমকেও একই উদ্দেশ্যে মরুভূমিতে পাঠানো হয়।<sup>[৫]</sup> এসব মরু-পাঠশালা কেবল রাজকুমারদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল না। অনেক বিজ্ঞ মনীষীও এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ভাষাজ্ঞান আয়ত্ত্ব করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন খলিল বিন আহমাদ (মৃত্যু ১৬০ হিজরি)। একবার কিসাই তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: এত জ্ঞান আপনি কোথায় শিখলেন? উত্তরে তিনি বললেন, হিজায়, নাজদ ও তিহামার মরুপাঠশালা থেকে।<sup>[৬]</sup>

বিশর বিন বারদ (মৃত্যু: ১৬৮ হিজরি)। একবার তাঁকে বলা হলো: ‘আরবি কবিদের মধ্যে এমন কোনো কবি নেই, যার কবিতার কোনো একটি শব্দ নিয়ে আপত্তি করা হয়নি বা সন্দেহ করা হয়নি। এক্ষেত্রে আপনিই বিরল। আপনার কবিতায় কেউ কখনো সন্দেহ করেনি।’ উত্তরে তিনি বললেন, কিভাবে আমার ভুল হতে পারে! আমি জন্মেছি এখানে। আর বেড়ে উঠেছি আকিল গোত্রের বিশুদ্ধ আরবিভাষী আশি জন শাইখের ঘরে। তাঁদের একজনও জানতেন না,

[১] Encyclopaedia of Education ৩: ১১১২।

[২] History of the Arabs p. ২৫৩।

[৩] আল ইকদুল ফারিদ: ২: ১৮।

[৪] আল ইকদুল ফারিদ: ২: ১৯।

[৫] আল ইকদুল ফারিদ: ১: ৩৬৫।

[৬] ইবনুল আনবারি পৃ ৮৩।



ভুল শব্দ কী। আর তাঁদের নারীরা পুরুষদের থেকেও বিশুদ্ধভাষী ছিলেন। ফলে বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমার ভাষার শুদ্ধতা ও পরিপক্বতাও বেড়েছে। এবার বলুন, কী করে আমার থেকে ভুল প্রকাশ পেতে পারে? [১]

কিসাসি (মৃত্যু : ১৮২ হিজরি)। তিনি মরুর পাঠশালায় পনেরোটি বোতলের কালি শেষ করেন আরবদের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে। এগুলো ছিল তাঁর মুখস্থ কাহিনীর বাইরের জিনিস। [২]

শাফিয়ি (মৃত্যু : ২০৪ হিজরি)। তাঁর প্রাথমিক জীবনের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমি মক্কা থেকে বেরিয়ে হুযাইল গোত্রের মরু-পাঠশালায় ভর্তি হলাম। সেখান থেকে তাদের কথা ও প্রকৃতি আয়ত্ত্ব করলাম। হুযাইল গোত্র ছিল আরবের সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী গোত্র। দীর্ঘ সাতেরো বছর আমি তাদের ওখানে ছিলাম। তারা যেখানে যেত, আমিও সেখানে যেতাম। তারা যেখানে তাঁবু ফেলত, আমিও সেখানে তাঁবু খাটাতাম। ওখান থেকে মক্কায় ফিরে আসার পর আমি কবিতার চর্চা করতে লাগলাম। সাহিত্যের রচনা, সাহিত্যের সংলাপ ও আরবদের প্রাচীন ইতিহাসের কথা বেশি বেশি আলোচনা করতে লাগলাম। [৩]

রিয়ালী আবুল ফাদল আল-আব্বাস ইবনুল ফারাজ (মৃত্যু : ২৫৭ হিজরি)। তিনি প্রায়ই গর্ব করে বলতেন, কুয়াশায় জীর্ণশীর্ণ, জারবোয়া খেতে অভ্যস্ত মরুবাসীর কাছ থেকে আমি ভাষাজ্ঞান শিখেছি। শুধু তিনিই নন; চাটনি ও শক্ত খাবার খেয়ে জীবন ধারণ করা মরুবাসীর কাছ থেকে তাঁর মতো অনেকেই ভাষাজ্ঞান আহরণ করেছেন। [৪]

এসব মরুপ্রান্তরে যারা ভাষা শিখতে আসত, তারা কেবল এক জায়গায় বসে থেকে ভাষা শিখত না। বরং মরুবাসীদের সঙ্গে মিশে সাধারণ লোকদের সঙ্গে কথা বলে বলে আরবি ভাষা শিখত। কারণ বিশুদ্ধ আরবি কেবল মরুবাসীরাই ব্যবহার করত। তা ছাড়া স্থানীয় সভ্য ও শিক্ষিত আরব বেদুইনদের পক্ষ থেকে আয়োজিত নানা বুদ্ধিবৃত্তিক অনুষ্ঠানেও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করত। সেসব অনুষ্ঠানে মরুবাসী লোকেরা চমৎকার কবিতা, আরবের ইতিহাস, বীরত্বপূর্ণ ঘটনা, পূর্ববর্তীদের জীবনচরিত বর্ণনা করত। তাঁদের অন্যতম ছিলেন আবু মালিক উমর বিন কারকারাহ, আবু সারওয়ান আকালী এবং আবু হিনদাম

[১] আল আগানী: ৩: ২৬।

[২] ইবনুল আনবারি: ৮৩-৮৪।

[৩] ইয়াকুত: মু'জামুল উদাবা: ৬: ৩৬৯।

[৪] আল ফিহরিস্ত: পৃ ৮৬।

কিলাব বিন হামরাহ [১]

## ৮. মসজিদ

ইসলামি শিক্ষা ও পাঠদানের ইতিহাসের সঙ্গে মসজিদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর তাই মসজিদ প্রসঙ্গে আলোচনা করা মানে ইসলামি সভ্যতা বিকাশের প্রাণকেন্দ্র নিয়ে আলোচনা করা। যখন থেকে মসজিদ নির্মাণ শুরু হয়, তখন থেকেই তাতে শিক্ষাদান কার্যক্রম শুরু হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলামি ভূখণ্ডের নানা প্রান্তে এভাবেই মসজিদ-কেন্দ্রিক নিরবচ্ছিন্ন পাঠদান চলে আসছে। মসজিদকে শিক্ষালয় হিসেবে নির্ধারণের প্রধান কারণ হলো: ইসলামের প্রাথমিক যুগে শিক্ষাব্যবস্থা কেবল ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেখানে দ্বীনের নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া হতো। ধর্মের মূল ভিত্তি, বিধিবিধান ও উদ্দেশ্যসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করা হতো। আর ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে মসজিদের ঘনিষ্ঠতা সবচেয়ে বেশি। তা ছাড়া প্রথম যুগের মুসলমানগণ মসজিদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ফলে মসজিদকেই তাঁরা ইবাদতখানা, শিক্ষাকেন্দ্র, বিচারালয়, সেনা সমাবেশ প্রাঙ্গণ ও রাষ্ট্রদূতদের অভ্যর্থনা জানানোর স্থান হিসেবে বেছে নেন।<sup>[২]</sup>

### ✽ মসজিদ নির্মাণের সূত্রপাত

কেন মুসলমানগণ দ্রুত মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন? কারণ তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সম্মিলিতভাবে ঘরোয়া পরিবেশে ইবাদত করতে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ইচ্ছামতো সেখানে ইবাদত ও নবিজির সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাওয়া যায় না। আমার মনে হয়, এই চিন্তা থেকেই তাঁরা মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে এর নাম দেন ‘আল্লাহর ঘর’। এ কথা বোঝানোর জন্য যে, এ ঘর কারও ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। এ স্থানে প্রবেশ করতে কারও অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া সেই সমাজে অনেক ইহুদি-খ্রিস্টানও বাস করত। তাদের জন্য ছিল পৃথক উপাসনালয়। সেখানে তারা আল্লাহর নাম জপত। উপাসনা করত। আমরা এ কথাও বলতে পারি যে, আরব মুসলমানগণ তাদের ইসলামপূর্ব সমাজের অনেক রীতিনীতির অনুসরণ করেছেন। কারণ তাদের পূর্বপুরুষ ইবরাহিম ও

[১] আল ফিহরিস্ত: পৃ ৬৬, ৬৯, ১২২।

[২] দেখুন: দাইরাইতুল মাআরিফিল ইসলামিয়ার মসজিদ অধ্যায়।



ইসমাইল আলাইহিমা সালাম দীর্ঘকাল আগে পবিত্র ‘মসজিদুল হারাম’ নির্মাণ করে যান। মক্কায় ইসলাম আসার পূর্বেও একে সবাই কাবা হিসেবে জানত। কাবাঘরের উদ্দেশ্যে হজ পালন করতে আরবের নানা প্রান্ত থেকে হাজিরা আসত মক্কায়। তাতে ইবাদত-বন্দেগি করত।<sup>[১]</sup> এই সুমহান ঘরকে মহান আল্লাহ নামাজ আদায়কারী, তাওয়াফকারী, রুকুকারী ও সিজদাকারী সকলের জন্য নির্বাচন করেছেন। মুশরিকরা কাবায় মূর্তি স্থাপন করে তার পূজা করত। তাওহীদবাদীরা তাতে ইবাদত-বন্দেগি করত। ইসলাম আসার পর মুসলমানগণ এ কাবার ভাবগাম্ভীর্য আরও উন্নত করেন। বাইতুল্লাহর মর্যাদা আরও মহিমাম্বিত করেন। এমনকি মূর্তি অপসারণের আগেও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকনুল আসওয়াদ ও রুকনুল ইয়ামানির মধ্যবর্তী জায়গাকে নামাজের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করেন।<sup>[২]</sup> মক্কা ছেড়ে যাওয়ার সময় এ পুণ্যময় ঘরের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আল্লাহর জমিনের মধ্যে তুমিই সবেচেয়ে প্রিয় আমার কাছে। নিশ্চয় আল্লাহর কাছেও তুমি সব থেকে প্রিয় জায়গা। তোমার আশপাশের বাসিন্দাগণ যদি আমাকে এখান থেকে বের করে না দিত, তবে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।<sup>[৩]</sup>

এরপর মুসলমানদেরকেও মক্কা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। মসজিদুল হারামে জমায়েত ও ইবাদত থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। ফলে খুব দ্রুত তারা এর বিকল্প কিছু চিন্তা করতে থাকেন। মদিনার দিকে হিজরতের পথে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুবা প্রান্তরে কিছুদিন অবস্থান করেন। সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম নির্মিত এ মসজিদের নাম হলো মসজিদে কুবা। বলা হয়, এ মসজিদক কেন্দ্র করেই নিচের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় :

لَسَجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ  
فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

‘তবে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার ওপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই তোমার দাঁড়ানোর যোগ্য স্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের

[১] শাহরাস্তানী: আল মিলালু ওয়ান নিহালু: ৪৪২-৪৪৩।

[২] ইবনু হিশাম: ১: ২১৮।

[৩] আর রাউযুল আনিফ: সুহাইলী: ২: ৩।

| ভালোবাসেন।<sup>[১]</sup>

বালাযুরি লেখেন:<sup>[২]</sup> মহানবির আগে যারা মদিনায় হিজরত করেন, তারাই মসজিদটি নির্মাণ করেন। এরপর মদিনায় প্রবেশের পর তিনি একটি উন্মুক্ত ময়দানে মদিনার মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি নিজে তাতে অবস্থান করেন, মুহাজির ও আনসার মুসলমানদেরও তাতে অবস্থান করে ইবাদত করতে উৎসাহ দেন।<sup>[৩]</sup> বালাযুরি ও ইবনু হিশামের অন্যান্য বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, আয়াতটি মসজিদে কুবাকে কেন্দ্র করে নয়। বরং মদিনার মসজিদকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ। তা ছাড়া মসজিদে নববিতে যেভাবে আল্লাহর রাসূল আপন সঙ্গীদের ধর্মীয় ও নানা বিষয় শিক্ষা দিতেন<sup>[৪]</sup>, তেমনি মসজিদে কুবাতেও জ্ঞানের পাঠদান অব্যাহত ছিল।<sup>[৫]</sup>

## ✽ মসজিদের বিস্তৃতি

এরপর মসজিদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। ইসলামের প্রচার-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মসজিদেরও বিস্তার ঘটে বিপুল পরিমাণে। নতুন কোনো এলাকা বিজয় করার পর অথবা কোনো নতুন শহর নির্মাণের পর সেনাপতি বা বিজেতা তাতে একটি মসজিদ নির্মাণ করবেন—এটি একটি ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাসে পাওয়া যায়: নানা দেশ যখন ইসলামের পতাকাতলে আসে, তখন খলিফা উমর ইবনুল খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বসরার গভর্নর আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একটি জামে মসজিদ এবং প্রত্যেক গোত্রের জন্য পৃথক পৃথক মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন। জুমুআর দিন সবাই জামে মসজিদে চলে আসত। তা ছাড়া কুফার গভর্নর সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং মিশরের শাসনকর্তা আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুয়ার কাছেও তিনি একই নির্দেশ প্রেরণ করেন।<sup>[৬]</sup>

কালের পরিক্রমায় বিপুল হারে মসজিদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বিশেষ করে রাজধানীগুলোতে। হিজরি তৃতীয় শতকেই মসজিদের নগরী হিসেবে

[১] সূরা তাওবা: ৯: ১০৮।

[২] ফুতুহুল বুলদান: পৃ ১৭।

[৩] ইবনু হিশাম: ২: ১২ তাবারী: ১: ৩: ১২৫৯, বালাযুরি ২০, ফুতুহুল বুলদান পৃ ১৭।

[৪] আল বুখারি: সালাত অধ্যায়।

[৫] আল ইহয়া: ১: ৫২।

[৬] আল-খুতাত ২: ২৪৬, হুসনুল মুহাযারা: ২: ১৪৯।



পরিচিতি পায় বাগদাদ। ইয়াকুব লেখেন: <sup>[১]</sup> বাগদাদ নগরীতে ত্রিশ হাজার মসজিদ গণনা করেছি। <sup>[২]</sup>

মিশরের অবস্থাও বাগদাদ থেকে খুব একটা ভিন্ন ছিল না। তবে হ্যাঁ, মিশরে জামে মসজিদের সম্প্রসার তুলনামূলক ধীর গতিতে হয়েছে। কার্যরোভে নির্মিত সর্বপ্রথম জামে মসজিদ হলো জামে আমর ইবনুল আস। যেটি আজ পর্যন্ত সুমহিমায় বিদ্যমান। মিশর বিজয়ের পরপরই তিনি মসজিদটি নির্মাণ করেন। ১৩৩ হিজরি পর্যন্ত আমর ইবনুল আস মসজিদ ছাড়া আর কোনো জামে মসজিদ ছিল না মিশরে। এ বছরই সর্বশেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ান বিন মুহাম্মাদকে গ্রেফতার করতে আবদুল্লাহ বিন আলি আব্বাসীয় সেনাদল নিয়ে মিশরে আগমন করেন। আব্বাসীদের বিজয়ের পরপরই মারওয়ান মিশরে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আব্বাসী সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন আলি তার সেনাদল নিয়ে ফুসতাত নগরীর উত্তর দিকে শিবির স্থাপন করেন। সেখানে তিনি অনেক বসতঘর ও প্রচুর প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। এর মধ্যে আল-আসকার জামে মসজিদ অন্যতম। আল-কাতায়ে এলাকায় ২৬৫ হিজরিতে আহমাদ বিন তুলুন সূনামে জামে মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে জুমুআর নামাজ স্থানান্তরিত করেন। এর আগ পর্যন্ত আল-আসকার জামে মসজিদে জুমুআ আদায় হতো। <sup>[৩]</sup>

জাওহার সাকলী ৩৬০ হিজরিতে আল-আযহার জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। তবে ৩৭৮ হিজরি থেকে এটিকে কেবল গবেষণালয় ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়। সেই থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত এটি ইসলামি বিশ্বের প্রথম সারির একটি বিদ্যাপিঠ। <sup>[৪]</sup> বিখ্যাত শাসক আযিয বিল্লাহ আরেকটি জামে মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নিলেও তা সমাপ্ত করতে পারেননি। এর আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর পুত্র হাকিম অসমাপ্ত কাজ শেষ করে এর নাম দেন আল-হাকিম জামে মসজিদ। তা ছাড়া জামে আল-মাকিস ও জামে রাশিদাও নির্মাণ করেন শাসক হাকিম। এরপর জামে মসজিদ নির্মাণের ধারাবাহিকতা বন্ধ থাকে। শেষ পর্যন্ত আইয়ুবি রাজবংশের হাতে ক্ষমতা আসার পর মিশরে এই ছটি জামে মসজিদই বিদ্যমান ছিল। <sup>[৫]</sup>

[১] আল বুলদান: পৃ ২৫০।

[২] ইয়াকুব এখানে অতুক্তি করেছেন এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই। কারণ বিশাল বাগদাদ শহরের সর্বত্রই ছিল পাঞ্জিগানা মসজিদ। বলা হয়, প্রতিটি বাড়ির একপাশে নির্দিষ্ট একটি জায়গা বরাদ্দ রাখা হতো নামাজের জন্য। ওই স্থানকেও তারা মসজিদ বলত।

[৩] তারিখুল জামি' আত তুলুনী: মুহাম্মাদ উকুশ।

[৪] Lane- Poole: Cairo: ১২৩-১২৪।

[৫] মাকরিযি: আল-খুতাত ২: ২৪৪-২৪৫, সুয়ুতি: হুসনুল মুহাযারা: ২: ১৪৮।

এই ছিল জুমুআ আদায়ের জন্য বিখ্যাত মিশরের জামে মসজিদসমূহের বৃত্তান্ত। এ ছাড়া কেবল পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের জন্য নির্মিত মসজিদসমূহের সংখ্যা ছিল প্রায় বাগদাদের মতো। মিশরে তখন প্রচুর পরিমাণে পাঞ্জিগানা মসজিদ ছিল। উদাহরণস্বরূপ: আলেকজান্দ্রিয়ার মসজিদগুলো সম্পর্কে ইবনু জুবাইর বলেন, সবচেয়ে বেশি মসজিদ ছিল এই নগরে। অনেকে বলেন, এখানকার মসজিদ সংখ্যা বারো হাজার। মোটকথা, বিপুল পরিমাণে মসজিদ ছিল সেখানে। একই পাড়ায় চারটি বা পাঁচটি করে মসজিদ পাওয়া যেত।<sup>[১]</sup>

এখন আমরা এসব মসজিদের পাঠদান কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করব। এসব মসজিদে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষার্থীদের মজলিস সম্পর্কে সামান্য ধারণা দেওয়ার জন্য আমরা তিনটি মসজিদকে বেছে নিচ্ছি:

### ✽ জামে আল-মানসুর

বিখ্যাত শাসক মানসুর ইসলামি বিশ্বের জন্য নতুন রাজধানী নির্মাণে মনোযোগ দেন। ১৪৫ হিজরিতে তিনি বাগদাদকে সুর্গখচিত প্রাসাদ ও জামে আল-মানসুর দিয়ে সুশোভিত করার পরিকল্পনা হাতে নেন।<sup>[২]</sup> ইয়াকুতের বর্ণনানুযায়ী এ প্রকল্পে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তার পরিমাণ আঠারো মিলিয়ন দিনার। বাদশাহ রশিদের শাসনামলে জামে আল-মানসুরকে সংস্কার করা হয়। অনেক কিছু তাতে যোগ করা হয়। এরপর সময়ের প্রতিক্রমায় তাতে আরও সংস্কার ও সম্প্রসারণ হয়েছে।<sup>[৩]</sup>

এ ঐতিহাসিক মসজিদ ছিল তৎকালীন বিদ্যার্থী ও জ্ঞানবাহকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। বিজ্ঞানী ও মনীষীগণ সবসময় এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে জড়িত রাখার আশা পোষণ করতেন। এর প্রমাণ হলো, খতিব বাগদাদী হজে গিয়ে যমযামের পানি পান করে আল্লাহর দরবারে তিনটি প্রয়োজন পূরণের জন্য দুআ করেন। সেই প্রয়োজন তিনটির একটি ছিল: জামে আল-মানসুরে হাদিস সংকলনের সুযোগ পাওয়া।<sup>[৪]</sup> আমার ধারণা, পঞ্চম শতাব্দীতে হাম্বলী মাযহাবের লোকদের দাপট ও প্রভাব বেশি ছিল এ মসজিদে। এমনকি ৪৫১ হিজরিতে তারা সেখানকার শিক্ষক খতিব বাগদাদীর ওপর বাড়াবাড়ি করে।

[১] আর রিহলাহ: পৃ ৪৩।

[২] মু'জামুল বুলদান: ২: ২৩২।

[৩] আল খতিবুল বাগদাদী: কারিখু বাগদাদ: ১: ১০৮।

[৪] ইয়াকুত: মু'জামুল বুলদান: ১: ২৪৬-২৪৭।



নানাভাবে তাঁকে কষ্ট দেয়।<sup>[১]</sup> ভাষাজ্ঞান শিক্ষা দিতে এ মসজিদেই বসাতেন কিসাই। তখন ফারা, আহমার, ইবনু সাদান ছিল তাঁর শিষ্যদের অন্যতম।<sup>[২]</sup> তা ছাড়া এ মসজিদে বসেই কবিতা রচনা করতেন আবুল আতাহিয়া।

কুফার এক বয়স্ক ব্যক্তি বলেন, একবার তিনি এ মসজিদে প্রবেশ করে দেখেন এক বর্ষীয়ান শিক্ষকের পাশে অনেক শিক্ষার্থী বসা। আর সেই শিক্ষক নিচের এ কবিতা উপস্থাপন করছিলেন :

لُفِي عَلَى وَرَقِ الشَّبَابِ # وَغَصُونُهُ الْخَضِرُ الرُّطَابِ  
 ذَهَبَ الشَّبَابُ وَبَانَ عَنِي # غَيْرُ مُنْتَظَرِ الْإِيَابِ  
 فَلَأَبْكِينَ عَلَى الشَّبَابِ # بَ وَطِيبَ أَيَّامِ التَّصَابِي  
 وَلَأَبْكِينَ مِنَ الْبُلَى # وَلَأَبْكِينَ مِنَ الْخَضَابِ

কবিতাটি বলার সময় তার দু-গাল বেয়ে অশ্রু পড়ছিল। তারপর কুফার ওই বৃদ্ধ লোকটিও সেই পাঠশালায় বসে এ কবিতাটি লিখে নেন। ওই বর্ষীয়ান শিক্ষকের পরিচয় জিজ্ঞেস করলে শিক্ষার্থীরা বলল, ইনি হলেন আবুল আতাহিয়া।<sup>[৩]</sup> আল-মানসুর জামে মসজিদেই আবু উমর যাহিদ তাঁর বিখ্যাত আল-ইয়াকুত গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করেন। ৩২৬ হিজরিতে তিনি এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। গ্রন্থ সংকলন শেষে তিনি বইটির পুনর্পাঠ করে তা আরও সুবিন্যস্ত করেন। তাতে আরও অনেক কিছু যোগ করেন।<sup>[৪]</sup>

### ❖ দামিশকের জামে মসজিদ

ইবনুল ফকিহের বর্ণনা অনুযায়ী<sup>[৫]</sup> দামিশকের জামে মসজিদ হলো তৎকালীন পৃথিবীর চারটি বড় আশ্চর্যের একটি। এ মসজিদের ভাব-গাভীর্য, প্রভাব বলয় ও সভ্যতার বিকাশে এর অবদান সম্পর্কে কিছু বর্ণনা এখানে উল্লেখ করছি।

» এই মসজিদ নির্মাণ করতে গিয়ে শাসক ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক

[১] ইয়াকুত: মু'জামুল বুলদান: ১: ২৪৬-২৪৭।

[২] মু'জামুল উদাবা: ৪: ২৪৩।

[৩] আল আগানী: ৩: ১৪৩।

[৪] আল ফিহরিস্ত: ১১৩।

[৫] কিতাবুল বুলদান পৃ ১০৬।

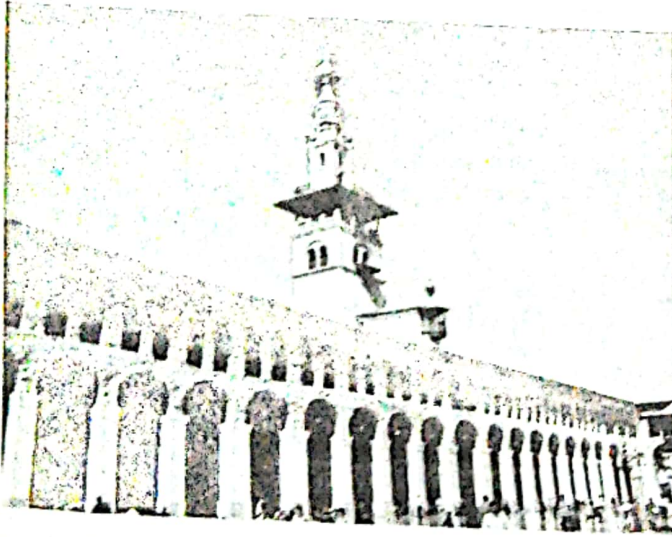
পুরো সাম্রাজ্যের সাত বছরের সমুদয় রাজস্ব ব্যয় করেন। এর ব্যয় হিসাবের নথি, কাগজপত্র ও ভাউচারগুলো আঠারোটি উটে বহন করে বাসগহ ওয়ালিদের কাছে নিয়ে আসা হয়।

» নির্মাণ কাজ আট বছরব্যাপী চলমান থাকে। এই আট বছরে শ্রমিকগণ যে পরিমাণ খাদ্য আহার করে, তার মূল্য ছয় হাজার দিনার।

» এ মসজিদে বাতি হিসেবে ব্যবহারের জন্য ছয় শ সূর্যখচিত খোপ ছিল।

» মনীষীগণ বলেন, দামিশকের এ মসজিদের সবচেয়ে বড় আশ্চর্য হলো, এক শ বছর পর্যন্ত কেউ যদি এ মসজিদে অবস্থান করে, তবুও প্রতি মুহূর্তে এখানে সে নতুন নতুন মজার বিষয় দেখতে পাবে, যা সে আগে কখনো দেখেনি।<sup>[১]</sup>

তৎকালীন বিশ্বের অত্যাশ্চর্য এ কীর্তি নিয়ে চিন্তা করলে সত্যিই মনে বড় বিস্ময় জাগে।



দামিশকের জামে উমাইর একাংশের চিত্র

সে কালে কী পরিমাণ মহত্ত্ব, গাভীর্য ও প্রভাব বহন করত এ মসজিদ, ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে আমি নিজে তা পরিদর্শনকালে যে কয়টি ছবি ক্যামেরায় ধারণ করেছি, সেখান থেকে দুটি ছবি পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি (মূল গ্রন্থের ছবিগুলো অস্পষ্ট হওয়ায় বর্তমান

মসজিদের চিত্র উইকিপিডিয়া থেকে নেওয়া হয়েছে- অনুবাদক)।

তৎকালীন ইসলামি বিশ্বে যে কয়টি প্রধান ও আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, এই মসজিদ ছিল তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। এ মসজিদের বিবরণ দিতে গিয়ে ইবনু জুবাইর বলেন,<sup>[২]</sup> সেখানে শিক্ষার্থীদের অনেক মজলিস আছে। শিক্ষকদের জন্যও সেখানে প্রচুর ব্যবস্থা আছে। মালিকি মাযহাবীদের জন্যে পশ্চিম দিকে আছে একটি প্রাস্ত। পশ্চিম দিকের ছাত্ররা ওখানে সমবেত হয়।

[১] প্রাপ্ত তথ্যসূত্র: ১০৭-১০৮, মু'জামুল বুলদান: ৪: ৭৬-৭৭।

[২] আর রিহলাহ ২৬৬-২৭২।



সেখানে তাদের আছে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও রুটিন। প্রবাসী ও জ্ঞানপিপাসুদের জন্য এ মসজিদে প্রচুর সেবা ও সুবিধা বিদ্যমান। সবচেয়ে অবাক-করাবিষয় হলো, এ মসজিদের আঙিনায় স্থাপিত দুটি উন্মুক্ত ছোট কক্ষের মধ্যবর্তী যেসব খুঁটি আছে, সেগুলোতে বসার জন্যও নির্দিষ্ট সময় আছে। সেখানে পরস্পর আলোচনা ও পাঠদানের সময় হেলান দেওয়ার জন্য এসব খুঁটিকে ব্যবহার করা হয়। আল-বারিদ ফটকের বাইরে ডান দিকে আছে শাফিয়ি মাযহাবীদের জন্য বিশেষ মাদরাসা। এর মধ্যস্থলে আছে চৌবাচ্চা, তাতে সবসময় পানি প্রবাহিত হয়।

এ মসজিদের অনেকগুলো প্রান্ত আছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ লেখার জন্য, কেউ অধ্যয়নের জন্য, কেউ একাকী পড়ার জন্য এগুলো ব্যবহার করে। এই ছিল মসজিদে ছাত্রদের জন্য প্রদত্ত সুবিধাসমূহের কিছু বিবরণ।



জামে উমাতীর আরেকটি চিত্র

৪৫৬ হিজরিতে এ মসজিদে খতিব বাগদাদীর বিশাল পাঠশালা ছিল। প্রতিদিন সকালে বিদ্যার্থীরা এখানে জড়ো হতো। তিনি তাদের সামনে হাদিস পাঠ করতেন। তিনি যখন হাদিস পড়তেন, তখন মসজিদের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর আওয়াজ পৌঁছাত।<sup>[১]</sup>

### ✽ জামে আমর ইবনুল আস

২১ হিজরিতে মিশর-বিজেতা বিখ্যাত সাহাবি আমর ইবনুল আস মসজিদটি নির্মাণ করেন। এরপর তাতে একাধিকবার সংস্কার ও সম্প্রসারণ হয়।<sup>[২]</sup> একেবারে গুরুত্ব দিকে সুলাইমান ইবনু আনাস তুজাইবী এ মসজিদে বসে মানুষের সামনে নানা ঘটনা বর্ণনা করে তাদের উপদেশ দিতেন। প্রথমে তিনি বিচার-সালিশের পাশাপাশি এটি করতেন। পরে বিচারকার্য থেকে ইস্তফা দিয়ে কেবল এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ৩৮ হিজরিতে তিনি এ মসজিদে শিক্ষাদান

[১] ইয়াকুত: মু'জামুল উদাবা: ১: ২৫৫।

[২] মাকরিযি: আল-খুতাব ২: ২৪৬, ২৫৬।

কার্যক্রম শুরু করেন। সেই থেকে মসজিদটি শিক্ষাকেন্দ্র ও আদালত হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। ৭৪৯ হিজরির মহামারির পূর্বে বিখ্যাত মনীষী মুহাম্মাদ ইবনু আবদির রহমান আল-হানাফি এ মসজিদে চল্লিশটিরও বেশি পাঠশালা গণনা করেন।<sup>[১]</sup> এ মসজিদের যেসব প্রান্তে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শাস্ত্রের পাঠ দেওয়া হতো, বিখ্যাত ইতিহাসবিদ মাকরিযি সেগুলো থেকে আটটি প্রান্তকে সবিস্তারে বর্ণনা করেন। এর তিনটি থেকে সামান্য কিছু এখানে তুলে ধরাছি:

**ইমাম শাফিয়ির প্রান্ত:** বলা হয়, ইমাম শাফিয়ি এখানে পাঠদান করে পরিচিতি পেয়েছেন। সেখানে সান্দিবসের পাশে একটি জায়গা আছে। প্রতাপশালী সুলতান উসমান বিন সালাহুদ্দিন এটিকে শিক্ষার্থীদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। এখনো সেখানে বড় বড় ফকিহ ও বিখ্যাত মনীষীগণ পাঠদান করে থাকেন।

**আল-মাজদিয়া প্রান্ত:** একেবারে মসজিদের সামনের দিকে এটি। সুলতান আল-মালিকুল আশরাফের বিখ্যাত উজির মাজদুদ্দিন আবুল আশবাল এর ব্যবস্থা করেন। এরপর সেখানে তার নিকটাত্মীয় ও প্রধান বিচারপতি আবদুল ওয়াহাব আল-বাহানসিকে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। মিশর ও কায়রোর অনেক ওয়াকফ প্রকল্প এ প্রান্তের পৃষ্ঠপোষণ করেছে। রাষ্ট্রের উন্নত পদবিধারীগণ এ প্রান্তে পাঠদান করতেন।

**সাহিবিয়া প্রান্ত:** সাহিব মুহাম্মাদ বিন ফখরুদ্দিন এ প্রান্তের ব্যবস্থা করেন। এরপর সেখানে দুজন শিক্ষক নিয়োগ দেন। তাদের একজন ছিলেন মালিকি মাযহাবের। অপরজন শাফিয়ি মাযহাবের। এর ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি কায়রোতে ওয়াকফ প্রকল্পের ব্যবস্থা করেন।

মুহাম্মাদ ইবনু জারির তাবারী মিশরে আসার পর কুরআন, হাদিস, ভাষা, ব্যাকরণ ও কাব্যে তাঁর অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একবার আবুল হাসান বিন সিরাজ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সামনে যে প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা করেন, সে প্রসঙ্গেই তাঁকে সুদক্ষ ও বিজ্ঞ রূপে আবিষ্কার করেন। যতগুলো প্রশ্ন করেন, সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে তিনি তাদের চমকে দেন। কবিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে দেখেন তাঁর কাব্যপ্রতিভা অসামান্য। বিখ্যাত কবি তারমাহের কবিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে দেখেন সেই কবিতা আগে থেকেই তাঁর মুখস্থ। এরপর সেসব কবিতা লিখে দেওয়ার অনুরোধ করা হলে তিনি আমর ইবনুল আস মসজিদে অবস্থান করে সেসব

[১] মাকরিযি, মাজ-মুনত ১: ১৪৮।



কবিতা লিখে দেন।<sup>[১]</sup>

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, মসজিদের পাঠশালাগুলো কেবল ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং সেখানে যুগোপযোগী অন্যসব জ্ঞান ও শাস্ত্রেরও তালিম দেওয়া হতো। তবে কোনো সন্দেহ নেই, ধর্মীয় শিক্ষাই ছিল ছাত্রদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষকগণও এ শিক্ষাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু তারপরও আমাদের সামনে যেসব নথিপত্র আছে সেগুলো প্রমাণ করে যে, মসজিদসমূহ ছিল ধর্মীয় ও সাধারণ সকল জ্ঞানের পাঠদানকেন্দ্র। যেসব সাধারণ বিষয়ের পাঠদান মসজিদে সম্পন্ন হতো, তার কিছু আলোচনা আমি নিচে উল্লেখ করছি:

হাসান বসরির পাঠশালা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুতাযিলা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন ওয়াসিল বিন আতা। তিনি ও তার সাথি যুক্তিবিদ্যা ও তর্কশাস্ত্রকে খুব গুরুত্ব দিতেন। তারা বলতেন, কবির গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিন নয় এবং কাফিরও নয়। বরং কবির গুনাহ করার পর সে এ দুই স্তরের মাঝামাঝি স্থলে অবস্থান করে। তো, ওয়াসিল বিন আতা তার সঙ্গীদের নিয়ে বসরার মসজিদে বসতেন। তাদেরকে সে যুগের আধুনিক বিষয়—তর্কবিদ্যা ও যুক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন।<sup>[২]</sup>

তা ছাড়া ভাষা ও সাহিত্যের পাঠদানও মসজিদে সম্পন্ন হতো। আবু উমর যাহিদ এবং আবুল আতাহিয়ার আলোচনা আমরা ইতিমধ্যে পড়েছি। এর সঙ্গে যোগ করছি আনবারীদের মসজিদে অনুষ্ঠিত নাফতোয়াইর বৈঠক। তা ছাড়া কর্ডোভার জামে মসজিদে বিখ্যাত ভাষাবিদ (মাকাররী তাঁর নাম উল্লেখ করেননি) বসে বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থীদের আরবি ভাষার নিয়মকানুন শেখাতেন।<sup>[৩]</sup> কুমাইত বিন যাহিদ ও রাবী হামাদ উভয়ে কুফার মসজিদে সমবেত হয়ে আরবের কবিতা ও ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতেন। একবার কোনো এক বিষয়ে দুজন ভিন্ন মত পোষণ করেন। তখন হামাদের উদ্দেশে কুমাইত বলেন, তুমি কি মনে করো, আরবের ইতিহাস ও কবিতা সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে বেশি জানো? হামাদ বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! বাস্তব এটাই। তা শুনে কুমাইত রেগে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বিতর্ক শুরু করেন। তাঁকে নানা বিষয় জিজ্ঞেস করতে থাকেন। একপর্যায়ে হামাদ চূপ হতে বাধ্য হন।<sup>[৪]</sup>

[১] ইয়াকুত: মু'জামুল উদাবা: ৬: ৪৩২।

[২] ইবনু খাল্লিকান ২: ২৫২।

[৩] নাফতুত তীব: ২: ২৫৪।

[৪] আল আগানী: ১৫: ১১৩-১১৪।

মসজিদে ছন্দরীতিও শিক্ষা দেওয়া হতো। বর্ণিত আছে, এক বেদুইন বসরার মসজিদ-কেন্দ্রিক পাঠশালায় প্রবেশ করল। সেখানে কবিতা ও আরবের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা চলছিল। আলোচনা ভালো লাগায় সে তাদের সঙ্গে বসে ছন্দরীতি পড়তে লাগল। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা (ছন্দশাস্ত্রের বিশেষ পরিভাষা) মুফাইল ও ফাউল নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। তখন বেদুইন মনে মনে ভাবল, তারা হয়তো আমাকে নিয়ে কোনো ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে! তাই সে এ কবিতা আবৃত্তি করতে করতে দ্রুত সেখান থেকে কেটে পড়ল :

قد كان أخذهم في الشعر يعجبني # حتى تعاطوا كلام الزنج والروم

لما سمعت كلاما لست أعرفه # كأنه زجل الغربان واليوم

وليت منفلتا والله يعصمني # من التقحم في تلك الجرائم

তা ছাড়া চিকিৎসাবিদ্যা ও সময় নির্ধারণ বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হতো মসজিদে। ইমাম সুয়ুতি লেখেন : তলুনি জামে মসজিদে নানা বিষয়ের পাঠদান চলত। তাফসির, হাদিস, চার মাযহাবের ফিকহ, কুরআন তিলাওয়াত, চিকিৎসা ও সময় নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয় সেখানে শিক্ষা দেওয়া হতো।<sup>[১]</sup> আবদুল লতিফ বাগদাদী বলেন, রোজ দুপুরে আল-আযহার জামে মসজিদে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হতো।<sup>[২]</sup>

[১] হুসনুল মুহাম্মারী: ২: ১৩৮।

[২] ইবনু আব্বি উসাইবিয়া: উয়ুনুল আনবা: ২: ২০৭।



২য় ভাগ

## মাদরাসা ও বিদ্যালয়



মাদরাসা বা বিদ্যালয় সংক্রান্ত আলোচনার আগে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা উচিত।

- ১) শিক্ষাকার্যক্রম মসজিদ থেকে মাদরাসায় স্থানান্তরিত হওয়ার কারণ।
- ২) মসজিদ এবং মাদরাসার পার্থক্য।
- ৩) মাদরাসাগুলোতে অন্যসব জ্ঞানের তুলনায় ধর্মতত্ত্বকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণ।

## ১) শিক্ষাকার্যক্রম মসজিদ থেকে মাদরাসায় স্থানান্তরিত হওয়ার কারণ

শুরু থেকেই ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষের আগ্রহ ছিল প্রবল। সময় যতই গড়িয়েছে, ততই জ্ঞান ও ইলমের মজলিসে মানুষের সমাগম বেড়েছে। এমনকি অনেক মসজিদে একটি দুটি নয়; অনেকগুলো পাঠশালা একসাথে পরিচালিত হতো। আর প্রতিটি পাঠশালা থেকে শিক্ষকদের পাঠদান এবং শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক মুজাকারা ও আলোচনার আওয়াজ ভেসে আসত। এভাবে একই মসজিদে একাধিক পাঠশালা প্রচলনের ফলে সবার আওয়াজে মসজিদের পরিবেশ ভারী হয়ে উঠত। এক পাঠশালার আওয়াজ অন্য পাঠশালা থেকে শোনা যেত। ফলে মসজিদের স্বাভাবিক কার্যক্রম যেমন নামাজ ও ইবাদতে ব্যঘাত সৃষ্টি হতো। যার কারণে মসজিদে একই সঙ্গে পাঠদান ও নামাজ চালিয়ে যাওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন। তাই তো আমরা দেখি, আল-আযহার মসজিদে কেবল জুমুআর নামাজ আদায় হতো। আর সপ্তাহের অন্যান্য দিন তাতে পাঠদান কার্যক্রম চলত। তবে এটি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান নয়। কারণ মসজিদ নির্মাণের মৌলিক ও প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, তাতে মানুষ নামাজ আদায় করবে। ইবাদত-বন্দেগি করবে। যত কঠিন পরিস্থিতিই আসুক, কখনো মসজিদে নামাজ বন্ধ রাখা যাবে না।

আরেকটি বিষয় হলো, সময়ের সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন হয়েছে। ফলে পাঠ্যসূচিতে এমন অনেক নতুন বিষয় যুক্ত হয়েছে, যা আয়ত্ত্ব করার জন্য দরকার হয়েছে বিতর্ক ও সংলাপ। যেমন: যুক্তিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি। এসব আধুনিক বিষয়ের পাঠদান ও চর্চা মসজিদের মতো শান্ত ও গাভীরপূর্ণ পরিবেশের জন্য মানানসই ছিল না। তা ছাড়া ভন ক্রেমারের মত হলো, এক শ্রেণীর জ্ঞানানুরাগী স্বেচ্ছায় শিক্ষার্থীদের পাঠদানকর্মে লিপ্ত থাকতেন। ফলে জীবিকার তাগিদে অবৈতনিক শিক্ষকতার পাশাপাশি অন্য



কোনো পেশায় তাকে যুক্ত হতে হতো। কিন্তু জীবিকার পেছনে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে না পারায় তারা উন্নত জীবন লাভ করতে পারতেন না। কলে শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন নিশ্চিত করতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা তখন আবশ্যিক হয়ে পড়ে।<sup>[১]</sup>

## ২) মসজিদ এবং মাদরাসার পার্থক্য

সাধারণ দৃষ্টিতে মসজিদ ও মাদরাসার মাঝে পার্থক্য করা একটু কঠিনই হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, সে সময় মসজিদেও শিক্ষক নিয়োগ করা হতো।<sup>[২]</sup> অপরদিকে মাদরাসাতেও নিযুক্ত করা হতো মুয়াযযিনদের।<sup>[৩]</sup> অথবা তাতে খুতবা ও ভাষণের জন্য মিস্বার স্থাপন করা হতো। তবে আরেকটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালে মাদরাসার আরও কিছু সুতন্ত্র দিক আমাদের চোখে পড়বে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ইওয়ান (বড় হলরুম বা সভাকক্ষ)। সব মাদরাসাতেই এ সভাকক্ষ ছিল। তা ছাড়া মাদরাসায় ছিল আবাসিক ভবন। সেখানে ছাত্র ও শিক্ষকদের আবাসন সুবিধা ছিল। মুসলমানদের অধিকাংশ মাদরাসায় ছিল আবাসিক ব্যবস্থাপনা। এর সম্পূরক হিসেবে ছিল রান্নাঘর, খাবার-ঘর প্রভৃতি। ইবনু আজামি বলেন,<sup>[৪]</sup> খলিফা নুরুদ্দিন জেনগি আলেক্সান্দ্রিয়া শহর জয় করে সেখানকার মসজিদে সিরাজাইনকে মাদরাসায় রূপান্তরিত করেন। ফকিহদের থাকার জন্য সেখানে আবাসিক ব্যবস্থাপনা যুক্ত করেন। তা ছাড়া মাদরাসার আরও একটি সুতন্ত্র দিক হলো, প্রতিষ্ঠাতার পক্ষ থেকে সেখানে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু মসজিদে এমনটি হয় না। নিয়োগ ছাড়াই অনেক জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মসজিদে শিক্ষকতা করতেন। আর ছাত্রদের দিক থেকে হিসাব করলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাদরাসায় ছাত্র সংখ্যা থাকত সীমিত। অপরদিকে মসজিদে শিক্ষার্থীর সংখ্যা থাকত তুলনামূলক বেশি। তা ছাড়া মাদরাসার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রায়সময় ওয়াকফ প্রকল্পের ব্যবস্থা করা হতো।

## ৩) মাদরাসাগুলোতে অন্যসব জ্ঞানের তুলনায় ধর্মতত্ত্বকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণ

এ বাস্তবতা প্রত্যেক গবেষক খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। কারণ ধর্মতত্ত্বই ছিল মুসলমানদের মাদরাসাগুলোর প্রধান পাঠ্যবিষয়। তাদের

[১] Khuda Bukhsh: Islamic Civilization p. ২৮৫।

[২] আর রাওয়াতাইন: ১: ১৮৯।

[৩] আল-খুতাব: ২: ৩৭৪, ৩০০।

[৪] ইবনু জুবাইর: ২১৯।

আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। মাদরাসা-ভিত্তিক শিক্ষা চালু হওয়ার পর ধর্মতত্ত্ব ছাড়া অন্যান্য বিষয় জৌলুস হারায়। ফলে মাদরাসা-ভিত্তিক শিক্ষা চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত এসব জ্ঞানের দ্বারা মুসলমানগণ যেভাবে উপকৃত হয়েছিল, পরে সেগুলো থেকে আর তেমন আশানুরূপ উপকৃত হতে পারেনি। প্রতিটি মাদরাসায় তখন ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হতো। বিশেষ করে প্রচলিত চার মাযহাবের ফিকহের ওপর তাদের অভিজ্ঞ করে তোলা হতো। সেগুলো হলো আবু হানিফা, মালিক, শাফি'য়ি ও আহমাদ বিন হাম্বলের মাযহাব।

তবে ধর্মীয় ও মাযহাবগত শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপের প্রধান কারণ ছিল যুগের চাহিদা। কারণ মাদরাসা-ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়ার আগে ইরাক, সিরিয়া ও মিশরে ছিল শিয়া বুওয়াইহ ও ফাতিমি রাজবংশের শাসন। এ দুটি পরিবারের শাসকগণ ছিলেন শিয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী। শুধু তাই নয়, কখনো নাওয়াত দিয়ে আবার কখনো বলপ্রয়োগ করে সাধারণ মুসলমানদের মাঝে শিয়া মতাদর্শ ছড়িয়ে দিতে তারা সর্বকম চেষ্টাই করেছিলেন।<sup>[১]</sup>

বুওয়াইহ ও ফাতিমি রাজবংশের বিপরীতে বলিষ্ঠ রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতাদর্শে বিশ্বাসী অন্য দুটি পরিবার। তারা হলেন, সেলজুক ও আইয়ুবী রাজবংশ। শিয়াদের কবল থেকে মুসলিম-বিশ্বকে মুক্ত করার পর, শিয়াদের ছড়ানো সর্বনাশা আকিদা থেকে মানুষকে মুক্ত করতে তারা বেশি বেশি আহলুস সুন্নাহর মাদরাসা নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিশুদ্ধ ধর্ম বিস্তারের লক্ষ্যে এসব মাদরাসার মাধ্যমে তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদার প্রসার করেন।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতি গুরুত্বারোপ ছিল এসব মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। এরপর যখন শিয়াদের প্রভাব কমে যায়, আহলুস সুন্নাহর হাতে ক্ষমতা চলে আসে, তখন চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি নতুনভাবে আগ্রহী হতে শুরু করে শিক্ষার্থীগণ। মাদরাসাগুলোতে ধীরে ধীরে তা গুরুত্ব পেতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় মুস্তানসিরিয়া মাদরাসায় দশজন মুসলিম ছাত্রকে চিকিৎসাবিদ্যা শেখাতে একজন দক্ষ চিকিৎসক নিয়োগের নির্দেশ দেন খলিফা মুস্তানসির। ফকিহ ও মুহাদিসদের যে ভাতা দেওয়া হতো, তাদের সবার জন্যই সে-রকম ভাতার ব্যবস্থা করা হয়।<sup>[২]</sup>

[১] যাহাবী: দুওয়ালুল ইসলাম: ১: ১৭১।

[২] আল মাদরাসাতুল মুস্তানসিরিয়া: নাজি মারুফ পৃ ৪৬।



## ইসলামি বিশ্বে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা

সেলজুকদের ইরাক জয় এবং ৪৪৭ হিজরিতে বিজয়ীর বেশে বাগদাদে প্রবেশ ছিল শিয়াদের ওপর আহলুস সুন্নাহর বিজয়ের সূচনা। বুওয়াইহ শাসকগণ শিয়া মতাদর্শ প্রচারে যে অপতৎপরতা শুরু করেছিলেন, এ সময় থেকেই তা বন্ধ হয়ে যায়। সেলজুক শাসকগণ উপলব্ধি করেন, বিকল্প প্রচারনা ও সঠিক ইসলামি শিক্ষার প্রসারণ ছাড়া অপতৎপরতা নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয়। জ্ঞানের প্রচারই মুক্তির একমাত্র পথ। মানুষ যখন ধর্মের সঠিক জ্ঞান লাভ করবে, তখন তারাই বুঝতে পারবে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এসব মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন আলপ আরাসালান ও মালিকশাহের অন্যতম মহান উজির নিজামুল মুলক। এসব মাদরাসাকে তাঁর নামের দিকে সম্বোধন করেই ‘আল-মাদরাসাতুন নিজামিয়া’ বলে ডাকা হয়। তিনি ছিলেন সুমহান ও ভাবগাম্ভীর্যের প্রতীক। ধীরে ধীরে এসব মাদরাসার প্রচার-প্রসার ঘটতে থাকে। প্রতিটি শহরে এ রকম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। সামনে এ মহান উজিরের বৃত্তান্তে এ বিষয়ে আলোচনা আসবে।

তখন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা কেবল এক লক্ষ্যের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কারণ নিজামুল মুলকের পর যেসব সেলজুক শাসক ও উজির এসেছেন, সবাই মাদরাসা ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সেলজুকদের বিপরীতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা শাহ রাজবংশ ও আতাবেকগণও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তাদের পর দৃশ্যপটে আসেন দুঃসাহসী বীর নুরুদ্দিন জেনগি। প্রথমে সিরিয়া এবং পরে মিশর বিজয় করা এ রাষ্ট্রনায়ক শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিপ্লব সৃষ্টি করেন, তা সেলজুক, আইয়ুবি, শাহ ও আতাবেক সবাই মিলেও পারেননি। তিনিই দামিশকে সর্বপ্রথম মাদরাসা নির্মাণ করেন। তাঁর শাসনামল নানা ঐতিহাসিক কীর্তিতে সমৃদ্ধ ছিল। এর অন্যতম হলো, রাজ্যের প্রতিটি শহর ও গ্রামে মাদরাসা নির্মাণ।

আইয়ুবি শাসকগণ মিশরে শিয়াদের অপতৎপরতার লাগাম টেনে ধরেন। মিশরকে আহলুস সুন্নাহদের মতাদর্শে রূপান্তরিত করেন। বাগদাদের খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুধু এতটুকু করেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি; মানুষের বুদ্ধি ও বিশ্বাস পবিত্র করতে মিশরে তাঁরা মাদরাসা প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগ দেন। অল্পদিনেই প্রচুর মাদরাসা গড়ে ওঠে। সুপ্রাচীন সময়ের ব্যবধানে আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শ মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেয়। এ শাসনামলে কেবল আমির-উমারা, ব্যবসায়ী ও অভিজাত শ্রেণিই নয়; বরং কর্মচারীগণও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা এবং শুদ্ধ জ্ঞানের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। নিজামুল মুলক,

নুরুদ্দিন জেনগি ও আইয়ুবী শাসকদের প্রতিষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ মাদরাসাগুলো নিয়ে নিচে সামান্য আলোচনা করা হলো।

### ❁ নিজামুল মুলকের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাসমূহ

আবু শামা লেখেন : বিশ্বব্যাপী নিজামুল মুলকের মাদরাসাসমূহ প্রসিদ্ধ। কোনো শহরই এসব মাদরাসা থেকে বঞ্চিত নয়। এমনকি পৃথিবীর এক প্রান্তে থাকা ইবনু উমর দ্বীপেও মাদরাসা গড়ে তুলেন নিজামুল মুলক। এখন (আবু শামার জীবদ্দশায়) এই মাদরাসাকে সবাই ‘মাদরাসা রাজিয়ুদ্দিন’ নামে চেনে।<sup>[১]</sup> ইমাদুদ্দীন আল-আসফাহানি লেখেন : যে এলাকাতেই জ্ঞানে-গুণে সমৃদ্ধ কাউকে পেয়েছেন, সেখানেই তাঁর জ্ঞানের প্রচার-প্রসারের জন্য তিনি একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। মাদরাসার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ওয়াকফ প্রকল্প চালু করেছেন এবং সেখানে সমৃদ্ধ পাঠাগার স্থাপন করেছেন।<sup>[২]</sup>

ইবনুল আসির এবং ইবনুল জাওযিও একই রকম কথা বলেছেন। এগুলো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, নিজামুল মুলক বিপুল সংখ্যক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে সেখানে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেন। পর্যাপ্ত অর্থ ও কিতাবাদি দিয়ে সেগুলো সমৃদ্ধ করেন। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ সুবকি এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, যেসব শহরে নিজামুল মুলক বড় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন সেগুলো হলো : বাগদাদ, বালখ, নিশাপুর, হেরাত, আসফাহান, বসরা, মারও, আমাল, মুসেল। অন্যান্য ইতিহাসবিদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে শেষদিকে সুবকি বলেন, বলা হয়—ইরাক ও খুরাসানের প্রতিটি শহরে নিজামুল মুলকের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা আছে।<sup>[৩]</sup>

বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত আল-মাদরাসাতুন নিজামিয়া ছিল সর্বপ্রথম নির্মিত তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাদরাসা। ৪৫৭ হিজরিতে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। মাদরাসাটির অবস্থান ছিল দাজলা নদীর তীরে। এর কারিগর ছিলেন আবু সাইদ নুফী। ৪৫৯ হিজরিতে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এরপর সুন্দর ব্যবস্থাপনা দিয়ে তা সাজানো হয়। তাতে শিক্ষকতা করতেন শাইখ আবু ইসহাক শিরাজি (রাহিমাহুল্লাহ)। তিনি চেপে থাকা জ্ঞানকে আরও বিকশিত করেন। সন্দেহের অন্ধকার দূরীভূত করে উদ্ভাসিত করেন সত্যকে। সকল মৌলিক ও শাখাগত বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন সব রকমের দলিল-

[১] আর রাওজাতাইন: ১: ২৫।

[২] তারিখু আলি সালজুক: পৃ ৫৭।

[৩] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যা আল কুবরা ৩: ১৩৭।



প্রমাণ।<sup>[১]</sup>

### ✽ নুরুদ্দিন জেনগির প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাসমূহ

দামিশকে সর্বপ্রথম মাদরাসা নির্মাণ করেন নুরুদ্দিন জেনগি। এ কথা আগেই আলোচনা করেছি। আরও যোগ করতে চাই যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাসমূহের সংখ্যা ছিল প্রচুর। সিরিয়ার প্রতিটি শহরে ও গ্রামে সেগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।<sup>[২]</sup> ইতিহাসের নানা গ্রন্থে এসব মাদরাসার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। নিচে সেগুলো তুলে ধরছি।

ক্র.	মাদরাসার নাম	উৎস		
		লেখক	গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
দামিশক	দারুল হাদিস আন-নুরিয়া	নুআইমি	তারিখুল মাদারিস	১/৯৯
	আস-সালাহিয়া	নুআইমি	তারিখুল মাদারিস	১/৩৩১
	আল-ইমাদিয়া	নুআইমি	তারিখুল মাদারিস	১/৪৪৭
	আল-কালাসা	নুআইমি	তারিখুল মাদারিস	১/৪৪৭
	আন-নুরিয়াতুল কুবরা	নুআইমি	তারিখুল মাদারিস	১/৬০৬
	আন-নুরিয়া আস-সুগরা	নুআইমি	তারিখুল মাদারিস	১/৬৪৮
আলেপ্পো	আল-হালাভিয়া		আ'লামুন নুবালা	২/৭১
	আল-আসরুনিয়া		আ'লামুন নুবালা	২/৭৫
	আন-নুরিয়া		আ'লামুন নুবালা	২/৭৬
	আশ-শুআইবিয়া		আ'লামুন নুবালা	২/৭৬
অন্যত্র	হুমাত (দুটি মাদরাসা)		মুফাররিজুল কুরুব	১৬৫
	হিমস (দুটি মাদরাসা)		মুফাররিজুল কুরুব	১৬৫
	বা'লাবাক মাদরাসা	নুআইমি	তারিখুল মাদারিস	১/৪০১

[১] তারিখু আলে সালজুক: পৃ ৩৩।

[২] আর রাওয়াতইন: ১: ১৪।

মাদরাসার তালিকা শেষ করে এসব মাদরাসা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

## ❖ আইয়ুবি শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাসমূহ

ক) শাসক ও সুলতানদের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাসমূহ :

মাদরাসা	প্রতিষ্ঠাতা	তথ্যের উৎস	মন্তব্য
মিশর			
আল-আতিক মসজিদের পাশে নির্মিত আন-নাসিরিয়া	সালাহুদ্দিন	আল-খুতাত: ১/৩৬৩	ইবনু দিকমাক: ৪/৯৩
আল-কামহিয়া	সালাহুদ্দিন	আল-খুতাত: ১/৩৬৪	ইবনু দিকমাক: ৪/৯৫
আস-সুযুফিয়া	সালাহুদ্দিন	আল-খুতাত: ১/৩৬৫	হুসনুল মুহবার: ২/১৫৭
আন-নাসিরিয়া বিল কারাফাহ	সালাহুদ্দিন	আল-খুতাত: ১/৪০০	
আল-মালিকুল আদিল	আদিল	আল-খুতাত: ১/৩৬৫	
আল-কামিলিয়া	কামিল	আল-খুতাত: ১/৩৭৫	হুসনুল মুহবারা: ২/১৫৯
আস-সালিহিয়া	সালিহ নাজমুদ্দিন আইয়ুব	আল-খুতাত: ১/৩৭৪	
বায়তুল মাকদিস			
আস-সালিহিয়া	সালাহুদ্দিন	আল-উনসুল জালিল: ১/৩৯৩	
আল-আফদালিয়া	আফদাল বিন সালাহুদ্দিন	আল-উনসুল জালিল: ১/৩৯৭	
আন-নাবিয়া	মুয়াজ্জাম ঈসা	আল-উনসুল জালিল: ১/৩৮৬	
দামিশক			
আস-সালিহিয়া	সালাহুদ্দিন	নুআইমি: ১/১০	
আল-আজিজিয়া	আজিজ বিন সালাহুদ্দিন	নুআইমি: ১/৩৮২	



আল-যাহিরিয়া আল-বারানিয়া	যাহির বিন সালাহুদ্দিন	নুআইমি: ১/৪৩০	
আল-আদিলিয়া আল-কুবরা	আদিল	নুআইমি: ১/৩৫৯	
আল-মুয়াজ্জামিয়া	মুয়াজ্জাম ইসা	নুআইমি: ১/৫৭৯	
দারুল হাদিস আল-আশরাফিয়া আল-বারানিয়া	মুসা বিন আদিল	নুআইমি: ১/৪৭	
আল-আজিজিয়া	আজিজ বিন আদিল	নুআইমি: ১/৫৪৯	

খ) আমির উমারা ও মহান ব্যক্তিবর্গের নির্মিত মাদরাসাসমূহ:

আইয়ুবী শাসনামলে 'আমির' শব্দটি কেবল রাজবংশের লোকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং সেনাপতি ও রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ লোকদের ক্ষেত্রেও এ শব্দের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। তাই এ দুটোর মাঝে পার্থক্য করতে আমরা আইয়ুবী রাজবংশের লোকদের বেলায় 'আইয়ুবী আমির' বলব।

মাদরাসা	প্রতিষ্ঠাতা	প্রতিষ্ঠাতার পরিচয়	তথ্যের উৎস
মিশর			
আল-কুতবিয়া	কুতবুদ্দিন খসরু	আমির	আল-খুতাত: ১/৩৩৫
মানাগিলু ইয়	তকিয়ুদ্দিন উমর	আইয়ুবী আমির	আল-খুতাত: ১/৩৩৪
আল-ফুয়ুমের দুটি মাদরাসা	তকিয়ুদ্দিন উমর	আইয়ুবী আমির	আল-খুতাত: ২/৩৩৫
আল-ফাযিলিয়া	কাযি ফাদিল	উজির	আল-খুতাত: ১/৩৩৬
আল-আযকাশিয়া	সাইফুদ্দিন আযায় কুজ	আমির	আল-খুতাত: ২/৩৩৭
আস-সাইফিয়া	সাইফুদ্দিন বিন আইয়ুব	আইয়ুবী আমির	আল-খুতাত: ২/৩৩৮
আল-আশুবিয়া	আশুরা বিনতু সারক	আমিরের স্ত্রী	আল-খুতাত: ২/৩৩৯
আল-কুতবিয়া	ইসমাতুদ্দিন বিনতুল আদিল	আইয়ুবী আমির	আল-খুতাত: ২/৩৩৮

আল-শারিফিয়া	শরিফ ফখরুদ্দিন	মীর	আল-খুতাত: ২/৩৭১
আস-সাহিবিয়া	আবদুল্লাহ বিন আলি	উজির	আল-খুতাত: ২/৩৬৭
আল-ফাখরিয়া	ফখরুদ্দিন ইয়ারুমি		আল-খুতাত: ২/৩৬৮
আস-সাইরামিয়া	জামালুদ্দিন বিন সাইরাম	আমির	আল-খুতাত: ২/৩৬৮
আল-ফাইযিয়া	শরফুদ্দিন হিবাতুল্লাহ	উজির	আল-খুতাত: ২/৩৬৫
বায়তুল মাকদিস			
আল-মাইমুনিয়া	মাইমুন বিন আবদিল্লাহ	আমির	আল-উনসুল জালিল: ২/৩৯৯
আল-বাদরিয়া	বাদরুদ্দিন ইবনু আবিল কাসিম	আমির	আল-উনসুল জালিল: ২/৩৯৮
দামিশক			
আস-সাহিবিয়া	রবিআ বিনতু নাজমুদ্দিন	আইয়ুবি আমির	নুআইমি: ২/৭৯
আল-ফারুখশাহিয়া	ফারুখশাহ ইবনু শাহিনশাহ	আইয়ুবি আমির	নুআইমি: ১/৫৬১
আল-আযুরিয়া	আযরা বিনতু নরিদাওলা	আইয়ুবি আমির	নুআইমি: ১/৩৭৩
আত-তাকবিয়া	তাকিয়ুদ্দিন ইবনু শাহিনশাহ	আইয়ুবি আমির	নুআইমি: ১/৩১৬
আশ-শামিয়াতুল বারানিয়া	সিতুশ শাম বিনতু নাজমুদ্দিন	আইয়ুবি আমির	নুআইমি: ১/২৭৭
আশ-শামিয়াতুল জাওয়ানিয়া	সিতুশ শাম বিনতু নাজমুদ্দিন	আইয়ুবি আমির	নুআইমি: ১/৩০১
আল-মারওয়ানিয়া	খাতুন আজিজা	আল মুয়াজ্জামের স্ত্রী	নুআইমি: ১/৫৯২
আল-বাহানসিয়া	মাজদুদ্দিন বাহানসি	উজির	নুআইমি: ১/২১৫
আল-আতাবিকিয়া	খাতুন বিনতু ইজ্জুদ্দিন	আশরাফের স্ত্রী	নুআইমি: ১/১২৯



আল- আজিজিয়াতুল বারানিয়া	ইজ্জুদ্দিন আজমী	সারখাদের বাদশাহর নায়েব	নুআইমি: ১/৫৫০
আল- আজিজিয়াতুল জাওয়ানিয়া	ইজ্জুদ্দিন আজমী	সারখাদের বাদশাহর নায়েব	নুআইমি: ১/৫৫০
আল-আজিজিয়াতুল হানাফিয়া	ইজ্জুদ্দিন আজমী	সারখাদের বাদশাহর নায়েব	নুআইমি: ১/৫৫৭

গ) সাধারণ মানুষদের প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি মাদরাসাসমূহ :

মাদরাসা	প্রতিষ্ঠাতা	প্রতিষ্ঠাতার পরিচয়	তথ্যের উৎস
মিশর			
ইবনুল আরসুফি	আবদুল্লাহ ইবনুল আরসুফি	ব্যবসায়ী	আল-খুতাত: ২/৩৬৪
আল-মাসরুরিয়া	মাসরুর সাফাদি	খাদেম	আল-খুতাত: ২/৩৭৮
আল-গাযনাভিয়া	হুসামুদ্দিন কাইমায	আজাদকৃত দাস	আল-খুতাত: ২/৩৯০
ইবনু রুশাইক	হাজ্জাজ তাকরুর		আল-খুতাত: ২/৩৬৫
দামিশক			
আল-আসরুরিয়া	ফরফুদ্দিন বিন আসরুর	বিচারপতি	নুআইমি: ১/৩৯৮
আল-ফালাকিয়া	ফালাকুদ্দিন সুলাইমান	আল-মালিকুল আদিলের সৎভাই	নুআইমি: ১/৪৩১
লা-কুবালিয়া	জামালুদ্দিন ইকবাল	আজাদকৃত দাস	নুআইমি: ১/১৫৮
আল-মাসরুরিয়া	শিবলুদ্দিন কাফুর	খাদেম	নুআইমি: ১/৪৫৫
আল-উমরিয়া	আবু উমর মাকদিসি	বিচারপতি	নুআইমি: ২/১০০
দারুল হাদিস	শরফুদ্দিন বিন আরওয়া	ফকিহ	নুআইমি: ১/৮২
আল-আরাভিয়া	যকিয়ুদ্দিন বিন রাওয়াহা	ব্যবসায়ী	নুআইমি: ১/২৬৫

আম সারিমিয়া	আবু মুদ্দিন বিন উজ্জেক	আজাদকৃত দাস	নুআইমি: ১/৩১৬
আশ শিবলিয়াতুল বারানিয়া	শিবলুদ্দিন কাফুর	খাদেম	নুআইমি: ১/৫৩০
আব-রুকনিয়া	রুকনুদ্দিন মানকুরিস	আজাদকৃত দাস	নুআইমি: ১/২৫৩
আদ-দাওলাঈয়া	জামালুদ্দিন দাওলাঈ	ফকিহ	নুআইমি: ১/২৪২
আদ-দিমাগিয়া	শুজাউদ্দিন ইবনুদ দিমাগের স্ত্রী	ফকিহ	নুআইমি: ১/২৩৬
আদ-দাখুরিয়া	মুহাযযিবুদ্দিন দাখুর	ডাক্তার	নুআইমি: ২/১২৭
আদ-দুনাইসিরিয়া	ইমাদুদ্দিন দুনাইসিরি	ডাক্তার	নুআইমি: ২/১৩৩

## দুটি গুরুত্বপূর্ণ টীকা

» ১. মনে হচ্ছে চিকিৎসা বিদ্যালয় সে সময় অনেক কম ছিল। এর কারণ হলো, সে সময় বিশেষ এসব মাদরাসায় মেডিক্যাল সাইন্স পড়ানো হতো না। বেশিরভাগ তা শেখানো হতো হাসপাতালে। যেন শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পাশাপাশি অভিজ্ঞ ডাক্তারদের সঙ্গে থেকে সরাসরি রোগীদের দেখে চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা করতে পারে। কেননা হাসপাতালে তখন বড় হলরুম ছিল। যেখানে শিক্ষার্থীরা ডাক্তারদের নানা বিষয়ের পাঠ গ্রহণ করত। এরপর সেই হল থেকে তারা রোগীদের পরিদর্শন করতে এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারদের সামনে তাদের চিকিৎসা চর্চা করতে চলে আসত। ইবনু আবু উসাইবিয়া লেখেন: [১] দামিশকের প্রাণকেন্দ্রে আল-মালিকুল আদিল কর্তৃক নির্মিত বড় বিমারিস্তানে (হসপিটালে) নিয়মিত রোগী দেখতেন পাঁচ শ ... হিজরিতে মৃত্যুবরণ করা বিখ্যাত চিকিৎসক আবুল মাজদ আবুল হাকাম। তিনি এসে প্রথমে হলরুমে বসতেন। চিকিৎসাবিদ্যার নানা বই-পুস্তক সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। শহরের নামকরা চিকিৎসকগণ তার কাছে আসতেন। তার সামনে বসতেন। দীর্ঘ সময় তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলতেন। চিকিৎসাবিদ্যার নানা বিষয় নিয়ে সংলাপ করতেন। ছাত্রদের পড়াতেন। এভাবে বই পুস্তক ও আলোচনা সংলাপে তিন ঘণ্টা করে ব্যয় করতেন। তেমনি কায়রোর আল-মানসুরি মারিস্তানেও একই ধরনের কার্যক্রম চলত। সেখানে চিকিৎসা-বিষয়ক আলোচনা করতে নির্দিষ্ট একটি

[১] উয়ুনুল আনবা: ২: ১৫৫।



স্থানে বসতেন প্রধান ডাক্তার।<sup>[১]</sup> এসব যুগে ইসলামি বিশ্বে প্রচুর পরিমাণে হাসপাতাল ও ক্লিনিক নির্মিত হয়। এর পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বে সূচিত হয় চিকিৎসাবিদ্যার এক নতুন জাগরণ।

» ২. বিস্তারিত আলোচনার জন্য নমুনা হিসেবে আমি দামিশকের আল-মাদরাসাতুন নুরিয়াকে বেছে নিচ্ছি। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আমি তা পরিদর্শন করে এ নিয়ে গবেষণা করি। নিচে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরছি।

## আল-মাদরাসাতুন নুরিয়াতুল কুবরা

উদ্বোধনের কয়েক বছর পর ৬১৪ হিজরিতে বিখ্যাত পর্যটক ইবনু জুবাইর মাদরাসাটি পরিদর্শন করে সে সম্পর্কে যে বিবরণ তুলে ধরেন। তা সেই যুগে মাদরাসার উন্নত রূপ ও আধুনিক সৌন্দর্যকেই স্পষ্ট করে। তার বিবরণ থেকে আমি নিচে কয়েক লাইন উল্লেখ করছি:

‘অবকাঠামোগত সৌন্দর্যের দিক থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মাদরাসা হলো নুরুদ্দিন রাহিমাউল্লাহর নির্মিত মাদরাসা। দৃষ্টিনন্দন ভবনটির মাঝখানে রয়েছে জলাশয়। তাতে রয়েছে পানির ফোয়ারা। এক চৌবাচ্চা থেকে অপর চৌবাচ্চার মাঝে রয়েছে লম্বা পানির নালা। সবগুলো এসে মিলেছে ভবনের কেন্দ্রে থাকা জলাশয়ে। এর সৌন্দর্য দেখে সত্যিই মুগ্ধ হতে হয়।<sup>[২]</sup> নানা ঝড়ঝাপ্টা ও দুর্ঘটনার কারণে এ মহান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অনেক সৌন্দর্য নষ্ট হলেও আজও তার ভাবগাভীর্য একটুও কমেনি। আজও যেন সেই স্বর্ণালি সময় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রতিষ্ঠানটি। উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব উপায় উপকরণ ও ব্যবস্থাপনা এখানে রয়েছে।

আবু শামা<sup>[৩]</sup> (মৃত্যু ৬৬৫ হিজরি) এবং ইবনু শাদাদে<sup>[৪]</sup> (মৃত্যু ৬৪৮ হিজরি) বিবরণ অনুযায়ী ৫৬৩ হিজরিতে নুরুদ্দিন মাহমুদ জেনগি এ মাদরাসা নির্মাণ করেন। তবে নুআইমি (মৃত্যু ৯৭৩ হিজরি) এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন। যদিও তিনি তাঁর অধিকাংশ লেখায় ইবনু শাদাদে<sup>[৪]</sup> ওপর নির্ভরশীল। অধিকাংশ তথ্য তিনি ইবনু শাদাদ থেকেই গ্রহণ করেছেন। নুআইমির বক্তব্য

[১] মাকরিযি: আল-খুতাত ২: ৪০৬।

[২] রিহলাতু ইবনি জুবাইর পৃ ২৮৪।

[৩] আর রাওজাতাইন ১: ২২৯।

[৪] আল আ'লাকুল খাতীরা পৃ ৪৪ (হস্তলিখিত)।

হলো : এ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ইসমাইল বিন নুরুদ্দিন।<sup>[১]</sup> তবে তাঁর এ দাবির পক্ষে তিনি শক্তিশালী কোনো প্রমাণ পেশ করেননি। তিনি ইঙ্গিত করেন যে, ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে নুরুদ্দিনের লাশ এ মাদরাসায় দাফন করা হয়নি; বরং শুরুতে তা অন্যত্র দাফন করা হয়। পরবর্তী সময় তা বর্তমান কবরে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু তাঁর এ বক্তব্যের দ্বারা মাদরাসাটি ইসমাইলের আমলে নির্মিত হয়েছে, এ কথা বোঝায় না। হতে পারে মাদরাসাটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে উদ্বোধন হয়েছে নুরুদ্দিন জেনগির আমলে। আর কবরস্থানের জন্য জায়গা বরাদ্দ করা হয়েছে পরে। কারণ, কবরস্থান একটি মাদরাসার প্রধান অনুবঙ্গ নয়। তাই তো বিভিন্ন মাদরাসার পাশে যে কবরস্থান আমরা দেখি, তা মাদরাসা নির্মাণের সময় পরিকল্পনাধীন থাকে না। বরং পরবর্তী সময় তা বিশেষ কারণে যুক্ত করা হয়। ফলে নুরুদ্দিন জেনগির মৃত্যুর পর মূল কবরস্থান তৈরি না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে তাঁকে অন্যত্র দাফন করা হয়। এরপর তা পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে গেলে সেখানে তাঁর লাশ স্থানান্তর করা হয়। এই মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা নুরুদ্দিন জেনগি নিজে—এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো মাদরাসার ফটকের ওপর খোদাই করে লেখা পাথরের বড় লিপি। প্রাচীন এই লিপির তারিখ হলো ৫৬৭ হিজরি। অর্থাৎ নুরুদ্দিন জেনগির শাসনকাল। এর দুই বছর পর তিনি ইন্তেকাল করেন। সেই লিপিতে স্পষ্ট করে লেখা আছে যে, এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন নুরুদ্দিন জেনগি। আমার মনে হয় নুআইমি এ লিপি দেখেননি। তাঁর মতামত আমরা সামনে উল্লেখ করব।

খাওয়াসিন এলাকায় এ প্রতিষ্ঠানের অবস্থান। দামিশকের স্থানীয় লোকজন বর্তমানে এ এলাকাকে খাইয়াতিনদের (দর্জীদের) এলাকা হিসেবে চিনে। উমাভী জামে মসজিদ থেকে পশ্চিম দিকে আধা মাইল দূরে তা অবস্থিত।

মাদরাসাটি শুরুতে ১৫০০ বর্গমিটার জায়গার ওপর নির্মিত ছিল। পরে প্রতিবেশী কিছু লোক এক পাশ থেকে ১৫০ বর্গমিটার জায়গা দখল করে নেয়। মূল ভবনটি ভেঙে পরবর্তী সময় তা সংস্কার ও নবায়ন করা হয়। পুরোনো স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে কেবল ফটক, অভ্যর্থনাকক্ষ, গম্বুজ ও আঙিনার ডিজাইন অবশিষ্ট আছে। তবে নবনির্মিত কাঠামো অনেকটাই পুরোনো কাঠামোর সঙ্গে মিল রেখে তৈরি করা হয়েছে।<sup>[২]</sup>

মাদরাসার ভবনগুলো আঙিনার নানা প্রান্তে তৈরি করা। মাঝখানে প্রায় ৩৪০ বর্গমিটার আয়তনের একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। সেখানে কিছু গাছ লাগানো।

[১] আদ দারিসু ফি তারিখিল মাদারিস ১: ৬০৭।

[২] আসআদ আতলাস: যাইল সিমারিল মাকাসিদ পৃ ২৫৮।



এর মধ্যস্থলে ৭/৮ মিটার দীর্ঘ এবং ৫/৬ মিটার প্রস্থ একটি জলাশয়। তাতে রয়েছে পানি প্রবাহের নালা। যা ফটকের উল্টো পাশে থাকা কবরনার সঙ্গে সংযুক্ত। এই নালা ছোট একটি খালের সঙ্গে যুক্ত, যেখানে দামিশকের সাতটি বড় নদীর একটি থেকে পানি প্রবাহিত হতো।<sup>[১]</sup>

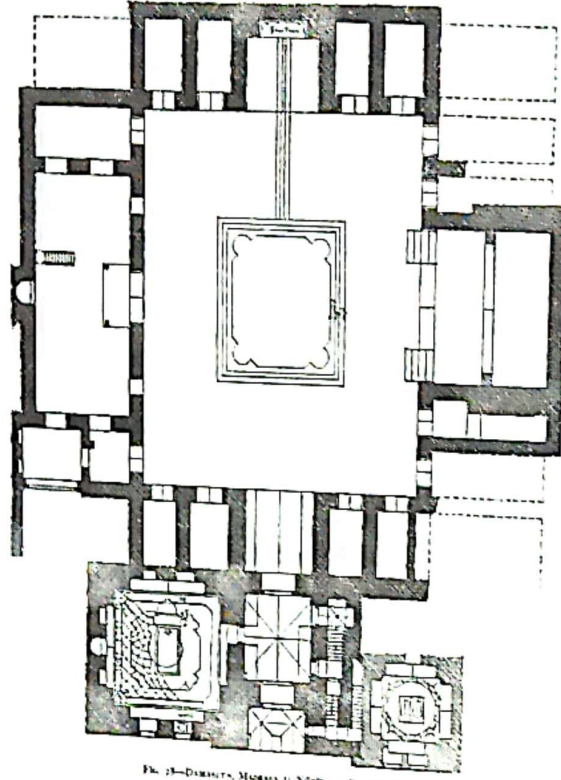


FIG. 25—DURRATUL MADRASAT NURIYA AT KURUS, EGYPT

## ✽ মাদরাসা

### ভবনের নকশা

সেই প্রাচীন ফটকটিই মাদরাসার বর্তমান গেট। সেটি একটি বিশাল প্রবেশদ্বার। সুনিপুণভাবে তৈরি এ ফটকের ওপরের দিকে বড় পাথরে খোদাই করে আস-সুলুস ফন্টি লেখা রয়েছে মাদরাসার নাম, প্রতিষ্ঠার তারিখ এবং ওয়াকফ প্রকল্পসমূহের তালিকা। প্রবেশের পরই একটি লম্বা পথ। এর মাঝামাঝি স্থানে আরেকটি

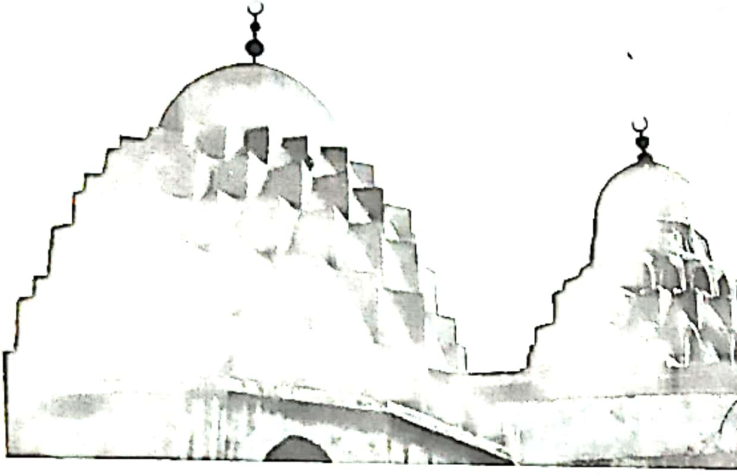
আল মাদরাসাতুন নুরিয়া আল কুবরা ভবনের নকশা প্রবেশস্থল, যাতে কোনো দরজা নেই। এ পথ ধরেই মাদরাসার মূল আঙিনায় যেতে হয়।

বারান্দার পথ ধরে হাঁটতে থাকলে বাম পাশে পড়বে শেখ মুহাম্মাদ দাকিক আল-ঈদের (মৃত্যু ৭০২ হিজরি) কবর। কবরের অন্য প্রান্তের দরজা রাস্তার সঙ্গে সংযুক্ত। বাম দিকে পড়বে প্রতিষ্ঠাতা নুরুদ্দিন জেনগির কবর। কবরের ওপর মুগ্ধকর শৈল্পিক সৌন্দর্যে নির্মিত একটি গম্বুজ। আলমারিস্তান আন-নুরিতেও (চিকিৎসালয়) ঠিক একই রকম একটি গম্বুজ আছে। তা ছাড়া পুরো দামিশক জুড়ে এ রকম তৃতীয় কোনো গম্বুজ নেই।

বারান্দার পথ ধরে শাইখ দাকিক আল-ঈদের কবরের পাশ দিয়ে একটি

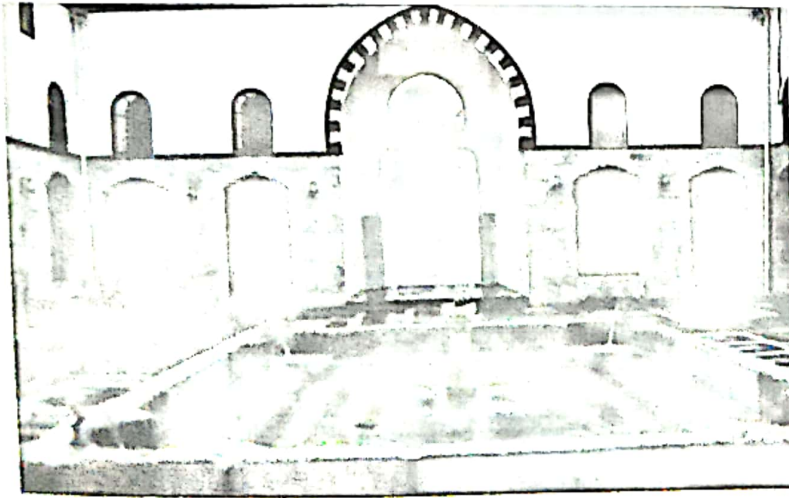
[১] সালাহুদ্দিন আল মুনায্জিদ: খুতাতু দিমাশক পৃ ৩৩।

দরজা চলে গেছে সিঁড়িঘরের দিকে। আর সেই সিঁড়ি দিয়ে যেতে হয় মাদরাসা শিক্ষকদের বিশেষ আবাসস্থলে। আমার পরিদর্শনকালে এ আবাসস্থলে অবস্থান করছিলেন শাইখ সালিহ আল-আক্কাদ। এই সিঁড়ির মধ্যস্থল থেকে আরেকটি শাখা অন্য দিকে চলে গেছে। ছয় মিটার লম্বা একটি খুঁটির চারপাশে নির্মিত এ সিঁড়ি। খুঁটিটি মূলত মিনারার ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি দিয়ে ওপরে উঠতে থাকলে মাদরাসার ছাদে পৌঁছা যায়।



নুরুদ্দিন জেনগির কবরের ওপর নির্মিত গম্বুজের চিত্র

কম। তবে এ ইওয়ানের কোনো প্রবেশদ্বার নেই। উন্মুক্ত এ হলের দুই প্রান্ত সিঁড়ির সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষার্থীগণ ওই সিঁড়ি দিয়ে হলে উপস্থিত হয়। আঙিনা থেকে ইওয়ানের উচ্চতা প্রায় এক মিটার।



আল-মাদরাসাতুন নুরিয়াতুল কুবরার প্রশস্ত আঙিনা

কারণে। আর মসজিদ কেবল ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। মসজিদ ছিল

## ১) ইওয়ান বা বড়

হলরুম : আমরা আগেই বলেছি ইওয়ান ছিল মাদরাসার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঙ্গ। আল-মাদরাসাতুন নুরিয়াতুল কুবরার ইওয়ানও ছিল বেশ বড়। দৈর্ঘ্যে সোয়া আট মিটার আর প্রস্থে আট মিটারের চেয়ে কিছু

## ২) মসজিদ :

ভেতর থেকে দেখলে হলরুমটি আঙিনার ডানপাশে পড়বে। আর বাম পাশে মসজিদ। হলরুমকে মসজিদ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে যৌক্তিক



সকলের ইবাদতের জন্য উন্মুক্ত। তাই হলরুমকে মসজিদ থেকে যথেষ্ট দূরে নির্মাণ করা হয়েছে। যেন হলরুমে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা, আলোচনা, বিতর্ক অনুষ্ঠান ও সংলাপের আয়োজ মসজিদে ইবাদতরত মুসল্লিদের কানে না পৌঁছায়। আন-নুরিয়া মসজিদের একটি প্রাচীন মেহরাব রয়েছে। তিনটি গম্বুজাকৃতির উন্মুক্ত ফটকের ওপাশেই রয়েছে মসজিদ। এগুলো বন্ধ করার মতো কোনো দরজা নেই। মাঝখানের ফটকটি একটু বড়।

৩) শিক্ষকের রেস্ট হাউজ : মসজিদের পূর্ব পাশে রয়েছে দুটি ছোট কক্ষ। প্রতিটি কক্ষে রয়েছে মসজিদে প্রবেশের দরজা। আরেকটি অভ্যন্তরীণ দরজা রয়েছে, যা দিয়ে দুই রুমে যাতায়াত করা যায়। এই রুম দুটিকে প্রস্তুত করা হয়েছে শিক্ষকদের বিশ্রামের জন্য। আজও কক্ষ দুটি একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অপরদিকে শিক্ষকের আবাসস্থল নির্মাণ করা হয়েছে তাদের বসবাসের জন্য।

৪) ছাত্র হোস্টেল : আবাসিক ছাত্রদের বসবাসের জন্য এগুলো নির্মিত। এগুলো নানা ইউনিটে বিভক্ত। প্রতিটি ইউনিটে আছে দুটি করে কক্ষ। যার একটি অপরটির ওপর নির্মিত। এ দুটোতে ওঠানামার জন্য রয়েছে অভ্যন্তরীণ সিঁড়ি। এসব আবাসকক্ষ আজও একই কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেখানে শিক্ষার্থীরা অবস্থান করে দামিশকের নানা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে থাকে।

৫) মাদরাসা প্রধানের নিবাস : এ নিবাসে বেশ কয়েকটি কক্ষ ও প্রয়োজনীয় সকল সুবিধা রয়েছে। আমি যখন পরিদর্শন করি, তখন এ বাসায় হাজি মাহমুদ জাওহার অবস্থান করছিলেন।

৬) ওয়াশরুম : আজও সেগুলো একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৭) বেদখলকৃত এলাকা : কিছু জায়গা মাদরাসার দখলে নেই। পঞ্চাশ বছর ধরে কিছু প্রতিবেশী তা দখল করে আছে। এমনটিই বললেন মাদরাসার প্রধান মাহমুদ জাওহার। ধারণা করা হয়, এ স্থানটি রান্নাঘর ও খাবার হল হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

৮) খাদ্যের গুদাম : দ্বিতীয় একটি জায়গা প্রায় একই সময়ে মাদরাসা থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ধারণা করা হয়, এটি ছিল নানা জাতের খাদ্য সংরক্ষণাগার।

৯) স্টোর রুম : আরও একটি জায়গা মাদরাসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিস সংরক্ষণের জন্য বরাদ্দ ছিল। ব্ল্যাকবোর্ড, অতিরিক্ত বাতি, বিছানা, কার্পেট ইত্যাদি বস্তু এখানে সংরক্ষণ করা হতো। হাজি মাহমুদ জাওহারের বক্তব্য

অনুযায়ী, চল্লিশ বছর যাবৎ এ জায়গাটি আর মাদরাসার নিয়ন্ত্রণে নেই। জায়গাটি অবহেলায় পড়ে থাকায় প্রতিবেশীরা সুযোগ বুঝে তা দখল করে নেয়। কিন্তু ওই সময়ের শিক্ষক তাদের চ্যালেঞ্জ করে তাদেরকে থামানোর বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি কুলিয়ে উঠতে পারেননি। তবে তিনি এই জায়গা উদ্ধারের আশা ছাড়েননি। কারণ পরবর্তী সময়ে মাদরাসার সীমানা ঘেঁষে যে দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছে এর পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন দুটি দরজা। দরজার পেছনেই বড় রুম ছিল তার প্রমাণ অক্ষত রাখতেই দরজা দুটিকে সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

### ✽ মাদরাসার শিক্ষকমণ্ডলী

এ মাদরাসায় বিশেষভাবে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহর মাযহাব অনুযায়ী ফিকহের পাঠ দেওয়া হতো। সেজন্যে হানাফি মাযহাবের প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন :

- » বাহাউদ্দিন ইবনু আকাদাহ। ৫৯৬ হিজরিতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। আমৃত্যু তিনি এ মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন।
- » বুরহানুদ্দিন মাসউদ। ৫৯৯ হিজরিতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। আমৃত্যু তিনি এ মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন।
- » শারায় দাউদ। ৬২৩ হিজরি সন পর্যন্ত তিনি তাতে শিক্ষকতা করেন। এরপর চাকুরি থেকে অব্যাহতি নেন।
- » তারপর নিয়োগ পান ধর্মীয় জ্ঞানে পরিপক্ব বিখ্যাত জামালুদ্দিন মাহমুদ বিন আহমাদ আল-হুসাইরি। ৬৩৬ হিজরিতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। আমৃত্যু তিনি এ মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন।
- » কিওয়ামুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন জামালুদ্দিন আল-হুসাইরির স্থলে শিক্ষকতা করেন সদরুদ্দিন ইবরাহিম। এরপর কিওয়ামুদ্দিন পরিণত বয়সে জ্ঞানে-গুণে পরিপক্ব হলে তিনি সেই পদে অধিষ্ঠিত হন। ৬৬৫ হিজরিতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। তিনিও আমৃত্যু এ মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন।
- » কিওয়ামুদ্দিনের পর তাঁর আপন ভাই নিজামুদ্দিন আল-হুসাইরি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ৬৯৮ হিজরিতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। তিনিও আমৃত্যু এ মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন।
- » সদরুদ্দিন আল-বাসরাভী। ৭২৭ হিজরিতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। আমৃত্যু তিনি এ মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন।

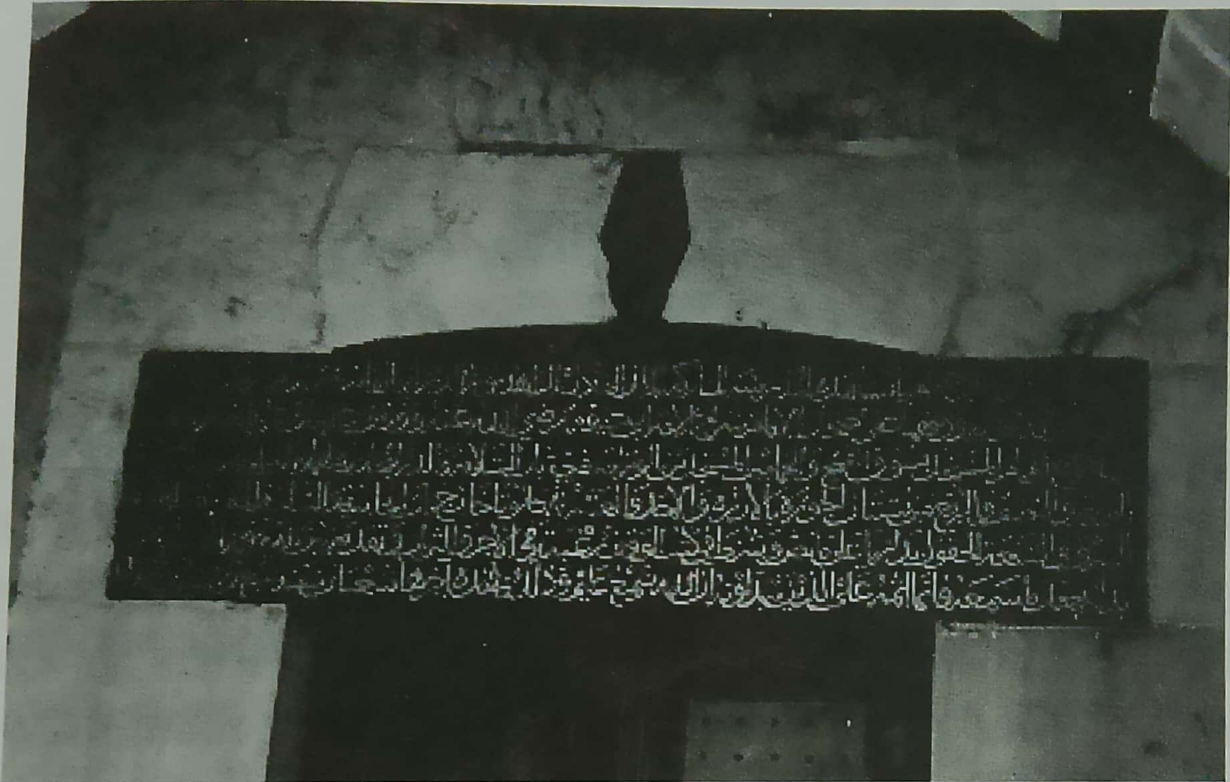


» ইমাদুদ্দিন ইবনুত তারতুসী। ৭৪৮ হিজরিতে তাঁর ইন্তেকাল হয়।  
আমৃত্যু তিনি এ মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন।

### ❖ মাদরাসার যত ওয়াকফ প্রকল্প

মাদরাসার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য কী কী ওয়াকফ প্রকল্পের ব্যবস্থা করা হয়, তা মাদরাসার প্রধান ফটকের ওপরের অংশে খোদাই করে লেখা আছে। সেই লেখাটি একদম স্পষ্ট। তাতে লেখা :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ধর্মপ্রাণ আল-মালিকুল আদিল নুরুদ্দিন আবুল কাসিম মাহমুদ বিন জেনগি বিন আকা সানকার এ মাদরাসা নির্মাণের আদেশ করেন। মহান আল্লাহ তাঁর পুরস্কার বহুগুণে বাড়িয়ে দিন। মুসলিম উম্মাহর আলোকবর্তিকা ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গীদের নামে তিনি এ মাদরাসা ওয়াকফ করেন। সকল ফকিহ ও ফিকহের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি ওয়াকফ করেন গম বাজারের নবনির্মিত সকল হাম্মামখানা। আস-সালামা ফটকের বাইরের অংশের গ্রন্থাগারের পাশে নির্মিত দুটি হাম্মামখানা এবং এ দুটির পাশের ভবন। তা ছাড়া আউনিয়াতুল হুম্মায় অবস্থিত গ্রন্থাগার, উজিরের ছোট বাগান, আল-জুরায় অবস্থিত গাছ বাগানের এক চতুর্থাংশ বা অর্ধাংশ, আল-জাবিয়া ফটকের বাইতে থাকা এগারোটি দোকান। এবং পূর্বপ্রান্তের লাগোয়া আঙিনা। দারিয়ার নয়টি চাষের জমি। কিতাবে উল্লেখিত ওয়াকফ-সংক্রান্ত সকল শর্ত মেনে পুরস্কার ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে এবং রোজ হাশরের ময়দানে তাঁর সামনে পেশ করার নিয়তে এগুলো ওয়াকফ করা হলো। এ কথা জানার পরও যে তাতে পরিবর্তন করবে, পরিবর্তনকারীদের ওপরই এর পাপের বোঝা চাপবে। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু শুনেন। এসব ওয়াকফকৃত সম্পত্তি পাঁচ শ সাতষট্টি হিজরির শাবান মাস শেষ হওয়ার আগেই মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দিতে হবে।



মাদরাসার প্রধান ফটকের ওপরের অংশে খোদাই করে লেখা নামফলক



## দ্বিতীয় অধ্যায়

# গ্রন্থাগার

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, শিক্ষা ও পাঠদানের ইতিহাস সংক্রান্ত বইয়ে গ্রন্থাগারের প্রসঙ্গ আসবে কেন? এর সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক কী? এর উত্তর হলো, গ্রন্থাগারই ছিল প্রাচীন যুগে জ্ঞানের উৎকর্ষ ও বিকাশের অন্যতম মাধ্যম। ধনী ও বিত্তবান শ্রেণী ছাড়া অন্যদের জন্য হস্তলিখিত দামি গ্রন্থ সংগ্রহ করা ছিল কঠিন। তাই শিক্ষানুরাগী মানুষেরা স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতেন। তাতে প্রচুর বইপত্র জমা করে বিদ্যার্থীদের জন্য দরজা উন্মুক্ত করে দিতেন। বাতলেসি রাজবংশ আলেকজান্দ্রিয়ায় এবং আব্বাসীয় শাসকগণ বাগদাদের বায়তুল হিকমায় এ রকম বিশাল গ্রন্থাগার নির্মাণ করেন।<sup>[১]</sup>

তৎকালীন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মূল চালিকাশক্তিই ছিল গ্রন্থ। যেমন, বাগদাদের বায়তুল হিকমা এবং কায়রোর দারুল হিকমাহ। তাই এসব প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষাকেন্দ্র বলা হবে, নাকি গ্রন্থাগার—এ নিয়ে ইতিহাসবিদদের মাঝে মতপার্থক্য দেখা যায়। এরপর এ দুটিই হয়ে ওঠে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত প্রতিষ্ঠানের জন্য নমুনা ও আদর্শ। তাই আমরা দেখি, আধুনিক যুগে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যে ভূমিকা পালন করে, সে সময় গ্রন্থাগারগুলোও একই ভূমিকা পালন করত। তা ছাড়াও বর্তমান যুগের গ্রন্থাগারসমূহ আরও বিস্তৃত ভূমিকা পালন করছে, তা অস্বীকার করার কোনো জো নেই।

একই উদ্দেশ্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত গ্রন্থাগারের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে। বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত সেই যুগের যেসব গ্রন্থাগার বর্তমান সময়ের বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা পালন করত, তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি।

» ইয়াকুত লেখেন:<sup>[২]</sup> বাগদাদের আল-কুফস গ্রামের এক প্রান্তে আলি ইবনু ইয়াহইয়া ইবনুল মুনায্জিমের একটি মূল্যবান প্রাসাদ ছিল। সেই

[১] জর্জ যাইদান: আত তামাদ্দুনুল ইসলামি ৩: ২১০।

[২] মু'জামুল উদাবা ৫: ৪৬৭।

প্রসাদে ছিল দামি দামি গ্রন্থের ভাণ্ডার। এটার নাম তিনি খাজানাতুল হিকমাহ রাখেন। শহরের নানা প্রান্ত থেকে বিদ্যার্থীরা এখানে আসত। এখানে অবস্থান করে নানা বিষয়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত্ব করত। সেখানে তাদের জন্য সব রকম গ্রন্থ উন্মুক্ত ছিল। আলি ইবনু ইয়াহইয়া নিজস্ব অর্থায়নে এর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতেন। এ গ্রন্থাগারে বিদ্যার্থীদের আবাসন ও খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। তবে কি তা মাদরাসার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়?! এটিকে মাদরাসায় রূপ দিতে বাকি ছিল শুধু শিক্ষকের। শুধু তাই নয়, অনেক গ্রন্থাগারে শিক্ষকও নিয়োজিত থাকতেন। এত কিছুর পরও সেটিকে মাদরাসা হিসেবে নামকরণ না-করার অনেকগুলো কারণের একটি হলো, ছাত্রদের উদ্দেশ্যে শিক্ষকের বসার কোনো রুটিন ছিল না এখানে। আর তা হয়তো অন্য কোথাও তার শিক্ষকতার কারণে। অথবা নানা গ্রন্থে সমৃদ্ধ থাকার দরুন সেখানে কোনো শিক্ষক দরকার ছিল না বলে। শিক্ষকের আলোচনা শোনার চেয়ে গ্রন্থ অধ্যয়নের দিকেই বিদ্যার্থীদের আগ্রহ বেশি ছিল। এ রকম আরেকটি জ্ঞানকেন্দ্র হলো মুসেলে প্রতিষ্ঠিত আবুল কাসিম জাফর বিন মুহাম্মাদ বিন হামদান আল-মুসিলির সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। সমকালীন সকল শাস্ত্রের নানা বইপুস্তকে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারটি সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য ওয়াকফ করে দেওয়া ছিল। সেখানে সবার উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার ছিল। ভিনদেশী বা দূরের কোনো দরিদ্র ব্যক্তি এখানে সাহিত্য শেখার জন্য এলে, তাকে বইপত্রের পাশাপাশি হাতখরচও দেওয়া হতো। প্রতিদিন তা খোলা থাকত। আবুল কাসিম ব্যস্ততা শেষ করে এখানে বসতেন। মানুষ তার কাছে জমায়েত হতো। তিনি নিজের ও অন্যান্য কবিদের কবিতা তাদের লিখে দিতেন।<sup>[১]</sup>

» রামহরমুজ শহরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগারের আলোচনা করতে গিয়ে মাকদিসি বলেন, বসরার গ্রন্থাগারের আদলে বিশাল গ্রন্থাগার আছে এখানে। দুটি গ্রন্থাগার নির্মাণ করেন ইবনু সিওয়ার। যারা গ্রন্থ অধ্যয়নে আসত এবং নিরবচ্ছিন্ন গবেষণাকর্মে লিপ্ত থাকত, তাদের জন্য এখানে নানারকম সুবিধা ও ব্যবস্থাপনা ছিল। তবে সেই তুলনায় বসরার গ্রন্থাগার ছিল আরও বড়, আরও সমৃদ্ধ। তাতে গ্রন্থসংখ্যাও ছিল অনেক বেশি। বসরার এ গ্রন্থাগারে একজন শাইখ নিযুক্ত ছিলেন, যিনি মুতাযিলা চিন্তাধারার অনুকূলে যুক্তিবিদ্যা ও তর্কশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন।<sup>[২]</sup>

[১] ইয়াকুত: মু'জামুল উদাবাব ২: ৪২০।

[২] আহসানুত তাকাসীম ফি মা'রিফাতিল আকালীম পৃ ৪১৩।



» ৪১৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণকারী সাবুর বিন আরদেশিরের নির্মিত গ্রন্থাগারটি ছিল সকল গবেষক ও পাঠকদের মিলনমেলা। শহরের নামিদানি জ্ঞানী-গুণীজন আলোচনা, বিতর্ক, সংলাপ ও প্রশ্নোত্তর করতে প্রায়ই এতে সমবেত হতেন। তাদের একজন ছিলেন আবুল আলা মাজারী। তিনি এ গ্রন্থাগারকে দারুণ ভালোবাসতেন। বাগদাদে অবস্থানকালে এখানেই তিনি সময় কাটাতেন। এ গ্রন্থাগার সম্পর্কে সামনে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।<sup>[১]</sup>

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ইসলামি সভ্যতা ও শিক্ষার বিকাশের সঙ্গে গ্রন্থাগারের একটি নিবিড় সম্পর্ক ছিল সবসময়। তাই তো এসব ইতিহাস সৃষ্টিকারী গ্রন্থাগার সম্পর্কে গবেষকদের মুখ বন্ধ রাখার কোনো উপায় নেই। প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আলোচনার মাঝখানে এ বিষয়ে আলোকপাত করা যেত। কিন্তু গ্রন্থাগারের বিশেষ গুরুত্বের কারণে এবং আরও বিস্তারিতভাবে গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও অবদানকে তুলে ধরতে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় রাখা আমি সমীচীন মনে করেছি।

## গ্রন্থের সাহিত্য-বিষয়ক মূল্যায়ন

তৎকালীন আরবের জ্ঞানী সমাজ গ্রন্থকে খুব সম্মান করত। একজন আরবিভাষীর লেখা গ্রন্থের প্রশংসাবাদী পড়লে পাঠক ধোঁকায় পড়ে যেত। ভাবত, লেখক হয়তো কোনো প্রাণপ্রিয় বন্ধু ও প্রিয়জনের প্রশংসা করছেন। অথবা দীর্ঘদিন ধরে কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুর বিয়োগ-বেদনায় কাতরাচ্ছেন। অথবা পাঠক মনে করত, যেন যুদ্ধের কোনো সেনাপতি (তার বাহিনীকে) সোজা পথে চলার নির্দেশনা দিচ্ছেন। হাত ধরে তাকে সত্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

একবার গল্প ও আলাপ-আলোচনা করার জন্য জনৈক শাসক একজন জ্ঞানীকে ডেকে পাঠালেন। খাদেম এসে দেখেন ওই জ্ঞানী একা বসে আছেন। তার চারপাশে গ্রন্থের স্তুপ। তিনি কেবল নিরবচ্ছিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করে চলেছেন।

খাদেম : আমিরুল মুমিনিন আপনাকে ডাকছেন!

জ্ঞানী : আমার কাছে একদল বিদগ্ধ মানুষ উপস্থিত আছেন। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলছি। আলোচনা শেষ করে আসব।

খাদেম এসে খলিফাকে সে কথা বলল।

[১] Margoliuth's Introduction to Basail Abi Al 'Ala.

খলিফা : তোর কপাল পুড়ুক! কারা তার কাছে বসে আছে?

খাদেম : আল্লাহর শপথ আমি রুল মুমিনিন, তার কাছে আমি কাউকে বসে থাকতে দেখিনি।

খলিফা : তাকে এই মুহূর্তে এখানে উপস্থিত কর।

এরপর ওই জ্ঞানী ব্যক্তি দরবারে উপস্থিত হলেন।

খলিফা : আপনার কাছে কারা বসা ছিলেন?

জ্ঞানী : হে আমি রুল মুমিনিন, (কবিতার ভাষায় তিনি উত্তর দিলেন) :

هم جلساء ما نمل حديثهم # أميون مأمونون غيبا ومشهدا  
إذا ما خولنا كان خير حديثهم # معينا على نفي الهموم مؤيدا  
يفيدوننا من علمهم علم ما مضى # وعقلا وتأديبا ورأيا وسؤدا  
فلا ريبة تخشى ولا سوء عشرة # ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا  
فإن قلت: أموات فلست بكاذب # وإن قلت: أحياء فلست مفندا

(কবিতার মর্ম : তারা হলেন সেসব মর্যাদাবান সঙ্গী, যাদের সঙ্গে কথা বলে কখনোই বিরক্ত হই না। তারা উপস্থিত থাকুক বা না-থাকুক, সবসময় তারা নিজেরা নিরাপদ ও সুখী। তাদের সঙ্গে আলাপ চলাকালে সকল উদ্বেগ ও দুষ্টিন্তা কেটে যায়। তারা অতীতের সব ঘটনার কথা আমাদের জানান। জ্ঞান, বুদ্ধি, শিষ্টাচার ও নৈতিকতা দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করে তুলেন। তাদের সঙ্গে সময় কাটালে কোনো সন্দেহ থাকবে না। অসৎ সঙ্গে জড়িত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। আর তাদের মুখ ও হাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর দরকার পড়ে না। যদি বলি, তারা মৃত, তবে আমার কথা মিথ্যা নয়। আর যদি বলি তারা জীবিত, তবে সেটিও অতু্যক্তি হবে না।)

কবিতায় তিনি গ্রন্থমালার দিকে ইঙ্গিত করছেন, তা বুঝতে পেরে খলিফা আর কিছু বলেননি।<sup>[১]</sup>

গ্রন্থ মূল্যায়নে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন জাহিয়। তিনিই মানুষকে বইমুখী করেন। গ্রন্থের মূল্য মানুষের কাছে তুলে ধরেন। গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও তার নানাবিধ উপকারের কথা মানুষকে জানান। এর আগে মানুষের

[১] ইবনু তাবতাবা পৃ ১০, মুহাযারাতুল আবরার ৩ (হস্তলিখিত)।



আগ্রহ নিবদ্ধ ছিল কেবল কবিতা ও কবিদের আসরের মধ্যে। জাহিয় এসে মানুষকে সচেতন করেন। গ্রন্থ অধ্যয়ন করে মানব-সভ্যতার উন্নতি সাধনে মানুষকে উৎসাহিত করেন। গ্রন্থে থাকা নানাবিধ জ্ঞান ও তত্ত্ব সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করেন। তাঁর অমূল্য বাণীর অন্যতম হলো : আমি মনে করি প্রকৃতিভিত্তিক বিদ্যা খুবই আধুনিক, যার জন্ম খুব বেশি দূরে নয়। গ্রন্থের মূল্য হয় কম। আর তা সহজলভ্য। গ্রন্থে আছে নানা শিক্ষণীয় ও বিস্ময়কর ঘটনা। আছে অবাক করা সব ঘটনা। আছে বিশুদ্ধ জ্ঞান-ভাণ্ডার ও চমৎকার সব অভিজ্ঞতার বিবরণ। আছে বিগত মানুষের ঘটনা। প্রাচীন সভ্যতার চমৎকার সব কাহিনী। আপনি যদি গ্রন্থ পরিদর্শন করেন, তবে সেটি হবে খুবই উপকারী। আর যদি চান, তবে সে আপনাকে ছায়ার মতো সবসময় আগলে রাখবে। আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো করে জড়িয়ে থাকবে আপনার সাথে।<sup>[১]</sup>

গ্রন্থ এমন একটি বস্তু, আপনি যতক্ষণ তাকে চুপ করিয়ে রাখবেন, ততক্ষণ সে নীরব থাকবে। যখন কথা বলাতে চাইবেন, তখন সে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় কথা বলবে। সে আপনার গল্প বলার উত্তম সঙ্গী। আপনি যখন ব্যস্ত, তখন সে আপনাকে বিরক্ত করবে না। কিন্তু আপনার উদ্যমতার সময় সে আপনাকে ডাকবে। তার কাছে সাজসজ্জা করতে হবে না। তার কাছে গেলে অপমান হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। গ্রন্থ এমন এক বস্তু, যে আপনাকে হতাশ করবে না। এমন এক পথ, যে পথ আপনাকে ধোঁকায় ফেলবে না। এমন এক সাথী, যে আপনাকে বিরক্ত করে তুলবে না। মিথ্যা বলে ছলনা করবে না।<sup>[২]</sup>

জাহিয় আরও বলেন, আমি একবার বাগদাদের আমির মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের দরবারে গেলাম। তিনি তখন বাগদাদের শাসক। দরবারে তিনি শাহী গাভীর্য নিয়ে বসা। মানুষ তার সামনে বিনয়ী হয়ে বসে আছে। দেখে মনে হচ্ছে তাদের মাথায় পাখি বসা। এর কিছুকাল পর আমি আবার তার কাছে গেলাম। তিনি তখন আর শাসক পদে নেই। গ্রন্থ-ভাণ্ডারের কক্ষে নীরবে বসে অধ্যয়ন করছেন। তার চারপাশে কিতাব, পাণ্ডুলিপি, কালি ও কলমের সমাহার। তখন তাকে আরও বেশি গাভীর্যপূর্ণ দেখাচ্ছিল।<sup>[৩]</sup>

জাহিযের এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানুষ গ্রন্থমুখী হতে শুরু করে। গ্রন্থের মূল্যায়ন করতে আরম্ভ করে। একবার মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক যাইয়াত কিছুকাল মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী দিন-যাপন করলেন। তখন জাহিয়

[১] আল মাহাসিনু ওয়াল আযদাদ: পৃ ২।

[২] আল হাইওয়ান: ১: ৫০-৫১।

[৩] ইবনু তাবতাবা পৃ ১০-১১।

তার ঘরে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার কথা ভাবলেন। একটা কিছু উপহার নেওয়ার ইচ্ছা করলেন। ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত সিঁচাওয়াই রচিত একটি গ্রন্থ নির্বাচন করলেন। জাহিযের হাত থেকে সেই উপহার গ্রহণ করার সময় ইবনুয যাইত বলছিলেন, আল্লাহর শপথ, আপনি যে বস্তুটি আমার জন্য উপহার হিসেবে এনেছেন, এই মুহূর্তে এটাই আমার কাছে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ও প্রিয় বস্তু।<sup>[১]</sup>

কিন্তু জাহিয জীবনভর যে কিতাবাদিকে মূল্যায়ন করলেন, সেই গ্রন্থাদি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেনি। বরং তার সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করেছে। বইপুস্তকের কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে। বর্ণিত আছে, অনেকগুলো স্তূপিকৃত গ্রন্থ তার ওপর আছড়ে পড়ায় তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তার অভ্যাস ছিল, একটির ওপর আরেকটি বই রেখে দেয়ালের মতো উঁচু সারি করে রাখা। একবার তার চারপাশ ঘিরে এভাবে বইপুস্তক সারি করে রাখলেন। তিনি ছিলেন মাঝখানে বসা। অসুস্থ। এমন সময় কিতাবের স্তূপ তার ওপর পড়ে গেলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়।<sup>[২]</sup>

জাহিয মৃত্যুবরণ করলেও তার যে মিশন ও ভিশন ছিল, তাতে তিনি সফল হয়েছেন। তার চিন্তাধারা ও তার ফলাফল মানুষের কাছে প্রকাশ হওয়ার পর মানুষ কী পরিমাণ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে, তার বিবরণ দিতে গিয়ে মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি লেখেন:<sup>[৩]</sup> জনৈক জ্ঞানী বলেন, গ্রন্থ হলো আস্তিনে বহন করা সুরভিত বাগান। পাথরে স্থানান্তরিত করা সবচেয়ে সুন্দর পুষ্পের কানন। গ্রন্থ মৃতদের নিয়ে কথা বলে। জীবিতদের অবস্থা বর্ণনা করে। এমন কোনো বন্ধু আছে, তুমি ঘুমিয়ে পড়লেও যে ঘুমায় না? তুমি যা চাও, তার বাইরে কোনো কথা বলে না? সবথেকে বেশি তথ্য গোপন রাখে? সবচেয়ে বেশি যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করে? গ্রন্থের চেয়ে নেককার প্রতিবেশী, ন্যায়বান বন্ধু, উপযুক্ত সাথি, বিনয়ী শিক্ষক দ্বিতীয়টি আর নেই। এ বন্ধু উত্তম বন্ধু। এ বন্ধু শ্রেষ্ঠ। এ সঙ্গী কখনো বিরক্ত করে না। কাউকে বিব্রত করে না। কখনো ঝামেলা বাঁধায় না। কখনো বিতর্ক তৈরি করে না। কখনো মারামারি ও হানাহানি উসকে দেয় না।<sup>[৪]</sup>

ইসলামের ইতিহাসে নানা যুগে এমন অনেক উজির ছিলেন, যারা গ্রন্থের

[১] মু'জামুল উদাবা ৬: ৮৫-৮৬।

[২] আবুল ফিদা ২: ৪৭।

[৩] ইবনুল আরাবি: আল মুসামারাত ২ (হস্তলিখিত)।

[৪] আল মাহাসিনু ওয়াল আযদাদ: পৃ ৩ জাহিযের বরাত দিয়ে।



মহত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সভ্যতার অগ্রযাত্রা, নেক চরিত্র ও সংসাহস তৈরিতে গ্রন্থের অনুপম ভূমিকার কথা তারা অনুধাবন করেছিলেন। তাই তো দুর্বলমনা শাসক ও খলিফাদের কাছে বইপুস্তক পেশ করার আগে খুব ভালোভাবে যাচাই করে বই নির্বাচন করতেন। যেন শত্রুদের লেখা কোনো বই পড়ে দুর্বলমনা খলিফার মন বিগড়ে না যায়।

বর্ণিত আছে, একবার খলিফা মুকতাফি বিল্লাহ তার উজিরের কাছে কিছু গ্রন্থ চাইলেন। ক্ষমতায় থাকাকালে সেসব গ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করবেন। এরপর উজির তার নায়েবদের কাছে এসে কিছু গ্রন্থ সংগ্রহের নির্দেশ দিলেন। খলিফার কাছে উপস্থাপনের আগে সেগুলো তাকে দেখানোর কথা বললেন। নায়েবগণ ইতিহাসের নানা গ্রন্থ সংগ্রহ করল। এসব বইয়ে ছিল পূর্ববর্তী যুগের উজিরদের নানা ঘটনা। কৌশলে কিভাবে অর্থ বের করে নিতে হয় তার পদ্ধতি...। উজির এসব গ্রন্থ দেখে নায়েবদের বললেন, আল্লাহর শপথ, তোমরা দেখছি আমার সবচেয়ে বড় শত্রু! যে কিতাব তোমরা সংগ্রহ করেছে, তা পড়লে উজিরদের কিভাবে সর্বনাশ করতে হয় সেই কৌশল খলিফাও রপ্ত করবেন। ছল-ছাতুরি করে কিভাবে অর্থ হাতিয়ে নিতে হয়, তার দীক্ষা পাবেন। দেশের উন্নয়ন না করে বরং দেশ ধ্বংসের পথ আবিষ্কার করবেন। এগুলো নিয়ে যাও। এমন কিতাব সংগ্রহ করো, যেখানে থাকবে অনুপ্রেরণামূলক ঘটনা। মনোমুগ্ধকর সব কবিতা।<sup>[১]</sup>

## গ্রন্থাগারের সাহিত্য-বিষয়ক মূল্যায়ন

মুসলমানগণ গ্রন্থের কীরূপ মূল্যায়ন করতেন, কতটুকু মর্যাদা দিতেন—একটু আগেই আমরা তা জেনে এসেছি। এই মূল্যায়নের কারণেই তারা অতি যত্ন ও গুরুত্বের সঙ্গে গড়ে তুলেন বিশ্বখ্যাত সব গ্রন্থাগার। শুধু তাই নয়; গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের যে সদিচ্ছা ও উচ্চ মনোবল মুসলমানদের ছিল, গ্রন্থাগার নির্মাণেও তা প্রকাশ পায়। এই প্রবল অনুরাগের কথা তাদের সাহিত্যের পাতায় পাতায় ভরপুর।

» বিখ্যাত জ্ঞানী ও গ্রন্থাগারিক ইবনু আমিদের বাড়িতে হানা দেয় খুরাসান বাহিনী। দারোয়ান ও সেবকদের পরাস্ত করে পুরো বাড়ি দখল করে নেয় তারা। ইবনু আমিদ ঘরবাড়ি ছেড়ে সরকারি ভবনে পালিয়ে যান। এরপর রাতের বেলায় যখন খুরাসান বাহিনী চলে যায়, তখন তিনি বাড়িতে ফিরে

[১] ইবনু তাবাতাব পৃ ১১।

আসেন। এসে দেখেন তার অর্থভাণ্ডার সব লুট করে নিয়ে গেছে। ঘরে বসার মতো কোনো চেয়ার নেই। পান করার মতো কোনো পাত্র নেই। আবু হামযাহ আলভী তড়িঘড়ি করে তার কাছে একটি বিছানা ও পাত্র নিয়ে আসেন। কিন্তু তার হৃদয় পড়ে ছিল গ্রন্থাগারের বই-পুস্তকের প্রতি। শত্রুরা লাইব্রেরির কোনো ক্ষতি করল কি না, এ নিয়ে তিনি যারপরনাই উদ্বিগ্ন ছিলেন। কারণ সেখানে তিনি জীবনভর নানা দেশ থেকে নানা বিষয়ের প্রচুর মূল্যবান গ্রন্থ জমা করেছেন। জ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতিটি শাখার প্রচুর বই এক শ'র চেয়ে বেশি সংখ্যক বাহনে করে নিয়ে আসা হয়েছে। গ্রন্থাগারের প্রধান রক্ষক ইবনু মাসকুওয়াই এলে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, গ্রন্থাগারের কী অবস্থা? তিনি উত্তর দিলেন, গ্রন্থাগার আগের মতোই আছে। সেখানে কেউ কোনো ক্ষতি করেনি। এ কথা শুনে ইবনু আমিদ সৃষ্টির নিঃশ্বাস ফেলেন। আনন্দের আতিশয্যে রক্ষককে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি বড় সৌভাগ্যবান প্রহরী। কারণ সকল ভাণ্ডারের বিকল্প ব্যবস্থা করা সম্ভব। কিন্তু গ্রন্থ-ভাণ্ডারের বিকল্প সম্ভব নয়।<sup>[১]</sup>

» একবার সাহিব ইবনু আব্বাদের কাছে রাজপ্রাসাদের উচ্চপদে দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব আসে। এই বার্তা পাঠান সামানীয় রাজবংশের বিখ্যাত শাসক নুহ বিন মানসুর আস-সামানী। কিন্তু সাহিব সেই রাজকীয় প্রস্তাব ও লোভনীয় পদের চেয়ে নিজের প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের পাশে অবস্থান করাকেই প্রাধান্য দেন। সে জন্য শাসক লোক পাঠিয়ে তাকে দরবারে ডাকেন। নানা সুযোগ সুবিধার কথা বলে তাকে উৎসাহিত করেন। উচ্চমূল্যের বেতন প্রদানের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তিনি তার মহামূল্যবান গ্রন্থাগারের কথা ভেবে সেই রাজপ্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। কারণ গ্রন্থাগার ছাড়া তিনি থাকতে পারবেন না। আবার গ্রন্থাগারটি সাথে করে রাজপ্রাসাদে নিয়েও যেতে পারবেন না। তাই গ্রন্থাগারের পাশে অবস্থান করাকেই তিনি প্রাধান্য দেন।<sup>[২]</sup>

» শামের ত্রিপলীর অধিবাসী বনু আম্মার শাসকগণও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাকে বিরাট গুরুত্বের সঙ্গে নেন। নানা শাস্ত্রের অসংখ্য মূল্যবান কিতাব সংগ্রহ করার পরিকল্পনা হাতে নেন। নতুন ও দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সে জন্য একদল বিশেষজ্ঞ ও ব্যবসায়ীদের নিযুক্ত করেন। তাদের ওপর দায়িত্ব ছিল, দূর-দূরান্তের নানা সভ্যতার নানা দেশ ঘুরে উপকারী বই

[১] ইবনু মাসকুওয়াইহ: তাজারিবুল উমাম ৬: ২২৪-২২৫।

[২] ইয়াকুত: মু'জামুল উদাবা ২: ৩১৫।



সংগ্রহ করা।<sup>[১]</sup>

» ইবনু সুরাহ কিতবী বর্ণনা করেন : একবার কাযি ফাদিলের পুত্র পড়ার জন্য আমার কাছে আল-হামাসা (কাব্যগ্রন্থ) তলব করেন। পুত্রের এই আবেদনের কথা আমি কাযি ফাদিলকে জানাই। তিনি তখন খাদেমকে নির্দেশ দিলেন আল-হামাসা নামের সকল বই নিয়ে আসার জন্য। খাদেম গিয়ে পঁয়ত্রিশটি কপি নিয়ে এল। তিনি প্রতিটি কপি হাতে নিয়ে পাতা উল্টিয়ে উল্টিয়ে দেখতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, এটি অমুকের হাতের লেখা। ওটা তমুকের হাতের লেখা। এভাবে সব ক'টি দেখে শেষ করলেন। এরপর বললেন, এগুলো শিশু-কিশোরদের উপযোগী নয়। এরপর এক দিনার দিয়ে আল-হামাসার একটি কপি কিনে আনতে আমাকে নির্দেশ দিলেন।<sup>[২]</sup>

» আন্দালুসের দিকে তাকালে সেখানেও গ্রন্থাগার নির্মাণ ও গ্রন্থের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সীমাহীন তৎপরতা আমরা দেখতে পাই। কারণ, আন্দালুসের শাসকও একদল বণিককে নিযুক্ত করেছিলেন বিশ্বব্যাপী সফর করে মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করার জন্য। এসব গ্রন্থ ক্রয় করে আন্দালুসে নিয়ে আসার জন্য তাদের কাছে অর্থ পাঠাতেন। আল-আগানী গ্রন্থ রচিত হচ্ছে শুনে গ্রন্থকার আবুল ফারাজ আসফাহানীর কাছে এক হাজার খাঁটি স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়ে দেন আন্দালুসের শাসক। গ্রন্থ লেখা শেষে ইরাকে প্রকাশের আগেই গ্রন্থটির একটি কপি তিনি আন্দালুসের শাসকের কাছে পাঠিয়ে দেন। তেমনি মুখতাসারু ইবনি আবদিল হাকাম-এর ব্যাখ্যা-গ্রন্থ রচিত হচ্ছে শুনে গ্রন্থকার কাযি আবু বকর আবহারির (মৃত্যু ৩৭৫ হিজরি) কাছেও একইভাবে স্বর্ণমুদ্রা পাঠান আন্দালুসের শাসক।<sup>[৩]</sup>

কেবল জ্ঞানী ও গবেষকগণই গ্রন্থাগারপ্রেমী ছিলেন এমনটি নয়। সাধারণ মানুষদের মাঝেও ছিল গ্রন্থপ্ৰীতি এবং লাইব্রেরি তৈরির প্রতি সীমাহীন আগ্রহ। বইয়ের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই, গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, তারপরও বাড়িতে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি থাকাকে ঘরোয়া সৌন্দর্যের পরিপূরক ভাবা হতো। গ্রন্থ দিয়ে ঘরের শোভা বাড়ানো হতো। মাকাররী বলেন, আন্দালুসের বিখ্যাত জ্ঞানী হাদরামী বলেছেন : একবার একটি গ্রন্থ খুঁজতে কিছুদিন কর্ডোভার বইবাজারে অবস্থান করলাম। বহুদিন যাবৎ সেই

[১] Islamic Culture ১৯২৯, p. ২৩১, কুরদ আলী: খুতাতুশ শাম ৬: ১৯১।

[২] আল-খুতাত ২: ৩৬৭।

[৩] ইবনু খালদুন: আল ইবরা ৪: ১৪৬, আল মাকাররী: ১: ১৮২।

গ্রন্থের তালাশে ছিলাম। শেষ পর্যন্ত খুব স্পষ্ট করে লেখা এবং সুন্দর ব্যাখ্যাসহ বইটির এটি কপি পেয়ে গেলাম। দারুণ খুশি হয়ে আমি দাম বাড়িয়ে বললাম। নিলামের ঘোষকের উদ্দেশ্যে আরেকজন অতিরিক্ত দাম ঘোষণা করল। আমি ঘোষককে বললাম, এ বইয়ের দাম তো এত নয়। কোন সে জ্ঞানী, যে এত দাম বাড়িয়ে বইটি কেনার আগ্রহ করেছে! আমাকে দেখাও, কে তিনি। তখন সে আমাকে এক ব্যক্তির সন্ধান দিল। পরনে তার অভিজাত পোশাক। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, হে সম্মানিত ফকিহ, আল্লাহ আপনার মান মর্যাদা বাড়িয়ে দিন। আপনার যদি গ্রন্থটি এতই দরকার থাকে, তাহলে এটি আপনিই নিয়ে নিন। আপনি খুব বাড়িয়ে দাম বলেছেন। এ গ্রন্থের মূল্য তো এত নয়। তখন উত্তরে তিনি বললেন, আমি কোনো ফকিহ নই। এ বইয়ে কী লেখা আছে, তাও আমি জানি না। তবে শহরের অভিজাত লোকদের মাঝে নিজেকে অনন্য হিসেবে তুলে ধরতে আমি একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছি। সেই গ্রন্থাগারের ছোট্ট একটি জায়গা ফাঁকা আছে। সুন্দর হস্তলিপিতে রচিত ও মজবুত বাঁধাইয়ের এ বইটি চোখে পড়তেই সেটি আমার পছন্দ হয়ে যায়। কত বেশি মুদ্রা দিয়ে কিনলাম, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না।

## গ্রন্থাগার-ভবন ও তার বিন্যাস

ইসলামি গ্রন্থাগারসমূহ সম্পর্কে ওলগা পিন্টো তার একটি প্রবন্ধে লেখেন :<sup>[১]</sup> মুসলমানগণ বিরাট গুরুত্বের সঙ্গে গণগ্রন্থাগার (পাবলিক লাইব্রেরি) প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেসব গ্রন্থাগারে সব শ্রেণীর মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল। বিশেষ নির্মাণশৈলীতে নির্মিত হয়েছে শিরাজ, কর্ডোভা, কায়রো প্রভৃতি শহরের গ্রন্থাগার-ভবন। তাতে ছিল একাধিক কক্ষ। প্রত্যেকটির মাঝে ছিল প্রশস্ত বারান্দা। সারি সারি করে বই রাখার জন্য তাক স্থাপন করা হতো একেবারে দেয়াল ঘেঁষে। তাতে কিছু বিশেষ কক্ষ ছিল অনুসন্ধানের জন্য। আর কিছু ছিল অনুলিপি করার জন্য। কিছু কক্ষে পাঠশালা চলত। পাঠক ও গবেষকদের মনোরঞ্জন করতে এবং তাদের মনোবল চাঙা করতে কিছু কিছু গ্রন্থাগারে নাশীদ আড্ডার বিশেষ কক্ষ ছিল। প্রতিটি রুম উন্নত আসবাব ও আরামদায়ক সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত ছিল। প্রাচ্যের পাঠকদের রুচি অনুযায়ী কক্ষগুলোর মেঝেতে উন্নত কার্পেট ও গালিচা স্থাপিত ছিল। কারণ তারা মেঝেতে পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে পড়ালেখা করতে অভ্যস্ত।

[১] Islamic Culture ১৮২৯, p. ২২৭।



দরজা ও জানালায় ছিল দৃষ্টিনন্দন পর্দা। গ্রন্থাগারের মূল প্রবেশদ্বারে ছিল পাতলা পর্দা, যার কারণে শীতকালে ঠাণ্ডা বাতাস ভেতরে যেত না। মাকরিযি বলেন,<sup>[১]</sup> কায়রোর দারুল হিকমাহ গ্রন্থাগার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার আগে এর ভেতর উন্নত গালিচা স্থাপন করা হয়। নানা কারুকার্যে তাকে সজ্জিত করা হয়। সকল দরজা ও বারান্দায় দৃষ্টিনন্দন পর্দা ঝোলানো হয়। লাইব্রেরির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বশীল, রক্ষক ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের নিয়োগ দেওয়া হয়।

ফাতিমি রাজবংশের শাসনামলে নির্মিত গ্রন্থাগারটি ছিল সুবিশাল। তাতে ছিল বহু রক্ষণাগার। প্রত্যেক শাখার গ্রন্থসমূহের জন্য ছিল চল্লিশটি পৃথক সংরক্ষণাগার। এর প্রতিটিতে আঠারো হাজার করে গ্রন্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল।<sup>[২]</sup>

শিরাজ শহরে বাদশাহ আজুদুদৌলার গ্রন্থাগারের সুনিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন বিখ্যাত লেখক মাকদিসি। তার লিখিত গ্রন্থাগার এবং এর বিন্যাস সংক্রান্ত তথ্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :

গ্রন্থাগারটি ছিল বিশাল লম্বা একটি ভবন। এর সব দিকে অনেকগুলো সংরক্ষণাগার ছিল। লম্বা হলরুম ও সবগুলো সংরক্ষণাগারের সঙ্গে একাধিক ঘর ছিল, যার দৈর্ঘ্য প্রায় আড়াই গজ এবং প্রস্থ তিন গজ। তাতে ছিল ওপর থেকে নিচে নামার দরজা। আর সেখানে পাণ্ডুলিপিগুলো শেলফের ওপর বিন্যস্ত করে রাখা ছিল।<sup>[৩]</sup>

এ আলোচনা থেকে বোঝা যায়, এ লাইব্রেরির বইগুলো বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিভিন্ন কক্ষে ভাগ করা ছিল। গ্রন্থ সংরক্ষণের এই বিন্যাস প্রায় প্রতিটি ইসলামি গ্রন্থাগারেই অবলম্বন করা হয়। শাসক নুহ বিন মানসুরের আমলে সামানী রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার থেকে উপকৃত হয়েছেন বিখ্যাত মনীষী ইবনু সিনা। সেই গ্রন্থাগারের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ওই গ্রন্থাগারে প্রবেশ করে দেখি, তাতে অনেকগুলো কক্ষ। প্রতিটি কক্ষে অনেকগুলো গ্রন্থের বাক্স একটির ওপর অপরটি রাখা। তন্মধ্যে একটি কক্ষে আরবি ভাষা ও কবিতার গ্রন্থসমূহ। অপর কক্ষে ফিকহের গ্রন্থসমূহ। এভাবে প্রতিটি কক্ষে একেক শাখার বিপুল পরিমাণ বই সংরক্ষিত ছিল।<sup>[৪]</sup>

[১] আল-বুতাত ১: ৪৫৮।

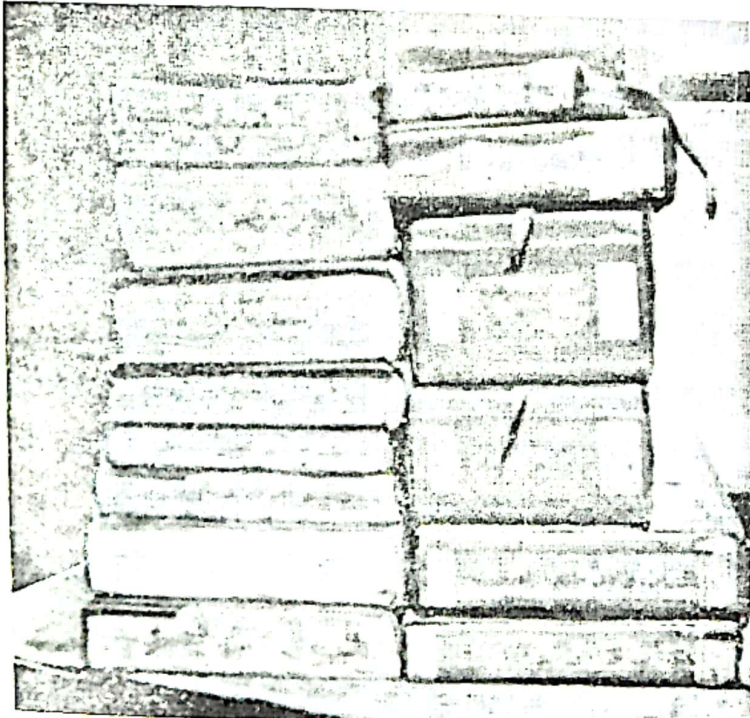
[২] দেখুন মাকরিযি ১: ৪০৮।

[৩] আহসানুত তাকসীম ৪৪৯।

[৪] ইবনু আব্বি উসাইরিয়া ২: ৪।

বর্তমান যুগে আমরা পাশাপাশি করে যেভাবে বই সাজিয়ে রাখি, মধ্যযুগে মুসলমাগণ তাদের গ্রন্থাগারগুলোতে এভাবে বই সংরক্ষণ করতেন না। বরং একটির ওপর অপরটি করে লম্বালম্বি আকারে বই রাখত। তার কারণ মেয়াদ দীর্ঘস্থায়ী করতে ও বাঁধাই মজবুত করতে সে সময় বই লেখা হতো মোটা কাগজে অথবা বিশেষ রকম পাতলা কাপড়ে। ফলে চাইলেও বইগুলো পাশাপাশি করে রাখা যেত না। তাই দায়িত্বশীলদের প্রতি নির্দেশনা ছিল, ওপরের বইগুলো যেন নিচে না পড়ে যায়, সে জন্য বড় বইগুলো নিচের দিকে এবং ছোট বইগুলো ওপরের দিকে রাখতে।<sup>[১]</sup>

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। এখন আমরা গ্রন্থের একপাশে পেছন দিকে বইয়ের নাম লিখি। যেন অনেকগুলো বই পাশাপাশি রাখলে নাম পড়ে বই নির্বাচন করা যায়। সে সময় বইয়ের নাম ওই স্থানে লেখা হতো না। বরং গ্রন্থটি বন্ধ থাকা অবস্থায় পৃষ্ঠাগুলোর পাশ ঘেঁষে নাম লেখা হতো। এভাবে নামের প্রতিটি অক্ষরের ওপরের অংশ থাকত গ্রন্থের শুরুর পৃষ্ঠাগুলোর দিকে। আর অক্ষরের নিচের অংশগুলো থাকত বইয়ের শেষের পৃষ্ঠাগুলোর দিকে। এরপর তাকে তাকে বই সাজিয়ে রাখার সময় নাম লেখা অংশটি সামনের দিকে রাখা হতো। যেন পাঠক নাম দেখে কান্জিক্ত বইটি পেয়ে যায়।<sup>[২]</sup>



মধ্যযুগে ইসলামী গ্রন্থাগারে বই বিন্যাসের নমুনা

### মধ্যযুগে ইসলামী গ্রন্থাগারের বই- বিন্যাস

অতি মূল্যবান, দুর্লভ বা অবাঁধাইকৃত বইগুলো বেশিরভাগ সময় বইয়ের আকার অনুপাতে ছোট ছোট বাক্সে ভরে রাখা হতো। অধিকাংশ বাক্স ছিল মোটা কাগজের তৈরি। আর

[১] ইবনু জামাআ: তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম পৃ ১৭২।

[২] ইবনু জামাআ: পৃ ১৭১-১৭২।



তখন বইয়ের পৃষ্ঠাগুলোর পাশঘেঁষে নয়; বরং বাস্তবের একপাশে বই ও লেখকের নাম লেখা হতো। কায়রোর দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যায় সংরক্ষণাগারে ওই যুগের অনেক গ্রন্থ এখনো সংরক্ষিত আছে। সেগুলোর গায়ে উক্ত পদ্ধতিতেই নাম লেখা। আগেকার যুগে কিভাবে একটির ওপর অপরটি রেখে বই সংরক্ষণ করা হতো, দারুল কুতুবের কর্মকর্তাগণ কিছু বই সেভাবে রেখে আমাকে দেখিয়ে দেন (ছবিতে দেখুন)।

বইয়ের তাকগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। সেখান থেকে ইচ্ছামতো বই নিয়ে পড়া যেত। গ্রন্থাগারে সবাই নিজ দায়িত্বেই বই খুঁজে বের করত। বহু খোঁজাখুঁজির পরও না পেলে দায়িত্বশীলদের সাহায্য নেওয়া হতো। এ ব্যাপারে সামনে আলোচনা করব। সবসময় সেখানে কিছু তালাবদ্ধ সিন্দুক থাকত, তাতে অতি মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংরক্ষণ করা হতো। এসব হস্তলিখিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে গ্রন্থাগারিক বা পরিচালকদের অনুমতি নিতে হতো।<sup>[১]</sup>

## গ্রন্থসূচি

বিখ্যাত সকল পাবলিক লাইব্রেরি বা বিশেষ লাইব্রেরিতে ছিল বইয়ের লিষ্ট। এসব গ্রন্থসূচি ছিল সুবিন্যস্ত। বইয়ের বিষয়বস্তু অনুসারে গ্রন্থসূচি ভাগ করা হতো। এসব তালিকার পাশাপাশি গ্রন্থাগারের প্রতিটি আলমিরার ওপর একটি করে বিশেষ পাতা ঝোলানো হতো। তাতে সংশ্লিষ্ট আলমিরায় থাকা সকল গ্রন্থের নাম এবং আলমিরার বিন্যাস অনুযায়ী ক্রমিক নম্বর লেখা থাকত। তা ছাড়া কোনো গ্রন্থের যদি কিছু পৃষ্ঠা হারিয়ে যেত বা কিছু অংশ মিসিং থাকত, তবে সূচিতে ওই গ্রন্থের নামের পাশে থাকা মন্তব্যের ঘরে তা লিখে দেওয়া হতো।<sup>[২]</sup>

এবার আমরা ইসলামি গ্রন্থাগারসমূহের জন্য মুসলমানদের আবিষ্কৃত গ্রন্থসূচি ও তার বিন্যাসের বিবরণ তুলে ধরব। এটা পরিষ্কার যে, বড় বড় লাইব্রেরির জন্য গ্রন্থসূচি ছিল অপরিহার্য একটি বিষয়। তাই গ্রন্থসূচির বিবরণ পড়লে এসব গ্রন্থাগারে কী বিপুল পরিমাণ বইয়ের সমাহার ছিল, তা অনুমান করা যাবে।

» সর্বপ্রথম আমরা ইবনু সিনার বক্তব্য তুলে ধরব। তিনি বুখারা অঞ্চলে অবস্থিত সামানি রাজবংশের বিখ্যাত লাইব্রেরির গ্রন্থসূচি পাঠ করে সেখানে

[১] Islamic Culture 1929, p. 229.

[২] Islamic Culture 1929, p. 229.

কয়েকটি কিতাব অধ্যয়নের জন্য আবেদন করেন। তৎক্ষণাৎ গ্রন্থগুলো তার কাছে উপস্থিত করা হয়। ইবনু সিনার বিবরণ অনুযায়ী, সেখানে তিনি এমন অনেক গ্রন্থ দেখতে পেয়েছেন, যেগুলোর নাম মানুষ কখনো শুনেনি। এর আগে কখনো দেখেনি। পরেও হয়তো কোনোদিন দেখতে পাবে না।<sup>[১]</sup>

» শিরাজ অঞ্চলে বাদশাহ আযুদুদৌলার প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার সম্পর্কে মাকদিসি বলেন,<sup>[২]</sup> প্রতিটি শাস্ত্রের গ্রন্থগুলোর জন্য দুটি করে গ্রন্থসূচি ছিল। তাতে সব গ্রন্থের নাম উল্লেখ ছিল।

» আবুল হাসান বায়হাকীর ভাষ্যমতে, সাহিব ইবনু আব্বাদের লাইব্রেরির গ্রন্থসূচি তিনি নিজে দেখেছেন। কেবল গ্রন্থসূচিই ছিল দশ খণ্ডের।<sup>[৩]</sup>

» বায়তুল হিকমা গ্রন্থাগারের সময় থেকেই ইরাকে গ্রন্থসূচির প্রচলন ছিল। হাসান ইবনু সাহল বলেন, একবার বাদশাহ মামুন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, অনারবদের লেখা কোন বইটি সব থেকে শ্রেষ্ঠ। আমি অনেকগুলো বইয়ের নাম বললাম। এরপর বললাম, জাভিয়ান খারদ (সুলতানের ইয়াতিম কন্যা) হে আমিরুল মুমিনিন! এরপর বাদশাহ মামুন তাঁর লাইব্রেরির গ্রন্থসূচি আনিয়ে সবগুলো পাতা উল্টিয়ে কোথাও এ বইয়ের নাম খুঁজে পেলেন না। তখন তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, কী করে গ্রন্থসূচি থেকে এ বইয়ের নাম বাদ যেতে পারে?<sup>[৪]</sup>

» বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসার গ্রন্থাগারের জন্যও ছিল পরিপূর্ণ একটি গ্রন্থসূচি। ইবনুল জাওয়ী (মৃত্যু : ৫৯৭ হিজরি) সেই গ্রন্থসূচি দেখে বলেন, নিজামিয়া মাদরাসার জন্য ওয়াকফ করা গ্রন্থগুলোর তালিকা আমি পড়েছি। তা ছয় হাজারেরও বেশি খণ্ডের।<sup>[৫]</sup>

» খলিফা মুস্তানসির বিল্লাহ তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা নির্মাণ শেষ করার পর খণ্ড খণ্ড অংশে বাঁধাই করা কুরআনের বাঞ্চ এবং ধর্মীয় ও সাহিত্যের ওপর লিখিত অতি মূল্যবান সব গ্রন্থ দিয়ে তা সমৃদ্ধ করেন। যেগুলো এক শ ষাট জন কুলি মাথায় বোঝাই করে এনে সংরক্ষণাগারে জমা করে। এরপর তিনি রাবাতুল হারমের শাইখ আবদুল আজিজকে অনুরোধ করেন মাদরাসায় উপস্থিত হয়ে গ্রন্থগুলো বুঝে নিতে এবং তা সুবিন্যস্তরূপে স্থাপনে

[১] Barthold Turkestan Down to the Mongol Invasion p.p. 9-10.

[২] আহসানুত তাকাসীম ফি মা'রিফাতিল আকালীম পৃ ৪৪৯।

[৩] ইয়াকুত: মু'জামুল উদাবা ২: ৩১৫।

[৪] মুহাম্মাদ কুরদ আলী: রাসাইলুল বুলাগা ৪৭৯-৪৮০।

[৫] সাইদুল খাতির ৩৬৬-৩৬৭।



সহযোগিতা করতে। তা ছাড়া তাঁর পুত্র ও নিজ ঘরে খলিফার গ্রন্থাগার সংরক্ষণের দায়িত্বে থাকা জিয়াউদ্দিন আহমাদকেও দায়িত্ব দেন। এরপর শাইখ এসে সেগুলো এক এক করে নিরীক্ষণ করেন। সেগুলো সুন্দর করে ওড়িয়ে বিন্যস্ত করেন। সহজে গ্রন্থ খুঁজে পেতে একটি সুন্দর ক্যাটালগও তৈরি করে দেন।<sup>[১]</sup>

» অপরদিকে মিশরে ফাতিমি রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারসমূহে শুরুতে মনে হয় পূর্ণ গ্রন্থসূচির ব্যবস্থা ছিল না। বরং প্রতিটি কক্ষে ভেতরে থাকা গ্রন্থগুলো নিয়ে আলাদা তালিকা থাকত। তালিকায় গ্রন্থের নাম ও নম্বর লেখা থাকত। প্রতিটি কক্ষের দরজায় সেটি ঝোলানো থাকত।<sup>[২]</sup> তবে উজির আবুল কাসিম জুরজানি এ সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের জন্য একটি সুবিন্যস্ত গ্রন্থসূচি প্রণয়নের তাগিদ অনুভব করেন। অবশেষে ৪৩৫ হিজরিতে তিনি নির্দেশনা জারি করেন। এই কাজের জন্য কাযি আবু আবদিল্লাহ কুযাঈ এবং আবু খালাফ ওয়াররাককে দায়িত্ব দেওয়া হয়।<sup>[৩]</sup>

» স্পেনে সরকারি গ্রন্থাগারের ছিল সুনিপুণ ও সুবিন্যস্ত গ্রন্থসূচি। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আন্দালুসের সরকারি গ্রন্থাগারে বিপুল কিতাবের সমাহার ছিল। মাকাররী লেখেন: সেখানে কেবল কাব্যগ্রন্থের ক্যাটালগ ছিল চুয়াল্লিশ খণ্ডের।<sup>[৪]</sup>

## গ্রন্থ ধার নেওয়া

গ্রন্থ ধার দিতে যাদের অসুবিধা নেই, তাদের জন্য বিদ্যার্থীদেরকে ধার দেওয়া উত্তম। ছাত্র ও শিক্ষকদেরকে গ্রন্থ ধার দেওয়া অতি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কারণ এর দ্বারা জ্ঞানের প্রচার-প্রসার হয়। সর্বসাধারণ উপকৃত হতে পারে। কিতাব ধার দেওয়া জ্ঞানীদের অন্যতম গুণ। হাফিয় ইবনুল খাযিবা ছিলেন সব শ্রেণীর মানুষের কাছে প্রিয়। ছিলেন জ্ঞানে-গুণে অনন্য। তাঁর কাছে কেউ গ্রন্থ ধার চাইলে নিজের কাছে থাকলে দিয়ে দিতেন। না থাকলে কোথায় পাওয়া যাবে, তা বলে দিতেন।<sup>[৫]</sup>

[১] ইবনুল কুতি: আল হাওয়াদিসুল জামিয়া পৃ ৫৪।

[২] আল-বুতাত: ১: ৪০৯।

[৩] আল কিফতী: আপবাকুল হকানা পৃ ৪৪০।

[৪] নাক্ষত্ব তীব ১: ১৮৬, Sayid Ameer Ali: A Short History of the Saracens p. 514.

[৫] ইবনু জামা'আ পৃ ১৬৭, টীকা পৃ ১৮৮।

ধার নেওয়ার পর বই যত্ন না-করা বা ফেরত না দেওয়ার অভ্যাসও দেখা গেছে সেই প্রাচীন যুগেই।<sup>[১]</sup> এ ভয়ে অনেক জ্ঞানী ও সাহিত্যিক গ্রন্থ ধার দেওয়া পছন্দ করতেন না। একবার এক লোক আবুল আতাহিয়াকে বলল, আপনার গ্রন্থটি আমাকে ধার দিন! উত্তরে তিনি বললেন, আমি তা অপছন্দ করি। লোকটি বলল, নিজের কাছে ভালো লাগে না, এমন কাজ করলেই তো শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা যায়—এ কথা কি আপনি জানেন না? লোকটির কথা শুনে তিনি তাকে কিতাবটি ধার দিলেন।<sup>[২]</sup> একবার মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের কাছে কিছু গ্রন্থ ধার চাইলেন ইমাম শাফিয়ি। কিন্তু তিনি তা না-দেওয়ায় ইমাম শাফিয়ি তাকে লিখলেন :

يا ذا الذي لم تر عي # ن من رآه مثله

العلم يأبى أهله # أن يمنعوه أهله

হে জ্ঞানী, আপনার চোখে অন্য কাউকে হয়তো

নিজের মতো জ্ঞানী মনে হয় না।

জ্ঞান তো জ্ঞানীকে বারণ করে

অন্য জ্ঞানীদেরকে সেই জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করা থেকে।

সে যুগে গ্রন্থ ধার-করার প্রক্রিয়া সহজ ছিল। আর তাই নিজের কষ্টার্জিত টাকায় দামি দামি গ্রন্থ কেনা থেকে বিরত থাকতেন কিছু জ্ঞানী। তাদের অন্যতম হলেন আবু হাইয়ান গারনাতী। তিনি বলতেন, আমার যখন দরকার হয়, সরকারি গ্রন্থাগার থেকে বই ধার করে নিয়ে এসে প্রয়োজন পূরণ করি।<sup>[৩]</sup> তবে গ্রন্থ ধার নেওয়ার সুবিধা সবার জন্য ছিল না। এর প্রক্রিয়া সহজ ও সুষ্ঠু করতে সেজন্য কিছু শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছিল।

» কায়রোর গ্রন্থাগারের নিয়ম ছিল, সেখান থেকে কেবল আবাসিক ছাত্রদেরকে কিতাব ধার দেওয়া হবে।<sup>[৪]</sup>

» ধার-গ্রহণকারী থেকে অনেক সময় জামানত নেওয়া হতো। তবে জ্ঞানী ও নেককার ব্যক্তিদের সে ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হতো। মারওয়া অঞ্চলের গ্রন্থসমূহের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বিখ্যাত

[১] দেখুন মাকরিযি ২: ৩৬৬।

[২] ইবনু জামা'আ ১৬৭-১৬৮।

[৩] ইবনু হাজার: আদ দুরাফুল কামিনাহ: ৪: ৩০৯।

[৪] দাইরাতু মাআরিফি ওয়াজদি ৮: ৬৪।



মনীষী ইয়াকুত রুমী। কারণ তাদের কাছ থেকে তিনি দুই শ গ্রন্থ ধার নিয়েছেন। এ জন্য তাকে কোনো কিছু জামানত দিতে হয়নি।<sup>[১]</sup>

» অনেক সময় ধার-গ্রহণকারীকে বই ফেরত দেওয়ার সীমা বেঁধে দেওয়া হতো। আল-কায়রোয়ান জামে মসজিদের গ্রন্থাগারে নিজের লিখিত আল-ইবার গ্রন্থটি প্রদানের সময় ইবনু খালদুন যে চুক্তিনামা করেন, তাতে লেখা ছিল: গ্রন্থাগারের বাইরে পড়ার জন্য এ গ্রন্থ কাউকে ধার দেওয়া যাবে না। কিন্তু ধারপ্রার্থী যদি বিশ্বস্ত ব্যক্তি হয় এবং কিতাবের বিপরীতে দামি কিছু জামানত হিসেবে রাখে, তাহলে কিতাবটি তাকে ধার দেওয়া যেতে পারে। তবে শর্ত হলো, দুই মাসের মধ্যে তা ফেরত দিতে হবে।<sup>[২]</sup>

» গ্রন্থ ধারকারীকে অবশ্যই গ্রন্থের যত্ন নিতে হবে। আমানত মনে করে তা সংরক্ষণ করতে হবে। মালিকের অনুমতি ছাড়া তাতে সংশোধন করা যাবে না। কোনো টীকা সংযোজন করা যাবে না। তাতে কলম ধরা যাবে না। পৃষ্ঠার সাদা অংশে, সূচনায়, উপসংহারে বা পার্শ্বটিকায় মালিকের অনুমতি ছাড়া কিছু লেখা যাবে না। ধার-করা গ্রন্থকে অন্য কারও কাছে ধার দেওয়া যাবে না। কোনো কিছুর জামানত হিসেবে এ বই প্রদান করা যাবে না। প্রয়োজন ছাড়া ধার-করা কিতাব দীর্ঘদিন নিজের কাছে রাখা যাবে না। বরং প্রয়োজন বা শর্তের মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। মালিকের পক্ষ থেকে তলবের অপেক্ষায় বই আটকে রাখা যাবে না।

এই ছিল ব্যক্তি বা লাইব্রেরি থেকে বই ধার নেওয়ার সময় পালনীয় শর্তের কিছু নমুনা। তবে পাবলিক লাইব্রেরির নিয়মে কিছুটা শিথিলতা ছিল। যোগ্য ব্যক্তিগণ বইয়ের পৃষ্ঠায় টীকা সংযোজন করতে পারতেন। তা ছাড়া ধারগ্রহিতার কর্তব্য ছিল, ধার দাতাকে কৃতজ্ঞতা জানানো। তার জন্য উত্তম বিনিময়ের ব্যবস্থা করা।<sup>[৩]</sup>

এ বিষয়ে আলোচনা শেষ করার আগে আরেকটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করতে চাই। ইসলামি বিশ্বে এমনও গ্রন্থাগার ছিল, যেগুলো কেবল আভ্যন্তরীণ অধ্যয়নের জন্যই ব্যবহৃত হতো। বাইরে নিয়ে পড়ার জন্য সেখান থেকে কাউকে কিতাব ধার দেওয়া হতো না। বর্তমানে ব্রিটিশ জাদুঘরেও একই নিয়ম প্রচলিত। ইসলামি বিশ্বেও অনেকে এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তাদের

[১] মু'জামুল বুলদান: ৩৭৬।

[২] The Encyclopaedia of Islam II, p. 1047.

[৩] ইবনু জামা'আ ১৬৮-১৬৯ (সামান্য পরিমার্জিত)।

অন্যতম ছিলেন কাযি ইবনু হাইয়ান নিশাপুরী। তিনি জ্ঞানী ও বিন্যাসীদের জন্য তাঁর সকল গ্রন্থ ওয়াকফ করেছেন ঠিক, তবে শর্ত ছিল—যত বাই হোক, বাইরে নিয়ে পড়ার জন্য কাউকে ধার দেওয়া যাবে না।<sup>[১]</sup> জামালুদ্দিন মাহমুদ বিন আলির প্রতিষ্ঠিত আল-মাদরাসাতুল মাহমুদিয়ার গ্রন্থাগারেও একই নিয়ম প্রচলিত ছিল। মাদরাসা-ভবনের বাইরে কিতাব নেওয়া বারণ ছিল।<sup>[২]</sup>

## গ্রন্থাগারের কর্মকর্তাগণ

ছোট-বড়, বিশেষ-সাধারণ লাইব্রেরি অনুযায়ী তাতে কর্মকর্তা কর্মচারীদের সংখ্যা ও দায়িত্ব বণ্টন নানা রকম হতো। তবে কিছু পদ প্রায় বিদ্যাত সব গ্রন্থাগারেই ছিল। এ পরিচ্ছেদে আমরা সেসব পদ ও কর্মকর্তাদের নিয়ে আলোচনা করব।

এক. পরিচালক (গ্রন্থাগারিক)

দুই. অনুবাদক

তিন. অনুলিপিকারী

চার. বই বাঁধাইকারী

পাঁচ. পরিবেশক

## ✽ এক. পরিচালক (গ্রন্থাগারিক)

তিনি লাইব্রেরির জ্ঞানগত ও প্রশাসনিক সকল বিষয় পরিচালনা করতেন। নতুন নতুন গ্রন্থ সংগ্রহ করে গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ করতেন। পরিপূর্ণ ও সুবিন্যস্ত গ্রন্থসূচি তৈরি করতেন। পাঠক ও শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন সহজ করতে যা যা দরকার, সবকিছুরই ব্যবস্থা করতেন। যেমন: কোনো বই যেন হারিয়ে না যায় সে দিকে লক্ষ রাখা এবং পুরোনো গ্রন্থগুলো অধ্যয়নের উপযোগী করা। বাঁধাই করার প্রয়োজন হলে সেগুলো নতুন করে বাঁধাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া। যাদের দরকার নেই, তাদেরকে অযথা বই ধরতে না দেওয়া। যাদের প্রয়োজন, তাদের কাছে গ্রন্থ সরবরাহ করা। কিনে পড়ার সামর্থ্য রাখে না, এমন দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বইয়ের ব্যবস্থা করতে ধনীদের কাছে আবেদন করা।<sup>[৩]</sup>

[১] Islamic Culture III, 1929, p. 254.

[২] মাকরিযি: আল-খুতাত: ২: ৩৯৫।

[৩] আস সুবকি: মুক্তিদুন নাঈ ১৫৯।



বেশির ভাগ সময় একটি গ্রন্থাগারের জন্য এক জনই গ্রন্থাগারিক থাকতেন। তবে কিছু কিছু গ্রন্থাগার আয়তনে ছিল বিশাল। তাতে বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থীদের যাতায়াত থাকায় একজন গ্রন্থাগারিকের ওপর চাপ সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ত। তখন দুজন গ্রন্থাগারিক অথবা একাধিক সহকারী নিয়োগ করা হতো। সবাই মিলে সহযোগিতা করে গ্রন্থাগারিকের কাজ সহজ করে। এসব বিশাল লাইব্রেরির একটি হলো বুওয়াইহ রাজবংশের বিখ্যাত উজির সাবুর বিন আরদেশিরের প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার। সেই লাইব্রেরির বর্ণনা দিতে গিয়ে ইবনুল ইমাদ<sup>[১]</sup> লেখেন : এ গ্রন্থাগারে বিপুল পরিমাণ বইপুস্তক জমা করে হুসাইন বিন শাইবা। এরপর আবু আবদিল্লাহ দিব্বা আল-কাযীকে গ্রন্থাগারিক দেখভাল করার দায়িত্ব দেন। সাবুরের মৃত্যুর পর উজিরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন মুরতাজা আবুল কাসিম। তিনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী। বিদ্যার্থীদের খুব পছন্দ করতেন। তিনি উজির হয়ে বিখ্যাত আবু আবদিল্লাহ বিন হামাদ আবু মানসুরকে গ্রন্থাগারিক হিসেবে নিযুক্ত করেন। তা ছাড়া ফাতিমি রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরিসমূহেও এ রকম গ্রন্থাগারিক ছিল। তারা গ্রন্থালয়ের সার্বভৌম দেখাশোনা করতেন।<sup>[২]</sup>

### গ্রন্থাগারিক নিয়োগের পদ্ধতি

আধুনিক যুগে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতেও গ্রন্থাগারিকের রীতি প্রচলিত। শিক্ষার্থী ও জ্ঞানীসমাজ সবসময় গ্রন্থাগারিকের দ্বারস্থ হন। তাদের আহ্বান ও প্রয়োজন অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের সন্ধান দিয়ে গ্রন্থাগারিক সহযোগিতা করে থাকেন। তা ছাড়া কোনো নতুন প্রকাশিত গ্রন্থ সবার আগে গ্রন্থাগারিকের হাতেই আসে। তিনি খুব দ্রুত পাঠের মাধ্যমে বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা নিয়ে নেন। এরপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠক ও গবেষকদের সেই বইয়ের সন্ধান দেন। আর তাই উচ্চ-শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্য থেকে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে অনেকে আবার বড় বড় ডিগ্রিপ্রাপ্ত।

মধ্যযুগের মুসলমানগণ সম্ভবত এটি খুব ভালো করে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তারা বুঝেছিলেন, গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব কেবল লাইব্রেরি প্রশাসন পরিচালনা নয়। বরং সবার আগে তার দায়িত্ব হলো তত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিকগুলো পরিচালনা করা। তাই তো এ পদে যাদের আমরা দেখতে পাই, তারা সবাই ছিলেন সমকালীন বিখ্যাত জ্ঞানী ও সুসাহিত্যিক। নিম্ন

[১] শাযরাফুস সাহাব ১: ১০৪।

[২] মাকরিযি: আল-খুতাব ১: ৪৫৮।

তাদের কয়েকজনের নামের তালিকা ও তার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো।

» সাহল বিন হারুন, সাইদ বিন হারুন ও সালাম ছিলেন খলিফা হারুনের রশিদের প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত বায়তুল হিকমাহ গ্রন্থাগারিক। সাহল সম্পর্কে ইবনুন নাদিম বলেন, তিনি ছিলেন প্রজ্ঞাবান, বিগ্ধভাষী, কবি...। আবু উসমান জাহিয় তাঁর গুণকীর্তন করেছেন। তাঁর বিগ্ধ উচ্চারণ ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রশংসা করেছেন। নিজের রচিত বইপুস্তকে তাঁর আলোচনা করেছেন। সাহল বিন হারুন নিজেও ছিলেন বহু কিতাবের লেখক। সাইদ ছিলেন স্পষ্ট ও বিগ্ধভাষী পণ্ডিত। তাঁর রচিত কিতাবের মধ্যে কিতাবুল হিকমাহ ওয়া মানাফিইহা অন্যতম। তার লেখা ছোট ছোট পুস্তিকাও আছে বেশ। আর সালাম হলেন ফারসি থেকে আরবি অনুবাদক।<sup>[১]</sup>

» বিখ্যাত আব্বাসী উজির ফাতহ ইবনু খাকানের নামে গ্রন্থাগার নির্মাণ করে তা দেখাশোনা করেন আলি বিন ইয়াহইয়া মুনায্জিম (মৃত্যু ২৭৫ হিজরি)। তিনি ছিলেন খলিফা মুতাওয়াক্কিলের অন্তরঙ্গ বন্ধু। খলিফা মুতামিদের শাসনকাল পর্যন্ত যারাই ক্ষমতার মসনদে বসেছেন, সকলেই তাঁকে গ্রন্থাগারিকের পদে বহাল রাখেন। তিনি ছিলেন কবিতা ও ইতিহাসের কথক এবং নিজেও বিখ্যাত কবি। খলিফাদের কাছে তাঁর বেশ সমাদর ছিল।<sup>[২]</sup> ইয়াকুত তাঁকে নিয়ে লম্বাচওড়া আলোচনা করেছেন।<sup>[৩]</sup> সেখানে তিনি লেখেন : আলি ছিলেন সাহিত্যে সাড়া-জাগানো এক ব্যক্তি। সাহিত্যানুরাগীদের তিনি খুব পছন্দ করতেন। সমাদর করতেন। সাহিত্যপ্রেমীদের জন্য তাঁর ঘর সবসময় খোলা থাকত। যোগ্য সাহিত্যিকদের তিনি খলিফা ও আমিরদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন।<sup>[৪]</sup>

» অপরদিকে ফাতিমি রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় সমকালীন বিখ্যাত জ্বানীর হাতে। তিনি হলেন আলি ইবনু মুহাম্মাদ শাবাস্তি (মৃত্যু : ৩৯০ হিজরি)। তাঁর সম্পর্কে ইবনু খাল্লিকান লেখেন :<sup>[৫]</sup> তিনি ছিলেন সেরা সাহিত্যিক। মিশরের শাসক আজিজ ইবনুল মুঈযের দরবারে তাঁর যাতায়াত ছিল। আজিজ তাঁকে লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক

[১] ইবনুন নাদিকম: আল ফিহরিস্ত পৃ ১৭৪।

[২] প্রাগুক্ত পৃ ২০৫।

[৩] মু'জামুল উদাবা ৫: ৪৫৯-৪৭৭।

[৪] প্রাগুক্ত ৫: ৪৬০।

[৫] আল ওয়াফায়াত: ১: ৪৮১।



হিসেবে নিযুক্ত করেন। তিনি শাসকের সামনে নানা বিষয়ের গ্রন্থ পাঠ করতেন। তাঁর সঙ্গে ওঠাবসা করতেন। গল্প করতেন। তিনি ছিলেন বাগ্মী, কথার মাধুর্য ছিল তাঁর মুখে। ব্যবহার ছিল অমায়িক। বেশকিছু গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন। যেমন : কিতাবুদ দিয়ারাত এবং কিতাবু মারাতিবিল ফুকাহা ইত্যাদি।

» বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও বিদ্বান ইবনু মাসকুওয়াইহ ছিলেন ইবনুল আমিদের প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক।<sup>[১]</sup> এ ব্যাপারে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

বুওয়াইহি রাজবংশের বিখ্যাত উজির সাবুর বিন আরদেশিরের গ্রন্থাগার দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয় একদল জ্ঞানী ও সাহিত্যিককে। তাদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করছি :

» কাযি আবু আবদিল্লাহ আদ দিব্বা।<sup>[২]</sup>

» আবু আহমাদ আবদুস সালাম ইবনুল হুসাইন বাসরী (মৃত্যু : ৪০৫ হিজরি)। তিনি ছিলেন আবুল আলা মাআররির সমকালীন ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ছিলেন জ্ঞানী, সাহিত্যিক, কারী। একাধিক কিরাআতে পারদর্শীও ছিলেন। সুমধুর কণ্ঠে কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করতেন। চমৎকার কবিতা উপস্থাপন করতেন।<sup>[৩]</sup>

বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসার গন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় সে যুগের বিদ্বান একদল জ্ঞানী ও মনীষীকে। তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করছি :

» আবু ইউসুফ ইসফারাইনি। তিনি ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক। ৪৯৮ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর ওই পদে নিয়োগ পান মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আবয়ুরদি। তিনিও ছিলেন বিদ্বান, কবি ও সাহিত্যিক।<sup>[৪]</sup> নিজামিয়া লাইব্রেরির সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থাগারিক হলেন আবুল হাসান ইয়াহইয়া ইবনুল খতিব তাবরিযি। তাঁর সম্পর্কে ইয়াকুত লেখেন :<sup>[৫]</sup> তিনি ছিলেন ভাষা, ব্যাকরণ ও সাহিত্যে সে যুগের অন্যতম ইমাম। ছিলেন নির্ভরশীল, সত্যবাদী ও বিশুদ্ধ বর্ণনাকারী। তিনি আবুল আলা মাআররির কাছে চলে

[১] তাজারিবুল উমাম ৬: ২২৪।

[২] শাযারাতুয যাহাব ৩: ১০৪।

[৩] তারিখু বাগদাদ ১১: ৫৮।

[৪] মু'জামুল উদাবা ৬: ৩৪১-৩৪৩।

[৫] মু'জামুল উদাবা ৭: ১৮৩।

যান। তাঁর থেকে এবং বহু মনীষী থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। নিজামিয়া মাদরাসায় সাহিত্যের পাঠ দিতেন তিনি। তাঁর ইলম, প্রজ্ঞা, ভাষার দক্ষতা ও সাহিত্যজ্ঞানের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে মানুষ জ্ঞান অর্জনের জন্য তাঁর কাছে আসতে শুরু করে।

অপরদিকে আল-মাদরাসাতুল মুস্তানসিরিয়ার গ্রন্থাগারের দায়িত্বেও ছিলেন বিশেষ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গ। যেমন :

- » শামসি আলি ইবনুল কিতবী। মুস্তানসিরিয়া গ্রন্থাগারের তিনিই সর্বপ্রথম গ্রন্থাগারিক। উদ্বোধনের দিন খলিফা তাঁকে সম্মানসূচক পোশাক পরিয়ে দেন।<sup>[১]</sup>
- » বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনুস সাঈ। আল-জামিউল মুখতাসার গ্রন্থকার হিসেবেও তিনি পরিচিত।<sup>[২]</sup>
- » আল হাওয়াদিসুল জামিআ-সহ বহুগ্রন্থের লেখক ইবনুল কৃতী। এ গ্রন্থাগারে নিয়োগ পাওয়ার আগে তিনি ছিলেন নাসিরুদ্দিন তুসীর ব্যক্তিগত গ্রন্থশালার পরিচালক।

## ❖ দুই. অনুবাদকবৃন্দ

ভাষা ও ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য যেসব বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লবে মুসলমানগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, সেগুলোর ক্ষেত্রে তারা বেশির ভাগ নির্ভর করেছেন তৎকালীন অনারবদের জ্ঞান-গবেষণার ওপর। এসব জ্ঞান-গবেষণা এবং আরবদের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করে দিয়েছিলেন বিজ্ঞ অনুবাদকগণ। এসব অনুবাদকদের সাহায্যে গ্রিক, রোমান, কিবতী, পারসিক ও ভারতীয়দের জ্ঞান-গবেষণাগুলো আরবিতে তর্জমা করা হয়। এসব অনুবাদকদের নামের তালিকা ও তাঁদের কীর্তি ইবনুন নাদিম রচিত আল-ফিহরিস্ত এবং ইবনু আবি উসাইবিয়া রচিত তাবাকাতুল আতিব্বা গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে। এখানে আমরা সেসব বিজ্ঞ অনুবাদকদের কিছু বৃত্তান্ত অল্প কয়েক লাইনে তুলে ধরব। সেসব গ্রন্থাগারে কী পরিমাণ অনুবাদক দিনরাত কাজ করতেন, সেটিও এখানে উপস্থাপন করব।

এখানে একটি বিষয় আমি স্পষ্ট করতে চাই, ইসলামি বিশ্বে সর্বপ্রথম যে গ্রন্থাগারটির কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়, সেটিতেও কর্মরত ছিলেন অনুবাদকবৃন্দ।

[১] আল কৃতী: আল হাওয়াদিসুল জামিআ ২৫৬।

[২] দেখুন: আল জামিউল মুখতাসার গ্রন্থের ভূমিকা পৃ ১।



কুরদ আলি লেখেন :<sup>[১]</sup> যারা ব্যক্তিগত লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাদের মধ্যে বিখ্যাত উমাইয়া খলিফা খালিদ ইবনু ইয়াযিদের (মৃত্যু : ৮৫ হিজরি) নাম সবার আগে থাকবে। তিনিই সর্বপ্রথম আলাদা লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনুন নাদিম তাঁর সম্পর্কে বলেন,<sup>[২]</sup> তিনি প্রাচীন আরবদের গ্রন্থ খুঁজে খুঁজে সংগ্রহ করতেন। চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের নানা গ্রন্থ তাঁর উদ্যোগেই সর্বপ্রথম অনূদিত হয়। খালিদ সম্পর্কে অন্যত্র তিনি লেখেন :<sup>[৩]</sup> মিশরে একদল গ্রিক দার্শনিক উপস্থিত হয়েছে এবং তারা যথেষ্ট ভালো আরবিও জানে—এ সংবাদ পেয়ে তিনি ওই দার্শনিকদের নিজ দরবারে উপস্থিত করার নির্দেশ দেন। এরপর তাদেরকে গ্রিক ও কিবতীয় ভাষায় কারিগরি শিল্প নিয়ে লেখা গ্রন্থগুলো আরবিতে অনুবাদ করার নির্দেশ দেন। ইসলামের ইতিহাসে সেটি ছিল সর্বপ্রথম অনুবাদের উদ্যোগ। এমনকি ইবনুন নাদিম সেই দলের একজন অনুবাদকের নামও বলেন।<sup>[৪]</sup> তার নাম স্টিভেন ওল্ড। ইবনুন নাদিম বলেন, স্টিভেনই খালিদ বিন ইয়াযিদের নির্দেশে কারিগরি শিল্পের বইগুলো আরবিতে অনুবাদ করেন।

তবে অনুবাদশিল্প শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করে বায়তুল হিকমায়। সেখানে কর্মরত বিখ্যাত অনুবাদকদের অন্যতম হলেন আবু সাহল ফাদল বিন নাওবখত। ইবনুন নাদিম তাঁর সম্পর্কে লেখেন :<sup>[৫]</sup> তিনি হারুনুর রশিদের প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমা গ্রন্থশালায় কর্মরত ছিলেন। বেশকিছু ফারসি গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করেন। মুসলিম সেনাদল যখন আংকারা, আম্মুরিয়া ও রোম বিজয় করেন, তখন সেসব এলাকা থেকে প্রাচীন যুগের বহু গ্রন্থ বাগদাদে নিয়ে আসা হয়। খলিফা রশিদ প্রাচীন সেসব গ্রন্থ অনুবাদের উদ্যোগ নেওয়ার দায়িত্ব দেন ইউহান্না ইবনু মাসুওয়াইহকে।<sup>[৬]</sup>

খলিফা মামুন ছিলেন বিদগ্ধ জ্ঞানী ও বিদ্যানুরাগী। তাঁর শাসনামলে জ্ঞানের উৎকর্ষ ও বিকাশ ঘটেছে পুরোদমে। প্রাচীন যুগের লেখা মূল্যবান বইপত্র তিনি সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেন। অনেক দুর্লভ গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলো বায়তুল হিকমায় সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেন। এই বইগুলো আরবি ভাষায়

[১] খুতাতুশ শাম ৬: ১৮৯।

[২] আল ফিহরিস্ত ৪৯৭।

[৩] আল ফিহরিস্ত ৩৩৮।

[৪] ইবনুন নাদিম ৩৪০।

[৫] আল ফিহরিস্ত ৩৮২।

[৬] ইবনু আবি উসাইবিয়া ১: ১৭৫।

অনুবাদ করতে এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সংযুক্ত করতে একদল বিদ্বৎ জ্ঞানী ও দক্ষ অনুবাদক নিয়োগ দেন। ওই সময় বায়তুল হিকমায় যেসব অনুবাদক কর্মরত ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলেন : সালাম, হাজ্জাজ ইবনু মাতার, ইবনুল বিতরিক, হুনাইন ইবনু ইসহাক, উমর ইবনুল ফাররুখান ও ইসহাক ইবনু হুনাইন।<sup>[১]</sup>

কিছু ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারও অনুবাদের উদ্যোগ নিয়ে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এর মধ্যে বনু শাকিরের প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার অন্যতম। এর উদ্যোক্তা ছিলেন মুহাম্মাদ, আহমাদ ও হাসান। নানা শাস্ত্রের গ্রন্থ অনুবাদ করতে এবং তাদের গ্রন্থাগারে কাজ করতে কিছু অনুবাদক নিযুক্ত করেন। সেসব অনুবাদকের মধ্যে ছিলেন হুবািশ ইবনুল হাসান ও সাবিত ইবনু কুররাহ।<sup>[২]</sup>

খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহর ইন্তেকালের পর অনুবাদ কার্যক্রম প্রায় থেমে যায়। এর পর থেকে আর সরকারি ও বেসরকারি গ্রন্থাগারে কোনো অনুবাদক কর্মরত ছিলেন বলে ইতিহাসে খুব একটা পাওয়া যায় না। সম্ভবত এর প্রধান কারণ হলো, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন শাস্ত্রের বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়ে গিয়েছিল। অথবা বায়তুল হিকমা ও সমকালীন অন্যান্য গ্রন্থাগার থেকে অনূদিত বইপত্র পড়ে আরব মনীষীগণ নিজেদের ভাষায় জ্ঞান, বিদ্যা, দর্শন ও নানা শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ রচনা করে ফেলেছিলেন। যেগুলো পরবর্তী শতাব্দীতে জ্ঞান-গবেষণার প্রধান উৎস হিসেবে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ছিল।

### ✽ তিন. অনুলিপিকারবৃন্দ

মুসলমানদের অন্যতম গর্বের বিষয় হলো, মধ্যযুগেই তারা গ্রন্থাগারের জন্য প্রকাশনা বিভাগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। আমাদের যুগে বইপত্র ছাপানোর যে অত্যাধুনিক মেশিন ও প্রযুক্তির সঙ্গে আমরা পরিচিত, স্বাভাবিকভাবেই মধ্যযুগে তা ছিল না। তখন প্রত্যেক গ্রন্থাগার ও প্রকাশনীতে সুনিপুণ হাতের লেখায় পারদর্শী এবং দক্ষ অনুলিপিকারদের নিয়োগ দেওয়া হতো। নতুন প্রকাশিত বইগুলো সেসব অনুলিপিকারদের কাছে নিয়ে আসা হতো। সেগুলো তারা প্রতিলিপি করে গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ করতেন। কোনো লেখক বা সূত্রাধিকারী যদি অনুলিপিকারের কাছে গ্রন্থ পাঠাতে অনীহা দেখাতেন, তখন অনুলিপিকার নিজেই গ্রন্থকারের বাড়িতে গিয়ে তার নিবিড় তত্ত্বাবধানে বইয়ের প্রতিলিপি তৈরি করতেন। অনেকক্ষেত্রেই এমনটা হতে দেখা গেছে। সত্যিই,

[১] দেখুন আল ফিহরিস্ত: ১৭৪, ৩৩৭, ৪১৫, আন নাফতী ২৪২, ইবনু আবি উসাইবিয়া ১: ১৮৭।

[২] আল কিফতী।



সেসব অনুলিপিকার তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবেই পালন করেছেন। কোনো ত্রুটি বা কালক্ষেপণ না করে প্রতিটি লাইব্রেরিকে নতুন নতুন বইপত্র দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন।

খুব সুনিপুণভাবে, অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে লেখার কাজ করতে হতো অনুলিপিকারদের। দ্রুত শেষ করে জমা দিতে হবে এ তাড়া থাকত না। ফলে বাক্যের মাঝখান থেকে কোনো শব্দ ছুটে যাওয়ার বা ভুলে অন্য কিছু লিখে ফেলার সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ। কত পৃষ্ঠার মধ্যে লিখে শেষ করতে হবে, লেখার পদ্ধতি কী হবে, প্রতি পৃষ্ঠায় কয়টি লাইন হবে, কালির রঙ কী হবে— ইত্যাদি বিষয় মাথায় রেখেই তাদের কাজ করতে হতো। তা ছাড়া লোভনীয় অর্থের বিনিময়েও যে অপকারী বই অনুবাদ করা যাবে না, এ নির্দেশনাও তারা কঠোরভাবে মেনে চলতেন।<sup>[১]</sup>

সরকারি হোক বা বেসরকারি, প্রায় প্রতিটি লাইব্রেরিতেই অনুলিপিকার কর্মরত ছিলেন। নিচে কয়েকজন অনুলিপিকারের উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

» বায়তুল হিকমায় বেশ ক'জন অনুলিপিকার কর্মরত ছিলেন। আল্লান শাউবীর বরাতে ইবনুন নাদিম লেখেন:<sup>[২]</sup> আল্লান শাউবী মূলত পারস্য বংশোদ্ভূত। তিনি ছিলেন বলিয়ে। কুলজিশাস্ত্র বা বংশবৃত্তান্তের পণ্ডিত। ত্রুটিভেদে জ্ঞানীদের স্তর নির্ণয়ে অভিজ্ঞ। তর্কশাস্ত্রে পারদর্শী। তিনি বারমাকীদের খুব ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। বায়তুল হিকমা গ্রন্থাগারে তিনি বাদশাহ রশিদ ও মামুনের জন্য অনুলিপির কাজ করতেন।

» ওয়াকিদির (মৃত্যু: ২০৮ হিজরি) গ্রন্থাগারে দুজন গোলাম ছিল। তারা দিনরাত ওয়াকিদির জন্য অনুলিপির কাজ করত। ওয়াকিদির গ্রন্থ লিখতে লিখতে এভাবেই প্রসিদ্ধি পেয়ে যান মুহাম্মাদ ইবনু সাদ। এরপর 'ওয়াকিদির অনুলিপিকার'—এটাই হয়ে যায় ইবনু সাদের সবেচেয়ে বড় পরিচয়।<sup>[৩]</sup>

» বিখ্যাত খ্রিস্টান ডাক্তার হুনাইন ইবনু ইসহাকের একাধিক অনুলিপিকার ছিল। তাদের একজন হলেন ইয়াকুত মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনু দিনার। ডাক্তারিবিদ্যায় প্রাচীন যুগের নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান তিনি হুনাইন ইবনু ইসহাকের জন্য লিখে দিতেন।<sup>[৪]</sup> ইবনু আবি উসাইবিয়া লেখেন:<sup>[৫]</sup> হুনাইনের একজন

[১] আস সুবকী: মুফিদুন নাসি ১৮৬-১৮৭ (পরিমার্জিত)।

[২] পৃ ১৫৩-১৫৪।

[৩] আল ফিহরিস্ত: ১৪৪।

[৪] মু'জামুল উদাবা: ৬: ৪৮২।

[৫] ১: ১৮৭।

অনুলিপিকার ছিল আযরাক নামে। ইবনু আবু উসাইবিয়া আরও যোগ করেন : প্রাচীন গ্রিক চিকিৎসাবিদ গ্যালেন ও অন্যান্য বিজ্ঞানীর গ্রন্থ থেকে অনেক তথ্য তার হাতে লিখিত দেখেছি।

» জাহিযের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারেও একজন অনুলিপিকার ছিলেন। তার নাম হলো আবদুল ওয়াহাব ইবনু ঈসা।<sup>[১]</sup> ইমাম শাফিয়ির ভাতিজা আহমাদ বিন আহমাদ ছিলেন ইবনু আবদুসি জাহশিয়ারির অনুলিপিকার। সমকালীন অনেক গ্রন্থকার ও মনীষী তাঁর হাতে অনুলিপি করাতে পেয়ে গর্ববোধ করতেন। কারণ আহমাদ ছিলেন সুনিপুণ ও সুদক্ষ অনুলিপিকার।<sup>[২]</sup>

» ইবনুল বাওয়াব নামে বিখ্যাত আলি ইবনুল হিলালও (মৃত্যু : ৪২৩ হিজরি) ছিলেন প্রসিদ্ধ অনুলিপিকার। তাঁর যোগ্যতা, দক্ষতা ও পারদর্শিতার কারণে তাঁকে বাহাউদ্দৌলা ইবনু আযুদিদ্দৌলার প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু অনুলিপি বিষয়ে তাঁর দক্ষতা এবং সুন্দর হাতের লেখা থাকার কারণে পরিচালকের পাশাপাশি তিনি অনুলিপির কাজও করতেন। একবার ওই গ্রন্থাগারে বিখ্যাত মহান লিপিকার আবু আলি ইবনু মাকলার হাতে-লেখা কুরআনুল কারীমের ঊনত্রিশটি পারা পাওয়া যায়। প্রতিটি পারা আলাদা করে বাঁধাই করা ছিল। এরপর অসম্পূর্ণ একটি পারা লেখার জন্য ইবনুল বাওয়াবকে দায়িত্ব দেন বাহাউদ্দৌলা। ইবনু মাকলা যে কাগজ, কলম ও কালি ব্যবহার করেছিলেন, ইবনুল বাওয়াব অসম্পূর্ণ পারা লেখার জন্য ঠিক একই উপকরণ ব্যবহার করেন। ওই এক পারা লিখতে গিয়ে তিনি এত দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সাথে ইবনু মাকলার লেখা কপি করেন যে, ত্রিশ পারার মধ্যে কোনটি ইবনুল বাওয়াবের লেখা— বাহাউদ্দৌলা তা ধরতেই পারেননি।<sup>[৩]</sup>

» আব্বাসীয় খলিফা রাযী বিল্লাহ একবার গ্রন্থাগারিকের কাছে নাহশাল ইবনু জিযযির কাব্যগ্রন্থ তলব করেন। কিন্তু গ্রন্থটি তিনি খুঁজে পাননি। এ রকম মূল্যবান বই গ্রন্থাগারে নেই দেখে আস-সুলী ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এরপর তিনি খলিফার রুচি ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে মানানসই বইপুস্তক সংগ্রহের জন্য খলিফাকে পরামর্শ দেন। পাশাপাশি যেসব তথ্য ও কবিতা কেবল মানুষের মুখে মুখে আছে কিন্তু গ্রন্থে নেই অথবা যেসব গ্রন্থ সংগ্রহ করা অসম্ভব—সেগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিলিপি করিয়ে বাঁধাই করে রাখারও

[১] তারিখু বাগদাদ ১১: ২৮, আস সুমআনী: আল আনসাব: পৃষ্ঠা নম্বর: ৫৮০।

[২] ইয়াকুত: মু'জামুল উদাবা ১: ৮১।

[৩] ইয়াকুত: মু'জামুল উদাবা ৫: ৪৪৬-৪৪৭।



পরামর্শ দেন।<sup>[১]</sup>

» আল-মাদরাসাতুল মুস্তানসিরিয়ায় দুজন বিজ্ঞ জ্ঞানী অনুলিপিকার ছিলেন। একজন হলেন সফিউদ্দিন আবদুল মুমিন ইবনু ফাখির। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন, আমি শৈশবে বাগদাদে এসেছি। মুস্তানসির বিল্লাহর শাসনামলে আল-মুস্তানসিরিয়ায় কর্মরত শাফিয়ি মাযহাবের একজন ফকিহ'র কাছে বক্তৃতা, সাহিত্য, আরবি ভাষা, হস্তলিপি ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেছি। এরপর কাঠের কারুকার্য নিয়েও কাজ করেছি। হস্তলিপির চেয়ে তখন ওই বিষয়েই আমার দক্ষতা বেশি ছিল। শেষ পর্যন্ত আমি পরিচিতি পেয়েছি হস্তলিপিতে। এরপর মুস্তাসিম বিল্লাহর শাসনামল এল। তিনি গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ করার উদ্যোগ নিলেন এবং তাঁর পছন্দ করা গ্রন্থগুলো অনুলিপি করতে দুজন লেখক নিয়োগের নির্দেশ দিলেন। ওই সময় হস্তলিপিতে শাইখ যকিয়ুদ্দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ ছিল না। আর আমি ছিলাম দ্বিতীয় স্থানে। এরপর আমরা দুজন নিয়োগ পেলাম।<sup>[২]</sup>

» শাম, মিশর ও আন্দালুসের দিকে তাকালে সেখানেও আমরা অনুলিপিকারদের কর্মকুশলতার কথা জানতে পারি। নতুন ও উপকারী সব প্রতিলিপি করে সেসব অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলো তারা সমৃদ্ধ করেন।

» গ্রন্থ সংগ্রহে শামের বিখ্যাত উজির ও ডাক্তার সাহিব আমিনুদ্দৌলা আবুল হাসান ইবনু গাযযালের (মৃত্যু: ৬৪৮ হিজরি) ছিল বিপুল আগ্রহ ও উচ্চাভিলাষ। অনুলিপিকারগণ একের পর এক তাঁর জন্য গ্রন্থ প্রতিলিপি করতেন। একবার তিনি হাফিজ ইবনু আসাকিরের রচিত তারিখু দিমাশক গ্রন্থের একটি সেট সংগ্রহ করার ইচ্ছা করলেন। গ্রন্থটি ছিল আশি খণ্ডের। পুরো গ্রন্থ দশ জন অনুলিপিকারকে ভাগ করে দিলেন। প্রত্যেকের ভাগ্যে পড়ল আট খণ্ড করে। দশ জন লেখক টানা দুই বছর লেখার পর গ্রন্থটির অনুলিপি শেষ হয়।<sup>[৩]</sup> তা ছাড়া বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও আলেমের আমির আবুল ফিদার প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরিতেও একাধিক অনুলিপিকার কর্মরত ছিলেন।<sup>[৪]</sup>

» মিশরে অনুলিপিকারদের কর্মতৎপরতা ছিল বেশ লক্ষণীয়। বিপুল সংখ্যক অনুলিপিকার নিয়োগ দেওয়া হয় মিশরের বিখ্যাত গ্রন্থাগার দারুল

[১] আখবারুর রাযী বিল্লাহ ওয়াল মুত্তাকী বিল্লাহ পৃ ৪০।

[২] আল কিতাবী: ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত: ২: ১৮।

[৩] ইবনু আবু উসাইবিয়া ২: ২৩৬।

[৪] Islamic Culture IX ১৯৩৫ p. ১৩৫।

হিকমায়। যেসব কিতাব লাইব্রেরিতে নেই, সেগুলোর প্রতিলিপি তৈরি করার জন্য। মাকরিযি তাঁর গ্রন্থের একাধিক স্থানে সেসব অনুলিপিকারের কথা উল্লেখ করেছেন।<sup>[১]</sup> ইয়াকুব ইবনু কালিসের গ্রন্থাগারে একদল অনুলিপিকার ছিলেন। তারা কুরআনুল কারীম অনুলিপি করতেন। আরেকদল ছিলেন যারা হাদিস, ফিকহ, সাহিত্য এবং চিকিৎসাবিদ্যার গ্রন্থগুলো অনুলিপি করতেন।<sup>[২]</sup> তা ছাড়া আফরাইম ইবনু য়াফফানও ছিলেন গ্রন্থানুরাগী। নানা মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ ও প্রতিলিপি করাতে তাঁর বেশ আগ্রহ ছিল। সবসময় তাঁর কাছে একাধিক অনুলিপিকার থাকতেন। তারা অনুলিপির কাজ করতেন। আর বিনিময়ে আফরাইম তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন: ইবনু মালসাকা নামে খ্যাত মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ ইবনু হিশাম।<sup>[৩]</sup>

» আবদুল লতিফ বাগদাদির বরাতে ইবনু জামাআ লেখেন:<sup>[৪]</sup> কাযি ফাদিলের কাছেও একাধিক অনুলিপিকার ছিলেন, যারা প্রতিলিপির কাজ করতেন। মুওয়াফফিকুদ্দিন ইবনুল মাতরানের ছিল তিন জন অনুলিপিকার। সবসময় তারা প্রতিলিপির কাজ করতেন। তাদের জন্য মাসিক ভাতাও ধার্য করা ছিল। এসব অনুলিপিকারদের অন্যতম ছিলেন ইবনুল জামালা নামে খ্যাত জামালুদ্দিন। তার অনুলিপি বেশ জনপ্রিয় ছিল।<sup>[৫]</sup>

» এবার আসুন আন্দালুসের অনুলিপিকারদের কথায়। তাদের ভূমিকা জানতে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে আমরা স্পেনের দিকে যাই। ইবনু খালদুন লেখেন:<sup>[৬]</sup> আন্দালুসের তৃতীয় উমাইয়া শাসক ছিলেন হাকাম। তিনি তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগারের জন্য প্রতিলিপি-বিদ্যায় অভিজ্ঞ ও পারদর্শী একদল অনুলিপিকার নিয়োগ দেন। কর্ডোভার প্রধান বিচারপতি কাযি আবুল মুতাররিফ (মৃত্যু ৪০২ হিজরি) ছিলেন গ্রন্থানুরাগী ও প্রচুর বই সংগ্রাহক। তাঁর ছিল ছয় জন বিশিষ্ট অনুলিপিকার। তারা প্রতিলিপির কাজ করতেন। এর বিনিময়ে তিনি তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতেন। বিখ্যাত মনীষী মাত্তা কারও কাছে সুন্দর লিখনীতে পারদর্শী কোনো অনুলিপিকারের খোঁজ পেলে তাকে উচ্চমূল্য দিয়ে কিনে নিতে চাইতেন। কিনতে না পারলে তাকে

[১] আল-খুতাত: ১: ৪০৯, ৪৫৯।

[২] ইবনু খাল্লিকান ২: ৪৯৭।

[৩] ইবনু আবি উসাইবিয়া ২: ১০৫।

[৪] তাযকিরাতুস সামি' ১৬৬ (টীকায়)।

[৫] ইবনু আবি উসাইবিয়া ২: ১৭৮।

[৬] আল ইবার ৪: ১৪৬।



ভাড়া করে এনে গ্রন্থ লিখিয়ে ফেরত দিতেন।<sup>[১]</sup>

একটি বিস্ময়কর ঘটনা বলে অনুলিপিকারদের আলোচনা শেষ করতে চাই। বর্ণিত আছে, শামের ত্রিপলীর বনু আম্মার শাসকদের প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারে ছিল ১৮০ জন অনুলিপিকার। নিরবচ্ছিন্নভাবে দিনরাত তারা প্রতিলিপির কাজ করতেন। যেকোনো মুহূর্তে গিয়ে দেখা যেত, ত্রিশ জন অনুলিপিকার সেখানে কাজ করে চলেছেন।<sup>[২]</sup>

### ✽ চার. বাঁধাইকারীগণ

আমি মনে করি, বাঁধাইকারীদের নিয়ে লম্বা আলোচনার দরকার নেই। মাওয়ারাউন্নাহারের (ট্রান্স-অক্সিয়ানা) বিভিন্ন অঞ্চলসহ খুরাসান, ইরাক, শাম, মিশর, উত্তর আফ্রিকা থেকে নিয়ে আন্দালুস পর্যন্ত প্রতিটি অঞ্চলের বাঁধাইকারীদের নিয়ে সূতন্ত্রভাবে লেখার প্রয়োজন বোধ করি না। আগের পরিচ্ছেদে অনুলিপিকারদের আলোচনা থেকেই বাঁধাইকারীদের সংখ্যা ও কর্মতৎপরতা অনুমান করা যায়। কেননা, অনুলিপিকার ও বাঁধাইকারী এ দুটি শব্দ সর্বত্র পাশাপাশি বর্ণিত পাওয়া যায়। যেখানেই অনুলিপিকারের আলোচনা হয়েছে, এর পরেই বাঁধাইকারীদের প্রসঙ্গও তুলে ধরা হয়েছে।

স্যার টমাস আর্নল্ড এবং এডলফ গ্রোহম্যান চমৎকার একটি গবেষণাপত্র লিখেছেন, যা *The Islamic Book* গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে। সেখান থেকে আমি কয়েকটি লাইনে এখানে তুলে ধরছি :

‘ইরাক ও আন্দালুসবাসীগণ বাঁধাই-শিল্পকে খুব যত্নের সঙ্গে বিকশিত করেছেন। আন্দালুসের মালাগা শহরের চামড়াশিল্প ছিল খুবই চমৎকার ও উন্নত মানের। বিশেষ করে সেখানকার বই বাঁধাইয়ের কাজ ছিল গুণে-মানে অনন্য। বই সংগ্রাহক, গ্রন্থানুরাগী ও মুসলিম শাসকগণ গ্রন্থশিল্প ও সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নে সফলতার বিরাট স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশাল বিশাল লাইব্রেরি নির্মাণ করে সময়ে সময়ে সেগুলো সুবিন্যস্ত ও সমৃদ্ধ করেছেন। বই বাঁধাইয়ে তারা নৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, যা সে যুগে জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মধ্যযুগে বই বাঁধাই-শিল্পে অন্য কোনো অঞ্চলে এর নজির দেখা যায় না।’<sup>[৩]</sup>

[১] আস দিল্লাহ; ইবনু বাশকুওয়াল ১: ৩০৪-৩০৫।

[২] *Islamic Culture* IX ১৩৫; See also. III: ১৯২৯, p. ২৩১।

[৩] পৃষ্ঠা ৩১-৩২।

উক্ত গ্রন্থ এবং এফ. সাররে এর রচিত *Islamic Bookbinding* গ্রন্থ থেকে বাছাই করে এ রকম উন্নত বাঁধাইয়ের পাঁচটি চিত্র আমি এখানে তুলে ধরছি। সেই প্রাচীন যুগে বাঁধাই-শিল্প কতটুকু অগ্রগতি লাভ করেছিল, এসব ছবি দেখেই তা অনুমান করা যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যাওয়ার পরও সেসব বাঁধাই ও চামড়ার তৈরি বইয়ের কভারগুলো আজও তার সৌন্দর্য ধরে রেখেছে।

সূচনালগ্নে বই বাঁধাই ছিল খুব সাধারণ মানের। তবে খুব দ্রুত তাতে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়। একপর্যায়ে তা হয়ে যায় সৌন্দর্য ও নৈপুণ্যের সূতন্ত্র একটি শিল্প। ইবনুন নাদিম লেখেন:<sup>[১]</sup> পশুর চামড়া চুনা দিয়ে পাকা করার পর সেটি খুব ভালোভাবে শুকিয়ে যেত। ওই শোকানো চামড়া দিয়ে বই বাঁধাই করা হতো। কুফার পাকাকরণ ছিল উন্নত। সেখানকার পাকাকৃত চামড়া ছিল বেশ নরম ও আরামদায়ক। ফলে সেই চামড়াকে বই বাঁধাইয়ের কাজে ব্যবহার করা হতো। সেই থেকে বাঁধাই-শিল্পের অগ্রযাত্রা শুরু। ইবনুন নাদিরে পরও এ শিল্পের বিকাশ অব্যাহত ছিল। এরপর শুরু হয় বাঁধাইকৃত চামড়ার ওপর সূর্ণ দিয়ে নানা কারুকাজ। এভাবেই মুসলমানদের নিবিড় যত্ন ও পরিচর্যায় বাঁধাই-শিল্প তার চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করে। সৌন্দর্য ও সৃজনশীলতার এক অনুপম নিদর্শন হয়ে ওঠে।<sup>[২]</sup>

নাজাফের আল-হায়দারিয়া গ্রন্থাগারে আমি বেশ কিছু কুরআনুল কারীমের হস্তলিখিত কপি দেখেছি। সেগুলো ছিল খুব উন্নত মানের বাঁধাই। নিপুণ শিল্পীর হাতে সূর্ণ দিয়ে করা মনোমুগ্ধকর কারুকাজ।

ভারতীয় মনীষী আয়াতুল্লাহ বলেন, ইসলামি বিশ্বে যারা এ শিল্পের কাজ করতেন, তাদের ছিল উন্নত রুচিবোধ, প্রখর সৃজনশীলতা, দারুণ উদ্ভাবনী শক্তি। বই বাঁধাই-শিল্পে মুসলমানদের উৎকর্ষ ও উন্নতির কথাই আমি বলছি। অষ্টম ও নবম শতকে মিশরের দক্ষ শিল্পীগণ যে অমর কীর্তি গড়েছেন, আমি তার কথা বলছি। এরপর মুসলমানদের যত্ন ও পরিচর্যায় গ্রন্থ বাঁধাই শিল্প আরও বিকশিত হয়। বইয়ের ওপর নানা কারুকাজ ও সূর্ণ দিয়ে অলংকরণ করা শুরু হয়। এভাবেই ইসলামি বিশ্বে বই বাঁধাইকারীগণ প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন তাদের সুনিপুণ কাজ এবং অসামান্য পারদর্শিতার কারণে।<sup>[৩]</sup>

[১] আল ফিহরিস্ত পৃ ৩২।

[২] *Islamic Culture* IX p, ১৩৮।

[৩] *Islamic Culture* XII ১৯৩৮, p, ১৬৮।





ইসলামের সূর্যযুগে বাঁধাই করা চমৎকার কিছু কভারের নমুনা

### ❁ পাঁচ. পরিবেশকবৃন্দ

লাইব্রেরির কর্মকর্তাদের আলোচনায় প্রায়ই পরিবেশকদের কথা উঠে এসেছে ইতিহাসের কিতাবে। তাদের দায়িত্ব ছিল, পাঠক ও গবেষকদের গ্রন্থের সন্ধান দেওয়া। অথবা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে বই খুঁজে বের করে পাঠকদের কাছে নিয়ে আসা। এ থেকেই তাদের নাম হয়ে গেছে পরিবেশক। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, পরিবেশকদের কাজ ছিল গ্রন্থাগারিকের চেয়ে ছোট স্তরের। তাই বলে তারা ঝাড়ুদার কিংবা পরিচ্ছন্নতাকর্মী নয়। কারণ, (লাইব্রেরির) গ্রন্থের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ও কিতাবের অবস্থান সম্পর্কে তাদের জ্ঞান থাকতে হতো। তবে শুধু এতটুকুই, গ্রন্থের ভেতরকার সূচি ও আলোচ্য-বিষয় সম্পর্কে তাদের তেমন ধারণা থাকত না। সেটা থাকত গ্রন্থাগারিকদের। কারণ গ্রন্থাগারিককেই বইয়ের সূচিপত্রের সঙ্গে মিল রেখে গ্রন্থ-তালিকা প্রস্তুত করতে হতো। সে অনুযায়ী বই স্থাপন করতে হতো নির্দিষ্ট জায়গায়।

পরিবেশকরা যে কাজ করত, তা অনেকটা কর্মচারীদের মতোই। কারণ

পাঠকদের চাহিদামতো তাদের কাছে আসা-যাওয়া করতে হতো। তাই অনেক সময় তাদেরকে খাদেম নামেও ডাকা হতো। তবে উভয় প্রকার খাদেমের মাঝে পার্থক্য করতে পরিষ্কারের দায়িত্বে থাকা লোকদের সাথে পরিচ্ছন্নতাকর্মী শব্দটিও জুড়ে দেওয়া হতো। এভাবেই গ্রন্থ পরিবেশক এবং আসবাব পরিষ্কারের দায়িত্বে থাকা খাদেমদের মাঝে তারতম্য করা হতো।

পরিবেশক শব্দটি এই হিসেবে আরও যথার্থ। আরবি ইতিহাস-গ্রন্থসমূহে এর ব্যবহার অনেক দেখা যায়। ইবনুল ফুতী লেখেন: আল-মাদরাসাতুল মুস্তানসিরিয়ায় যখন বিপুল কিতাবাদি সংযোজন করা হয়, তখন সেগুলো ভালো করে বুঝে নিতে এবং বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিন্যাস করতে একজন বিশেষজ্ঞ ও জ্ঞানীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। যেন বই পেতে সহজ হয়। পরিবেশকের জন্য গ্রন্থ খুঁজে বের করতে কষ্ট না হয়।<sup>[১]</sup> তা ছাড়া মুস্তানসিরিয়া মাদরাসার পরিবেশকদের সম্পর্কে ইবনু হাজারও আলোচনা করেছেন।<sup>[২]</sup> আমরা সামনে তা উপস্থাপন করব।

যাই হোক, নাম, পদবি ও পরিভাষা বিচিত্র হলেও বর্তমান বিশ্বের উন্নত লাইব্রেরিগুলোতে যেমন নানা দায়িত্বের কর্মকর্তা নিযুক্ত থাকেন, তেমনি সেসব গ্রন্থাগারেও ছিল। ব্যক্তিগত লাইব্রেরি হোক বা পাবলিক, সবখানেই পরিবেশকদের উপস্থিতি ছিল। আবুল আলা মাজারি লেখেন, এক মহিলা সেখানে পরিবেশকের কাজ করত। সে তার ভাষায় বলল, আপনি কি আমাকে চেনেন? আমি হলাম বিখ্যাত গ্রন্থাগারিক আবু মানসুর মুহাম্মাদ বিন আলির সময় বাগদাদের গ্রন্থাগারে কাজ করা তাওফিক সাওদা। সেখানে আমি অনুলিপিকারদের কাছে গ্রন্থ খুঁজে নিয়ে আসতাম।<sup>[৩]</sup>

মুস্তানসিরিয়া মাদরাসায় বহু পরিবেশক কর্মরত ছিলেন। তাদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করছি:

» জামাল ইবনু ইবরাহিম ইবনু হুযাইফা। তিনি হলেন সেখানকার পরিবেশক পদে নিয়োগ পাওয়া সর্বপ্রথম ব্যক্তি। মাদরাসা উদ্বোধনের দিন তাঁকে মর্যাদার বিশেষ পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয়।<sup>[৪]</sup>

» আবদুর রহিম বিন মুহাম্মাদ বিন সাইদ হাদাদী...। পিতার মতো তিনিও মুস্তানসিরিয়া গ্রন্থাগারের পরিবেশক ছিলেন। লাইব্রেরির সব বইপুস্তক

[১] আল হাওয়াদিসুল জামিআ ৫৪।

[২] আদ দুরাফুল কামিনা ২: ৩৬০।

[৩] রিসালাতুল গুফরান ৭৩।

[৪] আল হাওয়াদিসুল জামিআ ৫৬।



সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিলেন।<sup>[১]</sup>

» মাকরিযি লেখেন:<sup>[২]</sup> কায়রোর দারুল হিকমা গ্রন্থাগারে একদল গ্রন্থাগারিক, পরিবেশক ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়।

ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে কর্মরত পরিবেশকদের বিবরণ দিতে গিয়ে ইবনু খাল্লিকান বলেন:<sup>[৩]</sup> একবার সুলীকে রকমারি বইপুস্তকে ঠাসা একটি গ্রন্থাগারের সন্ধান দিলেন আবু সাইদ উকাইলী। তিনি বলতেন, এসব কিছুই হলো জনশ্রুতি। গবেষণার জন্য কোনো গ্রন্থ খুঁজে বের করার দরকার হলে তিনি পরিবেশককে ডেকে বলতেন, ওহে বালক, অমুক গ্রন্থটি নিয়ে এসো! সুলী ছিলেন বিদগ্ধ জ্ঞানী। তবে উকাইলী নিজের ওপর ভরসা না করে সবসময় গ্রন্থের ওপর ভরসা করতেন। মনে হতো, গ্রন্থই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় জ্ঞানের আধার। উকাইলী তাঁর এ ভাবনার কথা ছোট্ট একটি কবিতার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। কবিতায় তিনি সুলীকে সামান্য খোঁচাও দিয়েছেন। পরিবেশকদের প্রসঙ্গ থাকায় কবিতাটি আমি এখানে উল্লেখ করলাম:

إنما الصولي شيخ # أعلم الناس خزانه

كلما جئنا إليه # نبتغي منه إبانه

قال: يا غلام هاتو # رزمة العلم فلانه

## গ্রন্থাগারের আর্থিক স্থিতি

ওয়াকফকৃত প্রকল্পই ছিল অধিকাংশ লাইব্রেরির আয়ের প্রধান উৎস। ওইসব প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত ইনকাম দিয়েই গ্রন্থাগারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হতো। ব্যয়ের খাতের মধ্যে ছিল কাঠামোগত উন্নয়ন, নতুন গ্রন্থ ক্রয়, কর্মকর্তাদের বেতন ইত্যাদি। গ্রন্থাগারের পরিচালক ওয়াকফ প্রকল্পের ইনকাম জমা করতেন। সে আয় উক্ত খাতগুলোতে প্রয়োজনমতো ব্যয় করতেন। অবশ্য মাসিক নির্দিষ্ট কোনো বেতন ধার্য ছিল না কারও। বরং ওয়াকফ প্রকল্প থেকে আসা অর্থের ভিত্তিতে তাতে কমবেশি হতো। তবে ইতিহাস-গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী কর্মকর্তাদের জন্য নির্দিষ্ট বেতন-ভাতার কথাও জানা যায়। নিচে এ

[১] ইবনু হাজার: আদ দুরাফুল কামিনা ২: ৩৬০।

[২] আল-খুতাত ১: ৪৫৮।

[৩] ওয়াকফাতুল আ'য়ান ১: ৭২৭।

রকম কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো :

» হুনাইন ইবনু ইসহাক যেসব মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ করতেন, তার বিনিময়ে খলিফা মামুন তাঁকে গ্রন্থের সমপরিমাণ ওজন স্বর্ণ প্রদান করতেন। এক পাল্লায় কিতাব এবং অপর পাল্লায় সমপরিমাণ সোনা রেখে তা দিয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করা হতো।<sup>[১]</sup>

» শাকিরের পুত্রগণ (মুহাম্মাদ, আহমাদ ও হাসান) একদল অনুবাদককে অনুবাদ ও দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে পাঁচ শ দিনার করে প্রদান করতেন। (যাঁদের মধ্যে ছিলেন হুনাইন ইবনু ইসহাক, হুবাইশ ইবনুল হাসান ও সাবিত ইবনু কুররাহ)।<sup>[২]</sup>

» অনারবি ভাষা থেকে আরবিতে অনুবাদ করে যারা ইসলামি সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাদের খুব মর্যাদা দিতেন খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহ। বিখ্যাত অনুবাদক ইবনু মাসুওয়াই ছিলেন এক্ষেত্রে তাঁর ডান হাত। নানা অনুদান ও পুরস্কারে তাঁকে ভূষিত করেছেন। একবার তিনি তাঁকে তিন লাখ টাকা সমমানের দিরহাম দেন।<sup>[৩]</sup>

» মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল মালিকের পক্ষ থেকে অনুবাদক ও অনুলিপিকারদের জন্য মাসিক বরাদ্দ ছিল দুই হাজার দিরহাম।<sup>[৪]</sup>

» অপরদিকে দারুল হিকমা গ্রন্থাগারের বার্ষিক বেতন-ভাতার একটি তালিকা বর্ণনা করেছেন মাকরিযি।<sup>[৫]</sup> যদিও তাতে বরাদ্দের পরিমাণ কিছুটা কম দেখা যায় :

ক্রমিক নং	খরচের খাত	পরিমাণ
১	অনুলিপিকার (খুব সম্ভবত তার বেতনও এর অন্তর্ভুক্ত)	৯০ দিনার
২	পরিচালক	৪৮ দিনার
৩	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	১৫ দিনার
৪	বই বাঁধাই (খুব সম্ভবত মজুরিও এর অন্তর্ভুক্ত)	১২ দিনার
৪	পাঠক ও গবেষকদের জন্য কাগজ, কালি ও কলম	১২ দিনার

[১] ইবনু আবি উসাইবিয়া ১: ১৮৭।

[২] প্রাগুক্ত তথ্যসূত্র।

[৩] Khuda Bukhsh: Islamic Civilization p. ২৬৯।

[৪] ইবনু আবি উসাইবিয়া ১: ২০৬।

[৫] আল-খুতাত: ১: ৪৫৯।



৫	মাদুরের মূল্য	১০ দিনার
৬	পানি	১০ দিনার
৭	শীতকালে মাদুরের ওপর বিছানোর জন্য পশম	৫ দিনার
৮	শীতকালে ব্যবহারের জন্য গালিচা	৪ দিনার
৯	পর্দা মেরামত	১ দিনার

মুস্তানসিরিয়া মাদরাসার লাইব্রেরির কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা ছিল নিম্নরূপ :

- » গ্রন্থাগারিকের জন্য রোজ সাড়ে চার কেজি রুটি, পৌনে দুই কেজি গোশত এবং প্রতি মাসে দশ দিনার।
- » তত্ত্বাবধায়কের জন্য প্রতিদিন সোয়া দুই কেজি রুটি, এক কেজি গোশত এবং প্রতি মাসে তিন দিনার।
- » পরিবেশকের জন্য প্রতিদিন পৌনে দুই কেজি রুটি, কয়েক আঁজলা রান্না করা খাবার এবং প্রতি মাসে দুই দিনার।<sup>[১]</sup>

### গ্রন্থাগারের প্রকার

তিন প্রকার গ্রন্থাগারের উল্লেখ পাওয়া যায় ইসলামের ইতিহাসে। প্রতিটি প্রকার স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। জ্ঞানের বিকাশ ও সভ্যতার উন্নতিতে তার ভূমিকা অনুযায়ী গ্রন্থাগারের বিন্যাস করব। কাজেই গ্রন্থাগারের মালিক হোন আমির, উজির বা সাধারণ কোনো ব্যক্তি—তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। এখানে ওই গ্রন্থাগারই প্রাধান্য পাবে, যা মানবতার উৎকর্ষ সাধনে বেশি অবদান রেখেছে। শিক্ষার্থী, পাঠক ও গবেষকদের জন্য বেশি উপকারী সাব্যস্ত হয়েছে। উপর্যুক্ত শর্তের আলোকে আমরা গ্রন্থাগারকে মূলত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করব:

১. পাবলিক লাইব্রেরি বা গণগ্রন্থাগার
২. ব্যক্তিগত ও সাধারণের মাঝামাঝি স্তরের
৩. ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার

### ১. পাবলিক লাইব্রেরি বা গণগ্রন্থাগার

শুরুতে বিদ্যার্থী ও আগন্তুকদের সুবিধার্থে এ শ্রেণীর গ্রন্থাগার মসজিদ-

[১] কুরকিস আ ওয়াদ: খাযাইনুল কুতুবিল কাদীমাহ ফিল ইরাক পৃ ১৬৫।

কেন্দ্রিক স্থাপিত হতো। অনেক সময় গ্রন্থাগারই একটি বিশাল স্কুল প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করত। ঠিক যেমন ছোট্ট গাছের চারা বিশাল বৃক্ষ তৈরিতে ভূমিকা রাখে। এসব গ্রন্থাগার পরবর্তী সময়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মিলনমেলায় পরিণত হয়। গ্রন্থাগারের উন্নতি ও বিকাশের পর প্রতিটি মাদরাসার গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে লাইব্রেরি। এ ধরনের গ্রন্থাগার ছিল প্রচুর পরিমাণে। একটা সময় প্রতিটি মসজিদ বা মাদরাসায় বিদ্যার্থী ও পাঠকদের পড়ার জন্য গ্রন্থাগার ছিল। নিচে এ ধরনের কয়েকটি গ্রন্থাগারের বিবরণ তুলে ধরছি—

### ❖ ক) বায়তুল হিকমা

বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস খলিফা হারুনুর রশিদের সঙ্গে জড়িত। আবু সাহল ফাযল ইবনু নাওবাখতের বরাতে ইবনুন নাদিম লেখেন: তিনি ছিলেন হারুনুর রশিদের প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরির পরিচালক।<sup>[১]</sup> তা ছাড়া আল্লান শাউবির বরাতে লেখেন: তিনি ছিলেন বারমাকীদের ঘনিষ্ঠ। বায়তুল হিকমায় তিনি খলিফা রশিদ, মামুন ও বারমাকীদের জন্য অনুলিপির কাজ করতেন।<sup>[২]</sup> তবে বিদ্যানুরাগী ও স্বাধীনচেতা খলিফা মামুনের শাসনকাল ছিল বায়তুল হিকমার স্বর্ণযুগ। জ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল খলিফা মামুনের। তাই খুব যত্নের সঙ্গে তিনি বায়তুল হিকমা গ্রন্থাগারের উন্নতি সাধন করেন। যার ফলে মুসলমানদের জ্ঞান ও সভ্যতা দিন দিন উৎকর্ষ লাভ করে। প্রাচীন জ্ঞানরত্নগুলো মুসলমানদের কাছে বেশ সমাদৃত হয়েছে। ফলে বিলুপ্ত হতে চলা সেই সভ্যতার সুষ্ঠু সংরক্ষণ হয়েছে। ধীরে ধীরে প্রতিপালন করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা যত্নের সঙ্গে তুলে দিয়েছেন মুসলমানগণ।

বায়তুল হিকমায় নানা ভাষার গ্রন্থের সমাহার ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল গ্রিক দর্শনের গ্রন্থ। এরপর পারসিক গ্রন্থ। এরপর ভারতীয় গ্রন্থ। এরপর কিবতিয়ান গ্রন্থ। এর পর আরামীয় গ্রন্থ। যার কারণে বায়তুল হিকমায় অনুবাদক ছিলেন বেশি। কেউ গ্রিক থেকে, কেউ ফারসি থেকে আর কেউ ভারতীয় ভাষা থেকে... আরবিতে অনুবাদ করতেন।

একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে বায়তুল হিকমায় ফারসি ও ভারতীয় গ্রন্থের আধিপত্য ছিল। এর কারণ হলো, ইয়াহইয়া ইবনু খালিদ এ সময় রাজ্যের সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করতেন। বিশেষ করে সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক বিষয়। আর ইয়াহইয়া ইবনু খালিদ ছিলেন পারস্য বংশোদ্ভূত। তাই পারস্য সভ্যতার

[১] আল ফিহরিস্ত পৃ ৩৮২।

[২] প্রাগুক্ত ১৫৪।



নানা গ্রন্থ আরবিতে ভাষান্তরকে তিনি বেশি গুরুত্ব দেন। বায়তুল হিকমায় প্রচুর ফারসি গ্রন্থ যোগ করে সেগুলো অনুবাদ করার জন্য ফারসি ও আরবিতে পারদর্শী একদল দক্ষ অনুবাদক নিয়োগ দেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবু সাহল ফাযল বিন নাওবাখত, আল্লান শাউবি। ইবনু নাওবাখত সম্পর্কে ইবনুন নাদিম লেখেন: তিনি বহু গ্রন্থ ফারসি থেকে আরবিতে অনুবাদ করেন। পারস্যের গ্রন্থাদির ওপর তাঁর বেশ দখল ছিল।<sup>[১]</sup> অপরদিকে পারসিক সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার মিল ছিল বহু দিক থেকেই। তাই আমরা দেখি, একদল প্রাজ্ঞ ভারতীয় পণ্ডিতকে তলব করে তাদের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও চিন্তাধারা আরবিতে অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন ইয়াহইয়া। তাঁর তলব করা সেসব পণ্ডিতদের মাধ্যমেই ভারতীয় সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করা হয়।<sup>[২]</sup> গ্রিক সভ্যতার উত্তরাধিকার লাভ করার পর খলিফা রশিদের শেষ যুগ এবং খলিফা মামুনের পুরো শাসনকাল জ্ঞান ও সভ্যতা বিকাশের স্বর্ণযুগ পার করেছে। আরবি ইতিহাস-গ্রন্থসমূহ যার বিবরণে ভরপুর।

ইবনু আবি উসাইবিয়া লেখেন:<sup>[৩]</sup> আংকারা, আমুরিয়া-সহ মুসলিম সেনাদল রোমান সাম্রাজ্য বিজয় করেন। এই সব এলাকায় পাওয়া প্রাচীন গ্রন্থগুলো অনুবাদ করার জন্য ইউহান্না ইবনু মাসুওয়াইহকে দায়িত্ব দেন বাদশাহ রশিদ। আংকারা ও আমুরিয়া থেকে অনেক গ্রন্থ বায়তুল হিকমায় আনা হয়। আবার সাইপ্রাস থেকে বহু মূল্যবান বইপত্রও এ গ্রন্থাগারে যোগ করা হয়। মিশরীয় লেখক ইবনু নাবাতাহ লেখেন:<sup>[৪]</sup> সাইপ্রাস দ্বীপ থেকে যেসব গ্রিক দর্শনের গ্রন্থ বায়তুল হিকমায় নিয়ে আসা হয়, বাদশাহ মামুন সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেন সাহল বিন হারুনকে। ঘটনা হলো, সাইপ্রাস দ্বীপের শাসকের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হওয়ার পর সেখানে থাকা গ্রিক দর্শনের সকল গ্রন্থ বাগদাদে পাঠাতে বলেন খলিফা মামুন। ওই গ্রন্থগুলো সাইপ্রাসের এক গোপন কক্ষে সংরক্ষিত ছিল। সেগুলো কারোর পড়ার অনুমতি ছিল না। খলিফা মামুনের পত্র পেয়ে সাইপ্রাসের জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেন শাসক। খলিফার প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ার পরামর্শ দেন সবাই। কিন্তু একজন আর্চবিশপ সেগুলো হস্তান্তরের পরামর্শ দিয়ে বলেন, দ্রুত সেগুলো বাগদাদে পাঠিয়ে দিন। কারণ এসব মানব বুদ্ধিপ্রসূত জ্ঞান যখন শরিয়তী রাষ্ট্রে

[১] আল ফিহরিস্ত পৃ ৩৮২।

[২] Khuda Bukhsh: Islamic Libraries ১৯১২, Century L II, p. ১২৮।

[৩] উয়ুনুল আনবা: ১: ১৭৫।

[৪] সারজুল উয়ুন ১৬৬।

প্রবেশ করবে, তখন নিশ্চিতভাবে সেগুলো তাদের মানো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। আলিমদের মাঝে মতের পার্থক্য দেখা দেবে। এরপর শাসক তার কাছে থাকা গ্রিক দর্শনের গ্রন্থগুলো খলিফা মামুনের কাছে পাঠিয়ে দেন। সেগুলো পেয়ে বেশ পুলকিত হন মামুন।

বায়তুল হিকমায় আরও কিছু গ্রন্থ আসে কনষ্ট্যান্টিনোপল থেকে। সে সম্পর্কে ইবুনন নাদিম লেখেন : খলিফা মামুন ও রোমান সাম্রাজ্যের মাঝে প্রায়ই পত্রবিনিময় হতো। তার ওপর বিজয় লাভ করেন মামুন। এরপর রোমান সাম্রাজ্যের জ্ঞানভাণ্ডারে থাকা প্রাচীন গ্রন্থগুলো থেকে বাছাই করে সেগুলো বাগদাদে হস্তান্তরের কথা বলেন। রোমান সাম্রাজ্য শুরুতে আপত্তি করলেও শেষে তা মেনে নেন। বই নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য তিনি হাজ্জাজ ইবনু মাতার, ইবনুল বিতরিক, সালাম প্রভৃতি লোকদের মনোনীত করেন। তারা রোমান সাম্রাজ্যে গিয়ে সেখানকার গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান গ্রন্থসমূহ বাগদাদে পাঠিয়ে দেন। এরপর সেগুলো অনুবাদের উদ্যোগ নেওয়া হয়। অনেকে বলেন, প্রাচীন গ্রন্থের সন্ধানে রোমান সাম্রাজ্যে যাওয়া দলে ইউহান্না বিন মাসুওয়াই-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এরপর হুনাইন ইবনু ইসহাককে নিয়োগ দেন খলিফা মামুন। হুনাইন তখন বয়সে তরুণ। হুনাইনকে গ্রিক দার্শনিকদের লেখা গ্রন্থগুলো আরবিতে অনুবাদের নির্দেশ দেন খলিফা মামুন। খলিফার নির্দেশ তিনি যথাযথভাবে পালন করেন।

এই ছিল বায়তুল হিকমায় প্রাচীন গ্রিক গ্রন্থসমূহ সংযোজনের মোটামুটি চিত্র। আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী এগুলো সংকলন করা হয়। সেজন্য আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখা দক্ষ অনুবাদকদের নিয়োগ দেওয়া হয়। যারা গ্রিক ও আরবি উভয় ভাষাতেই ছিলেন সমান দক্ষ। এসব গ্রিক গ্রন্থ অনুবাদে যারা অংশগ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলেন : ইউহান্না ইবনু মাসুওয়াই, হুনাইন ইবনু ইসহাক, তার পুত্র ইসহাক, মুহাম্মাদ ইবনু মুসা আল-খাওয়ারিজমী, সাইদ বিন হারুন, সাবিত বিন কুররা ও উমর ইবনুল ফাররুখান।

ইসলামি বিশ্বের সর্বপ্রথম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র ও ভাবগাভীরের প্রতীক হলো এই বায়তুল হিকমা। এটি ছিল প্রথম ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে জ্ঞানী-গুণী ও গবেষকগণ সমবেত হতেন। বিদ্যার্থীদের ভিড় লেগে থাকত। সেটি ছিল সর্বপ্রথম বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র, শিক্ষার্থীরা যেখান থেকে জ্ঞানের পাথেয় সংগ্রহ করত। রাষ্ট্রীয় উদ্যোক্তাদের কল্যাণে তারা লাভ করেছিল চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র ইত্যাদি বহুমুখী জ্ঞান আহরণের সুযোগ।

খলিফা মামুনের আমল হলো বাইতুল হিকমার সোনালি যুগ। খলিফা



মামুনের পর তার মতো করে আর কেউ এ গ্রন্থাগারের প্রতি তেমন মনোযোগ দেননি। মামুনের পর খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমেই গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ও মর্যাদা কিছুটা কমে যায়। জ্ঞান, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি আসক্তি কম ছিল মুতাসিমের। এগুলোতে তিনি কোনো সুাদ, তৃপ্তি ও আনন্দ খুঁজে পেতেন না। ফলে এ গ্রন্থাগারকে যতটুকু গুরুত্ব দেওয়ার কথা ছিল, ততটুকু তিনি দেননি। বরং নানা রাজ্য বিজয়, তুর্কী মামলুক সৈন্যদের আনয়ন, তাদের প্রশিক্ষণ দান এবং সৈন্যদের বীরত্ব দেখেই তিনি বেশি খুশি হতেন। এরপর এতসব সৈন্যের পদভারে বাগদাদ শহর সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। তৈরি হয় জনজট। ফলে তিনি ইসলামি সাম্রাজ্যের রাজধানী বাগদাদ থেকে সামাররায় স্থানান্তর করেন। এরপর বাগদাদ থেকে খলিফাদের প্রস্থান এবং প্রথম রাজধানী বাগদাদের নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি অযত্ন ও অবহেলা ছিল বায়তুল হিকমা গ্রন্থাগারের জন্য দ্বিতীয় আঘাত। এরপর বাগদাদ ও তার প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর দিয়ে নানা ঝড়ঝাপ্টা ও বিপদ যেতে থাকে। বাগদাদ-কেন্দ্রিক ফিতনা ও যুদ্ধের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় এ গ্রন্থাগারের ভাবমূর্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পেতে থাকে।

তার মানে এই নয় যে খলিফা মামুনের পর এ গ্রন্থাগার একেবারে নিস্ক্র হয়ে গেছে। বরং নানা প্রতিঘাত মোকাবিলা করে বায়তুল হিকমা স্নায়ু অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম ছিল। তারপরেও সেটি ছিল অবহেলিত ও দুর্দশাগ্রস্ত। খলিফা মামুনের পরবর্তী সময়ে বায়তুল হিকমার অবস্থান নিয়ে নিচে কয়েকটি ঐতিহাসিক মন্তব্য তুলে ধরা হলো :

» ইবনু আবি উসাইবিয়া লেখেন :<sup>[১]</sup> বায়তুল হিকমা গ্রন্থাগারে গ্রিক দর্শনের গ্রন্থসমূহ অনুবাদের দায়িত্বে ছিলেন ইউহান্না ইবনু মাসুওয়াইহ। তিনি খলিফা হারুন, আমিন ও মামুনকে সেবা দিয়ে যান। মুতাওয়াক্কিলের শাসনামল পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল ছিলেন।

» ইবনুন নাদিম লেখেন :<sup>[২]</sup> হিজরি চতুর্থ শতকের শেষার্ধ্বে এ গ্রন্থাগার থেকে হিময়ারী ও হাবাশী লিপির নমুনা স্থানান্তর করা হয়।

» কালাকশান্দি লেখেন :<sup>[৩]</sup> বর্বর তাতার জাতির বাগদাদ আক্রমণের সময় পর্যন্ত এ গ্রন্থাগারের পরিষেবা চালু ছিল। তাতারী সম্প্রদায় সর্বশেষ আব্বাসীয় খলিফা মুতাসিম বিল্লাহকে হত্যা করার পর এ গ্রন্থাগারের ওপর

[১] উয়ুনুল আনবা ১: ১৭৫।

[২] আল ফিহরিস্ত পৃ ৮, ২৯।

[৩] সুবহুল আ'শা ১: ৪৬৬।

বিপর্যয় নেমে আসে। বায়তুল হিকমার নাম-নিশানা মুছে দেওয়া হয়।

### ❖ খ) নাজাফের হায়দারিয়া গ্রন্থাগার

আজ পর্যন্ত এ গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব টিকে আছে। বিখ্যাত সাহাবি আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্যতম নাম হায়দার। এ নামের দিকে সম্বন্ধেণ করেই গ্রন্থাগারের নামকরণ করা হয়। অথবা বলা যায়, শিয়া সম্প্রদায় তাদের নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উচ্চকণ্ঠে এ নামে শ্লোগান দিয়ে থাকে। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে ইরাক সফরে আমি কিছুদিন কারবালা, নাজাফ ইত্যাদি শিয়া অধ্যুষিত শহরে অবস্থান করি। সময়টা ছিল শিয়াদের বার্ষিক নানা অনুষ্ঠানের মুহূর্ত। আমি দেখেছি, ভারত-পাকিস্তান-ইরান-ইরাকসহ নানা দেশ থেকে শিয়ারা এ সময় এখানে জড়ো হয়। খুব ভক্তি-সহকারে লাখো শিয়া জনতার হায়দার শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে ইরাকের জনপদ।

আমিরুল মুমিনিন আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবর-কেন্দ্রিক আল-মাশহাদুশ শারিফের অন্যতম গ্রন্থভাণ্ডার হলো হায়দারিয়া লাইব্রেরি। এর ইতিহাস অনেক পুরোনো। ঠিক কোন সালে বা কোন তারিখে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তা জানা যায়নি। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবর-কেন্দ্রিক হওয়ায় বড় বড় উজির, উমারা ও শিয়া গুরুদের থেকে বিরাট সমাদর পায় গ্রন্থাগারটি। মূল্যবান ও দুর্লভ গ্রন্থ দিয়ে সমৃদ্ধ করা হয়। গ্রন্থাগারটি যাদের থেকে বেশি যত্ন ও সমাদর পেয়েছে, তাদের অন্যতম হলেন শিয়া বুওয়াইহি রাজবংশের শাসক আযুদুদ্দৌলা (মৃত্যু : ৩৭২ হিজরি)। সেই সমাদর ও যত্নের ফলে, বিখ্যাত সাহাবির কবর-কেন্দ্রিক হওয়ার কারণে এবং হায়দার নাম বহন করার দরুন আজও স্মৃতিসমায় টিকে আছে গ্রন্থাগারটি।

১৯৫০ সনের ডিসেম্বর মাসের দুই তারিখ আমি গ্রন্থাগারটি পরিদর্শন করি। এ সময় নিজের চোখে দেখা গ্রন্থাগারটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক এখানে তুলে ধরিছি :

» আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবরের আশপাশে থাকা অনেকগুলো কক্ষের মধ্যে একটি বড় কক্ষ হলো এই গ্রন্থাগার। তবে গ্রন্থাগারটি এখন সবার জন্য উন্মুক্ত নয়। তা ছাড়া এখানে যারা আসে, পাঠ ও গবেষণায় তাদের খুব গুরুত্ব বা মনোযোগ থাকে না। তাতে ঢুকতে হলে মাজারের পরিচালকের বিশেষ অনুমতি নিতে হয়। সেখানে কেবল ইতিহাসবিদ ও প্রাচীন গ্রন্থভাণ্ডার দেখতে আগ্রহীগণ প্রবেশ করে থাকেন।



» এখন গ্রন্থাগারটির কোনো গ্রন্থসূচি তৈরি করা নেই। বইগুলো অগোছালোভাবে তাকে পড়ে আছে। সেখানে অনেক আরবি ও ফারসি ভাষার গ্রন্থ আছে, যেগুলোর কোনো বিকল্প নেই। মোটা অঙ্কের অর্থ খরচ করলেও সেগুলো পাওয়া যাবে না। এর বেশিরভাগই গ্রন্থকারদের হাতের লেখা। পুরোটা না হলেও সবকটিতে গ্রন্থকারদের হাতে কিছু না কিছু লেখা আছে। আর যেসব কুরআনের কপি সেখানে দেখেছি, সেগুলো এক কথায় মহামূল্যবান রত্ন। সব গ্রন্থের মাঝে সেই কুরআনের কপিগুলোই দামি, চমৎকার ও মূল্যবান মনে হয়েছে। অতি সুন্দর স্টাইলে লেখা। মোটা চামড়ার বাঁধাই। যাকে নানা শৈল্পিক কারুকাজের দ্বারা অলংকৃত করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই বিখ্যাত কুরআন লিপিকারদের হাতের লেখা। যাদের মধ্যে আছেন : ইয়াকুত মুস্তাসিমী, আহমাদ তাবরিযী। আর যে মুসহাফটি আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সহস্র লেখা বলে প্রচার করা হয়, সেটি আর এখানে নেই। সেটি বরং মূল কবরে।

» কুরআনের কপির পাশাপাশি তাতে আছে সাহিত্যের মহামূল্যবান সব গ্রন্থ। এর মধ্যে আবু আলি ফারিসির লেখা আর-রাসাইলুশ শিরায়িয়া অন্যতম। গ্রন্থটি তিনি নিজেই সম্পাদনা করেছেন। আরও আছে ইয়াকুতের লেখা মুজামুল উদাবার প্রথম খণ্ড। আবু হাইয়ান আন্দালুসির লেখা আত-তাকরীব। সবগুলো বই গ্রন্থকারের নিজ হাতে লেখা। আরও আছে ৫৩৮ হিজরিতে হিবাতুদ্দিন ইবনু আলির লেখা আল-মুতাবার মিনাল হিকমাহ। আছে ইমাম আলির বলে দাবি করা নাজুল বুরদা। পাশাপাশি সেখানে আছে শিয়া মতাদর্শের প্রচুর গ্রন্থ। বিশেষ করে ইমামাত ও বিসায়াত বিষয়ক বইপুস্তক।

### ✽ গ) বসরার ইবনু সিওয়ার গ্রন্থাগার

শাসক আযুদদৌলার আস্থাভাজন ও বিখ্যাত লেখক আবু আলি ইবনু সিওয়ার গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রন্থাগারটি আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গ্রন্থ অধ্যয়নের পাশাপাশি এখানে পাঠদান কার্যক্রম চালু ছিল। রাম হরমুয়ের বরাত দিয়ে মাকদিসি বলেন,<sup>[১]</sup> বসরার মতো বিশাল গ্রন্থাগার আছে এখানে। দুটি গ্রন্থাগার নির্মাণ করেন ইবনু সিওয়ার। যারা গ্রন্থ অধ্যয়নে আসত এবং নিরবচ্ছিন্ন গবেষণাকর্মে লিপ্ত থাকত, তাদের জন্য এখানে নানারকম সুবিধা ও ব্যবস্থাপনা ছিল। তবে সেই তুলনায় বসরার গ্রন্থাগার ছিল আরও

[১] আহসানুত তাকাসীম ফি মা'রিফাতিল আকালীম পৃ ৪১৩।

বড়, আরও সমৃদ্ধ। তাতে গ্রন্থসংখ্যাও ছিল অনেক বেশি। বসরার এ গ্রন্থাগারে একজন শাইখ নিযুক্ত ছিলেন, যিনি মুতায়িলা মতাদর্শের অনুকূলে যুক্তিবিদ্যা ও তর্কশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। তা ছাড়া বিখ্যাত মাকামাতুল হারীরী গ্রন্থের দ্বিতীয় হারীরী বলেন, ‘... এরপর আমি যখন ভ্রমণ থেকে আমার মাতৃভূমিতে ফিরে আসি, তখন সেখানকার গ্রন্থাগারে যাই। গ্রন্থশালাটি তখন সাহিত্যিক, বিদ্যার্থী ও দূরবাসীদের মিলনমেলা ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘন দাড়ি বিশিষ্ট জীর্ণকায় এক লোক সেখানে ঢুকে সবাইকে সালাম দিয়ে একেবারে সবার পেছনে বসল। এরপর সে তার ভেতরে থাকা জ্ঞান ও সাহিত্য প্রকাশ করতে লাগল। মনোমুগ্ধকর ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য দিয়ে লোকদের অবাক করে দিল।<sup>[১]</sup>

### ❖ ঘ) সাবুর গ্রন্থভাণ্ডার

আবু নাসর সাবুর ইবনু আরদেশির (মৃত্যু ৪১৬ হিজরি) এ গ্রন্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন ৩৮৩ হিজরিতে। ইবনুল ইমাদ লেখেন:<sup>[২]</sup> এ বছরই খলিফা বাহাউদ্দৌলার বিখ্যাত উজির সাবুর বিন আরদেশির কারখ এলাকায় একটি গ্রন্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রচুর মূল্যবান গ্রন্থ দিয়ে সমৃদ্ধ করে এর নাম দেন দারুল ইলম। পাঠক ও গবেষকদের জন্য তা ওয়াকফ করে তাতে প্রচুর গ্রন্থ সংযোজন করেন। ইয়াকুত লেখেন:<sup>[৩]</sup> তাতে নানা বিষয়ের গ্রন্থের সংখ্যা ছিল দশ হাজার চার শ। এর মধ্যে বিখ্যাত লিপিকার বনি মাকলার হাতে লেখা এক শ কুরআনের কপি ছিল। মারগোলিথ যোগ করেন: এ গ্রন্থে থাকা বেশির ভাগ গ্রন্থই ছিল গ্রন্থকারের সুহস্তে লিখিত। অথবা তাতে গ্রন্থকারের হাতের লেখা কিছু অংশ ছিল। অথবা ছিল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের হস্তলিপি। সাবুর এ গ্রন্থভাণ্ডারের জন্য নির্দিষ্ট প্রকল্প ওয়াকফ করেন। সেখান থেকে যা আয় হতো, তা দিয়ে গ্রন্থভাণ্ডারের ব্যয় নির্বাহ করা হতো।

সাবুরের প্রতিষ্ঠিত এ গ্রন্থভাণ্ডার ছিল একটি অসাধারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, যেখানে জ্ঞানী, গবেষক ও শিক্ষার্থীগণ পাঠ ও গবেষণার জন্য নিয়মিত আসতেন। সেখানে প্রচুর বিতর্ক ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো। মহান দার্শনিক আবুল আলা মআররি বাগদাদে অবস্থানকালে এখানে নিয়মিত

[১] শারহ মাকামাতিল হারীরী পৃ ১৫।

[২] শাযারাতুয যাহাব ৩: ১০৪।

[৩] মু‘জামুল বুলদান ২: ৩৪২।



আসতেন। এটিই ছিল তার পছন্দের জায়গা।<sup>[১]</sup>

অনেক জ্ঞানী ও মনীষী তাদের কাছে থাকা নানা গ্রন্থ অথবা তাদের রচিত বইপুস্তক এ গ্রন্থাগারের জন্য ওয়াকফ করেন। বিখ্যাত মিশরী লেখক আহমাদ ইবনু আলি ইবনু খিরান তার রচিত কবিতা ও রচনার দুটি খণ্ড দারুল ইলমের জন্য ওয়াকফ করেন। সেটি পাঠকদের কাছে সমাদৃত হলে অবশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ ও পুস্তিকাগুলোও তাতে ওয়াকফ করে দেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।<sup>[২]</sup> জিবরিল ইবনু বাখতিশু-ও এমনটি করেন। তিনি তার বিখ্যাত আল-কাফী গ্রন্থ লেখা শেষ করার পর গ্রন্থের একটি কপি বাগদাদের এই দারুল ইলমের জন্য ওয়াকফ করে দেন।<sup>[৩]</sup>

### ✽ ৬) যাইদি মসজিদের ওয়াকফকৃত লাইব্রেরি

এ যাইদী হলেন ৫৭৫ হিজরিতে বাগদাদে ইন্তেকাল করা আবুল হাসান আলি ইবনু আহমাদ। তিনি ছিলেন সম্রাট বংশের। দ্বীনদারিরা ও আল্লাহভীতিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সাবত ইবনুল জাওযির লেখা মিরআতুয় যামান গ্রন্থ থেকে এ মসজিদ নির্মাণ ও গ্রন্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তুলে ধরেছেন উস্তায় কুরকিস আওয়াদ।<sup>[৪]</sup> তা ছাড়া আল-হাদারাহ সাময়িকীকেও এর ইতিহাস উল্লেখ আছে।<sup>[৫]</sup> তবে এ দুটো উৎস ঘেঁটে দেখার সুযোগ আমার হয়নি। তাই উস্তায় আওয়াদ থেকেই আমি তা বর্ণনা করছি। তিনি বলেন, খলিফা মুস্তাযি বিআমরিল্লাহর উজির ছিলেন আযুদুদ্দিন মুহাম্মাদ। এরপর তাকে মন্ত্রিত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কিছুকাল পর আবার তাকে এ পদে বসানো হয়। এরপর তিনি উক্ত খলিফার কাছে একটি চিরকুট লেখেন। তাতে লেখা ছিল: ‘আমি মানত করেছিলাম, মন্ত্রিত্ব ফিরে পেলে শরিফ যাইদির কাছে এক হাজার দিনার পাঠাব।’ উত্তরে খলিফা লিখলেন: ‘আমিও তার কাছে এক হাজার দিনার পাঠাতে চাই।’ এরপর দুই হাজার দিনার শরিফ যাইদির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি ওই অর্থে কোনো হস্তক্ষেপ না করে ‘দার্বদিনারিস সাগির’ এলাকায় একটি বাড়ি ক্রয় করে তাকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে প্রচুর গ্রন্থ ক্রয়ে মানুষের উপকারের জন্য মসজিদের নামে সেগুলো ওয়াকফ

[১] রাসাইলু আবিল আলা আল মাআররি পৃ ৩৪।

[২] ইয়াকুত: মু‘জামুল উদাবা ১: ২৪২।

[৩] ইবনু আবি উসাইবিয়া ১: ১৪৬।

[৪] ৮: ২২৭।

[৫] সংখ্যা: ৩৩ পৃ ৮।

করে দেন...। এরপর যাইদি মৃত্যুর আগে তার অধিকারে থাকা সকল গ্রন্থ ওয়াকফ করে সেগুলো এ মসজিদে স্থানান্তরিত করেন। তেমনি তার বন্ধুবর সুবাইহ বিন আবদুল্লাহও নিজ অধিকারে থাকা সকল গ্রন্থ এ মসজিদের জন্য ওয়াকফ করেন। এ দুজনের ওয়াকফকৃত গ্রন্থ ছিল প্রচুর। মানুষ সেগুলো থেকে বিরাট উপকার লাভ করে।<sup>[১]</sup> তা ছাড়া আরও দুটি জায়গা থেকে গ্রন্থ উপটোকন লাভ করে এ গ্রন্থাগারটি :

» একটি হলো আবুল খাত্তাব আল-ওলাইমী উপাধিতে খ্যাত উমর বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ দিমাশকী থেকে। তিনি ছিলেন দামিশকের বিখ্যাত বণিক। একবার তিনি বাগদাদে এসে যাইদির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বাগদাদের লাইব্রেরির জন্য বহু গ্রন্থ ওয়াকফ করার প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর উমরের ইস্তেকাল হয়ে গেলে তার ভাই সব কিতাব বাগদাদ পাঠিয়ে দেন। এসব গ্রন্থ যখন বাগদাদ এসে পৌঁছায়, তখন যাইদি আর বেঁচে নেই। যাইদির বন্ধু সুবাইহ সেগুলো গ্রহণ করে গ্রন্থাগারে সংযোজন করেন। সুবাইহ তখন লাইব্রেরির পরিচালক।<sup>[২]</sup>

» দ্বিতীয় উপটোকনটি আসে ইয়াকুত হামাভী থেকে। ইবনু খাল্লিকান লেখেন :<sup>[৩]</sup> দার্বদিনারে অবস্থিত মসজিদে যাইদির জন্য নিজের সকল গ্রন্থ ওয়াকফ করে শাইখ ইয়যুদ্দিন আবুল হাসান আলি ইবনুল আসিরের কাছে সেগুলো হস্তান্তর করেন। ইয়যুদ্দিন হলেন আত তারিখুল কাবির-এর লেখক। তিনি গ্রন্থগুলো মসজিদে যাইদিতে নিয়ে আসেন।<sup>[৪]</sup>

## ❖ চ) কায়রোর দারুল হিকমা গ্রন্থাগার

বিখ্যাত ফাতিমি শাসক হাকিম বিআমরিল্লাহর প্রতিষ্ঠিত কায়রোর দারুল হিকমা গ্রন্থাগারটি ৩৯৫ হিজরির জুমাদাল উখরা মাসের দশ তারিখ শনিবার উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনের আগে থেকেই গ্রন্থাগারটির জন্য বিপুল পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল, বাগদাদে খলিফা হারুনুর রশিদের প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমা গ্রন্থাগারের মর্যাদা ও গুরুত্ব হ্রাস করে মানুষের মনোযোগ এ দিকে ফেরানো।

বিপুল পরিকল্পনার মধ্যে ছিল : বিশাল অবকাঠামো নির্মাণ, ব্যবস্থাপনা, দামি

[১] খাযাইনুল কুতুবিল কাদীমাহ ফিল ইরাক ১৫৪-১৫৫।

[২] আওয়াদ ১৫৫-১৫৬ (সামান্য পরিমার্জিত)।

[৩] আল ওয়াফায়াত ২: ৩১৮।

[৪] আরও দেখুন: ইবনুল ইমাদ: শাযারাতুয যাহাব ৫: ১২২।



গালিচা বিছানো, নানা কারুকার্য, দরজা ও বারান্দাসমূহে দামি পর্দা বোলানো এবং নানা সমৃদ্ধ গ্রন্থভাণ্ডার থেকে এখানে বই পুস্তক আনয়ন ইত্যাদি। আমিরুল মুমিনিন হাকিম বিআমরিলাহর বিখ্যাত ও সুবিশাল এ গ্রন্থাগারে সাহিত্যসহ নানা বিষয়ের হস্তলিখিত এত বেশি পরিমাণ গ্রন্থ সংযোজন করেন, যা ইতিপূর্বে কোনো শাসক করেননি। পাঠকদের প্রয়োজনে সেখানে কাগজ, কলম ও কালির ব্যবস্থা করা হয়। এর জন্য সুদক্ষ পরিচালক, পরিবেশক, পরিচ্ছন্নতাকর্মী প্রভৃতি লোকদের নিয়োগ দেওয়া হয়। পাঠক, ফকিহ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ব্যাকরণবিদ, ভাষাবিদ, চিকিৎসাবিদগণ এ গ্রন্থাগারে বসতেন। সেখানে দায়িত্বরত কর্মকর্তা ও ফকিহদের উচ্চমানের বেতন দেওয়া হতো। গ্রন্থটি সব শ্রেণীর মানুষের জন্য উন্মুক্ত ছিল। নানা শ্রেণীর মানুষ এখানে আসত। কেউ আসত অধ্যয়ন করতে। কেউ অনুলিপি করতে। আবার কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে।<sup>[১]</sup>

এর পাশপাশি এখানে যাতায়াতকারীদের জন্য বিতর্ক অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি দেন খলিফা। তাই প্রায়ই এখানে নানা তাত্ত্বিক সভা সেমিনারের আয়োজন হতো। বিতর্ক অনুষ্ঠান হতো। কখনো কখনো সেই বিতর্ক ঝগড়ায় রূপ নিত।<sup>[২]</sup>

হিজরি ষষ্ঠ শতকের গোড়া পর্যন্ত দারুল হিকমাহ গ্রন্থাগারের দরজা ছিল উন্মুক্ত। এরপর শাসক আল-মালিকুল আফযাল টের পান যে, এক শ্রেণীর মানুষ এ গ্রন্থাগারকে পুঁজি করে মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি নষ্ট করার পায়তারা করছে। এ গ্রন্থাগারকে নিজেদের মতাদর্শ প্রচারের হাতিয়ার বানিয়ে নিচ্ছে। ফলে তৎক্ষণাৎ তিনি গ্রন্থাগারটি বন্ধ করে ওই দলের প্রধানকে (তার নাম বারাকাত) গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এরপর আল-মালিকুল আফযালের মৃত্যুর পর খলিফা আমির বিআহকামিল্লাহ তার উজির মামুন ইবনুল বাতাইহিকে দারুল হিকমাহ গ্রন্থাগারটি শরয়ী গবেষণার কাজে ব্যবহারের উদ্দেশে খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন।<sup>[৩]</sup> গ্রন্থাগারটি এভাবেই চালু ছিল। শেষ পর্যন্ত সালাহুদ্দিন আইয়ুবী ﷺ ক্ষমতায় আসেন এবং খলিফা আযিদের শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। এরপর গ্রন্থাগারটি সরিয়ে সেখানে শাফিযী মাযহাব অবলম্বনে একটি মাদরাসা নির্মাণ করেন সালাহুদ্দিন।<sup>[৪]</sup>

[১] আল-খুতাত: মাকরিযি ১: ৪৫৮-৪৫৯, ২: ৩৪২ (সামান্য অগ্র-পশ্চাতকৃত)।  
[২] আত তামাদুনুল ইসলামি ৩: ২১০।

[৩] আল-খুতাত ১: ৪৫৯।

[৪] ইবনু খালদুন: আল ইবার ৪: ৭৯।

## ❖ ছ) বিভিন্ন মাদরাসায় প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার

ইরাক, খুরাসান, সিরিয়া ও মিশরের এমন কোনো মাদরাসা নেই, যেখানে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ছিল না। মাদরাসার প্রভাব এবং তার জন্য ওয়াকফকৃত প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী ছোট বড় বহু গ্রন্থের সমাহার ছিল সেসব গ্রন্থশালায়।

মাদরাসা-ভিত্তিক শিক্ষাকার্যক্রম চালু হওয়ার আগে মসজিদগুলোই ছিল গ্রন্থশালা। এরপর নিজামুল মুলক যখন প্রচুর মাদরাসা নির্মাণ করেন, তখন প্রতিটি মাদরাসার সঙ্গে একটি করে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার যুক্ত করেন। বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসা ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মাদরাসা। তাই এ মাদরাসার গ্রন্থাগার উজির নিজামুল মুলকের বিশেষ যত্ন, সুদৃষ্টি ও সমাদর পেয়ে সে কালের মাদরাসা-ভিত্তিক সবচেড়ে বড় গ্রন্থাগার হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

» বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসার এ গ্রন্থাগারে সংযোজিত হয় নানা মূল্যবান ও উপকারী হস্তলিখিত গ্রন্থ। বর্ণিত আছে: উজির নিজামুল মুলককে চারটি বস্ত্র উপহার দেন আবদুস সালাম কায়ভিনী। এগুলো তখন আর কারও কাছে ছিল না। এর মধ্যে, ইবরাহিম হাযমী রচিত আবু উমর ইবনু হাযাভিয়ার হস্তলিখিত দশ খণ্ডের মূল্যবান গ্রন্থ গারীবুল হাদিস। এর উজির নিজামুল মুলক উপহারটি বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসার ছাত্রদের জন্য ওয়াকফ করে দেন।<sup>[১]</sup>

» সবসময় ও সর্বযুগেই খলিফা ও সম্রাট ব্যক্তিদের সুদৃষ্টি ছিল এ মাদরাসার ওপর। ইবনুল আসির লেখেন: খলিফা নাসির লিদ্দীনিয়াহ ৫৮৯ হিজরিতে বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসার গ্রন্থভাণ্ডারটি আরও সমৃদ্ধ করার নির্দেশ দেন। এরপর তাতে হাজার হাজার দুর্লভ ও মূল্যবান গ্রন্থ সংযোজন করা হয়।<sup>[২]</sup>

» হিজরি সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে যাইলু তারিখি বাগদাদ গ্রন্থপ্রণেতা মুহিবুদ্দিন আন নাজ্জার দুটি গ্রন্থভাণ্ডার নিজামিয়া মাদরাসার জন্য ওয়াকফ করেন। এসব গ্রন্থের সমুদয় মূল্য ছিল এক হাজার দিনারের সমান।<sup>[৩]</sup>

» আল-মাদরাসাতুল মুস্তানসিরিয়াতেও ছিল সমৃদ্ধ ও সুবিন্যস্ত একটি গ্রন্থাগার। উদ্বোধনের দিন নানা অংশে ভাগ করা কুরআনের বাত্র, ধর্মীয় ও

[১] দেখুন, আস সুবকি: তাবাকাতুশ শাফিয়িয়া ৩: ২৩০।

[২] ইবনুল আসির ১২: ৬৭ (৫৮৯ হিজরীর ঘটনাবলির অধ্যায়ে)।

[৩] ফাওয়াতুল ওয়াফয়াত ২: ২৬৪।



সাহিত্যের প্রচুর মূল্যবান গ্রন্থ তাতে নিয়ে নিয়ে আসা হয়। যা এক শ যাট জন কুলি মাথায় বহন করে নিয়ে আসে।<sup>[১]</sup> ইবনু আনবাহ লেখেন :<sup>[২]</sup> গ্রন্থের পরিমাণ ছিল আশি হাজার। এ গ্রন্থাগারে চেঙ্গিস খানের রচিত ইয়াশা গ্রন্থ ছিল। চেঙ্গিস খান যে নীতিমালা ও শান্তির বিধান প্রণয়ন করেছিলেন, তাই ছিল বইয়ের আলোচ্য। বইটিকে তিনি জাতীয় সংবিধান হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন।<sup>[৩]</sup> তা ছাড়া এখানে ছিল গ্রন্থকারের নিজ হাতে লেখা চৌদ্দ খণ্ডের তারিখু বাগদাদ গ্রন্থ।<sup>[৪]</sup>

» দামিশকে প্রচুর মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার পর ছাত্রদের জন্য এসব মাদরাসায় প্রচুর বই ওয়াকফ করেন নুরুদ্দিন জেনগি।<sup>[৫]</sup> তা ছাড়া বড় বিমারিস্তানের জন্যও তিনি প্রচুর চিকিৎসাবিদ্যার গ্রন্থ ওয়াকফ করেন। কারণ বিমারিস্তান নামে ডাকা এসব হাসপাতালেই তখন রোগ নিরাময়ের শিক্ষা দেওয়া হতো।<sup>[৬]</sup>

» কুতুবুদ্দিন নিশাপুরি ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ ফকিহ ও অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁকে পেয়ে নুরুদ্দিন পুলকিত হন। তাঁর পাঠদানের জন্য তিনি শাফিয়ি মাযহাবের ওপর একটি মাদরাসা নির্মাণ শুরু করেন। কিন্তু নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার আগেই শাইখ কুতুবুদ্দিনের ইন্তেকাল হয়ে যায়। তবে মৃত্যুর আগেই তাঁর সকল কিতাব ছাত্রদের জন্য ওয়াকফ করে যান। মাদরাসা নির্মাণের পর তাঁর সকল কিতাব তাতে স্থানান্তর করা হয়। নুআইমি লেখেন : জীবিত থাকতে এ মাদরাসা তিনি দেখে যেতে পারেননি। তবে মৃত্যুর পরও (গ্রন্থাদি ওয়াকফ করার কারণে) এর সুফল তিনি লাভ করে চলেছেন।<sup>[৭]</sup>

» ৫৮০ হিজরিতে কায়রোতে নিজের মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার পর তাতে সকল বিষয়ের প্রচুর গ্রন্থ ওয়াকফ করেন কাযি ফাদিল। বলা হয়, এর সংখ্যা ছিল এক লাখ।<sup>[৮]</sup>

» আল-মাদরাসাতুস সাহিবিয়া প্রতিষ্ঠা করার পর সফিউদ্দিন আবদুল্লাহ

[১] আল হাওয়াদিসুল জামিআ ৫৪।

[২] ওমদাতুত তালিব পৃ ১৯৫।

[৩] আল-খুতাত ২: ২২০।

[৪] কাশফুয যুনুন ১: ১৭১।

[৫] নুআইমি ১: ৬০৮।

[৬] ইবনু আবি উসাইবিয়া: উয়ুনুল আনবা ২: ১৫৫।

[৭] আদ দারিস ১: ৩৬০।

[৮] আল-খুতাত ২: ৩৬৬।

বিন আলি মাদরাসার জন্য বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ ওয়াকফ করেন।<sup>[১]</sup>

## ২. ব্যক্তিগত ও সাধারণ স্তরের মাঝামাঝি

এসব গ্রন্থাগারে সর্বস্তরের মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। অপরদিকে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারও ছিল না এগুলো। কারণ নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার উদ্দেশ্যে নয়; বরং কেবল অবসরে সময় কাটানোর জন্য এগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়। জ্ঞানের ছোঁয়া পেতে এবং নিজেদের জ্ঞানী ও বিদ্যানুরাগী হিসেবে জাহির করতে রাজা বাদশাহগণ এসব গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। কেবল বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষকে তাতে প্রবেশের অনুমতি দেন। মাকদিসি লেখেন : বাদশাহর ঘনিষ্ঠজন ছাড়া তাতে কেউ প্রবেশ করতে পারত না।<sup>[২]</sup> এসব গ্রন্থাগারে ঢুকতে বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হতো। নিকলসন লেখেন : বিখ্যাত দার্শনিক ইবনু সিনাকে সামানী রাজবংশের বিশেষ গ্রন্থাগারে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় ঠিক; তবে তা বিশেষ অনুমতি গ্রহণের পর।<sup>[৩]</sup>

এসব গ্রন্থাগার সুসমৃদ্ধ ও বিশাল হবে, এটাই স্বাভাবিক। কারণ এগুলো ছিল খলিফা ও শাসকদের অধিকারে। তাঁদের হাতে ছিল অটল অর্থবিত্ত। ক্ষমতা প্রভাব প্রতিপত্তি সবই ছিল তাদের। তাই ইচ্ছেমতো তাঁরা এসব গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ করেন। রাজ্যের নানা জায়গা থেকে প্রাচীন ও দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহ করে তাতে সংযোজন করেন। এ ধরনের কিছু গ্রন্থাগারের উদাহরণ নিচে তুলে ধরছি।

### ❖ ক) নাসির লিদিনিল্লাহর প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার

বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার কারণে (৫৭৫ হিজরি থেকে ৬২২ হিজরি) খিলাফতের ভাবমূর্তি ও প্রভাব পুনর্বহাল করতে সক্ষম হন খলিফা নাসির লিদিনিল্লাহ। খিলাফতের শোভা ও নানা আয়োজন তিনি পুনর্বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হন। তাঁর নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য দিক হলো, তিনি তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনকে যত্নের সঙ্গে গড়ে তুলেন। সে জন্যই তিনি একটি বিশাল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন।

এ গ্রন্থাগারকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি ভাগ ছিল একেকটি স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। এ থেকেই গ্রন্থশালাটির বিশালতা অনুমান করা যায়।

[১] আল-খুতাত ২: ৩৭১।

[২] আহসানুত তাকাসীম ফি মা'রিফাতিল আকালীম পৃ ৪৪৯।

[৩] Literary History of the Arabs: p. p. ২৬৫-২৬৬।



হাসিব আবুর রুশাইদ মুব্বাশির ইবনু আহমাদের বৃত্তান্তে কিফতি লেখেন:<sup>[১]</sup> খলিফা নাসির লিদিনিল্লাহর শাসনামলে খুব সুনাম অর্জন করেন আবুল আব্বাস আহমাদ। ফলে তিনি খলিফার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিতে পরিণত হন। প্রিয় স্ত্রী সেলজুকি খাতুনের মহল-সংলগ্ন গ্রন্থশালা, নিজামিয়া মাদরাসার গ্রন্থশালা ও দারুল মুসান্নাত গ্রন্থশালায় ওয়াকফকৃত বইপুস্তক নির্বাচনের জন্য খলিফা তাকেই নিযুক্ত করেন। এরপর সুয়ং খলিফার প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের বইপুস্তক নির্বাচনের জন্যও তিনি মনোনীত হন। তা ছাড়া এর আগে আমরা উল্লেখ করেছি যে, এসব গ্রন্থাদি থেকে নিজামিয়া মাদরাসাও কিছু অংশ লাভ করে: 'হাজার হাজার গ্রন্থ নিজামিয়া মাদরাসায় স্থানান্তরিত করেন খলিফা আন নাসির।'<sup>[২]</sup>

### ✽ খ) মুস্তাসিম বিল্লাহর গ্রন্থাগার

মুস্তাসিম বিল্লাহ হলেন সর্বশেষ আব্বাসীয় খলিফা (মৃত্যু ৬৪০ হিজরি)। ৬৫৬ হিজরিতে বাগদাদ পতনের পর তাতাররা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাঁর ছিল বিখ্যাত ও বিরাট গ্রন্থশালা। নানা ইতিহাস-গ্রন্থে তাঁর এ সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইবনুল ফুতি লেখেন:<sup>[৩]</sup> ৬৪১ হিজরিতে খলিফা নিজ প্রাসাদে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন। সেই গ্রন্থাগারের পাশে বিখ্যাত কবি সফিউদ্দিন আবদুল্লাহ ইবনু জামিলের রচিত এ কবিতা লেখা ছিল:

أُنشأ الخليفة للعلوم خزانة # سارت بسيرة فضله أخبارها

أهدى مناقبه لها مستعصم # بالله، من لألائه أنوارها

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, প্রসিদ্ধ দুই অনুলিপিকার শাইখ যকিয়ুদ্দিন এবং সফিউদ্দিন আবদুল মুমিন ইবনু ফাখিরকে খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাহর গ্রন্থাগারে প্রতিলিপির দায়িত্ব দেওয়া হয়।<sup>[৪]</sup>

ইবনু তাবাতাবা লেখেন:<sup>[৫]</sup> খলিফা মুস্তাসিম তাঁর শাসনামলের শেষদিকে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তাতে প্রচুর মূল্যবান গ্রন্থ সংযোজন

[১] আখবারুল হুকামা পৃ ২৬৯।

[২] আল কামিল ফিত তারিখ ১২: ৬৭।

[৩] আল হাওয়াদিসুল জামি'আ পৃ ১৮৪।

[৪] ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত ২: ১৮।

[৫] আল ফাখরি ফিল আদাবিস সুলতানিয়া পৃ ১১২।

করেন। এর সকল চাবি তুলে দেন আবদুল মুমিন ইবনু ফাখিরের হাতে। ফলে আবদুল মুমিন এ গ্রন্থাগারে বসে খলিফার জন্য প্রতিলিপির কাজ করতেন। ইচ্ছা হলেই খলিফা এ গ্রন্থাগারে চলে আসতেন। শাইখ সদরুদ্দিন আলি ইবনুত তাইয়ারের কাছে হস্তান্তর করা গ্রন্থাগার থেকে তাঁর মন উঠে গিয়েছিল।

ইবনু তাবাতাবার এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, খলিফা মুস্তাসিম ঘনঘন এ দুটি লাইব্রেরিতে আসা-যাওয়া করতেন। সেখানে সময় নিয়ে বসতেন। এর পক্ষে অনেক ঘটনা বর্ণনা করেন ইবনু তাবাতাবা। তবে এর সঙ্গে তিনি আরেকটি কথা যোগ করেন: ‘ঘনঘন গ্রন্থাগারে সময় দিলেও এতে তাঁর বড় কোনো ফায়দা হয়নি।’<sup>[১]</sup> ইবনু তাবাতাবা সে সময় জীবিত ছিলেন। তিনি ছিলেন তাতারীদের বিশৃঙ্খল লোক। তাতারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদেরকে বাগদাদের দিকে এগোনোর আহ্বান করেন। তাতারীদের বীরত্বের গুণকীর্তন করে খলিফা ও তাঁর সঙ্গীদেরকে দুর্বল ও ভীতু হিসেবে উপস্থাপন করেন তাতারীদের কাছে। তা ছাড়া উজির ইবনুল আলকামীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বাগদাদ জয়ের পর তার হাতেই ক্ষমতা তুলে দেন হালাকু খান।<sup>[২]</sup> তাই খলিফা হিসেবে মুস্তাসিম বিল্লাহকে খুব দুর্বল ভাবতেন ইবনু তাবাতাবা। তাই তো খলিফার ব্যাপারে তিনি ‘ঘনঘন গ্রন্থাগারে সময় দিলেও এতে তার বড় কোনো উপকার হয়নি’ মন্তব্য করেন।

### ✽ গ) ফাতিমি খলিফাদের গ্রন্থাগার

ইবনুল আসির লেখেন:<sup>[৩]</sup> সালামিয়া থেকে সিজিলমাসা যাওয়ার সময় পিতার রেখে যাওয়া সব গ্রন্থ ও দলিল-দস্তাবেজ সঙ্গে নেন খলিফা মাহদি। ত্রিপোলির সন্নিকটে তাহনা নামক এলাকায় সেগুলো চুরি হয়ে যায়। তবে মাহদির পুত্র আবুল কাসিম ৩০০ হিজরিতে তার প্রথম মিশর অভিযানে যাওয়ার সময় সেসব দলিলপত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হন।

খুব সম্ভবত, এগুলো হলো সেসব গ্রন্থ ও দলিল, যা খলিফা মুঈয লিদিনিল্লাহ মিশর বিজয়ের পর উত্তর আফ্রিকা থেকে কায়রোতে নিয়ে আসেন। তাই যদি হয়, তবে এগুলোই ছিল কায়রোতে ফাতিমি রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত বিশাল গ্রন্থাগারের প্রথম সংযোজন। আর ফাতিমিগণ কেবল মিশর বিজয় করেই খুশি থাকার মতো শাসক ছিলেন না। বরং তারা ইসলামি বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র

[১] আল ফাখরি পৃ ২৯৫।

[২] আল ফাখরি গ্রন্থের শেষ দিকের পৃষ্ঠাগুলো দেখুন।

[৩] আল কামিল ফিত তারিখ ৮: ১৯১।



বাগদাদের সঙ্গে পাল্লা দিতেন। গোটা মুসলিম বিশ্বের কর্তৃত্ব লাভের জন্য তারা সচেষ্ট ছিলেন। তাই তো নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে এবং নিজাদের গ্রন্থের প্রতিপত্তি, সুনাম সুখ্যাতি ও ভাবমূর্তি শক্তিশালী করতে তারা বড় বড় প্রতিষ্ঠান নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ গ্রন্থাগার ছিল সেসব প্রতিষ্ঠানের একটি।

এ গ্রন্থাগার গঠন ও সমৃদ্ধ করতে অভিনব পন্থা অনুসরণ করেন ফাতিমিগণ। কিছু কিছু বিশাল কলেবরের গ্রন্থের সবক'টি খণ্ড সংগ্রহে তাদের বেশ আগ্রহী দেখা যেত। যেন একমাত্র তাদের গ্রন্থাগারেই নির্দিষ্ট গ্রন্থের পুরো সেট বিদ্যমান থাকে। ধরুন, এক শ খণ্ডের একটি গ্রন্থের বই তারা সংগ্রহ করলেন। এরপর দেখা গেল সেখানে কোনো একটি খণ্ড এখনো তাদের হাতে নেই। সেটি অনেক দূরের একটি গ্রন্থশালায় আছে। তো বিপুল অর্থ গুনে হলেও সেই অবশিষ্ট খণ্ডটি তারা সংগ্রহ করে বইয়ের সেট পূর্ণ করতেন। পাশাপাশি কুরআনুল কারীমের কপি সংগ্রহেও ছিল তাদের বিপুল উদ্দীপনা। প্রসিদ্ধ লিপিকারদের হাতের লেখা মোটা কলেবরের কুরআনের কপিগুলো তারা নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করে গ্রন্থশালায় সংযোজন করত। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি, কেন এ গ্রন্থাগারে হাজার হাজার কুরআন ছিল অথবা নির্দিষ্ট গ্রন্থের কপি বিদ্যমান ছিল! ইতিহাসের গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি:

» এ গ্রন্থশালায় দারুণ সুন্দর লিপিতে সোনারোপা প্রভৃতি দিয়ে কারুকার্য করা কুরআনের বিভিন্ন অংশের বাস্তব সংখ্যা ছিল দুই হাজার চার শ।

» তারিখু তাবারী গ্রন্থের কপি ছিল এক হাজার দুই শ। এর মধ্যে একটি ছিল সুয়ং গ্রন্থকারের হাতে লিখিত।

» ইবনু দুরাইদ রচিত জামহারা তুল লুগাহ গ্রন্থের কপি ছিল এক শ।

» তা ছাড়া আল-আইন গ্রন্থের কপি ছিল ত্রিশের অধিক। এর মধ্যে একটি ছিল খোদ গ্রন্থকার খলিল ইবনু আহমাদের হাতে লেখা।<sup>[১]</sup> আর অন্যান্য সব গ্রন্থ মিলিয়ে যে সংখ্যা ইতিহাসে পাওয়া যায়, তা অনুমাননির্ভর। আবু শামা লেখেন:<sup>[২]</sup> এ গ্রন্থাগারে বিশ লাখ গ্রন্থ আছে বলে তিনি গুনেছেন। তা ছাড়া মাকরিযি থেকেও এ ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে ষোলো লাখ সংখ্যাই তার কাছে প্রাধান্য ছিল।<sup>[৩]</sup>

[১] আল-খুতাত ১: ৪০৮, আর রাওজাতাইন ১: ২০০।

[২] আর রাওজাতাইন ১: ২০০।

[৩] আল-খুতাত ১: ৪০৯।

» মাকরিযি আরও বলেন,<sup>[১]</sup> এসব গ্রন্থ ছিল নানা বিষয়ের। কিছু ছিল চার মাযহাবের ফিকহের, কিছু ভাষা ও ব্যাকরণের, কিছু হাদিসের, কিছু ইতিহাসের, কিছু শাসকদের ইতিহাসের, কিছু জ্যোতির্বিদ্যার, কিছু আধ্যাত্মিকতার, কিছু রসায়নশাস্ত্রের ইত্যাদি। তবে আবু শামা ও মাকরিযি উভয়ে একমত পোষণ করেন যে, গ্রন্থটি ছিল পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্যজনক প্রতিষ্ঠান। সে সময় পুরো ইসলামি সাম্রাজ্যে এর মতো দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থাগার ছিল না।

মুস্তানসিরের শাসনামলে মিশরে গৃহযুদ্ধ শুরুর আগ পর্যন্ত গ্রন্থাগারটি আপন মহিমা ধরে রেখেছিল। এ গৃহযুদ্ধের সময় নির্বোধ ও বর্বর তুর্কি জাতি রাজধানীতে ব্যাপক লুটপাট চালায়। খিলাফাতের রাজধানী দখল করে তাতে থাকা সকল শৈল্পিক সৌন্দর্য বিনষ্ট করে দেয়। গ্রন্থাগারটিও তাদের আক্রমণ ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়নি। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এ মহা উত্তরাধিকারকে তারা কলুষিত করে। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, এসব মূল্যবান ও দুর্লভ গ্রন্থাবলির পাতাগুলোকে সিগারেটে আগুন ধরানোর কাজে ব্যবহার করে এ নিষ্ঠুর ও বর্বর তুর্কি জাতি। শুধু তাই নয়; এদের দাস-দাসীরা এসব গ্রন্থের মূল্যবান চামড়াগুলো উঠিয়ে সেগুলো দিয়ে পায়ের জুতা তৈরি করে। বিপুল সংখ্যক বই নীলনদে নিক্ষেপ করা হয়। আরও অনেক বই পুড়িয়ে ফেলা হয়। আর কিছু বই অন্যান্য দেশে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর যা অবশিষ্ট ছিল, সেগুলোর ওপর ধুলোবালি ও মাটি জমা হয়ে অনেকগুলো টিলার মতো আকৃতি ধারণ করে, সেগুলোকে বলা হতো তিলালুল কুতুব। এসব গ্রন্থে তাদের মতাদর্শ পরিপন্থী কথা আছে—এ ধারণার বশবর্তী হয়ে বর্বর তুর্কীরা এসব বইপুস্তক ধ্বংস করে দেয়।<sup>[২]</sup>

তবে মহান আল্লাহ জানেন, এসব গ্রন্থে না প্রাচ্যবিদদের কোনো কথা ছিল, না পাশ্চাত্যবিদদের কোনো কথা ছিল, না অন্য কোনো জ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল। বরং কেবল মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা ও বর্বরতা প্রদর্শন করতেই তারা এ গুরুতর অপরাধে লিপ্ত হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে সর্বোচ্চ আসনে থাকা ইসলামি সভ্যতার গায়ে কালেমা লেপন করতেই তারা এ অপবাদের পথ বেছে নিয়েছে।

এরপর বদর জিমাঈ মিশরের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারের পর ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া গ্রন্থগুলো একত্র করেন। নানা জায়গা থেকে সেগুলো সংগ্রহ করে

[১] আল-খুতাত ১: ৪০৯।

[২] আল-খুতাত ১: ৪০৯।



জমা করেন। অল্প হলেও এভাবে তিনি গ্রন্থাগারটির মর্যাদা ও ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। ফাতিমি সাম্রাজ্যের পতন ও আইয়ুবী সালতানাতে উত্থানের সময় পর্যন্ত এ গ্রন্থ এভাবেই ফাতিমি প্রাসাদে অবশিষ্ট ছিল। এরপর বিখ্যাত মুসলিম বীর সেনাপতি সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবী এ গ্রন্থটি চিরতরে সরিয়ে দেন। আহলুস সুন্নাহর পরিপন্থী যত কিতাব ছিল, সেগুলো নিশ্চিহ্ন করেন। বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ তিনি কাযি ফাদিল এবং ইমাদুদ্দিন আসফাহানীর কাছে উপহার হিসেবে পাঠান। অবশিষ্টগুলো বিক্রি করে দেওয়ার জন্য ইবনু সুরাহকে দায়িত্ব দেন। এগুলো সম্পন্ন করতে প্রায় কয়েক বছর লেগে গিয়েছিল।<sup>[১]</sup>

ব্যক্তিগত ও সাধারণের মাঝামাঝি স্তরের গ্রন্থাগারের আলোচনা শেষ করার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার কথা তুলে ধরতে চাই। সেটি হলো, এ ধরনের বেশিরভাগ গ্রন্থশালাই শেষ পর্যন্ত গণগ্রন্থাগারে পরিণত হয়। যেমন, নাসিরের প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার এবং ফাতিমিদের গ্রন্থাগারের একটি বিরাট অংশ দারুল ইলম গ্রন্থশালায় স্থানান্তরিত করা হয়। যেমনটি ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি।

### ৩. ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার

ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহারের জন্য বড় জ্ঞানী ও সাহিত্যিকগণ এসব গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এসব গ্রন্থশালা ছিল সংখ্যায় প্রচুর এবং দ্রুত সম্প্রসারণশীল। কারণ এমন কোনো জ্ঞানী বা সাহিত্যিক ছিলেন না, যিনি পাঠ ও গবেষণার জন্য ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেননি। এ রকম কয়েকটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের কথা সংক্ষিপ্তভাবে এখানে তুলে ধরছি:

#### ❖ ক) ফাতহ ইবনু খাকানের গ্রন্থাগার

ফাতহ ইবনু খাকান ছিলেন আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিলের উজির। হিজরি ২৪৭ সনে সামাররায় খলিফার সাথে তিনিও নিহত হন। ফাতহ ছিলেন বিদ্বান মনীষী। বিপুল জ্ঞানের অধিকারী। প্রচুর অধ্যয়ন করতেন তিনি। এ কথাও বলা হয় যে তিনি খলিফা মুতাওয়াক্কিলের দরবারে উপস্থিত হতেন।

[১] আর রাওজাতাইন ১: ২৬৭, আল-খুতাত ১: ৪০৯। আমরা এবং ইতিহাসবিগণ বীর সালাহুদ্দিনকে প্রশংসার সাগরে ডাসাই। সীমাহীন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করি তাঁর প্রতি। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাকালে মনে প্রশ্ন জাগে, এসব গ্রন্থের সঙ্গে তিনি কেন এমন আচরণ করলেন?! বিশেষ করে যেসব গ্রন্থ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতাদর্শের পরিপন্থী ছিল না, কেন তিনি সেগুলোর প্রতি এমন অবহেলা দেখালেন?

এরপর যখন ওজু করার জন্য দরবার থেকে বের হতেন, তখন ওজুখানায় আসা-যাওয়ার পথে বই বের করে পড়তেন। এরপর দরবারে চলে এলে বই রেখে দিতেন।<sup>[১]</sup>

তঁার মতো অর্থবিভে পরিপূর্ণ একজন বিদ্যানুরাগীর স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। তিনি সেই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেন অপর বিখ্যাত মনীষী, সাহিত্যিক ও জ্ঞানী আলি ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু আবি মানুসর মুনাঞ্জিমকে। ইবনুন নাদিম লেখেন :<sup>[২]</sup> ফাতহ ইবনু খাকানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন মুনাঞ্জিম। এরপর তঁার জন্য একটি গ্রন্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে নিজের গ্রন্থশালা থেকে অনেক বইপুস্তক স্থানান্তর করেন। ফাতহ তঁাকে দিয়ে যেসব গ্রন্থ লিখিয়ে নেন, সেগুলোর সংখ্যা গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বইপুস্তকের সংখ্যার চেয়েও বেশি ছিল।

ফাতহ যেসব গ্রন্থ প্রতিলিপি করিয়ে নেন, সেগুলোর সংখ্যা ছিল প্রচুর। তৎকালীন সেরা অনুলিপিকারগণ তঁার জন্য সেগুলো লিখে দেন। তাঁদের অন্যতম ছিলেন জাহিয়। তিনি ফাতহের অনুরোধে সাড়া দিয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ দুটি হলো আত-তাজু ফি আখলাকিল মুলুক এবং মানাকিবুল আতরাক ওয়া আম্মাতু জুনদিল খিলাফাহ। তা ছাড়া মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস তাগলাবী ও মুহাম্মাদ ইবনু হাবিবও অনেক গ্রন্থ লিখে দেন। এগুলোর মূল কপি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। ইবনুন নাদিম সত্য বলেছেন যে, এখানে এত পরিমাণ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সমাহার ছিল, যার নজির তিনি পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখেননি।<sup>[৩]</sup>

## ✽ খ) হুনাইনের গ্রন্থাগার (২৬৪ হিজরি)

হুনাইন ইবনু ইসহাক ছিলেন খলিফা মামুনুর রশিদের জমানার নামকরা ডাক্তার ও অনুবাদক। গ্রিক, সিরীয় ও পারস্য—এ তিন ভাষায় তিনি দারুণ পারদর্শী ছিলেন। তঁার জীবদ্দশায় এ তিন ভাষায় তঁার মতো দক্ষ আর কেউ ছিল না। তা ছাড়া আরবি ভাষাতেও ছিল তঁার চমৎকার দখল। দীর্ঘসময় আরবি ভাষাকেন্দ্রিক চাকুরির ফলে তিনি হয়ে ওঠেন আরবি ভাষায় অন্যতম সুদক্ষ



অনুবাদক।<sup>[১]</sup> কিফতী লেখেন:<sup>[২]</sup> হুনাইন ছিলেন বিশুদ্ধভাষী, ভাষাবিদ ও কবি। ভাষাবিদ্যায় তিনি ছিলেন খলিল ইবনু আহমাদের শিষ্য। আরবি ভাষায় প্রচুর গ্রন্থ অনুবাদ করেন। এর মধ্যে বেশির ভাগই ছিল দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যার গ্রন্থ। চিকিৎসাবিদ্যা-সহ অন্যান্য চার ভাষায় তাঁর অনূদিত গ্রন্থসমূহ আরবি জ্ঞান-ভাণ্ডারকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তা ছাড়া হুনাইন ছিলেন বিদ্যানুরাগী। নিজের সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেন: তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। গ্রন্থের অনুসন্ধানে রোম সাম্রাজ্যের প্রান্তসীমা পর্যন্ত গিয়েছেন।<sup>[৩]</sup> তা ছাড়া ইবনুন নাদিম বিরাট সংখ্যক গ্রন্থকে হুনাইনের সংকলিত বলে উল্লেখ করেছেন।<sup>[৪]</sup> এসব সংকলন একত্র করলে সূত্র একটি গ্রন্থাগার রূপ লাভ করবে। এবার ভাবুন, গ্রন্থগুলো রচনা করতে গিয়ে হুনাইন যেসব পুস্তক অধ্যয়ন করেছেন, যেসব গ্রন্থ থেকে তথ্য খুঁজে বের করেছেন, তার সংখ্যা কত হবে?!

### ✽ গ) ইবনুল খাশশাবের গ্রন্থাগার (৫৬৭ হিজরি)

পুরো নাম আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ খাশশাব বাগদাদী। তিনি ছিলেন আরবি ভাষার পণ্ডিত। ব্যাকরণ, ভাষা, তাফসির, হাদিস, বংশশাস্ত্র ইত্যাদিতে তিনি ছিলেন দারুণ পারদর্শী। তাঁর অনেক বিখ্যাত গ্রন্থ ও উপকারী সংকলন রয়েছে। তিনি নিজ হাতে কোনো গ্রন্থ রচনা করলে শতাধিক দিনারে বিক্রি হতো। বইপ্রেমী মানুষ তা কিনতে প্রতিযোগিতায় নামত।<sup>[৫]</sup>

খাশশাব ছিলেন হাদিস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী, সত্যবাদী, মহৎ ও বিশুদ্ধ। তবে এত কিছু পরও তিনি তাঁর বিশুদ্ধতা পুরোপুরি রক্ষা করতে পারেননি। কারণ তিনি বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করেছেন ঠিক, তবে সেজন্য সদুপায় অবলম্বন করেননি। তিনি গ্রন্থপ্রেমী ছিলেন, অধ্যয়নপ্রিয় ছিলেন ঠিক, তবে সাথে সাথে তিনি ছিলেন কৃপণ। বই কিনতে তিনি খুব বেশি অর্থ খরচ করতে চাইতেন না। অনেক সময় তিনি গ্রন্থ সংগ্রহে অসদুপায় অবলম্বন করেছেন। কারও কাছ থেকে গ্রন্থ ধার করে আনার পর সে তা ফেরত চাইলে বলতেন, বিশাল গ্রন্থাগারে তা অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এত বড় গ্রন্থাগারে কোথায় খুঁজব আপনার বই! বইবাজারে যাওয়ার পর কোনো গ্রন্থ কেনার ইচ্ছা হলে মানুষের

[১] ইবনু আবি উসাইবিয়া ১: ১৮৬।

[২] আখবারুল হুকামা পৃ ১৭৪।

[৩] ইবনু আবি উসাইবিয়া ১৮৭।

[৪] ইবনুন নাদিম পৃ ৪১০।

[৫] মু'জামুল উদাবা গ্রন্থের টীকা (ফরিদ রিফাঈর ছাপা) ১২: ৪৯।

অগোচরে বইয়ের একটি পাতা ছিঁড়ে ফেলতেন। যেন অন্য কেউ ছেঁড়া বইটি কেনার আগ্রহ না দেখায়। এরপর তিনি অল্প মূলে বইটি কিনে নিতেন। শেষজীবনে তিনি তাঁর অধীনে থাকা সকল গ্রন্থ বিদ্যার্থীদের জন্য ওয়াকফ করে দেন।<sup>[১]</sup>

### ❖ ঘ) মুওয়াফফিকের গ্রন্থাগার (৫৮৭ হিজরি)

দামিশকের অধিবাসী মুওয়াফফিক ইবনুল মাতরান ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ও বিশুদ্ধ ভাষী। খুব ব্যস্ত একজন মানুষ। চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁর পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা প্রমাণ করতে তাঁর রচনাসমগ্রই যথেষ্ট। দিগ্বিজয়ী শাসক বীর সালাহুদ্দিনের শাসনামলে তাঁর চিকিৎসা-গবেষণা বিপুল কাজে দেয়। সেই আমলে চিকিৎসাবিদ্যায় নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যান। সালাহুদ্দিন আইয়ুবী তাঁকে খুব মূল্যায়ন করতেন। রাজদরবারে তাঁর বিরাট সমাদর ছিল।<sup>[২]</sup> গ্রন্থ সংগ্রহে তাঁর ছিল বিপুল আগ্রহ। মৃত্যুর সময় তাঁর গ্রন্থভাণ্ডারে কেবল চিকিৎসাবিদ্যার দশ হাজার গ্রন্থ ছিল। তা ছাড়া তাঁর লিখিয়ে নেওয়া বইও ছিল প্রচুর। গ্রন্থ অনুলিপি করানোর ব্যাপারে তাঁর ছিল দারুণ আগ্রহ। তাঁর অধীনে সবসময় তিন জন অনুলিপিকার নিরবচ্ছিন্ন কাজ করতেন। তাদেরকে উপযুক্ত বেতন ভাতা দিতেন। তা ছাড়া ইবনুল মাতরান নিজেও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।

তাঁর নিজ হাতে লেখা কিছু গ্রন্থ ইবনু আবি উসাইবিয়া নিজে দেখেছেন। দেখার পর তিনি মন্তব্য করেন: গ্রন্থের লেখা ছিল খুবই চমৎকার, বিশুদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত। গ্রন্থ অধ্যয়নে ইবনুল মাতরানের প্রচুর আগ্রহ ছিল। বেশিরভাগ সময় তিনি বইপাঠে লিপ্ত থাকার চেষ্টা করতেন। তাঁর কাছে থাকা অধিকাংশ গ্রন্থে তাঁর নিজ হাতে লেখা টীকা সংযুক্ত ছিল। কিছু গ্রন্থ তিনি নিজে শুদ্ধ করেছেন আর কিছু গ্রন্থের ব্যাখ্যা যুক্ত করেছেন। নিজ হাতে সেগুলো সম্পাদনা করেছেন...। তিনি ছিলেন উদার ও দানশীল। পাঠে উদ্বুদ্ধ করতে অনেক শিক্ষার্থীকে তিনি গ্রন্থ উপহার দেন। তাঁর সংগ্রহে ছিল হাজার হাজার ছোট ছোট পুস্তক, সুলতানের দরবারে এলে বা অন্য কোথাও গেলে সুযোগমতো পড়ার জন্য কোনো না কোনো পুস্তক সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন।<sup>[৩]</sup>

[১] ইয়াকুত: মু'জামুল উদাবা ৪: ২৮৬-২৮৭।

[২] ইবনু আবি উসাইবিয়া ২: ১৭৫।

[৩] ইবনু আবি উসাইবিয়া ২: ১৭৮-১৭৯।



### ✽ ৩) জামালুদ্দিন কিফতির গ্রন্থাগার

তিনি বিখ্যাত উজির ও বিচারক। পুরো নাম জামলুদ্দিন আবুল হাসান। মিশরে জন্ম গ্রহণ করেন। আলেপ্পোয় থিতু হন। ভাষা, ব্যাকরণ, ফিকহ, হাদিস, কুরআন, উসুলুল কুরআন ইত্যাদি শাস্ত্রে ছিলেন বিশারদ। যুক্তিবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর দখল ছিল। প্রকৌশল ও ইতিহাস বিষয়ে তিনি পণ্ডিত ছিলেন। ৬৪৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। অসংখ্য গ্রন্থ তিনি সংগ্রহ করেন। তাঁর দয়া ও অনুকম্পা পেতে দূর-দূরান্তের নানা দেশ থেকে মানুষ তাঁর জন্য গ্রন্থ নিয়ে আসত। এ পৃথিবীতে একমাত্র গ্রন্থই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। সন্তান ও পরিবার তাঁকে বই থেকে দূরে সরিয়ে দেবে—এই চিন্তায় তিনি বিয়েই করেননি। মৃত্যুর সময় তাঁর সকল গ্রন্থ আলেপ্পোর শাসক নাসিরের জন্য দিয়ে যান। সবগুলো গ্রন্থ মিলে দাম হয়েছিল পঞ্চাশ হাজার দিনার। তাঁর গ্রন্থানুরাগের ব্যাপারে অনেক মজার মজার ঘটনা বর্ণিত আছে।<sup>[১]</sup>

### ✽ ৮) মুবাশশিরের গ্রন্থাগার

তিনি হলেন বিখ্যাত আমির আবুল ওয়াফা মুবাশশির ইবনু ফাতিক। মিশরের উল্লেখযোগ্য শাসক ও বিদ্বান। জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তা ছাড়া চিকিৎসাবিদ্যা নিয়েও তিনি কাজ করেন। সে জন্য তিনি আলি ইবনু রিয়াযের সান্নিধ্যে দীর্ঘ সময় ব্যয় করেন। প্রচুর লেখালেখি করতেন মুবাশশির। পূর্ববর্তী মনীষীদের গ্রন্থের তালিকায় তাঁর হস্তলিখিত প্রচুর গ্রন্থ নিজ চোখে দেখেছেন বলে মন্তব্য করেন ইবনু আবি উসাইবিয়া। মুবাশশির ইবনু ফাতিক প্রচুর গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। কিছু গ্রন্থ উদ্ধার করা গেছে। তবে দীর্ঘ সময় পানিতে ডুবে থাকায় পাতার রঙ নষ্ট হয়ে গেছে।<sup>[২]</sup> গ্রন্থগুলো কী করে পানিতে ডুবেল, সেই ঘটনা উল্লেখ করেছেন বিখ্যাত যুক্তিবিদ শাইখ সাদিদুদ্দিন। তিনি বলেন, আমির ইবনু ফাতিক ছিলেন বইপ্রেমী। জ্ঞান আহরণে তাঁর ছিল ভীষণ আগ্রহ। সুতন্ত্র একটি গ্রন্থভাণ্ডার ছিল তাঁর। বেশিরভাগ সময় তিনি সেই গ্রন্থাগারে কাটাতেন। খুব কম সময় গ্রন্থাগারের বাইরে কাটাতেন। তাঁর একমাত্র কাজই ছিল গ্রন্থ অধ্যয়ন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন রূপবতী ও গুণবতী। তাকে ছেড়ে সারাক্ষণ বই নিয়ে পড়ে থাকায় লাইব্রেরির প্রতি তার বিদ্রোহ তৈরি হয়। ফলে ইবনু ফাতিকের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী ও দাসীরা মিলে সেই গ্রন্থাগারে ঢোকেন। লাইব্রেরির মাঝখানে ছিল একটি

[১] আল কিতাবী: ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত ২: ৯৭, খুতাতুশ শাম ৬: ১৯৩।

[২] ইবনু আবি উসাইবিয়া ২: ৯৮-৯৯।

পুকুর। গ্রন্থের প্রতি তার মর্মপীড়া থেকেই তিনি ও তার দাসীরা মিলে সব বই পুকুরে পানিতে নিক্ষেপ করে। বেশিরভাগ গ্রন্থই পানিতে তলিয়ে যায়। তাঁর লিখিত বেশিরভাগ গ্রন্থ বিবর্ণ হয়ে যাওয়ার এটাই ছিল মূল কারণ। মুবাশশিরের মৃত্যু হয় ৫ম শতকের শেষ দিকে।<sup>[১]</sup>

### ❖ ছ) আফরাইমের গ্রন্থাগার (৫০০ হিজরি)

আফরাইম যাকফান ছিলেন মিশরের বিখ্যাত ডাক্তার। শাসকদের আস্থাভাজন। খলিফাদের কাছ থেকে প্রচুর উপহার লাভ করেন। বিখ্যাত চিকিৎসক আবুল হাসান আলি ইবনু রিদওয়ানের কাছে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা শেখেন। তিনি ছিলেন তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্য। গ্রন্থ সংগ্রহ, সংকলন ও অনুলিপি করানোর ব্যাপারে তাঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ। এভাবে এক এক করে তাঁর ভাণ্ডারে যুক্ত হয় চিকিৎসা ও অন্যান্য শাস্ত্রের বিপুল গ্রন্থ। নিজ পিতা থেকে ইবনু আবি উসাইবিয়া বর্ণনা করেন:<sup>[২]</sup> একবার ইরাকের এক লোক গ্রন্থ ক্রয় করার উদ্দেশ্যে মিশরে আসেন। এরপর আফরাইমের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন। আফরাইম তাঁর লাইব্রেরি থেকে দশ হাজার কিতাব ওই লোকের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার চুক্তি করেন। ঘটনাটি ছিল বিখ্যাত শাসক আফযাল ইবনু আমিরিল জুয়ুশের শাসনামলের। এই চুক্তির বিষয়টি আফযালের কানে আসে। তিনি চাচ্ছিলেন, গ্রন্থগুলো মিশরেই থাকুক। মিশরের বাইরে না যাক। এরপর যে অর্থের বিনিময়ে চুক্তি সম্পাদিত হয়, সেই পরিমাণ অর্থ তিনি আফরাইমের কাছে পাঠিয়ে দেন। এরপর বইগুলো শাসক আফযালের লাইব্রেরিতে স্থানান্তর করে সেগুলোর ওপর তাঁর উপাধি লিখে দেওয়া হয়। এসব গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইবনু আবি উসাইবিয়া নিজ চোখে দেখেছেন। বইগুলোর ওপর আফরাইম ও আফযালের উপাধি লেখা ছিল। আফরাইমের রেখে যাওয়া গ্রন্থসংখ্যা বিশ হাজারের অধিক।<sup>[৩]</sup>

### ❖ জ) ইমাদুদ্দিন আসফাহানির গ্রন্থাগার

আবু শামা লেখেন: ইমাদুদ্দিন আসফাহানি বলেন, সপ্তাহে দু'দিন রাজপ্রাসাদে সুলভ মূল্যে বই বিক্রি হতো। প্রাসাদে সারি সারি অনেক কক্ষ ছিল। সেগুলোতে তাকে তাকে সূচি অনুযায়ী বই সাজানো ছিল। দালালরা

[১] ইবনু আবি উসাইবিয়া ২: ৯৯।

[২] প্রাপ্ত তথ্যসূত্র ২: ১০৫।

[৩] ইবনু আবি উসাইবিয়া ২: ১০৫।



সেগুলো নামমাত্র মূল্যে হাতিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রাসাদে বিক্রির দায়িত্বে থাকা বাহাউদ্দিন কারাকুশের সঙ্গে প্রতারণা করল। একবার দালালরা রুম পরিষ্কার এবং বইগুলো রোদে-বাতাসে রাখার পরামর্শ দিল বাহাউদ্দিনকে। তিনি তাদের পরামর্শ ভালো মনে করে তাই করলেন। ফলে বইগুলো বের করে আবার নতুন করে গোছাতে গিয়ে নানা শাস্ত্রের বই একসঙ্গে গুলিয়ে যায়। চিকিৎসাবিদ্যার গ্রন্থ তাফসিরের সঙ্গে মিশে যায়। অন্যদিকে একই লেখকের একাধিক খণ্ডবিশিষ্ট গ্রন্থ নানা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়। ফলে সবগুলো আর একত্রে পাওয়া যাচ্ছিল না। ফল এই দাঁড়াল, অগোছালো পদ্ধতির ফলে এবং সবগুলো খণ্ড একসঙ্গে না থাকার কারণে সেগুলো অল্প দামে বিক্রি হতে লাগল। দালালেরা সেগুলো স্বল্পমূল্যে কিনে নিয়ে বাইরে নিজেদের মতো করে গোছাত। ইমাদুদ্দিন আরও বলেন, রাজপ্রাসাদে নিয়মিত বইয়ের মেলা বসে শুনে আমি সেখানে গেলাম। সবার মতো আমিও বই কিনলাম। আমার বই কেনার আগ্রহ দেখে সুলতান আমাকে প্রচুর গ্রন্থ উপহার দিলেন। এরপর লাইব্রেরি থেকে আমার পছন্দমতো বই নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। আমি তার কাছে দিয়ে দেখি, তার সামনে প্রাসাদ থেকে সংগ্রহ করা প্রচুর গ্রন্থ রয়েছে। তিনি সেগুলো দেখছেন। সেগুলো নেওয়ার জন্য হাত বাড়চ্ছেন। আমি একবার নির্দিষ্ট কিছু গ্রন্থ চাইলাম। তা শুনে বললেন, এখানে কি ওই গ্রন্থগুলো আছে? আমি বললাম, সবগুলোই আছে। এরপর সেই বইগুলো তিনি আমাকে প্রদান করলেন। কয়েকজন কুলির সাহায্যে বইগুলো আমি সেখান থেকে নিয়ে এলাম।<sup>[১]</sup>

এভাবেই নানা উপটৌকন লাভ করে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন ইমাদুদ্দিন আসফাহানি। এ ছাড়া তাঁর সংগ্রহে আরও অনেক বইপুস্তক ছিল।

[১] আর রাওয়াতাইন ১: ২৬৮।

## তৃতীয় অধ্যায়

# শিক্ষক-সমাজ

একটি বিষয় খেয়াল করার মতো। সাধারণ জ্ঞানী এবং শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণকারী জ্ঞানী—মধ্যযুগে এ দুটি শ্রেণীর মাঝে কোনো পার্থক্য ছিল না। কারণ তারা সবাই (কেউ পারিশ্রমিক নিয়ে আবার কেউ বিনামূল্যে) স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতেন। কেউ জ্ঞানের আসর জমিয়ে, আবার কেউ গ্রন্থ রচনা ও প্রচার-প্রসার করে। কাজেই আমাদের এ গবেষণা নির্বিচারে উক্ত দুটি শ্রেণিকেই অন্তর্ভুক্ত করবে।

### শুরুর কথা

১. এমন বিভক্তির কথা আমরা কেন চিন্তা করলাম! বিখ্যাত জ্ঞানী জাহিয় নিজের প্রজন্ম ও পরবর্তী অনেক প্রজন্মকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছেন তাঁর জ্ঞানের দ্বারা। অথচ শিক্ষকতাকে তিনি কখনো পেশা হিসেবে নেননি। তিনি বলেন, একবার খলিফা মুতাওয়াক্কিলের এক ছেলেকে পড়ানোর জন্য আমার নাম প্রস্তাব করা হয়। দরবারে যাওয়ার পর খলিফা দেখলেন, আমার চেহারা বিবর্ণ ও মলিন। তখন খলিফা আমার জন্য দশ হাজার দিরহাম বরাদ্দ করে আমাকে দায়মুক্ত করে দিলেন।<sup>[১]</sup> এখানে কেবল জাহিয়কে দিয়েই উদাহরণ দিলাম। জাহিয় ছাড়াও অনেক শিক্ষক আছেন যারা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের কাভারি ছিলেন ঠিক, তবে তাঁদের কাছে শিক্ষার্থীদের ভিড় দেখা যায়নি। শিক্ষকতাকে তাঁরা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেননি।

২. একেবারে শুরু থেকেই মুসলমানগণ শিক্ষকদের থেকে জ্ঞান আহরণকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন। স্রেফ গ্রন্থ থেকে জ্ঞান আহরণকে ঘৃণার চোখে

[১] ইবনু খাল্লিকান ১: ৫৫৩।



দেখেছেন। কেউ কেউ বলেন, সবচেয়ে বড় বিপদ হলো, পুস্তকেই একমাত্র শাইখ বানিয়ে নেওয়া। অর্থাৎ গ্রন্থ থেকে জ্ঞান শেখা।<sup>[১]</sup> কিতাবুশ শাকওয়াতে এসেছে:<sup>[২]</sup> 'যার কোনো শাইখ নেই, তার কোনো ধর্ম নেই। যার কোনো উস্তায নেই, তার উস্তায শয়তান।' মুসআব ইবনুয যুবাইর বলেন, মানুষ তাদের আত্মস্থ করা সবচেয়ে সুন্দর কথাগুলো বলে থাকে। তাদের লেখা থেকে সবথেকে সেরা লাইনগুলো মুখস্থ করে থাকে। আর তাদের শোনা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলো লিখে রাখে। কাজেই শিষ্টাচারের কথা গ্রহণ করতে চাইলে, মানুষের মুখ থেকে গ্রহণ করো। কারণ জ্ঞানীদের মুখ থেকে যা শুনবে, সবগুলোই নির্বাচিত ও বিক্ষিপ্ত মণিমুক্ত।<sup>[৩]</sup> ইমাম শাফিয়ির একটি উক্তি প্রসিদ্ধ আছে। তিনি বলেন, কেবল গ্রন্থের ভেতর থেকে জ্ঞান আহরণ করে যে লোক বিদ্যা শেখে, তার ফতোয়া প্রদান কলুষিত হয় (তার দেওয়া সমাধান ত্রুটিযুক্ত হয়)।<sup>[৪]</sup> রাসায়িলু ইখওয়ানিস সাফা গ্রন্থে আছে:<sup>[৫]</sup> শুরুতেই নিজ থেকে জ্ঞান আহরণ করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষকে জ্ঞানের পথে নিয়ে যেতে দরকার হলো সুদক্ষ শিক্ষক, রাহাবার ও উস্তায। যিনি তাকে জ্ঞান শেখাবেন। তার চরিত্র গঠন করবেন। তার কথা ও কাজ সুন্দর করবেন। ধারণা ও বিশ্বাস বিগুহ্ন করবেন। কর্মদক্ষতা সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

শিক্ষক থেকেই জ্ঞান আহরণ করতে হবে—কেবল এটুকুর মধ্যেই ক্ষান্ত থাকেননি ইবনু জামাআ। আরও একধাপ এগিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষার্থী কেবল একজন শিক্ষকের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। যারা কিতাবের পাশাপাশি যুগের বিদগ্ধ মনীষীদের সঙ্গে লাভ করে জ্ঞান অর্জন করেছেন, এমন শাইখদের সাথেও লম্বা সময় ধরে ওঠাবসা করবে। দীর্ঘ সময় তাদের সঙ্গে আলোচনা করবে।<sup>[৬]</sup>

৩. মুসলমানদের শিক্ষার ইতিহাসে অন্যতম গৌরবের বিষয় হলো, তারা কেবল জ্ঞানকেই শিক্ষক নির্বাচনের হাতিয়ার মনে করেননি। বরং এর সঙ্গে তরবিরত বা তিলে তিলে শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলা, শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিকাশের পাশাপাশি তাদের আদব-আখলাককেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে

[১] ইবনু জামাআ পৃ ৮৭।

[২] অজ্ঞাত লেখকের গ্রন্থ, এটি উদ্ধৃত করা হয়েছে: Journal Asiatique ১৯৪০, P. P. ২৮৪-২৮৫।

[৩] মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী: মুহাযারাতুল আবরার পৃ ৩।

[৪] তাযকিরাতুস সামি' পৃ ৮৭।

[৫] খণ্ড ৪ পৃ ১৮।

[৬] তাযকিরাতুস সামি' পৃ ৮৭।

একজন শিক্ষক খুব কাছ থেকে শিক্ষার্থীদের মনোভাব ও প্রবণতা বুঝেছেন। নিবিড়ভাবে তার আত্মিক উন্নতি সাধনের প্রয়াস পেয়েছেন। এভাবেই জ্ঞান ও শিক্ষার্থীর বোধশক্তির মাঝে সেতুবন্ধন হয়েছেন শিক্ষক। ইবনু আবদুন লেখেন: [১] শিক্ষাদান হলো একটি শিল্প (Art)। যেখানে দরকার জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও হৃদাতা। দীর্ঘ সময় অনুশীলন করে শিক্ষকতাকে আয়ত্ত্ব করতে হয়। এর খুঁটিনাটি বিয়য় বুঝতে হয়। সহমর্মিতা ও সহনশীলতার গুণ অর্জন করতে হয়। তবেই একজন শিক্ষার্থী তার থেকে উপকৃত হতে পারবে। তার শিক্ষা গ্রহণ করবে। ইবনু খালদুন এ ব্যাপারে সূত্র একটি অধ্যায় রচনা করে বিষয়টি সুন্দর করে বিশ্লেষণ করেছেন। এর শিরোনাম দিয়েছেন—‘শিক্ষকতা হলো জ্ঞানের অনাসব শিল্পের মতো একটি কার্যকরী ও অপরিহার্য শিল্প’। তাতে তিনি বলেন, শিক্ষকতা হলো একটি শিল্প। কারণ তার রীতি ও পরিভাষাগুলো বৈচিত্র্যময়। বিখ্যাত সকল ইমামের (পাঠদানের) রীতি ও পরিভাষা ভিন্ন ভিন্ন। বোঝা গেল, এসব পরিভাষা জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি হতো, তবে সবার কাছে একই রকম হওয়ার কথা ছিল...। ইলমী মজলিসে নিয়মিত যাতায়াত, বেশি বেশি মুখস্থ করা, ইলম অর্জনকে গুরুত্ব দেওয়া—এসব কিছু জ্ঞান ও শিক্ষকতার মধ্যে অবাধ হস্তক্ষেপের যোগ্যতা তৈরি করে না...। শিক্ষককে কথোপকথন ও বিতর্কের মাধ্যমে নিজের জিহ্বা ধারালো করতে হবে। মুখের ভাষা জোরালো করতে হবে। আর শিক্ষকতা নামক শিল্পকে আয়ত্ত্ব করতে কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করতে হবে। [২]

৪. ঘরের সঙ্গে মাদরাসার সম্পর্ক কেমন হবে, শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নতি সাধন ও সফলতার পেছনে ঘরের ভূমিকা কী হবে, এ নিয়েও মুসলমানগণ সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। আল-ইরশাদ ওয়াত তা’লিম গ্রন্থে এ বিষয়ে লম্বা আলোচনা রয়েছে। সেখান থেকে নিচের কয়টি লাইন আমি তুলে ধরছি: শিশু হলো পরিবারের দর্পণ। পরিবারে ভালো-মন্দ সবই শিশুর চরিত্রে প্রভাব রাখে। পরিবারে যা কিছু দেখে, যা কিছু শুনে—সবই তার সৃভাবে প্রতিফলিত হয়। তাই তো মুসলিম মায়েরা সন্তানদের সুষ্ঠুরূপে গড়ে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। যে ব্যক্তি নিজের অর্থবিত্ত বৃদ্ধি করল, কিন্তু সন্তান গড়ল না—সে তার সন্তান ও বিত্ত দুটোকেই নষ্ট করল। [৩] আর ভালো গুণ ও উন্নত সৃভাব কেবল মাদরাসায় অর্জন করা সম্ভব নয়। যেদিন থেকে শিশু কথা বুঝতে শেখে, সেদিন

[১] রিসালাতু ইবনি আবদুন পৃ ২১৫ (১৯৩৪ সনের আল মাজাল্লাতুল আসিয়ভিয়া’য় প্রকাশিত)।

[২] আল মুকাদ্দিমা ৩০২ – ৩০৪ (সামান্য পরিমার্জিত)।

[৩] কিতাবুল ইরশাদ ওয়াত তা’লিম ৫৪১-৫৪২।



যেকোনো তার সঙ্গে (ভালো গুণের) চর্চা করতে হয়। শিশুর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের দায়িত্ব তার আশপাশের লোকদেরকেই নিতে হবে। কেননা, তাদের কথা, কাজ ও আচরণ দ্বারা শিশু বেশি প্রভাবিত হয়। আর সেই গড়ার কাজে দরকার হয় ধৈর্য, সহনশীলতা, বুদ্ধি, আদর, যত্ন ও আন্তরিক ভালোবাসা। এটা একমাত্র মা-বাবার পক্ষেই সম্ভব। সন্তান প্রতিপালনের এসব অপরিহার্য গুণ মা-বাবার হৃদয়ে সুভাবগতভাবেই মহান আল্লাহ তৈরি করে দেন।<sup>[১]</sup>

শিক্ষার্থী গড়ার কাজে মাদরাসা ও ঘরের ভূমিকা কেমন হবে, তা অতি সংক্ষেপে বলেছেন যারনুজি: ‘শিক্ষাগ্রহণ সফল করতে একসঙ্গে তিন ব্যক্তির প্রচেষ্টা জরুরি—শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও পিতা।’<sup>[২]</sup>

### শিক্ষক ও প্রশাসনের মাঝে সম্পর্ক

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি সরল ও বিশুদ্ধ দীন দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি স্বজাতির লোকদের আহ্বান করতেন সেই সত্য দ্বীনের প্রতি। যারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিত, তাদের তিনি এ দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো শিক্ষা দিতেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন একাধারে ধর্মগুরু এবং রাজনৈতিক নেতা। এ দুটো বিষয়কে তিনি সুনিপুণভাবে ও বিচক্ষণতার সাথে কাজে লাগান। তাঁর ইত্তেকালের পর পালাত্রমে খুলাফায়ে রাশিদীন তাঁর স্থলবর্তী হন। খলিফাগণ এ বিশাল দায়িত্বকে সঠিকভাবে আদায় করতে সক্ষম হন। একদিকে তাঁরা যেমন রাষ্ট্রীয় বিষয় পরিচালনা করতেন, সেনাবাহিনী পাঠাতেন; একইসাথে মানুষের মাঝে ধর্মীয় বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করতেন। মানুষকে দ্বীনি শিক্ষা দিতেন।

ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হতে থাকে ইসলামি সাম্রাজ্য। এ দ্বীন দেশ হতে দেশান্তরে, এক রাজ্য থেকে অপর রাজ্যে বিস্তৃত হতে থাকে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিয়ে এসব রাজ্যের মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আসতে থাকে। ফলে দূর দূরান্তের এসব দেশে গিয়ে মানুষকে ইসলামের শিক্ষা দেওয়া বা কুরআনের কথা শোনানো কঠিন হয়ে পড়ে আল্লাহর রাসূল বা তাঁর খলিফার ওপর। মূলত তাঁরা ছিলেন রাজধানীতে। ফলে শিক্ষাদানের এ দায়িত্ব আলিমদের কাঁধে স্থানান্তরিত হয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ প্রথা চালু করেন। মক্কা বিজয়ের পর

[১] কিতাবুল ইবশাদ ওয়াত তা'লীম ৫৪২-৫৪৩।

[২] তা'লীমুল নুতান্না পৃ ১৫।

নওমুসলিমদের দ্বীন শেখানোর জন্য তিনি মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সেখানে রেখে আসেন। এরপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জমানায় যখন বিভিন্ন দেশ বিজয় হতে থাকে, তখন তিনি অনেক বিজ্ঞ সাহাবিকে তালিমের দায়িত্ব দিয়ে নানান দেশে পাঠান। যেমন: আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইরাকের কুফায়, আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বসরায় পাঠানো হয়। এরপর ইসলামি সেনাদলের সঙ্গে যোগদান করেন একদল ফকিহ। সেনাদল যেদিকে যেত, তাঁরাও সঙ্গে সঙ্গে যেতেন। প্রফেসর গিবের ভাষায়: মুসলিম সেনাদল কেবল যুদ্ধবাজ বাহিনী নয়; একইসাথে সেটি হয়ে ওঠে দ্বীনের প্রতি মানুষকে আহ্বানের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।<sup>[১]</sup>

পরবর্তী সময়ে যখন উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন খলিফাগণ কেবল রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। মানুষের সমস্যাগুলো ধর্মীয় আঙ্গিকে সমাধান করা বা মানুষকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে তাদের খুব বেশি আগ্রহ বা পারদর্শিতা ছিল না। ফলে দ্বীন শেখানোর এ গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে আলিমদের কাঁধে। এমনকি খোদ রাজধানীতেও তখন আলিমগণই পাঠদান ও ধর্মীয় নির্দেশনা প্রদানের কাজ করতেন। তবে এসব শিক্ষক সরকারিভাবে নিযুক্ত ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের নবিজির অনুসরণ করে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার লাভের আশায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষকে দ্বীন শেখাতেন। তাঁদের অনেকে নিজ উদ্যোগে এখানে-ওখানে, দেশে-বিদেশে মানুষের মাঝে জ্ঞান বিতরণ করতেন। তাঁরা মসজিদকে পাঠদানকেন্দ্র হিসেবে নির্বাচন করেন। সেখানে তাঁদের চারপাশে শিক্ষার্থীরা ভিড় করত। তাঁদের থেকে জ্ঞান আহরণ করত। তাঁদের বিদ্যা থেকে উপকৃত হতো।

সে সময় মসজিদ ছিল সকল শিক্ষকের জন্য উন্মুক্ত। শিক্ষাদানে আগ্রহী যে-কেউ মসজিদে জায়গা নির্ধারণ করে পাঠচক্র চালিয়ে যেতে পারতেন। স্বাভাবিকভাবেই সে সময় একজন শিক্ষক কেবল একটি বিষয়েই পাঠদান করতেন না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যা কিছু কল্যাণকর মনে করতেন, তা-ই মানুষকে শোনাতে। মানুষকে শিক্ষা দিতেন। সাধ্যমতো সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলো সমাধান করতেন। কারও উৎসাহের অপেক্ষা না করে আলিমগণ স্বেচ্ছায় মসজিদে গিয়ে এ কাজ আঞ্জাম দিতেন। মানুষও দলে দলে মসজিদে এসে তাঁদের জ্ঞান থেকে উপকৃত হতো। প্রশাসন বা সরকার তাঁদের কাজে বাধা দিত না। যেহেতু শিক্ষক সরকারিভাবে নিযুক্ত নন, প্রশাসন থেকে তাঁরা কোনো ভাতাও গ্রহণ করছেন না—তাই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ তাদের ক্ষমতা বা

[১] Muhammadanism P.P. ৪-৫।



আগ্রহের মধ্যে ছিল না। ফলে তাঁরা তাঁদের ইচ্ছামতো বিষয় পড়াতে পারতেন। শিক্ষায় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ তখনি শুরু হয়, যখন নির্দিষ্ট কোনো বিষয় পড়ানোর জন্য সরকারিভাবে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এবং সরকারি অর্থায়নে কোনো প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাতে বেতনভুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এভাবেই সূচনা হয় শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ।

সর্বপ্রথম ঘটনা বর্ণনা করাকে সরকারি পাঠ্যক্রম হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।<sup>[১]</sup> এ ব্যাপারে মাকরিযি বলেন: একবার আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাজের ইমামতি করে তাতে কুনুত পড়লেন। তাঁর বিপক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত গোষ্ঠীর ওপর বদদুআ করলেন। মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কথা শুনে পেয়ে একজন গল্পকথক নিযুক্ত করলেন। তার দায়িত্ব ছিল—ফজরের পর এবং মাগরিব-ইশার মাঝামাঝি সময়ে মানুষকে নিয়ে মসজিদে বসে নানা ঘটনা বর্ণনা করা। মুআবিয়া ও শামবাসীর জন্য দুআ করা। এর দ্বারা মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্য ছিল—যারা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিরাপত্তায় অবহেলা করেছে, যারা হামলা করে তাঁকে হত্যা করেছে, যারা তাঁর হত্যাকারীদের গ্রেফতার করতে উদ্যোগ নেয়নি, তাঁর খুনের বদলা নিতে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি, তাদের বিরুদ্ধে সিরিয়াবাসীদের অনুভূতিকে প্রভাবিত করা এবং আবেগকে নাড়া দেওয়া।

মিশরে ঘটনা বর্ণনার ইতিহাস শুরু হয় ৩৮ হিজরিতে। আমরা ইবনুল আস মসজিদে। যাদেরকে সেখানে কথক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় তাদের মাঝে তাওবা হাদরামী, আবু ইসমাইল ইবনু নুআইম এবং আবু রজব ইবনু আসিমও ছিলেন। এ কাজের বিনিময়ে আবু রজবের মাসিক বেতন ছিল দশ দিনার।<sup>[২]</sup>

এই হলো শিক্ষা ও পাঠদান বিষয়ে সরকারি হস্তক্ষেপের সূচনাপর্ব। ধীরে ধীরে তা আরও ব্যাপক হয়। এরপর যখন সরকারি উদ্যোগে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে, তখন সেটা আরও বিস্তৃত আকার ধারণ করে।

» আব্বাসীয় শাসকগণ বাগদাদের বায়তুল হিকমা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তারা অনুবাদ, অনুলিপি ও জ্ঞানের সঠিক বিকাশ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে একদল বিজ্ঞ আলিমকে নিয়োগ দেন। তাদের জন্য বরাদ্দ করেন উন্নত বেতন ও সম্মানী। এর ফলে বায়তুল হিকমা গ্রন্থাগারের সকল কার্যক্রমে খলিফাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে কর্মরতদের

[১] আল-খুতাত ২: ২৫৩।

[২] মাকরিযি: আল-খুতাত ২: ২৫৩-২৫৪।

ইচ্ছমতো নির্দেশনা প্রদানের সুযোগ তৈরি হয়।

» কায়রোতে ফাতিমি রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোতে সরকারি হস্তক্ষেপ বেশ স্পষ্ট ছিল। কারণ সেখানে নির্দিষ্ট একটি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও (শিয়া) মতাদর্শকে সিলেবাস হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। সরকারি নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং (শিয়া) মতাদর্শ প্রচার-প্রসারের জন্য একদল দক্ষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। হাকিম বি-আমরিলাহর জমানায় 'দাঈদ দুআত' বা 'প্রধান আহ্বায়ক' পদে নিয়োগ দেওয়ার নথি আমরা উল্লেখ করব। ফাতিমি শাসকগণ এ পদে নিযুক্তদের কী কী দায়িত্ব প্রদান করতেন, কিভাবে তারা সেই দায়িত্ব পালন করতেন, সেই নথি থেকেই তা পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

» ইসলামি বিশ্বে অসংখ্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন বিখ্যাত উজির নিজামুল মুলক। এরপর সেগুলো নিজের নামে নামকরণ করেন। উচ্চবেতনে সেগুলোতে দক্ষ শিক্ষক ও আলিম নিয়োগ দেন। বুওয়াইহি রাজবংশের আমলে শিয়া মতাদর্শের বিষবাস্প ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এটা প্রতিরোধ করতে এবং আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শের অনুকূলে সবকিছু ঢেলে সাজাতে ওই শিক্ষকদের বিশেষ নির্দেশনা দেন তিনি। শুধু তাই নয়, যেসব শিক্ষক শিয়া মতাদর্শ লালন করত বা শিয়াদের সমর্থন করত, তাদের চাকুরি থেকে ছাটাই করার ব্যাপারেও সরকারি হস্তক্ষেপ ছিল।<sup>[১]</sup>

» শামে অধিকার প্রতিষ্ঠার পর নুরুদ্দিন জেনগি এবং মিশরের ক্ষমতা গ্রহণ করার পর বীর সালাহুদ্দিন আইয়ুবীও একই উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁরা উভয়েই প্রচুর মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাতে পাঠ্যক্রম হিসেবে একটি নির্দিষ্ট ফিকহি মাযহাবকে নির্ধারণ করেন। সেগুলোতে দরস প্রদান করতে সেই মাযহাবের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়োগ দেন। এ ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠজন, অনুসারী ও সমকালীন অনেক আলিম এই মহান সম্রাটদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

» খলিফা মুস্তানসির (মৃত্যু ৬৪০ হিজরি) আল-মাদরাসাতুল মুস্তানসিরিয়া প্রতিষ্ঠা করে সেখানে পৃথক চারটি হল তৈরি করেন। তাতে চার মাযহাবের ওপর পৃথক পৃথক দরস হতো। প্রত্যেক হলের জন্য ওই মাযহাবের বিজ্ঞ শাইখ নিযুক্ত করেন। প্রত্যেক শাইখের দরসে পঁচাত্তর জন করে শিক্ষার্থী ছিল। সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জন্য বরাদ্দ ছিল মাসিক বেতন ভাতা।<sup>[২]</sup>

[১] ইয়াকুত: মু'জামুল উদাবা ৫: ৪১৫।

[২] ইবনুল আবদী পৃ ৪২৫, Khuda Bukhsh: Islamic Civilization P. ২৮৭।



সৌভাগ্যক্রমে এ ব্যাপারে আমরা অনেক দলিল-দস্তাবেজ পেয়েছি। যেমন: শিক্ষক নিয়োগের কিছু রেজুলেশন ও রেকর্ড। সেসব নথিতে আছে—শিক্ষকদের দায়িত্ব শাসকগণ নির্ধারণ করে দিতেন। নিচে এ রকম দুটি নথি আমরা পেশ করছি:

**প্রথম নথি:** এই (প্রজ্ঞাপন) ফাতিমি শাসকের পক্ষ থেকে লেখা। সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা দেখাশোনা করতে এবং রাষ্ট্রের সকল ফকিহ ও শিক্ষকদের সার্বক্ষণিক নির্দেশনা প্রদান করতে ‘প্রধান আহ্বায়ক’ পদে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রজ্ঞাপনের সারমর্ম নিম্নরূপ:

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি ইসলাম ধর্মকে মনোনীত করে তাকে বিজয়ী ও মহান করেছেন। ঈমানকে খাঁটি করে তাকে সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছেন। আমিরুল মুমিনিন সেই মহান আল্লাহর স্তুতি বন্দনা করেছেন, যিনি তাঁকে পৃথিবীতে দ্বীয় প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করেছেন। প্রতিপালকের বিশেষ জ্ঞান দিয়ে তাঁকে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর সরল পথের দিশারি বানিয়েছেন। তাঁর রহমতের পথে তাঁকে আহ্বায়করূপে পাঠিয়েছেন। আমিরুল মুমিনিন মহান আল্লাহর কাছে তাঁর প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর রহমত প্রার্থনা করেছেন। যাঁকে তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে দয়া হিসেবে প্রেরণ করেছেন। সেই নবি এসে ধর্মের মূলনীতিগুলো সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। মুসলমানদের সামনে ধর্মের বাহ্যিক বিষয়গুলো পরিষ্কার করেছেন। আর আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো তাঁর বিশিষ্ট প্রতিনিধি আমিরুল মুমিনিন আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গোপন রেখেছেন। তাঁদের উভয়ের ওপর এবং তাঁদের সন্তানদের মধ্যে যারা ইমাম, তাঁদের ওপর মহান আল্লাহ রহমত নাযিল করেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন সকল মতাদর্শের প্রদীপ। ঈমানের প্রতীক।

এবং পৃথিবীতে দয়াময় আল্লাহর প্রতিনিধি।

মহান আল্লাহ আমিরুল মুমিনিনকে জ্ঞানের মহিমা দান করেছেন। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের পদে তাঁকে আসীন করেছেন। ধর্মের সীমারেখা ঠিক রাখার দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত করেছেন। মুমিনদের মধ্যে যারা আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ করে রাখে, তাদের সহযোগিতার দায়িত্ব তাঁকে প্রদান করেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সেই ক্ষমতার বলে তিনি তাঁর বন্ধুদের মাঝে একটি উদাত্ত আহ্বান প্রতিষ্ঠার এবং বিশিষ্ট লোকদের মাঝে তাঁর ছায়া দীর্ঘ করার ঘোষণা দিচ্ছেন। তবে এখনো

তাঁর দৃষ্টি সেই ঝুলন্ত বিষয় (তাকদিরের) দিকে নিবদ্ধ আছে। আর তাই আমিরুল মুমিনিন আপনাকে যে পদে আসীন করেছেন, তা মজবুতভাবে ধারণ করুন। যারা আপনার ডাকে সাড়া দেবে, আপনার প্রতি আগ্রহ লালন করবে, তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করুন। প্রভাবশালী অনুগতদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হোন। যারা গোপনীয়তা সংরক্ষণ করে, কেবল তাদের কাছেই গোপনীয়তা বর্ণনা করুন। যে জমিতে বীজ রোপন করলে উপযুক্ত ফসল পাওয়া যায় না, সেখানে অযথা সময় নষ্ট করতে যাবেন না। উপযুক্ত জায়গায় চাষাবাদ করুন। এই উজ্জ্বল খিলাফতের প্রাসাদগুলোতে অনুষ্ঠেয় জ্ঞানের মজলিসে যোগদান করুন। পাশাপাশি কায়রোর আল-মার্বিয়াস্ত জামে মসজিদে সময় দিন। তাদের সামনে আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করুন। তাদেরকে পথনির্দেশনা দিন। দুর্বল ও সাধারণ লোকেরা যেসব কথা নিতে পারবে না, সেগুলো তাদের সামনে উন্মোচন করা থেকে বিরত থাকুন। এসব দুর্বোধ্য কথা বলে তাদের বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট করবেন না। মুমিনগণ আপনার কাছে যাকাত, জিযিয়া, সম্পদের এক পঞ্চমাংশ ও অন্যান্য অর্থ নিয়ে এলে সেগুলো সযত্নে আমিরুল মুমিনিনের কাছে নিয়ে আসুন। এভাবে একদিকে যাকাত উত্তোলকারীদের কাজ সহজ হবে। অপরদিকে আল্লাহর কাছেও তারা দায়মুক্ত থাকবে। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জগতের বড় বড় শাইখ ও বিশুদ্ধ ব্যক্তিদের থেকে দাওয়াতের পাথেয় সংগ্রহ করুন।<sup>[১]</sup>

**দ্বিতীয় নথি:** দ্বিতীয় যে প্রজ্ঞাপনটি আমি উল্লেখ করব, তা মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া নিশাপুরীর উদ্দেশে জারি করেন সেলজুক রাজবংশের মহান সুলতান সানজার। প্রজ্ঞাপনে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়াকে নিশাপুরের নিজামিয়া মাদরাসার শিক্ষাসচিব হিসেবে নিয়োগ দেন। এ প্রজ্ঞাপনের দীর্ঘ ভূমিকায় সুলতান সানজার বিখ্যাত উজির নিজামুল মুলকের কৃতিত্ব, তাঁর ইলমী অবদান, জ্ঞান ও শিক্ষার্থীদের জন্য তাঁর বিশাল অনুগ্রহের কথা তুলে ধরেন। এরপর তিনি নিজামিয়া মাদরাসার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেই মাদরাসায় নিযুক্ত শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপরিসীম ত্যাগের বিবরণ তুলে ধরেন। এরপর তিনি বলেন, ... মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়াকে দীর্ঘজীবী করুন। যেহেতু জ্ঞান ও পারদর্শিতার দ্বারা আমাদের যুগের শোভা বৃদ্ধি পেয়েছে, আর তিনি শাফিয়ি ও হানাফি মাযহাবের অন্যতম কান্ডারি, সকলের প্রশংসার পাত্র,

[১] আল কালকাশান্দি: সুবহুল আ'শা ১০: ৪৩৪-৪৩৯।



তাই আমরা তাঁর কাছে শিক্ষাসচিবের পদ অর্পণ করলাম। এটি যুগের সেরা বিদ্যাপিঠ ও শিক্ষার্থীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু নিশাপুরের নিজামিয়া মাদরাসার সবচেয়ে উঁচু পদ। উক্ত মাদরাসা, মাদরাসার ওয়াকফকৃত সম্পত্তি-সহ সকল কিছু আজ থেকে তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী চলবে। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারা সিক্ত হবে।<sup>[১]</sup>

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করা উচিত যে, কেবল সেন্সর শিক্ষকই সরকারি হস্তক্ষেপের আওতাভুক্ত ছিলেন—যারা শাসকদের দ্বারা নিযুক্ত, প্রশাসন যাদের দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছে, অথবা সরকারিভাবে যারা বেতন পেতেন। একই সময়ে হাজার হাজার শিক্ষক এমন ছিলেন, যারা মসজিদে বসে পাঠদান চালিয়ে গেছেন। তাঁরা সরকারি হস্তক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের মাঝে জ্ঞান বিতরণ করেছেন। জনসাধারণ তাদের জ্ঞানের আলো থেকে বিপুলভাবে উপকৃত হয়েছে।

## শিক্ষকদের সামাজিক স্তর

শিক্ষকদের সামাজিক স্তরের আলোচনায় বিখ্যাত মনীষী জাহিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ উৎস মনে করা হয়। তাঁর থেকে একটি প্রবাদ বর্ণিত আছে: ‘লোকটি শিশুদের শিক্ষক থেকেও বেশি বোকা।’ তা ছাড়া তিনি জনৈক জ্ঞানীর একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন: ‘শিক্ষক, রাখাল এবং নারীসঙ্গ-প্রিয় লোকদের কাছে পরামর্শ চেয়ো না।’ তা ছাড়া তিনি জনৈক জ্ঞানীকে বলতে শুনেছেন: ‘তাঁতী, শিক্ষক ও বুনাঁকাজে অভ্যস্ত লোকদের মাঝেই যত নির্বুদ্ধিতা।’<sup>[২]</sup>

এখানে প্রথমোক্ত প্রবাদটি কেবল পাঠশালার শিক্ষক আর শেষ দুটি প্রবাদ সাধারণভাবে সকল শ্রেণীর ওপর প্রযোজ্য। এ প্রবাদের কারণেই অনেক শিক্ষক ভেবে বসেছেন যে, জাহিয় শিক্ষক শ্রেণিকে অপদস্থ করেছেন। সমাজের একেবারে নিচু সারিতে তাঁদের দাঁড় করিয়েছেন। অপরদিকে এই জাহিয়ই তাঁর অন্য দুটি গ্রন্থ রিসালাতুল মুআল্লিমীন<sup>[৩]</sup> এবং আল-বায়ান ওয়াত তিবায়ান-এ শিক্ষকদের সম্পর্কে নিজের মূল্যায়ন বিস্তারিত রূপে তুলে ধরেছেন। তাঁর আলোচনার সারমর্ম আমি নিচে উল্লেখ করছি:

‘ব্যাকরণবিদ, ছন্দশাস্ত্রবিদ, গণিতবিদ, উত্তরাধিকার বণ্টন আইনবিদ,

[১] ইয়াদজার: পারসিয়ান সাময়িকী: জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সংখ্যা ১৯৪৫ পৃ ৪১-৪৩।

[২] আল বায়ান ওয়াত তিবায়ান ১: ১৪০।

[৩] হস্তলিখিত গ্রন্থটির কিছু অংশ ব্রিটিশ জাদুঘরে আর কিছু ইরাকের মুসেলে সংরক্ষিত আছে।

লিপিকার ইত্যাদি শ্রেণীর জ্ঞানী ও মনীষীর সংখ্যা জরিপ করলে দেখতে পাই, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন মক্তবের শিক্ষক ও বড়দের উপদেষ্টা। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, আমি তাঁদের মধ্যে কত প্রচুর পরিমাণে বর্ণনাকারী ও বিচারক পেয়েছি! কত বিদ্বান ও প্রশাসক পেয়েছি! কত প্রভাবশালী ও নিরাপত্তাবিধানকারী পেয়েছি! কত নেতা ও সেনাপতি পেয়েছি! কত প্রধান ও কর্তা ব্যক্তি পেয়েছি! কত বিখ্যাত লেখক ও কবি পেয়েছি! কত উর্জির ও সাহিত্যিক পেয়েছি! কত লেখক ও অনলবধী বক্তা পেয়েছি! কত জানবাজ মুজাহিদ পেয়েছি! [১] ... তাই ছোট ছোট ব্যক্তিদের ভুলের কারণে বড়দের খাটো করবেন না। কিছু দুষ্ট লোকের অবহেলার কারণে মুজতাহিগণকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন না। [২]

আল-বায়ান ওয়াত তিবয়ান গ্রন্থে জাহিয় আরও বলেন, আমার কাছে শিক্ষকগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক, যারা জনসাধারণের সন্তানদের শিক্ষকতা করতে করতে একসময় বিশেষ ও শাসকশ্রেণির সন্তানদের শিক্ষকতা করে ধন্য হয়েছেন। এরপর রাজা বাদশাহদের সন্তানদের শিক্ষকতা করতে করতে একসময় নিজেদের নামটি প্রস্তাবিত খলিফাদের তালিকায় উঠিয়েছেন। তাহলে কী করে কিসাই, কুতরুব ও তাঁদের অনুসারীদের মতো লোকদের বোকা ও নির্বোধ বলা যায়! এমন কটুক্তি তাঁদের পর্যায়ে লোকদের ক্ষেত্রে এমনকি তাঁদের নিচু স্তরের লোকদের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই মানায় না। [৩]

ওইসব প্রবাদের মাধ্যমে তারা যদি গাঁয়ের সাধারণ পাঠশালার শিক্ষকদের উদ্দেশ্য করে থাকেন, তাহলে মনে রাখতে হবে—প্রত্যেক জাতির মাঝেই কিছু প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থাকে। কিছু নিম্নশ্রেণির লোক থাকে। তারাও সেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সারিতে পাড়বে। তাহলে কী করে আপনি সকল শিশুশিক্ষকের ব্যাপারে ঢালাওভাবে এ মন্তব্য করতে পারেন! অথচ তাঁদের মাঝে আছেন কুমাইত বিন যাইদ, আবদুল হামিদ কাতিব, কাইস ইবনু সাদ, হুসাইন মুআল্লিম ও আবু সাইদ মুআল্লিমের মতো শ্রেষ্ঠ ফকিহ, সেরা কবি, সুবক্তা...। জ্ঞানের সকল শাখায় পারদর্শী, শ্রেষ্ঠ বর্ণনাকারী গুনলে আমাদের বসরা নগরীতে আবুল উজির ও আবু আদনান ছাড়া আর কেউ ছিল না। তাঁরা দুজনই ছিলেন শিক্ষক। [৪]

শিক্ষকদের ব্যাপারে এই হলো জাহিযের মতামত। যারা বলেন, জাহিয়

[১] রিসালাতুল মুআল্লিমীন, পাতা নম্বর ১০ আলিফ ও বা।

[২] প্রাগুক্ত ৪ বা।

[৩] খণ্ড ১: ১৪০-১৪১।

[৪] আল বায়ান ওয়াত তিবয়ান ১: ১৪০-১৪১।



শিক্ষকদের মর্যাদা কলুষিত করেছেন, তাদের গায়ে কালেমা লেপন করেছেন—ওপরের বর্ণনায় তিনি এ ধারণাকে নাকচ করে দিয়েছেন। তা ছাড়া এসব প্রবাদ উল্লেখ করে জাহিয় মানুষকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, শিক্ষকগণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। কেবল এক শ্রেণীর মাঝে সীমাবদ্ধ নন। সেই শ্রেণীবৈষম্য স্পষ্ট করার কারণেই জাহিয়কে তিরের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে আমরা জাহিয়ার সঙ্গে একমত হব। তবে কিছুটা মতপার্থক্য থাকবেই। জাহিয় শিক্ষকদেরকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। আর আমরা তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করব। সেটি তাঁদের সামাজিক স্তরের দিক থেকে হোক বা আর্থিক দৃষ্টি বিবেচনায় হোক। শ্রেণী তিনটি হলো:

- ১) মুআল্লিম বা মক্তবের শিক্ষক
- ২) মুআদ্বিব বা শাহজাদাদের শিক্ষক
- ৩) মসজিদ ও মাদরাসার শিক্ষক।

এ তিন শ্রেণীর প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্য শ্রেণী থেকে আলাদা হয়ে আছে। নিচের বিবরণ থেকে তা সুস্পষ্ট হয়:

### ✽ ১. মুআল্লিম বা মক্তবের শিক্ষক

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে এ শ্রেণীর মাঝে কিছু লোক ছিলেন যারা এ পেশাকে একটি মানহীন ও দায়সারা কাজ হিসেবে গ্রহণ করেন। তারা এমন সব উদ্ভট আচরণ করতেন, যার ফলে তাদেরকে সম্মান তো করা হতোই না, উল্টো নিজেরাই লজ্জায় পড়তেন। সমাজে তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতো। ঢালাওভাবে সকল শিক্ষকের মর্যাদা নষ্ট করার পেছনে এরাই দায়ী। এদের কারণেই যত দুর্নাম হয়েছে মহান শিক্ষকদের। কী ছিল তাদের আচরণ? কোন কোন ঘটনার কারণে তাদের মানহানি ঘটেছে? নিচে এমন কিছু ঘটনা তুলে ধরা হলো।

প্রথম ঘটনা: জনৈক শিক্ষকের কাছে এক শিশু কুরআন পাঠ করছিল। এরপর,

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ

| এবং তোর ওপর অভিশাপ.. [১]

[১] সূরা আল হিজর ১৫: ৩৫।

এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে শিশুটি শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে বারবার তা পাঠ করছিল। হঠাৎ শিক্ষক মৃদু হয়ে বলল, তোর ওপর অভিশাপ, তোর মা-বাবার ওপর অভিশাপ! তখন শিশুটি বলল, আমার স্নেহে তো 'তোর মা-বাবার ওপর অভিশাপ' কথাটি লেখা নেই। আপনি কি চান বাক্যটি আমি এভাবে পড়ব:

وإن عليك اللعنة وعلى والديك

তোর ওপর অভিশাপ, তোর মা-বাবার ওপর অভিশাপ! [১]

দ্বিতীয় ঘটনা: আব্বাহ তাআলা বলেছেন,

غُلِبَتِ الرُّومُ (۱) فِى أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (۲)

রোমানরা পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী এলাকায়; কিন্তু তারা তাদের পরাজয়ের পর শীঘ্রই জয়লাভ করবে। [২]

একবার ক্ষুদ্রে পাঠশালার জনৈক শিক্ষক ওপরের আয়াতে الروم (রোমক জাতি)-এর স্থলে الترك (তুর্কি জাতি) পড়ে ফেলল। একজন শ্রোতা তাকে ভুল ধরিয়ে দিতে চাইলে সে বলল, কোনো সমস্যা নেই! তুর্কি আর রোমান উভয় জাতিই আমাদের শত্রু! [৩]

তৃতীয় ঘটনা: এক শিক্ষক তার শিশু ছাত্রকে নিচের আয়াতটি এভাবে পড়াচ্ছিলেন,

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُقَصِّصْ رُؤْيَاكَ  
عَلَىٰ خَوَاتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ وَكَيْدٌ كَيْدًا فَمَهْلٍ الْكَافِرِينَ  
أَمَهُلُهُمْ رُؤْيَا

উক্ত বাক্যে তিন সূরার পৃথক তিনটি আয়াতকে তিনি গুলিয়ে ফেলেন। [৪]

[১] আসফাহানী: মুহাযারাতুল উদাবা ১: ৩০।

[২] সূরা রুম: ৩০: ২।

[৩] আল আবশিহি: আল মুস্তাতরাফ ২: ২১৫।

[৪] সূরা লুকমান ৩১: ১৬, সূরা ইউসুফ ১২: ৫, সূরা আত তারিক ৮৭: ১৬-১৭

يُنَبِّئُهَا أَنَّ تِلْكَ مِتْلَفٌ خَبَّةٍ مِّنْ خَوْذَلٍ فَتَكُنْ فِيْ خُزْرٍ أَوْ فِي السَّنُوتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ  
خَبِيرٌ



তা শুনে পাশের এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, এভাবে পড়াচ্ছেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, এই ছাত্রের বাবা এক মাসের বেতন অন্য মাসের মধ্যে গুলিয়ে ফেলে। তাই তাকে পড়ানোর ক্ষেত্রেও এক সূরার ভেতর অপর সূরা গুলিয়ে পড়াচ্ছি। তাকে পড়িয়ে আমার কোনো লাভ হচ্ছে না। তাই আমার কাছে পড়ে সেও যেন কিছু শিখতে না পারে, সে জন্যই এ কৌশল।<sup>[১]</sup>

**চতুর্থ ঘটনা :** একবার কোনো এক মক্তবে ছাত্ররা অনেক দাবি ও অনুরোধ করেও শিক্ষকের কাছ থেকে নির্দিষ্ট এক দিনের ছুটি আদায় করতে পারল না। এরপর সবাই শিক্ষককে অসুস্থ প্রতিপন্ন করতে একমত হলো। এরপর ওই শিক্ষক পাঠশালায় উপস্থিত হলে সবাই বলতে লাগল, আজ আপনাকে বড় ক্লান্ত লাগছে। খুবই অসুস্থ মনে হচ্ছে। আপনার একটু বিশ্রাম দরকার। সবার কথা শুনে শিক্ষক ফাঁদে পড়ে গেলেন। নিরুপায় হয়ে তিনি ঘুমানোর জন্য চলে গেলেন। এই সুযোগে ছাত্ররা ছুটি বাগিয়ে নিল।<sup>[২]</sup>

**পঞ্চম ঘটনা :** সিসিলির শিক্ষকদের ব্যাপারে লম্বা আলোচনা করেছেন ইবনু হাওকাল।<sup>[৩]</sup> বিশেষ করে পালের্মো শহরে কর্তব্যরত মাত্রাতিরিক্ত শিক্ষকের ব্যাপারে তিনি প্রশ্ন তোলেন। সেখানে হঠাৎ করে কেন শিক্ষকদের সংখ্যা বেড়ে গেল? মূলত তারা জিহাদ থেকে পালানোর জন্যই শিক্ষকতার পেশা বেছে নিয়েছিল। শিক্ষকরা যুদ্ধে গমনের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত—মুসলিম শাসকের পক্ষ থেকে এমন প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল। ফলে রণাঙ্গন থেকে বাঁচতে তারা শিক্ষকতার পদ বেছে নেয়। জিহাদের মতো সুমহান মর্যাদা ও আভিজাত্য থেকে তারা পালাতে চেষ্টা করে। তাদের মূর্থতার কারণে। আর তাই শুধু পালের্মো শহরেই তিন শ শিক্ষকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তাদের অধিকাংশই ছিল মানসিক বিকারগ্রস্ত, গণ্ডমূর্থ ও প্রতারক। এরচেয়েও বড় বিপদ ছিল, গোটা সিসিলিবাসী তাদেরকে প্রাজ্ঞ ফকিহ, জ্ঞানী, ন্যায়বান ও যোগ্য মুফতি মনে করত। অথচ এসব শিক্ষকের মাঝে কেউ ছিল বোকা, কেউ ছিল নির্বোধ, আবার কেউ হাবাগোবা প্রকৃতির। মূর্থতা ও নির্বুদ্ধিতার পাশাপাশি তাদের সচ্চরিত্র বলতে কিছুই ছিল না। সবচেয়ে বাজে যে দৃশ্যটি ইবনু হাওকাল প্রত্যক্ষ করেছেন, তা হলো—একটি ক্ষুদ্রে পাঠশালায় পাঁচ-

قَالَ يَبْنِي لَا تَقْضُ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۖ

[১] আসফাহানী: মুহাযারাতুল উদাবা ১: ৩০।

[২] ইবনুল জাওযী: আখবারুল হামকা ওয়াল মুগাফফালীন পৃ ১০৯।

[৩] কিতাবু সুরাতিল আরদি ১২৬-১৩০।

পাঁচজন শিক্ষক দায়িত্ব পালন করছে। পরস্পর পাল্লা দিয়ে পড়াচ্ছে। তাদের প্রধান হলো এমন এক লোক, যাকে সবাই মিলতাত নামে চেনে। সে ছিল মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে উস্তাদ।

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার কাজে অভিজ্ঞ মিলতাতের আলোচনায় একটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। তা হলো, ক্ষুদ্রে পাঠশালার শিক্ষকদের কেউ মামলার সাক্ষী হয়ে এলে বিচারক দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। এর দুটি কারণ :

» এক. এই শিক্ষক কুরআন পড়িয়ে ছাত্রদের থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন। এখানেই যত বিপত্তি। এখানেই তার নিষ্ঠতা প্রশ্নবিদ্ধ। দিনুরি লেখেন : নামকরা বিচারক সুওয়ারের কাছে একবার এক লোক সাক্ষ্য দিতে এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার পেশা কী? উত্তরে তিনি বললেন, শিক্ষক। বিচারক বললেন, আমরা আপনার সাক্ষ্য গ্রহণ করব না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন? উত্তর এল, কারণ আপনি কুরআন পড়িয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন। তখন শিক্ষক বললেন, আপনিও তো মুসলমানদের বিচারকার্য সম্পাদন করে পারিশ্রমিক নেন! তখন বিচারক বললেন, আমি নিজ থেকে বিচারক হইনি। বিচারক হতে আমাকে বাধ্য করা হয়েছে। তখন শিক্ষক বললেন : তাই নাকি! মানলাম বিচারকের পদে বসতে আপনাকে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু পারিশ্রমিক নেওয়ার সময়ও কি আপনাকে বাধ্য করা হয়? তখন বিচারক বললেন, ঠিক আছে, আপনি আপনার সাক্ষ্য পেশ করুন। এরপর বিচারক তার সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন।<sup>[১]</sup>

» দুই. কুরআনের ধারক-বাহকদের ওপর সবাই আস্থা রাখে, সবাই তাদের কাছ থেকে সত্য সাক্ষ্য আশা করে। কোনো কোনো শিক্ষক এটাকে সুযোগ মনে করে সাক্ষ্যদানকে নিজেদের পেশা বানিয়ে নেন। সাক্ষ্যকে অর্থ উপার্জনের অন্যতম হাতিয়ার বানিয়ে ফেলেন। তাই এ রকম লোকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা থেকে বিচারকদের সাবধান করেছেন ইবনু আবদুন। বিশেষ করে যেসব শিক্ষক বেশি বেশি সাক্ষ্য দিতে আসে, তাদের ব্যাপারে। তা ছাড়া এ রকম ব্যক্তিদের ব্যাপারে সমাজের মানুষের কী মূল্যায়ন, সবাই তাকে ভালো জানে কি না—এ ব্যাপারটিও যাচাই করে তবেই সাক্ষ্য গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।<sup>[২]</sup>

কোনো সন্দেহ নেই, ক্ষুদ্রে পাঠশালার কিছু কিছু দায়িত্বশীল অনেক নিচু স্তরে নেমে গিয়েছিলেন। তবে এ ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের

[১] উয়ুনুল আপবার ১: ৬৯।

[২] রিসালাতু ইবনি আবদুন: The Journal Asiatique, ১৯৩৪, সংখ্যা ২২৪, পৃ ২১৫-২১৬।



অনেক ঘটনায় অত্যাচার করেছে। যতটুকু না ঘটেছে, তার চেয়ে বাড়িয়ে বলা হয়েছে। বেশকিছু ঘটনা একেবারেই বানোয়াট। কৃত্রিমতা সুস্পষ্ট। তবে ধারণা করা হয়, ঘটনা বর্ণনাকারীগণ নির্দিষ্ট কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করে গল্প তৈরি করে থাকে। কারণ, ক্ষুদ্রে পাঠশালার কিছু কিছু শিক্ষক এটাকে প্রধান পেশা হিসেবে নির্ধারণ করে নেয়। তারা কুরআন কারীম মুখস্থ করেছে এটাই তাদের একমাত্র যোগ্যতা। এর বাইরে তাদের আর কোনো জ্ঞান নেই। যারা কুরআন হিফজ ছাড়া আর কোনো যোগ্যতা অর্জন করেনি, তারা শিক্ষক হওয়ার উপযুক্ত নয় বলে মন্তব্য করেছেন ইবনু আবদুন।<sup>[১]</sup>

এরাই সকল শিক্ষকের সুনাম নষ্ট করেছে। অবস্থা এতটাই নাজুক হয়েছে যে, একসময় শিশুদের শিক্ষক বলে টিটকারি করা হতো। ইয়াকুত বলেন,<sup>[২]</sup> একবার বিখ্যাত লেখক ও মনীষী সাহিব ইবনু আব্বাদ শুনতে পান যে, আবু হাইয়ান তাওহিদি তাঁর রচিত পুস্তকের নিন্দা করে তা অনুলিপি করাতে অনাগ্রহ দেখিয়েছেন। তখন সাহিব তার প্রতি পাল্টা নিন্দা জানান। তাকে হুমকি দেন। তখন আবু হাইয়ান বলেন, ‘সে আমাকে হুমকি দিচ্ছে... অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আমি কুরআনের ব্যাপারে অপবাদ তুলেছি। অথবা ঋতুভ্রাবের নোংরা কাপড় কাবাঘরের দিকে ছুড়ে মেরেছি। অথবা নবি সালিহ আলাইহিস সালামের উট হত্যা করেছি। অথবা জমজম কূপে মল ত্যাগ করেছি। অথবা বলেছি, চরম অপবাদ নিয়ে সে মৃত্যুবরণ করেছে। অথবা বলেছি, মদ্যশালায় আবু হাশিম মারা গেছে। অথবা বলেছি, সাহিব হলো শিশুদের শিক্ষক।’ লক্ষ করুন, কী পরিমাণ নিচু স্তরের ব্যক্তি হলে শিশুদের শিক্ষককে কুরআনের ব্যাপারে অপবাদ আরোপকারী বা নবি সালিহ আলাইহি সালামের উট হত্যাকারীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে!

এতকিছুর পরও একজন নিরপেক্ষ ও সচেতন গবেষক মাত্রই অপাত্রে তার জ্ঞান ব্যবহার করবে না। কোনো কিছু শুনলে বা পড়লেই তা দ্বারা প্রভাবিত হবে না। বরং ঘটনার চারপাশের সবকিছু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে তবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। আমি মনে করি, কিছু শিক্ষকের সামাজিক স্তর নিচু থাকাটা সঠিক বলে মনে হয়। অন্যদিকে ক্ষুদ্রে পাঠশালার বিপুল সংখ্যক শিক্ষক এমন ছিলেন, যাদেরকে মানুষ অনেক সম্মান করত। তারা বিশাল মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এ স্তরে ছিলেন অনেক আলিম, ফকিহ, লিপিকার ও সাহিত্যিক। এদের অনেকে ভীষণ কষ্ট ও কঠোর সাধনা করে উঁচু পদের অধিকারী হন।

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫।

[২] মু‘জামুল উদাবা ৫: ৩৯৭।

কেউ হন ন্যায়বান বিচারক, কেউ হন ঝানু রাজনীতিবিদ, আবার কেউ দাপুটে সেনাপতি। জাহিযের বক্তব্যে এমন কিছু মনীষীর নাম আমরা জেনে এসেছি।

এ বিষয়ের আলোচনা শেষ করার আগে প্রাচ্যের কিছু ইতিহাসবিদের উক্তি এখানে তুলে ধরতে চাই। গোল্ড যিহার এবং ল্যানেন্স এ বিষয়ে প্রায় একমত। টিটকারির কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তারা লেখেন: ক্ষুদ্রে পাঠশালার শিক্ষকদের অধিকাংশই ছিল ক্রীতদাস শ্রেণী থেকে উঠে আসা। ঠিক যেনন ইসলামের প্রথম যুগে পড়ালেখা শেখানোর দায়িত্বে থাকা শিক্ষকরা ছিল কফির যিম্মী শ্রেণির। আর আরব মুসলিমগণ নিজেদের আরবীয় রক্ত নিয়ে অহংকার করত। তাদের ইসলাম ধর্ম নিয়ে গর্ব করত। অন্যদের তারা তুচ্ছ ভাবত। হতে পারে ক্ষুদ্রে পাঠশালার শিক্ষকদের প্রতি তুচ্ছতার ভাব তাদের সেই যুগ থেকে শুরু হয়েছিল।<sup>[১]</sup>

খলিফা মামুনের উক্তি বর্ণনা করে এ বিষয়ের আলোচনা শেষ করতে চাইছি। কিছু কিছু শিক্ষকের বোকামি ও নির্বুদ্ধিতার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষক তার জ্ঞান দ্বারা আমাদের বিবেককে শানিত করেন। বিনিময়ে আমরা আমাদের মূর্খতার দ্বারা তার বুদ্ধিকে কলুষিত করি। তিনি তার গাভীর দ্বারা আমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে তোলেন। বিনিময়ে অবহেলা করে আমরা তাকে হালকা করে ফেলি। নানা উপকারী বিষয় দিয়ে তিনি আমাদের মস্তিষ্কে সমৃদ্ধ করে তোলেন। বিনিময়ে আমরা আমাদের দুটুমি দিয়ে তার মস্তিষ্কে বিরক্ত করে ফেলি। আমরা তার উত্তম আদবগুলো ধারণ করি আর তিনি আমাদের দুটু আচরণ দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে যান। একপর্যায়ে উপকার লাভ করতে করতে আমরা উন্নত হতে থাকি। আর তিনি সরলতা গ্রহণ করতে করতে ভেসে যান। আমরা তার অর্জিত সুন্দর গুণাবলি ধারণ করে নিজেদের আলোকিত করি। আর বেচারা শিক্ষক জীবনভর আমাদের মাঝে জ্ঞান বিতরণ করতে করতে আমাদের থেকে গ্রহণ করেন মূর্খতার বুড়ি।<sup>[২]</sup>

## ❖ ২. মুআদ্বিব বা শাহজাদাদের শিক্ষক

আসফাহানি উল্লেখ করেন:<sup>[৩]</sup> সপ্তাহে একদিন ছেলেকে সময় দিতে আবদুল্লাহ ইবনুল মুকাফফাকে প্রস্তাব দেন বিখ্যাত শাসক ইসমাইল বিন আলি। তখন আবদুল্লাহ বললেন, আপনি কি আমাকে রাজসভায় প্রতিষ্ঠা করতে চান?

[১] Encyclopaedia of Religions and Ethics V p. ২০২ এবং Mu'awiya p. ৩১১।

[২] ইবনুল জাওযী: আখবারুল হামকা ওয়াল মুগাফফারীন ১০৭-১০৮।

[৩] মুহাম্মাদুল উদাবা ১: ২৯।



সাইদ ইবনু মুসলিম বলেন, একবার আমি কুফায় গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনুল মুকাফফাকে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, এখানে আপনি কী করছেন? আমি বললাম, আমার ওপর ঋণের বোঝা চেপে বসেছে। তা শুনে তিনি বললেন, কারও সঙ্গে দেখা করেছেন কি? আমি বললাম, ইবনু শুবরুমার সঙ্গে দেখা করে তাকে আমার অবস্থার কথা জানিয়েছি। আমি খলিফা আমিনের সঙ্গে কথা বলব। তিনি হয়তো তার সন্তানদের পড়াশোনার জন্য আমাকে নিযুক্ত করবেন। এতে করে বিরাট উপকার হবে। তা শুনে তিনি বললেন, ধিক আপনার! এই শেষ বয়সে আপনাকে তিনি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেবেন? আপনার স্তর কত উঁচুতে। এরপর দ্বিতীয় দিন এসে আমাকে অর্থ প্রদান করলেন। এরপর আমি বসরায় ফিরে এলাম।

আসফাহানির বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, সে যুগে শিশুদের পাঠদান কোনো উন্নত পেশা ছিল না। এতে সবাই আগ্রহ বোধ করত না। এমনকি শাসকদের সন্তানকে পড়ানোর জন্য হলেও। তবে এর দ্বারা কখনো শাসকদের প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদের পড়ানো উদ্দেশ্য নয়। কারণ শৈশব পেরিয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে যাঁরা পড়াত, বা যাঁদের কাছে তারা জ্ঞান শিখতে যেত, তাঁরা হতেন যুগশ্রেষ্ঠ ও সুবিখ্যাত জ্ঞানী। বিদ্যাবুদ্ধি ও আচার আচরণে তাঁরা ছিলেন অনন্য।

ওপরের দুটি ঘটনা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাব, ঘটনা দুটির মাঝে বাস্তবতার চেয়ে কৃত্রিমতার আলামত বেশি। কারণ ব্রুকিলমানের বর্ণনা অনুযায়ী ইবনুল মুকাফফা বাস্তবেই শাসক ইসমাইল বিন আলির সন্তানদের শিক্ষক ছিলেন। ব্রুকিলমানের বর্ণনাই বেশি গ্রহণযোগ্য ও প্রাধান্য পাওয়ার বেশি উপযুক্ত। কারণ শেষোক্ত ঘটনায় আসফাহানি খুব বেশি মুনশিয়ানার পরিচয় দিতে পারেননি। ওই ঘটনায় তিনি বলেছেন, খলিফা আমিনের যখন সন্তান ছিল তখন ইবনুল মুকাফফা জীবিত ছিলেন। অথচ বাস্তবতা হলো ১৪৫ হিজরিতে খলিফা মনসুরের শাসনামলে ইবনুল মুকাফফা নিহত হন। আর খলিফা আমিনের জন্ম হয়েছে ১৭১ হিজরিতে। অপরদিকে এ ঘটনায় উল্লেখিত ‘আমিন’ দ্বারা খলিফা আমিন ছাড়া অন্য কোনো আমিন উদ্দেশ্য, এটাও মেনে নেওয়া যায় না। কারণ তা হলে ওই আমিনের নাম, উপাধি ও বংশধারা বর্ণনা করতে হবে। আর সাধারণভাবে আমিন বললে কেবল খলিফা আমিনকেই বোঝানো হয়ে থাকে।

অপরদিকে আসফাহানির বর্ণনা ছাড়া অন্য সকল মনীষীর বর্ণিত ঘটনা ও বিবরণ থেকে বোঝা যায়, অভিজাত শ্রেণীর সন্তানদের পাঠদানকর্ম ছিল একটি মহান পেশা। সেক্ষেত্রে সন্তান শিশু হোক বা প্রাপ্তবয়স্ক। যারা এ পেশায়



নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হতেন। সমাজে তাঁদের সম্মান ও প্রতিপত্তি বেড়ে যেত। কারণ সুয়ং খলিফা দেখে শুনে নিজ সন্তানদের মানুষ করার জন্য এসব শিক্ষককে মনোনীত করতেন। ইতিপূর্বে জাহিযের বিবরণ থেকে আমরা শিক্ষকের স্তর ও তার পেশার মর্যাদার কথা পড়ে এসেছি। তবে এটাও ঠিক যে, খলিল বিন আহমাদের মতো কিছু মনীষী শাসকদের সন্তানদের শিক্ষক হওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। তবে এ কাজ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হওয়া বা এ পেশাকে ছোট করা তাঁদের উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং তাঁরা পার্থিব নির্মোহ, ধার্মিকতা, সম্পদ ও সুখ্যাতি থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে এ প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। এসব শিক্ষক উন্নতি করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছাতেন যে, একসময় তাঁদেরকে রাজপরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করা হতো। পরিবারের সবাইকে তিনি জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতেন। অনেক সময় রাজপরিবারের দিকে সম্বন্ধ করেই তাঁদের ডাকা হতো। যেমন, আবু মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া ইবনুল মুগিরাকে ইয়াযিদি বলে ডাকা হতো। কারণ তিনি খলিফা মাহদির মামা ইয়াযিদ বিন মানসুরের প্রাসাদে অবস্থান করে তার পুত্রকে পড়াতেন। ফলে তাঁর নামের সঙ্গে ইয়াযিদি উপাধি লেগে যায়।

খলিফা ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গ তাদের সন্তানদের জন্য যোগ্য শিক্ষক নির্বাচনকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নিতেন। ফলে তারা নিজ নিজ যোগ্যতার কারণে সামাজিকভাবে এমন উঁচু স্তরে পৌঁছাতেন, যে স্তরে রয়েছেন কেবল শাসক, উজির, গভর্নর ও অভিজাত শ্রেণি। আলি ইবনুল হাসান আহমার (মৃত্যু ১৯৪ হিজরি) বাস করতেন বাগদাদের এক গ্রামে। ছোট্ট একটি কুটিরে। শাহজাদা আমিনের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে খলিফা হারুনুর রশিদ তাঁর সামাজিক মর্যাদা উন্নত করেন। মুহাম্মাদ ইবনুল জাহম বলেন, আমরা যখন আহমারের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম, প্রাসাদের খাদেমগণ আমাদের নিতে আসত। আমরা অনেকগুলো প্রাসাদের মাঝে একটি প্রাসাদে প্রবেশ করতাম। তখন আহমার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তাঁর গায়ে থাকত রাজপোশাক।<sup>[১]</sup>

নিচে এ রকম কয়েকজন শাহজাদাদের শিক্ষকের তালিকা তুলে ধরলাম, যারা শাসক ও অভিজাত শ্রেণীর সন্তানদের পড়াশোনার দায়িত্বে ছিলেন। এসব নামকে নতুন করে চেনানোর দরকার নেই। কারণ তাঁরা একেকজন ইসলামি ও আরবি সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র। এ তালিকা পাঠ করার পর পাঠক বুঝতে পারবেন, আদবের শিক্ষকগণ কী পরিমাণ ভাবগাম্ভীর্য ও মহত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের অনেকে কী পরিমাণ রাজনৈতিক সফলতা অর্জন করেছিলেন।

[১] ইয়াকুত: মু'জামুল উদাবা ৫: ১১০।



শাহজাদাদের শিক্ষক	ছাত্র (শাহজাদা)	তথ্যসূত্র
আদ দাহহাক ইবনু মুয়াহিম	আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের পুত্রগণ	Brockelam SI, ২৩৫
আমির আশ-শাবী		
মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম যুহরী	হিশাম ইবনু আবদিল মালিকের পুত্র	তায়কিরাতুস সামি ওয়াল মুতাকাল্লিম পৃ. ১৭
আবদুস সামাদ ইবনু আবদিল আলা	ওয়ালিদ ইবনু ইয়াযিদ	আল আগানি: ৬/১৩৪
ইয়াযিদ ইবনু মুসাহিক সুলামি	ওয়ালিদ ইবনু ইয়াযিদ	Brockelam GI ১৯০, s ১৩৩২
সজাদ ইবনু আদহাম	মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ	দোহাল ইসলাম: ২/৫৪
মুফাদদাল দিব্বা	মাহদি	তাবাকাতুল উদাবা: পৃ. ৬৭
শারকি ইবনুল কাতামী	মাহদি	আসরুল মামুন: ১/১৭৪
আবদুল্লাহ ইবনুল মুকাফফা	ইসমাইল বিন আলির পুত্রগণ	Brockelam GI ১৫১, s ২৩৩
ইয়াহইয়া ইবনু খালিদ বারমাকি	রশিদ	ইবনু খাল্লিকান: ২/৩৬১
কিসাই	রশিদ	তাবাকাতুল উদাবা: ৮৭-৯১
আবু ইয়ায	মামুন ও ইবরাহিম ইবনুল মাহদির পুত্রগণ	আল-আগানি: ৫/১২৭
কিসাই	আল-আমিন	ইবনু খাল্লিকান: ১/৪৬৯
আহমার	আল-আমিন	মুজামুল উদাবা: ৫/১১০
ইয়াযিদ	ইয়াযিদ ইবনু মানসুরের পুত্র	তাবাকাতুল উদাবা: পৃ. ১০৪
ইয়াযিদ	মামুন	তাবাকাতুল উদাবা: পৃ. ১০৪
মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান	মামুন	তাবাকাতুল উদাবা: পৃ. ১০৪
ফিরা	মামুনের পুত্র	তাবাকাতুল উদাবা: পৃ. ১৩০
কুতরুব	আবু দিলফের (কাসিম ইবনু আলি) পুত্র	Brockelam GI ১০২, SI ১৩১
হুসাইন ইবনু কুতরুব	আবু দিলফের পুত্র	আল-ফিহরিস্ত: পৃ. ৭৮

ইবনুশ শিক্তিত	খলিফা মুতাওয়াক্তিদের পুত্রগণ	আল-ফিহরিস্ত: পৃ. ১০৮
ইবনুশ শিক্তিত	তাহির ইবনুল হুসাইনের পুত্রগণ	ইবনু খাল্লিকান: ২/৪৫৩
আবুল আমসিল (আবদুল্লাহ ইবনু খুলাইদ)	আবদুল্লাহ ইবনু তাহিরের পুত্র	আল-ফিহরিস্ত: পৃ. ৭২
সালাব	মুতায়ের পুত্র	ইবনুল আনবারি: পৃ. ৩০১
সালাব	তাহির ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি তাহির	ইবনুল আনবারি: পৃ. ৩০১
মুবাররিদ	আবদুল্লাহ ইবনুল মুতায়	ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ১২
কিনদি	মুতায়িদ	Brockelam Gl ২০৯, SI ২১৬
যাজ্জাজ	মুতায়িদের পুত্রগণ এবং আবদুল্লাহ ইবনুল মুতায়ের পুত্র	Brockelam Gl ১০০, SI ৫০৭, ১৭০
যাজ্জাজ	সুলাইমান ইবনু ওয়াহাবের পুত্র	ইবনু খাল্লিকান: ১/১৬
সুলি	রাযি বিল্লাহ	আল-ফিহরিস্ত: পৃ. ২১৫
কাফুর	ইখশিদের পুত্রগণ	ইবনু খাল্লিকান: ১/৬১৪
আলি ইবনু মানসুর হিলবী	হুসাইন ইবনু জাওহারের পুত্রগণ	ইয়াকুত (ফরিদ রিফাঈর ছাপা)
আলি ইবনু জাফর	বদর জামালির পৌত্র	ইয়াকুত: ১৫/৮৩-৮৪
আবু সাইদ বান্দাহি	সালাহুদ্দিন আইয়ুবির পুত্রগণ	খুতাতুশ শাম: ৬/১৯২

### ❖ ৩. মসজিদ ও মাদরাসার শিক্ষক

এই শ্রেণীর শিক্ষকবৃন্দ বিরাট মর্যাদা ও সমাদর পেয়েছেন। তাদের মানহানি বা সম্মান নষ্ট হওয়ার মতো কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে ইবনুশ শহীদ একটি কটুক্তি করেছেন এই শ্রেণীর শিক্ষকদের ব্যাপারে। ইবনুশ শহীদের কটুক্তির প্রধান কারণ হলো, শাসক ও অভিজাত শ্রেণীর কোনো মজলিসে উপস্থিত হলে এই শ্রেণীর শিক্ষকগণ সাহিত্যিকদের সঙ্গে ভালো আচরণ করেন না।<sup>[১]</sup> আর তাই ইবনুশ শহীদের এ মন্তব্য কোনো দলিল নয়। তা নিছক কবি

[১] আয যাবিরা ১: ১১৮।



ও সাহিত্যিকদের সম্মান না করার প্রতিশোধ। কারণ শাসকদের রাজসভায় তাঁরা কবি ও কবিতার মূল্যায়ন করেন না। তাই ইবনুশ শহীদেব এ উক্তি মূল্য আমাদের কাছে ম্লান হয়ে গেছে। কারণ তা কেবল ব্যক্তিগত আক্রমণের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

এ শ্রেণীর আলিম ও শিক্ষকদের ব্যাপারে ইতিহাস ও সাহিত্যের গ্রন্থগুলোতে প্রচুর পরিমাণে প্রশংসামূলক বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। এর বিপরীতে ইবনুশ শহীদেব বর্ণনার কীই-বা মূল্য থাকতে পারে! ইতিহাস ও সাহিত্যের গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায় যে, এই শ্রেণীর শিক্ষকগণ ছিলেন বিরাট মর্যাদার পাত্র। ছাত্র-জনতা, ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাই তাঁদেরকে গভীরভাবে সম্মান করত। এসব উৎস থেকে কয়েকটি আমি এখানে উল্লেখ করছি:

» জনৈক খলিফাকে পত্রযোগে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি উপদেশ দেওয়া হয়। চিঠিতে লেখা ছিল: মনে রাখবেন, উজ্জ্বল বাতি ঘর আলোকিত করে রাখে। আর আলিমগণ হলেন আপনার রাষ্ট্রের জন্য বাতি। আপনি এই বাতিগুলোর যত বেশি যত্ন নেবেন, তার আলো তত বেশি বিস্তার লাভ করবে। আর সেই আলো দিয়ে আপনি সবকিছু প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।<sup>[১]</sup>

» বিখ্যাত একজন খলিফাকে বলা হলো, মহান আল্লাহ আপনার সকল চাওয়া-পাওয়া পূরণ করেছেন। এখনো কি আপনার এমন কোনো চাওয়া আছে, যা অপূর্ণ রয়ে গেছে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ! একটি চাওয়া আমার বাকি রয়ে গেছে। এটি সকল কামনার চেয়ে বড়। আমি জীবনে যা লাভ করেছি, তার চেয়েও অনেক বড়। দুনিয়ার কোনো অর্জন, খিলাফতের কোনো উচ্চাসন—সেই আকাঙ্ক্ষার ধারেকাছেও আসতে পারবে না। সেটি হলো কোনো মুহাদ্দিসের মজলিসে বসে তাঁর থেকে হাদিস লেখা। এর ব্যাখ্যা জানা ও সংরক্ষণ করা।<sup>[২]</sup>

» বিখ্যাত মনীষী আবুল আসওয়াদ দুওয়ালী বলতেন, জ্ঞানের চেয়ে বেশি সম্মানিত আর কিছু নেই। রাজ-বাদশাহগণ মানুষের শাসক। আর জ্ঞানীরা হলেন রাজা-বাদশাহদের শাসক।<sup>[৩]</sup>

» ইলম ও জ্ঞান সবসময় মানুষকে অপদস্থ হওয়া থেকে রক্ষা করে। বর্ণিত আছে, একবার হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কিছু বন্দীর শিরচ্ছেদ করলেন।

[১] হস্তলিখিত পুস্তিকাসমগ্র: ইস্তাখ্বুল: পাতা নম্বর ৩৭ বা।

[২] মু'জামু ইবনি হাজার ৮, তারিখুল খুলাফা (সুয়ুতি): পৃ ১৩১।

[৩] তাযকিরাতুস সামি' পৃ ১০।

একপর্যায়ে আরেক লোককে তার সামনে পেশ করা হলো শিরচ্ছেদের জন্য। তখন সে বন্দী বলল, আল্লাহর শপথ, আমরা পাপ করে ভুল করেছি ঠিক। কিন্তু আপনি ক্ষমা করে নেকি কামাই করছেন না কেন! হাজ্জাজ তার কথা শুনে বলল, ধিক এসব মৃতের প্রতি। এদের মধ্যে কেউই এই লোকটির মতো ভালো কথা বলতে পারেনি। এ কথা বলে তিনি লোকটিকে রেহাই দিলেন।<sup>[১]</sup>

» একবার এক খারিজি লোকের শিরচ্ছেদের জন্য বাদশাহ আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের সামনে উপস্থিত করা হলো। নির্দেশ দেওয়ার আগমুহূর্তে বাদশাহর কাছে একটি ছোট্ট খোকা কাঁদতে কাঁদতে এল। কাঁদার কারণ, শিক্ষক তাকে প্রহার করেছেন। বাদশাহ আবদুল মালিক শিশুটিকে আদর করে তার অশ্রু মুছে দিচ্ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে খারিজি লোকটি বলল, বাচ্চাটিকে কাঁদতে দিন। কারণ এই কান্না তার চোয়ালের জন্য কল্যাণকর। চোখের সুস্থতার জন্য কার্যকরী। তার দণ্ড চূর্ণকারী। চোখের পানির কারণে হয়তো এ ভুল সে আর দ্বিতীয়বার করবে না। অশ্রু তাকে আল্লাহর আনুগত্যে আরও বেশি উৎসাহিত করবে। বাদশাহ আবদুল মালিক তার কথা শুনে বললেন, এখনই তোমার মুণ্ডপাত হওয়ার কথা। এ মুহূর্তেও তুমি এমন নীতিকথা বলছ! খারিজি বলল, সবসময় সত্য কথা বলা একজন মুসলমানের দায়িত্ব। সে যে-অবস্থাতেই থাকুক না কেন! লোকটির কথা শুনে বাদশাহ তাকে মুক্ত করে দিলেন।<sup>[২]</sup>

» বিখ্যাত মুহাদ্দিস সাইদ ইবনুল মুসাইয়াবের (মৃত্যু ৯৪ হিজরি) কন্যার সাথে নিজের পুত্রের বিয়ের জন্য প্রস্তাব পাঠান বাদশাহ আবদুল মালিক বিন মারওয়ান। কিন্তু বাদশাহর সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন সাইদ। শাহজাদার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার পর তাঁর কন্যার বিয়ে কার সাথে হয়েছিল? ইবনু খাল্লিকান বলেন,<sup>[৩]</sup> হাদিসের একজন ছাত্র। নাম তার আবু ওয়াদাআহ। সে সাইদ ইবনুল মুসাইয়াবের দরসে নিয়মিত বসতো। হঠাৎ কী কারণে যেন কয়েক দিন দরসে অনুপস্থিত থাকে। ফিরে আসার পর সাইদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় ছিলে তুমি? আবু ওয়াদাআহ উত্তরে বলল, আমার স্ত্রী মারা গেছে। সাইদ বললেন, আমাদের খবর দাওনি কেন? তাহলে আমরাও তার জানাযায় শরিক হতাম! এরপর জিজ্ঞেস করলেন,

[১] আল ইকদুল ফারিদ ১: ১৪০, আল বায়ান ওয়াত তিবয়ান ১: ১৪৪।

[২] আল বায়ান ওয়াত তিবয়ান ১: ১৪৪, আল কামিল লিল মুবাররিদ: ৫৭৩।

[৩] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ১: ২৯১-২৯২।



তুমি কি আবার বিয়ে করেছ? সে বলল, কিভাবে আমি বিয়ে করব, আমি তো খুব গরিব। সংসার চালাতে বড় কষ্ট হয় আমার! তখন সাইদ বললেন, আমি যদি বিয়ে দিই, তবে তুমি রাজি? সে বলল, হ্যাঁ! তখন ওই দিনই তিনি তার কন্যাকে আবু ওয়াদাআহর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন। ওই কন্যা ছিল বিদ্যাবতী। রূপে গুণে অনন্যা।

» হাসান বসরি (মৃত্যু ১১০ হিজরি) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন বসরা নগরীর সকল অধিবাসী তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করে। ওই দিন মসজিদে আসরের নামাজ পড়ার মতো কেউ ছিল না (সকলেই জানাযায় শরিক হওয়ার জন্য চলে গিয়েছিল)। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে ওই দিন পর্যন্ত কোনো দিন আসরের নামাজের জন্য মসজিদ জনশূন্য থাকেনি।<sup>[১]</sup>

» বিখ্যাত হাদিস-বিশারদ কাযি শারিকের (মৃত্যু ১৭৭ হিজরি) দরসে একবার খলিফা মাহদির পুত্রগণ উপস্থিত হলো। তিনি তখন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে দরস প্রদান করছিলেন। তখন মাহদির এক পুত্র দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে একটি হাদিস জিজ্ঞেস করল। শারিক তাঁর দিকে ভ্রক্ষেপও করলেন না। তারা আবার জিজ্ঞেস করল। এবারও তিনি তার দিকে তাকালেন না। তখন খলিফার পুত্র বলল, আপনি শাহজাদাদের অবজ্ঞা করছেন! উত্তরে তিনি বললেন, না তো! আলিমদের কাছে ইলম অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। এটিকে তাঁরা কখনো নষ্ট হতে দেন না।<sup>[২]</sup>

» ইমাম শাফিয়ি বলেন, যুবাইরী গোত্রের আমার কিছু ভাতিজা আমাকে পীড়াপীড়ি করল মদিনায় গিয়ে ইমাম মালিকের কাছে ফিকহ শিখতে। সে সময় আমি মক্কায় অবস্থান করছিলাম। এরপর মক্কার শাসনকর্তার পক্ষ থেকে মদিনার শাসকের উদ্দেশ্যে লেখা একটি চিঠি আমি সাথে নিলাম। চিঠিতে মালিক বিন আনাসের কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মক্কার শাসক মদিনার শাসককে অনুরোধ করেন। এরপর মদিনায় পৌঁছে পত্রটি আমি প্রশাসকের হাতে দিলাম। চিঠি পড়ে তিনি বললেন, ওহে তরুণ, মালিক বিন আনাসের দুয়ারের চেয়ে সুদূর মক্কায় খালি পায়ে হেঁটে যাওয়া আমার জন্য বেশি সহজ। তবে তাঁর দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে আমি লজ্জাবোধ করি না। আমি বললাম, মহান আল্লাহ আমার মহোদয়কে সংশোধন করুন। আপনি যদি মালিক বিন আনাসকে আপনার কাছে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিতেন! উত্তরে শাসক বললেন, হায় হায়! বলো কী! তাঁর কাছে যাওয়ার

[১] ইবনু খাল্লিকান ১: ১৮১।

[২] তাযকিরাতুস সামি' ৮৮-৮৯।

সময় আকিক উপত্যকার মরুঝাড় যদি আমাদের ওপর আছড়ে পড়ে, তাহলে হয়তো এই আশা পূর্ণ হতে পারে...। এরপর শাসক আমাকে নিয়ে ইমাম মালিকের দরজায় গিয়ে ভেতরে ঢোকানোর অনুমতি চাইলেন। ইমাম মালিক প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করলে শাসক তা খুলে বললেন। তখন ইমাম মালিক বললেন, সুবহানাল্লাহ! কী অবাক কাণ্ড! আজকাল ইলম অর্জনের জন্যও মাধ্যম ধরা হচ্ছে। এরপর শাফিয়িকে তাঁর সাথে থাকার অনুমতি দিলেন। শাসক ফিরে গেলেন।<sup>[১]</sup>

» একবার বিখ্যাত হাদিস-বিশারদ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের দরসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন খলিফা হারুনুর রশিদ। সবাই দরস ছেড়ে খলিফাকে দেখার জন্য উঠে গেল। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান নিজ জায়গায় বসে রইলেন। রাজঘোষক বাইরে এসে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানকে ডাকলেন। খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে ফিরে আসার পর ছাত্ররা জিজ্ঞেস করল, খলিফা কী কারণে আপনাকে ডাকলেন? উত্তরে তিনি বললেন, হারুনুর রশিদ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার! সবার মতো আপনি দরস ছেড়ে উঠে আসেননি কেন? আমি উত্তরে বললাম, আলিমদের স্তর থেকে সাধারণ জনতার স্তরে নেমে আসা আমার পছন্দ নয়। আমার উত্তর শুনে হারুনুর রশিদ খুশি হলেন।<sup>[২]</sup>

» পালমার লেখেন:<sup>[৩]</sup> আবু মুআবিয়া ছিলেন একজন অন্ধ আলিম। একবার তিনি খলিফা হারুনুর রশিদের সঙ্গে খেতে বসলেন। খাওয়া শেষে সুন্নাহ মোতাবেক তিনি দুই হাত ধোয়ার ইচ্ছা করলেন। তখন একজন সামনে চিলমচি ও পানির পাত্র এগিয়ে দিয়ে তাঁর হাতে পানি ঢেলে দিলেন। হাত ধোয়া শেষ করে ইলমের বাহককে এ রকম সম্মান করার জন্য ওই ব্যক্তির জন্যে দুআ করেন অন্ধ আলিম। তবে এত সব খাদেম থাকা সত্ত্বেও কাজটি যে খলিফা নিজেই করেছেন, তাও টের পেয়ে যান তিনি। তখন অন্ধ আলিম বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আমি মনে করি ইলমের সম্মানার্থেই আপনি এটি করেছেন। হারুনুর রশিদ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ! আপনার ধারণা ঠিক!

» আহমাদ বিন আবু দাউদ ছিলেন খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর প্রধান কর্তা ব্যক্তি। তিনিই সর্বপ্রথম খলিফাদের সঙ্গে সংলাপের সূচনা করেন। তাঁরা শুরু না-করলে অন্যরা কিছু বলত না। সে সময় আফশিন তুর্কি ও আবু

[১] মু'জামুল উদাবা ৬: ৩৬৯-৩৭০।

[২] আল খতিবুল বাগদাদী: তারিখু বাগদাদ ২: ১৭৩-১৭৪।

[৩] Harun el Rashid p. ৩২।



দিলফ কাসিম ইবনু ঈসা আরাবির মাঝে মনোমালিন্য চলছিল। একবার তিনি খবর পান যে, আফশিন সুকৌশলে আবু দিলফের বিরুদ্ধে হত্যা মামলার ফাঁদ পেতেছে। মিথ্যা সাক্ষ্য দেখিয়ে তাকে কতল করার জন্য উপস্থিত করেছে। খবর শুনে আহমাদ বিন আবু দাউদ দ্রুত আফশিনের কাছে ছুটে চান। তাকে বলেন, আমি আপনার কাছে আমিরুল মুমিনিনের পক্ষ থেকে এসেছি। কাসিম বিন ঈসার ওপর কোনো দণ্ড কার্যকর না করতে আমিরুল মুমিনিন আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর তিনি আফশিনের পাশে থাকা লোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা সাক্ষী থাকো, কাসিম জীবিত ও নিরাপদ থাকা অবস্থায় আমিরুল মুমিনিনের বার্তা আমি আফশিনের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এরপর তিনি খলিফা মুতাসিমের কাছে গিয়ে পুরো ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, হে আমিরুল মুমিনিন! আপনি সেই নির্দেশনা জারি করেননি, এরপরও আমি তার কাছে গিয়ে এটা বলেছি। খলিফা মুতাসিম তার সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে মেনে নেন।<sup>[১]</sup>

» একদিন বিখ্যাত জ্ঞানী সাবিত বিন কুররার হাত ধরে বাগানে ঘুরছিলেন খলিফা মুতাসিম। হঠাৎ কী মনে করে যেন খলিফা নিজের হাত ছাড়িয়ে নিলেন। সাবিত জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো আমিরুল মুমিনিন? খলিফা বললেন, আমার হাত আপনার হাতের ওপর ছিল। জ্ঞান সবসময় সব কিছুর ওপরে থাকে। অন্য কিছু জ্ঞানের ওপর থাকে না।<sup>[২]</sup>

» একবার খলিফা ও কাযি আবু হামিদ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আসফারাইনির মাঝে দ্বন্দ্ব চলছিল। তখন খলিফার উদ্দেশে শাইখ আবু হামিদ চিঠি লিখলেন: ‘মনে রাখবেন, মহান আল্লাহ আমাকে যে নেতৃত্ব, যোগ্যতা ও ক্ষমতা দিয়েছেন তা আপনি কোনোদিনও ছিনিয়ে নিতে পারবেন না। আমি কিন্তু খুরাসানের কেন্দ্রীয় শাসনকর্তার কাছে দু-তিন শব্দের একটি চিঠি লিখেই আপনাকে পদচ্যুত করার ক্ষমতা রাখি।’<sup>[৩]</sup>

» একবার কুতবুদ্দিন শাফিয়ির কোনো এক ভুলকে কেন্দ্র করে তাঁর নিন্দা করা হলো। বিখ্যাত শাসক নুরুদ্দিন জেনগি তখন উপস্থিত। নুরুদ্দিন বললেন, এই ভুল যদি তিনি করেও থাকেন, এরপরও তাঁর মাঝে অনেক গুণ আছে, যা এই ভুলকে নিমিষেই মিটিয়ে দেয়। তা হলো ইলম।<sup>[৪]</sup>

[১] ইবনু খাল্লিকান: ওয়াফায়াতুল আ‘যান ১: ৩১।

[২] ইয়াকুত: মু‘জামুল উদবা ৬: ৩১০।

[৩] সুবকি: তাবাকাতুশ শাফিয়িয়া ৩: ২৬।

[৪] মুফাররিজুল কুরুব: ইবনু ওয়াসিল প ১২৫।

» ৫৭১ হিজরিতে আলি ইবনুল হাসান ইবনু আসাকির হাফিজ দামিশকি ইন্তেকাল করেন। তখন বিখ্যাত বীর সেনাপতি ও খলিফা সালাহুদ্দিন আইয়ুবি তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করতে ময়দানে নেমে আসেন। সবার সঙ্গে জানাযার নামাজ আদায় করেন।<sup>[১]</sup>

» দামিশকের রাজপ্রাসাদ থেকে কিতাব বগলে করে নেমে আসতেন বাদশাহ আল-মালিকুল আফদাল। এরপর আল-আজমী নামক গলিতে অবস্থিত তাঁর উস্তায় কিনদির বাড়িতে উপস্থিত হতেন। অনেক সময় আগের দরস বিলম্ব হয়ে যেত। তখন বাদশাহ নিজের দরসের পালা আসার জন্য উস্তায়ের অপেক্ষায় বসে থাকতেন।<sup>[২]</sup>

মুসলিম মনীষীদের থেকে বর্ণিত এ রকম হাজারও ঘটনার মাঝে এগুলো কিছু নমুনা মাত্র। ইলম ও আলিমদের মর্যাদা কত উঁচু ছিল, এসব ঘটনার দ্বারা তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, জনসাধারণের অন্তরে জ্ঞান ও জ্ঞানের বাহক, শিক্ষা ও শিক্ষকদের প্রতি কী পরিমাণ সীমাহীন শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল!

## শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা

শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করার আগে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করা জরুরি মনে করছি।

১. ইসলামের সূচনালগ্নে সকল ইলমী পাঠশালায় পাঠ্যবস্তু ছিল কুরআনুল কারীম। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে বসতেন। তাঁদের কুরআন পড়াতেন। আয়াতের মর্ম তাঁদের সামনে তুলে ধরতেন। তা থেকে ধর্মীয় নানা বিধান বের করতেন। সুভাবতই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এ কাজ করতেন আল্লাহর রাসূল। সেই রীতি অনুসারে সাহাবিগণও মানুষকে কুরআন পড়াতেন। কুরআনের তাফসির শোনাতেন। তবে বিনিময়ে তাঁরা কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না। কেবল আল্লাহর কাছেই এর প্রতিদান আশা করতেন। আবদুল্লাহ বিন শফিক বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিগণ কুরআনের কপি বিক্রি করা অপছন্দ করতেন। এ কাজকে তাঁরা বিরাট পাপ বলে মনে করতেন। তা ছাড়া

[১] মু'জামুল উদাবা ৫: ১৩৯-১৪০।

[২] দাহমান: আল মানসুরাতুন নাজিয়া পৃ ১১।



কুরআন পড়িয়ে কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকেও তাঁরা অপছন্দ করতেন।<sup>[১]</sup> এই প্রবণতা ও রীতি সাহাবিদের পরও অবশিষ্ট ছিল। অনেক তরীক সাহাবিদের এ ঐতিহ্য ধারণ করে জ্ঞানের প্রচার-প্রসার করেছেন। কুরআনের পাশাপাশি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসও তাঁদের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হয়। হানাফি মাযহাবের বিরাট একটি অংশ, আহমাদ বিন হাম্বল, সুফিয়ান সাওরি প্রমুখ ইমামগণ কুরআন হাদিস শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয নয় বলে মত দেন।<sup>[২]</sup> খুরাসান প্রদেশের কীর আলিম ও মুহাদ্দিস আবুল আব্বাস আসাম-সহ সেখানকার মুহাদ্দিসগণও হাদিস পড়িয়ে কোনো বিনিময় গ্রহণ করতেন না। বরং আবুল আব্বাস প্রস্তুতপ্রতিদ ও সংকলনের কাজ করতেন। নিজ হাতের উপার্জন দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন।<sup>[৩]</sup>

এরপর বিষয়টি আরও উন্নত রূপ লাভ করে। ফলে ধর্মীয় সকল বিষয় কুরআন হাদিস শিক্ষাদানের সঙ্গে মিশে যায়। যেভাবে একজন হাকিম ও ধর্মবিশেষজ্ঞ ব্যক্তির কর্তব্য মানুষকে কুরআন হাদিস পড়ানো, সেভাবে তার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষকে জ্ঞান ও সুশিক্ষা দিয়ে সমৃদ্ধ করা। বর্ণিত আছে, হারিস বিন মুহাম্মাদকে যখন খলিফা উমর ইবনু আবদিল আজিজ মরুপাঠশালায় শিক্ষকতার দায়িত্ব দিয়ে পাঠান, তখন হারিস এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ যে জ্ঞান আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, তা মানুষের মাঝে বিতরণ করার বিনিময়ে আমি কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করব না।<sup>[৪]</sup>

এ দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই অধিকাংশ মুসলিম শিক্ষক পাঠদান কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন। আরবি কিতাবাদির উৎসগুলোতে এ ব্যাপারে বিপুল সংখ্যক ঘটনা বর্ণিত আছে। এ থেকে বোঝা যায়, দরিদ্র শিক্ষকগণও পারিশ্রমিক ছাড়াই মানুষকে কুরআন হাদিস শিক্ষা দিতেন। ঠিক যেমনটি করতেন বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ ও ফকিহ কামালুদ্দিন আবুল বারাকাত আনবারী। তাঁর দরজা সবসময় শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকত। তিনি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে ছাত্রদের জ্ঞান শেখাতেন।<sup>[৫]</sup>

[১] ইবনু কুতাইবা: উয়ুনুল আখবার ২: ১৩১।

[২] সামারকান্দি: মুকাদ্দিমাতু বুসতানিল আরিফিন।

[৩] মিতয ১: ৩০৬, আল মুনতায়াম: ইবনুল জাওযী।

[৪] ইবনু আবদিল হাকাম: সীরাতু উমর ইবনি আবদিল আজিজ পৃ ১৬৭।

[৫] আর রাওজাতাইন ২: ২৭।

মক্তবের শিক্ষকদের অনেকে এ রীতি ধারণ করেন। ইবনু কুতাইবা বর্ণনা করেন :<sup>[১]</sup> দাহহাক বিন মুযাহিম ও আবদুল্লাহ ইবনুল হাসির (উভয়ে ছিলেন মক্তবের শিক্ষক) শিক্ষকতা করতেন। তবে এর বিনিময়ে তাঁরা কোনো পারিশ্রমিক নিতেন না।

অসংখ্য আলিম হাদিস সংকলনের উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে দীর্ঘ পথ সফর করেছেন। ভীষণ কষ্ট ও পরিশ্রম করে ইলম অর্জন করেছেন। এরপর স্বদেশে ফিরে মানুষের মাঝে জ্ঞান বিতরণ করেছেন হাদিস প্রচারের উদ্দেশ্যে। তবে এর বিনিময়ে তাঁরা কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করেননি। নিশাপুরের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবু বকর জুযনি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাদিসের জ্ঞান অর্জন করতে আমি এক লাখ দিরহাম খরচ করেছি, তবে এর দ্বারা আমি এক দিরহামও উপার্জন করিনি।<sup>[২]</sup>

আলিমগণ বিনামূল্যে দরস দিতেন। এটাই প্রমাণ করে, ইলমের প্রতি তাঁরা কত নিষ্ঠাবান ছিলেন। ইলমের জন্য তাঁরা কী পরিমাণ ত্যাগ ও বিসর্জন দিয়েছেন। কারণ, এ সেবার বিনিময়ে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ইলমের প্রচার এবং পরকালে আল্লাহর কাছে সেরা পুরস্কার লাভ। তাই আমরা দেখি, বাগদাদে সরকারি অর্থায়নে নিজামিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার খবর শুনে মাওরাউন্বাহারের আলিমগণ গভীর শোক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তাঁরা বলেন, সুউচ্চ মনোবল, উন্নত অভিলাষ ও পবিত্র আত্মার লোকেরাই এতদিন জ্ঞানচর্চা করত। ইলমের মর্যাদা বুঝে, ইলমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখে তারা জ্ঞান অর্জন করতে আসত। এখন যেহেতু শিক্ষাদানের সঙ্গে পারিশ্রমিক জুড়ে গেছে, তাই এখন থেকে অসাধু, অলস ও লোভী শ্রেণীর লোকেরা অর্থের লোভে জ্ঞান অর্জন করতে আসবে। তারা ইলমকে অপদস্থ করবে। জ্ঞানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করবে।<sup>[৩]</sup> তবে নিজামুল মুলকই সর্বপ্রথম শিক্ষকদের বেতন ধার্য করার রীতি চালু করেননি। তাঁর আগেও এ রীতি সীমিত পরিসরে চালু ছিল। নিজামুল মুলক এসে এ রীতির ব্যাপক ও সুপরিকল্পিত রূপ দেন। প্রশ্ন হলো, প্রাচীন আলিমগণ কুরআন হাদিস শিক্ষাদানকে ইলমের খেদমত মনে করতেন, এর বিনিময় আল্লাহর কাছে আশা করতেন; তাহলে কিভাবে শিক্ষকদের বৈতনিক রীতির প্রচলন হলো?

আমার কাছে মনে হয়েছে, এর সদুত্তর দিতে হলে নিচের দুটি বাস্তবতা উপলব্ধি করতে হবে :

[১] আল মাআরি পৃ ১৮৫।

[২] তাবাকাতুশ শাফিয়িয়া ২: ১৬৯।

[৩] কাশফুয যুনুন ১: ১৫।



» এক. প্রাচীন যুগ থেকেই কোনো কোনো আলিমের কাছে মানুষ এমনটা আশা করত যে, তাঁরা মসজিদে সময় দেবেন। মানুষ তাদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনে উপকৃত হবে। এর দ্বারা জ্ঞানের সেবা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য ছিল না। আর সে কাজ করার বিনিময়ে তার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা না করা হলে, তিনি তা চালিয়ে যেতে উৎসাহ বোধ করতেন না। তাই এ কাজের বিনিময়ে তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হতো। মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে এভাবেই কাসসাস (ঘটনা বর্ণনাকারী) নিয়োগ দেওয়া হয়। যা আমরা ইতিপূর্বে জেনে এসেছি। সেখানে তার দায়িত্ব ছিল, নির্দিষ্ট একটি দলের পক্ষে ঘটনা বর্ণনা করা। বিশেষ একটি রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করা।

» দুই. বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব সাধনে মুসলমানগণ প্রচুর অমুসলিম জ্ঞানীর সাহায্য নিয়েছেন। বিশেষ করে অনুবাদের কাজে। বিখ্যাত অনুবাদকদের মধ্যে ছিলেন ইউহান্না ইবনু মাসুওয়াই, জিবরিল বিন বাখতিও, ছনাইন ইবনু ইসহাক প্রমুখ জ্ঞানী। তারা তাদের কাজের বিনিময়ে মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক লাভ করতেন।

এ থেকেই শুরু হয় জ্ঞান-প্রচারে কর্মরত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি সাধনে দায়িত্বরত লোকদের বেতন প্রদানের রীতি। কালের পরিক্রমায় এ দুটি শর্ত মানুষ ভুলে যেতে থাকে। একসময় শিক্ষকদের পারিশ্রমিক প্রদান একটি স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়। তা তিনি যে বিষয়ই পড়ান অথবা যে ধর্মেরই হন। এরপর ধীরে ধীরে শিক্ষকদের পারিশ্রমিক প্রদানের রীতি ইসলামি বিশ্বেও পরিচিত হতে থাকে। তবে এর পাশাপাশি সব যুগেই এমন অনেক আলিম ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, যারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের অনুসরণ করে বিনামূল্যে ইলমসেবা করে গেছেন। কেবল আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়ার আশা রাখতেন তাঁরা।

২. ইবনু খালদুন মনে করেন, তোষামোদি হলো উচ্চপদ লাভের অন্যতম উপায়। আর উচ্চপদ লাভ করতে পারলেই পাওয়া যায় সুখ ও সমৃদ্ধি। অধিকাংশ বিলাসী মানুষ এই চাটুভৃত্তিকে পুঁজি করেই সুখের সন্ধান করে থাকে। এর বিপরীতে আমরা দেখি, যারা চাটুকারিতার পথ বাদ দিয়ে জ্ঞানে-গুণে নিজেদের পরিপক্ব করে তোলে, তারা নিজ হাতের উপার্জন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। ফলে দারিদ্র্য হয় তাদের নিত্যসঙ্গী।<sup>[১]</sup> ইবনু খালদুন আরও বলেন, বিচারকার্য, ফতোয়া প্রদান, শিক্ষাদান, ইমামতি, খুতবা ইত্যাদি ধর্মীয় বিষয়কে বেশিরভাগ

[১] আল মুকাদ্দিমা পৃ ২৭৫।

ক্ষেত্রে মানুষ মূল্যবান পেশা মনে করে না। সমাজের প্রতি তাদের অবদানকে মানুষ বড় কিছু ভাবে না। কারণ, তাদের এই দায়িত্ব পালন নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজের মধ্যে পড়ে না। তাই অন্যান্য পেশাজীবী শ্রেণীর মতো শাসক তাদের জন্য কোনো পারিশ্রমিক বরাদ্দ করেন না।<sup>[১]</sup> এরপর ইবনুল খালদুন বলেন, সমাজের জন্যও তারা এমন কোনো প্রয়োজনীয় সেবা আঞ্জাম দিচ্ছেন না, যা সবার জন্য দরকার। অথবা সব মানুষ তা করতে বাধ্য। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের অবদানকে সম্মান করা হয় না। ইবনু খালদুন আরও যোগ করেন: খলিফা মামুনের শাসনামলের এমন অনেক নথি আমার হাতে আছে, যার মাধ্যমে প্রমাণ হয়—সে আমলে বিচারক, ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের বেতন ছিল অল্প।<sup>[২]</sup>

এখন প্রশ্ন হলো, প্রয়োজনীয় সেবা বলে কোন কাজকে উদ্দেশ্য করেছেন ইবনু খালদুন? কী মানদণ্ডে তিনি প্রয়োজনীয়তা পরিমাপ করেছেন? তিনি কি বস্তুগত দৃষ্টিতে সবকিছু মাপছেন? তাই যদি হয়, তবে দেশ ও দশের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু খাদ্য উৎপাদন করা। তাহলে গবাদি পশু পালনের কাজে নিয়োজিত কৃষকদের সামাজিক স্তর এত নিচু কেন? আমরা যদি ইবনু খালদুনের মতের সঙ্গে একমত হই যে, ইমাম-মুয়াজ্জিন কোনো জরুরি দায়িত্ব পালন করছেন না। কারণ ইমাম মুয়াজ্জিন না থাকলেও (যে কেউ আযান ও ইকামাত দিলে) নামাজ আদায় করা যায়। কিন্তু বিচারক এবং শিক্ষকও কোনো জরুরি দায়িত্ব পালন করছেন না, আর বিচারক ও শিক্ষক ছাড়াও সমাজ চলবে—ইবনু খালদুনের এ বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত নই। কারণ শাসকশ্রেণি মামলা-মুকদ্দমার বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তি করতে সেগুলো বিচারকদের হাতে ন্যস্ত করেছেন। এ থেকেই বিচারকদের দায়িত্ব ও ভূমিকার গুরুত্ব বুঝে আসে। ন্যায়নিষ্ঠভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করা বিচারকদের দায়িত্ব। আমার কাছে মনে হয়েছে, ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খতিবের দায়িত্বের সঙ্গে শিক্ষক ও বিচারকদের দায়িত্ব গুলিয়ে ফেলে ইবনু খালদুন ভুল করেছেন। কারণ একটি উজ্জ্বল বাস্তবতা হলো, ইসলামি বিশ্বের অধিকাংশ শাসক দুটি শক্তিকে কেন্দ্র করে নিজেদের ক্ষমতা মজবুত করতেন। একটি হলো আলিমদের শক্তি, আরেকটি সেনাবাহিনীর। এ কারণেই নিজেদের কর্তৃত্ব দীর্ঘস্থায়ী করতে এ দুটি শক্তিকে তারা সবসময় হাতে রাখতেন।

[১] প্রাগুক্ত তথ্যসূত্র পৃ ২৭৬।

[২] প্রাগুক্ত তথ্যসূত্র ২৭৬-২৭৭।



এরপর ইবনু খালদুন একটি সাধারণ বিধান সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করেন। কারণ তাঁর ধারণা অনুযায়ী খলিফা মামুনের যুগে বিচারক ও শিক্ষকদের বেতন ছিল কম। আমি ইবনু খালদুনের এ মত সমর্থন করি না। প্রথমত, সাধারণ বিধান সাব্যস্ত করতে হলে কেবল একটি উদাহরণ নয়; বিভিন্ন যুগের একাধিক উদাহরণ টানতে হয়। দ্বিতীয়ত, খলিফা মামুনের আমলের কী কী নথিপত্র ইবনুল খালদুনের হাতে আছে, তা নিয়েও রয়েছে আপত্তি। বাস্তবে ইবনু খালদুন আমাদের সামনে সেসব নথিপত্র পেশ করেননি। অপরদিকে খলিফা মামুনের আমলে বিচারক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান পালনকারীদের যে উন্নত পারিশ্রমিক ছিল, সে ব্যাপারে আমাদের কাছে অনেক দলিল আছে। এসব প্রমাণ ইবনু খালদুনের মতের সাথে সাজসম্মত।

কিনদি লেখেন : ১৯৮ হিজরিতে খলিফা মামুনের আমলে মিশরে বিচারক পদে নিয়োগ পাওয়া ফাদল বিন গানিমের মাসিক বেতন ছিল ১৬৮ দিনার।<sup>[১]</sup> ২১২ হিজরিতে একই পদে নিয়োগ পাওয়া ইসা ইবনুল মুনকাদিরের বেতন ছিল দৈনিক সাত দিনার। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, বিখ্যাত অনুবাদক হুনাইন ইবনু ইসহাক অন্যান্য ভাষা থেকে আরবিতে অনুবাদ করতেন। তাঁর বিনিময়ে খলিফা মামুন তাঁকে গ্রন্থের সমপরিমাণ ওজনের স্বর্ণ প্রদান করতেন। এসব সুস্পষ্ট বর্ণনার কারণে ইবনু খালদুনের মতের বিরোধিতা করতে আমরা বাধ্য হয়েছি। এবার আসুন, যে ধারাবাহিকতায় আমরা শিক্ষকদের সামাজিক অবস্থান জেনে এসেছি, একইভাবে শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করি।

## ❖ ১. ক্ষুদ্রে পাঠশালার শিক্ষকগণ

আমাদের হাতে থাকা বেশিরভাগ ঘটনা এ কথাই সমর্থন করে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মক্তবের শিক্ষকদের পারিশ্রমিক ছিল অল্প। খুব সম্ভবত এ শ্রেণীর শিক্ষকদের সামাজিক স্তর নীচু হওয়ার বিষয়টি সত্য-মিথ্যা যেভাবেই ছড়াক, সেটি তাদের আর্থিক অবস্থাকে প্রভাবিত করেছে। তা ছাড়া তারা কুরআন ও দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো শিক্ষা দিতেন। তাই সবার ধারণা ছিল এ ব্যাপারে তারা পূর্ববর্তী মনীষীদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে বিনামূল্যে পড়াবেন। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। কমপক্ষে তারা হবেন পার্থিব সবকিছুর প্রতি নির্মোহ। অল্পতেই তুষ্ট থাকবেন। অর্থের লোভ ও জাগতিক সমৃদ্ধি থেকে তারা থাকবেন মুক্ত। এমন ধ্যানধারণার ফলেই এই

[১] আল ওলাতু ওয়াল কুযাত পৃ ১০১।

শ্রেণীর শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভালো ছিল না। তাদের অধিকাংশই নানা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। এমনকি বর্তমান যুগেও। এই বাস্তবতা প্রমাণ করার জন্য আমাদের কাছে আছে অসংখ্য উদাহরণ।

ইতিপূর্বে আমরা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আলোচনা করেছি। তিনি মক্তবের শিক্ষক ছিলেন কি না, তাও তুলে ধরেছি। বাস্তবেই তার নাম কুলাইব (ছোট কুকুর) ছিল, নাকি তা কবিদের মিথ্যা রটনা, সেটিও আমরা বর্ণনা করেছি। হাজ্জাজ সম্পর্কে রচিত দুটি কবিতাও আমরা উল্লেখ করেছি। অনেকে বলেন এ কবিতাতেই তার কুলাইব নামটি উল্লেখ আছে:

أينسى كليب زمان الهزال # وتعليمه سورة الكوثر  
رغيف له فلك دار # وآخر كالقمر الأزهر

শীর্ণকায়-জমানার কুলাইবের কথা কি ভোলা যায় আর?

সে তো মানুষকে শেখাত ওই সূরাতুল কাওসার।

সে জন্য জুটত তার কপালে খুব সামান্যই অনুদান।

কিন্তু শেষটা ছিল তার উজ্জ্বল চাঁদের মতো দীপ্তিমান।<sup>[১]</sup>

এখানে কুলাইব দ্বারা হাজ্জাজ উদ্দেশ্য হোক বা না হোক, সে সময় মক্তব-শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল, তা এ কবিতার মাধ্যমে অনুমান করা যায়। পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ক্ষুদ্রে পাঠশালার শিক্ষক হলো জীর্ণকায়। তিনি নানা জায়গায় ঘুরেফিরে রুটি সংগ্রহ করেন। নিজের পরিশ্রমের বিনিময় হিসেবে তিনি এসব রুটি উপার্জন করেন।<sup>[২]</sup>

এই শ্রেণীর শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল নিম্নমানের। এর প্রমাণ হলো: ইবনুস সিক্কিত শুরুতে আস-সালাম শহরে তাঁর পিতার সঙ্গে মক্তবে শিক্ষকতা করতেন। বিনিময়ে তিনি উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেতেন না। এরপর তিনি মক্তবের শিক্ষকতা থেকে অব্যাহতি নেন। সাহিত্যিক ও জ্ঞানী হয়ে উন্নত পারিশ্রমিক লাভের আশায় আরবি ব্যাকরণ শেখা আরম্ভ করেন।<sup>[৩]</sup>

সিসিলির মক্তব-শিক্ষকদের নগণ্য বেতন ও অল্প আয় নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন ইবনু হাওকাল। সেখানে ক্ষুদ্রে পাঠশালার প্রতিটি শিক্ষকের বেতন ছিল

[১] সারহুল উয়ুন পৃ ১০২ - ১০৩।

[২] আরও দেখুন: আল মুস্তাখাব মিন কিনায়াতিল উদাবা: জুরজানি পৃ ১১৮।

[৩] ইবনু খাল্লিকান ২: ৪৬১।



বছরে দশ দিনার। অনেকে আবার এ বেতনও পেতেন না।<sup>[১]</sup>

অনেকে মনে করেন, বর্তমান যুগের মজুবগুলোও আগেকার সেই ধরন নিয়েই বহাল আছে। এর অন্যতম কারণ হলো, এতে কোনো সংস্কার সাধন হয়নি। মজুবের শিক্ষকগণ সেই দায়িত্ব বংশ-পরম্পরায় আদায় করে আসছেন। তাই পূর্ববর্তী শিক্ষক থেকে তিনি যতটুকু পেয়েছেন, ঠিক সেভাবেই পড়াচ্ছেন। কোনো সংস্কার-বিপ্লব এসব মজুবের মান উন্নয়নে তেমন ভূমিকা রাখতে পারেনি। বরং সেই প্রাচীন আমলে যেরকম ছিল, আজও তাই আছে। আধুনিক বিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউট গড়ে উঠেছে ঠিক, তবে মজুবগুলো আগের অবস্থায়ই বহাল আছে। কোনো রকম পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগেনি।

এ বিষয়ে যেসব বিবরণ আমাদের হাতে আছে, এবং যে পদ্ধতিতে সেই প্রাচীন যুগ থেকে এ পর্যন্ত চলে আসছে, তার আলোকে মজুব-শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা ধারণা নিতে পারি।

» ক্ষুদ্রে পাঠশালায় পড়তে আসা শিশুরা শিক্ষককে যে সম্মানি দিত, তা সবার জন্য এক ছিল না। বরং তা শিশুদের মানসিক অবস্থা এবং পরিবারের আর্থিক সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করত।

» সাধারণভাবে আমরা এসব ভাতাকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি: এক প্রকার ভাতা ছিল মেয়াদের সাথে সম্পৃক্ত। আরেক প্রকার ছিল শিশুর পড়ালেখার উন্নতির সাথে যুক্ত।

» প্রথম প্রকার ভাতা প্রায় সকল শিশু পরিশোধ করত। অর্থাৎ সাপ্তাহিক বা মাসিক মেয়াদে তা শিক্ষকের হাতে তুলে দিত। কিছু রুটি সপ্তাহান্তে শিক্ষককে দিয়ে আসত। আরও কিছু অর্থ নানা উৎসব, ঈদ ও বিভিন্ন মৌসুম উপলক্ষ্যে দেওয়া হতো।<sup>[২]</sup> কখনো কখনো অর্থের পরিবর্তে সপ্তাহে বা মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ গম ও ভুট্টা দেওয়া হতো।

» দ্বিতীয় প্রকার ভাতা ছিল এ রকম: নির্দিষ্ট একটি সূরা শেষ করার পর তা দেওয়া হতো। যেমন সূরা মুলক পুরোটা শেষ করার পর শিক্ষকের সম্মানার্থে কিছু একটা প্রদান করা হতো। এরপর সূরা ফাতহ শেষ করার পর একই নিয়মে আরও কিছু সম্মানি দেওয়া হতো। কোন সূরা শেষ করার পর কী দেওয়া হবে, তা শিক্ষকদের কাছে প্রসিদ্ধ ছিল। এভাবে পুরো কুরআন মুখস্থ করার পরও শিক্ষককে সম্মানিত করা হতো। এই পারিশ্রমিকের ধরন

[১] কিতাব সুরাতিল আরদি ১: ১২৭।

[২] আল কাবিসি, আল ফাদালাহ ৭৩।

ছিল বড়। যে যেভাবে পারত, সাধ্যমতো মোটা অঙ্কের অর্থ দিয়ে শিক্ষককে খুশি করে দিত। শিশুর আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ, পোশাক ছাড়াও অনেক কিছু দেওয়া হতো।

ইতিপূর্বে আমরা জেনে এসেছি যে মজবুত শিক্ষকদের সামাজিক অবস্থানও অনেক সময় তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখত। তবে অনেক সময় এর উল্টো চিত্রও দেখা যেত।

## ❖ ২. শাহজাদাদের শিক্ষকগণ

দরবারের সঙ্গে যুক্ত জ্ঞানীদের মাধ্যমে অনেক শিক্ষক শাহজাদাদের পড়ানোর দায়িত্ব পান। তারা অব্যবহিত অর্থবিত্ত ও বিলাসিতা উপভোগের সুযোগ লাভ করেন। শাহজাদাদের শিক্ষক হিসেবে মনোনীত হওয়া মানে নিজের ও পরিবারের জন্য সকল প্রাচুর্যের দ্বার খুলে যাওয়া। কারণ এ পদে অধিষ্ঠিত শিক্ষকগণ খুব দ্রুত বিত্তশালী হয়ে উঠতেন। ঋণগ্রস্ত হলে বা কোনো আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত থাকলে নিমিষেই তা মিটে যেত। বর্ণিত আছে, খলিফা হিশাম ইবনু আবদিল মালিক যদিও কিছুটা কৃপণ ছিলেন, কিন্তু তার সন্তানের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার সময় যুহরীকে সাত হাজার দিনার উপহার দেন।<sup>[১]</sup>

ইতিপূর্বে আমরা ইয়াকুতের বর্ণনা করা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছি। সন্তানদের শিক্ষকদেরকে খলিফা ও রাজন্য ব্যক্তিবর্গ কী পরিমাণ মূল্যায়ন করতেন, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কতটা সমৃদ্ধ করতেন, ওই ঘটনা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুরো ঘটনাটি এ রকম:

শাহজাদা আল-আমিনকে পড়ানোর দায়িত্ব পেয়ে খলিফা হারুনুর রশিদের প্রাসাদে আসেন আলি ইবনুল হাসান আহমার (মৃত্যু ১৯৪ হিজরি)। তখন তাঁর ঘরে উন্নত কার্পেট বিছানো হয়। খলিফা তাঁর পুত্রদের পড়ালেখার জন্যে কাউকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিলে, প্রথম দরসের পর ওই মজলিসের সকল রাজকীয় আসবাবপত্র শিক্ষকের ঘরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন। এসব আসবাব যে বাহনে করে পৌঁছে দেওয়া হতো, সেগুলোও শিক্ষককে দিয়ে দেওয়া হতো। এরপর আহমার যখন পাঠদানের দায়িত্ব শেষ করে নিজ বাড়িতে ফিরে আসার ইচ্ছা করেন, তখন খলিফা সেসব আসবাব সাথে করে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন। উত্তরে আহমার বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার

[১] ইবনু জামাআ: তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম পৃ ১৭ (টীকা দ্রষ্টব্য)।



ঘরে এত কিছু ধরবে না। আমার ঘর খুব ছোট। সেখানে আমি ছাড়া আর কেউ ঢোকে না। এ কথা শুনে খলিফা হারুনুর রশিদ তাঁর জন্য একটি প্রশস্ত ঘর ও বাঁদি কিনে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁকে বাহনে করে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। তাঁর জন্য সেবক নিয়োগ করা হয়। মুহাম্মাদ ইবনুল জাহম বলেন, আমরা যখন আহমারের কাছে আসতাম, তখন সেবকগণ আমাদের অভ্যর্থনা জানাত। আমরা তাঁর অনেকগুলো প্রাসাদের একটিতে প্রবেশ করতাম। আহমার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তাঁর গায়ে থাকত শাহী পোশাক।<sup>[১]</sup>

শাহজাদাদের শিক্ষক হিসেবে কেবল আহমারই এমন আয়েশি জীবন লাভ করেছিলেন, তা কিন্তু নয়। বরং প্রায় সকল রাজপুত্রদের শিক্ষক এ রকম প্রাচুর্যের অধিকারী হয়েছেন। ইবনু খাল্লিকান লেখেন: কিসাইর জন্য বরাদ্দ করা হয় মোটা অঙ্কের বেতন। শুধু তাই নয়, নিয়োগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দশ হাজার দিরহাম প্রদান করা হয়। সাথে সুন্দরী দাসী, প্রয়োজনীয় সকল আসবাব, সেবক, তাগড়া ঘোড়া ও খচ্চরও প্রদান করা হয়।<sup>[২]</sup>

কোনো এক উপলক্ষকে কেন্দ্র করে খলিফা মুতাওয়াক্কিল তাঁর পুত্রের শিক্ষক ইবনুস সিক্কিতকে পঞ্চাশ হাজার দিনার প্রদান করেন। এ ছাড়াও তার জন্য বরাদ্দ ছিল উচ্চবেতন। এ শ্রেণীর শিক্ষকগণ অর্থের পাশাপাশি ঘর, বাড়ি, উন্নত খাবার-সহ নানা উপহার লাভ করেন।<sup>[৩]</sup>

ইতিহাসের নানা বিবরণ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, শাহজাদাদের শিক্ষকদের গড়পড়তা মাসিক বেতন ছিল এক হাজার দিরহাম। মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু তাহিরের পুত্রের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর এটাই ছিল ইবনুস সিক্কিতের বেতন।<sup>[৪]</sup> মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহও নিজ পুত্রের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর সালাবের জন্য একই পরিমাণ বেতন বরাদ্দ করেন।<sup>[৫]</sup> আর স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত হলে বরাদ্দ হতো সত্তর দিনার। সত্তর দিনার ছিল প্রায় এক হাজার দিরহামের সমান। খলিফা আবদুল্লাহ বিন তাহিরের জনৈক সেনাপতি নিজ পুত্রের জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগ দেন। তার বেতন ছিল মাসে সত্তর দিনার।

[১] মু'জামুল বুলদান ৫: ১১০।

[২] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ১: ৪৭০।

[৩] ইয়াকুত: মু'জামুল উদাবা পৃ ১৪৪।

[৪] ইবনু খাল্লিকান ২: ৪৬১।

[৫] মু'জামুল উদাবা ২: ১৪৪।

### ❖ ৩. মাদরাসার শিক্ষকবৃন্দ

শিক্ষকদের আর্থিক স্থিতির পরিচ্ছেদে মসজিদ-কেন্দ্রিক আলোচনা আমরা করতে পারছি না। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মসজিদের শিক্ষকগণ স্বেচ্ছায় পাঠদান করতেন। এক্ষেত্রে আদ্যাহর কাছে প্রতিদান ছাড়া দুনিয়াতে তারা কিছু আশা করতেন না। তা ছাড়া এই আলোচনায় সেসব জ্ঞানী ও স্থান পাবে, যারা শিক্ষক ছিলেন না বটে, তবে গ্রন্থ সংকলন ও জ্ঞানের প্রচার করে নিজেদের নামগুলো অমর করেছেন। শিক্ষকদের আলোচনায় কেন তারা স্থান পাবে, সে কারণও ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি।

আমরা নির্দিধায় এ কথা বলতে পারি যে এ শ্রেণীর আলিম ও গবেষক বিলাসবহুল জীবন লাভ করেন। উচ্চমানের বেতন ভোগ করেন। খলিফা, সম্রাট ও অভিজাত লোকেরা নানাভাবে তাদেরকে সম্মানিত করেন। হাদিয়া-তোহফায় ভরপুর করে দেন। বর্ণিত আছে, হুনাইন ইবনু ইসহাককে একের পর এক উপহার প্রদান করতেন খলিফা মামুন। তার প্রতি বাদশাহর উপহারের ধারা কখনো বন্ধ হতো না।<sup>[১]</sup>

ইমাম শাফিয়ি যখন মিশরে আসেন, তখন ইবনু আবদিল হাকাম তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। নানা উপহার দিয়ে তাঁকে খুশি করেন। শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন। তাঁর আদরযত্নে কোনো ক্রটি করেননি। নিজের অর্থ থেকে তাঁকে এক হাজার দিনার হাদিয়া দেন। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ইবনু আসামা থেকেও এক হাজার দিনার নিয়ে তাঁকে প্রদান করেন। আরও দুজন সঙ্গী থেকে এক হাজার দিনার সংগ্রহ করে তাঁকে দেন।<sup>[২]</sup>

জাহিয় তাঁর কর্মজীবনের শুরুতে সিহান এলাকায় রুটি ও মাছ বিক্রি করতেন। সে সময় তাঁর আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই করুণ। তবে জাহিয়ার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়লে তাঁর অবস্থা দ্রুত পাল্টে যায়। জাহিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানের ফলে তাঁর আর্থিক অবস্থা সফল ব্যবসায়ীদের মতো বাড়তে থাকে। একবার জাহিয় বসরায় আগমন করেন। অল্প সময় সেখানে অবস্থানের পর ফিরে যাওয়ার সময় হাদিয়ার প্রচুর অর্থ সাথে করে নিয়ে যান। মাইমুন বিন মিহরান তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, বসরায় গিয়ে আপনার কেমন খরচ হয়েছে? এ প্রশ্ন শুনে তিনি হেসে বললেন, সেখানে গিয়ে মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল মালিককে আল-হায়াওয়ান গ্রন্থটি উপহার দিই। তিনি আমাকে পাঁচ হাজার দিনার উপহার দেন। ইবনু আবি দাউদকে আল-বায়ান ওয়া তিবয়ান গ্রন্থটি উপহার দিই।

[১] Khuda Bukhsh, Islamic Civilization P, ২৭৭।

[২] ইবনু জামাআ: তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম পৃ ১৭ (টীকা দ্রষ্টব্য)।



তিনিও আমাকে পাঁচ হাজার দিনার উপহার দেন। ইবরাহিম ইবনুল আব্বাস সুলিকে আয-যারউ ওয়ান নাহলু গ্রন্থটি উপহার দিই। তিনি আমাকে পাঁচ হাজার দিনার উপহার দেন। বসরায় আমার যা লাভ হয়েছে, তা আর নবায়ন করার দরকার হবে না কখনো।<sup>[১]</sup>

ইবনু তুলুন জামে মসজিদের নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পর সেখানে ইমাম হিসেবে নামাজ পড়ান কাযি বাক্কার। ইমাম শাফিয়ির বিখ্যাত ছাত্র রবি বিন সুলাইমান সেখানে হাদিস লেখার কাজে যোগ দেন। ওই দিনই শাসক আহমাদ বিন তুলুন খুশি হয়ে এক হাজার দিনারের একটি থলে তাঁকে উপহার দেন।<sup>[২]</sup>

অনেক আলিম ও জ্ঞানী একাধিক পদ লাভ করেন। অনেকে একই সঙ্গে ফকিহ, বিজ্ঞানী ও গল্পকার ছিলেন। এ স্তরের অনেকে যাজ্জাজের (মৃত্যু ৩১০ হিজরি) মতো বেতন লাভ করতেন। যাজ্জাজের বেতন ছিল গল্পকার, ফকিহ ও জ্ঞানীর স্তরে। সবগুলো পদ মিলিয়ে তার বেতন গিয়ে দাঁড়াত তিন শ দিনার।<sup>[৩]</sup>

ইবনু দুরাইদ (মৃত্যু ৩২১ হিজরি) যখন বাগদাদে আসেন, তিনি ছিলেন ভীষণ দরিদ্র। তবে খলিফা মুকতাদির তাঁর জন্য মাসিক পঞ্চাশ দিনার বরাদ্দ করেন।<sup>[৪]</sup>

যখন মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সরকারি অর্থতহবিল থেকে অথবা মাদরাসার জন্য বরাদ্দ ওয়াকফ প্রকল্প থেকে শিক্ষকদের জন্য মাসিক বেতন বরাদ্দ থাকত। প্রায় সব মাদরাসাতেই কিছু ওয়াকফ প্রকল্প থাকত। যার আয় থেকে মাদরাসার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হতো। শিক্ষকদের স্তর ও ওয়াকফ প্রকল্পের আয় অনুপাতে বেতনের মাঝে তারতম্য ঘটত। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের বেতন হতো উচ্চ মানের।

ফাতিমি রাজবংশের জমানার শিক্ষকদের অবস্থা সম্পর্কে মাকরিযি<sup>[৫]</sup> ও কালকাশান্দি<sup>[৬]</sup> খুবই উপকারী তথ্য লেখেন। কেবল শিক্ষকদের বেতনই নয়, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদের বেতন ভাতার বিবরণও সেখানে উল্লেখ আছে। এসব পদের মধ্যে আছে প্রধান আহ্বায়কের পদও। ফাতিমিদের শাসনামলে শিক্ষক

[১] মু'জামুল উদাবা ৬: ৭৫-৭৬।

[২] হুসনুল মুহাযারা ২: ১৩৭।

[৩] আল ফিহরিস্ত ৯০।

[৪] মিতয: আল হাদারাতুল ইসলামিয়া ১: ৩০৯ (উৎস: Wastenfeld AGGW, ৩৭, Nr. ৯২।

[৫] আল-খুতাত ১: ৪০১-৪০২।

[৬] সুবহুল আ'শা ৩: ৫২৫-৫২৬।

শ্রেণীর মাঝে এ পদটি একেবারেই নতুন। সেই বিবরণের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরাছি। রাষ্ট্রের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের তুলনায় শিক্ষকশ্রেণির বেতন কেমন ছিল, এখান থেকেই তা অনুমান করা যায়।

পদ	মাসিক বেতন (দিনার)
উজির	৫০০০
উজিরপুত্র	৩০০-২০০
দস্ত শরিফের লেখক	১৫০
দ্বার-প্রহরী	১২০
প্রধান বিচারপতি	১০০
দাঈদ দুআত (প্রধান আহ্বায়ক)	
অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলি	
রাজকোষ রক্ষী	
পত্রবাহক	
নথি-বাহক	
তরবারি রক্ষী	৭০
তির রক্ষী	
পর্যবেক্ষণ বিভাগীয় প্রধান	
বিশেষ চিকিৎসক	৫০
তদন্ত বিভাগের প্রধান	
সংসদ বিভাগীয় প্রধান	৪০
মসজিদে উপদেশদাতা	২০-১০
খলিফার কবি	
রাজপ্রাসাদে অবস্থানকারী অন্যান্য চিকিৎসক	১০

আইয়ুবী শাসনামলে শিক্ষকদের জন্য নিয়মিত কোনো বেতন ছিল না। বরং শিক্ষকদের স্তর, মাদরাসার ওয়াকফ প্রকল্পের পরিমাণ ইত্যাদির ধরন অনুযায়ী শিক্ষকদের ভাতার মাঝে তারতম্য ঘটত। তা ছাড়া সেই আমলের শাসকদের মনোভাব শিক্ষকদের বেতনে প্রভাব ফেলত। শাসক যদি দানশীল ও উদার



হতেন, জ্ঞানের কদর বুঝতেন, তাহলে শিক্ষকদের জন্য দানের হাত প্রসারিত করতেন। আর যদি শাসক কৃপণ ও মিতবায়ী হতেন, তবে ওয়াকফ প্রদানের আয় বা ওয়াকফকারীর শর্ত যতই জোরালো থাকুক, শিক্ষকের স্তর যতই ওপরে হোক, শিক্ষকদের বেতন তাতা কমিয়ে দিতেন। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ সুয়ুতি এই প্রবণতার কিছু সুস্পষ্ট উদাহরণ তুলে ধরেছেন। নিচে এ রকম একটি ঘটনা তুলে ধরিছি :

ইমাম শাফিয়ির পাশেই আল-মাদরাসাতুস সালাহিয়া প্রতিষ্ঠা করেন সালাহুদ্দিন আইয়ুবি। এরপর সেখানে শিক্ষকতা ও মাদরাসার যাবতীয় বিষয় দেখাশোনার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন শাইখ নাজমুদ্দিন খাবুশানির হাতে। তাঁর জন্য এবং তাঁর পরে যারা এ পদে বসবে তাদের জন্য নিম্নোক্ত বেতন নির্ধারণ করেন :

- » যারা শিক্ষকতা করবে তাদের জন্য মাসে চল্লিশ দিনার।
- » যারা মাদরাসার ওয়াকফ প্রকল্পগুলো পরিচালনা করবে তাদের জন্য মাসে দশ দিনার।
- » পাশাপাশি তাদের জন্য থাকবে রোজ ষাট রিতিল পরিমাণ রুটি এবং নীল নদের দুই মশক পানি।

সুয়ুতি বলেন, খাবুশানির তত্ত্বাবধানে মাদরাসা খুব ভালোভাবেই পরিচালিত হয়। এরপর ৫৮৭ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। ওয়াকফকারীর জীবদ্দশাতেই সেই পদে বসেন শাইখুশ শুয়ুখ সদরুদ্দিন আবুল হাসান মুহাম্মাদ জুওয়াইনি। এরপর ওয়াকফকারী মারা গেলে সেই পদ থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এরপর তাতে একের পর এক সুলতানদের হস্তক্ষেপ ঘটতে থাকে...। আইয়ুবি রাজবংশের পর যেসব সুলতান ক্ষমতার মসনদে বসেন, তারাও সেখানে ক্ষমতার প্রদর্শন করতে থাকেন। ফলে শিক্ষাবিভাগ অস্থির ও বেসামাল হয়ে ওঠে। কখনো মাদরাসা শিক্ষকশূন্য হয়ে যায়। আবার কখনো সহকারী শিক্ষকদের দিয়ে কাজ চালানো হয়। কখনো নির্ধারিত বেতনের অর্ধেক ভাতা দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। আবার কখনো এক চতুর্থাংশ বেতন দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। অবশেষে বুরহানুদ্দিন খিদির সানজারি ক্ষমতায় এসে উপর্যুক্ত ওয়াকফের শর্ত অনুযায়ী কোনো কর্তন না করে ওই পদের জন্য নির্ধারিত পুরো বেতন ধার্য করেন।<sup>[১]</sup>

সালাহুদ্দিন আইয়ুবির প্রতিষ্ঠিত আরেকটি বিখ্যাত মাদরাসা হলো আল-মাদরাসাতুল ইউসুফিয়া। মাদরাসাটি নির্মাণ করে সেখানে শিক্ষকতার জন্য

[১] হুসনুল মুহাযারা ২: ১৫৭।

শাইখ মাজদুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ জিবতিকে নিয়োগ দেন। তাঁর জন্য প্রতি মাসে এগারো দিনার বেতন ধার্য ছিল।<sup>[১]</sup>

শিক্ষকদের আর্থসামাজিক অবস্থানের আলোচনায় আরেক প্রকার শিক্ষকের আলোচনা ভুলে যাওয়া উচিত নয়, যারা উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। বিনিময়ে তাদের থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলো ছিল একেকটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মতো। এসব শিক্ষকের আর্থিক অবস্থাও ছিল বলার মতো। কারণ বিদ্যানুরাগী ও শিক্ষার্থীরা তার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য সাধ্যমতো খরচ করত। যাজ্জাজ বলেন, আমি কাঁচে দাগ ঐকে নকশা তৈরির কাজ করতাম। কিছুদিন পর আমার ভেতর আরবি ব্যাকরণ শেখার তুমুল আগ্রহ জন্ম নেয়। এরপর আমি মুবাররিদের কাছে ব্যাকরণ শিখতে গেলাম। তিনি বিনামূল্যে কিছু শেখাতেন না। আমাকে বললেন, তুমি কী কাজ করো? বললাম, কাঁচে দাগ ঐকে নকশা তৈরি করি। প্রতিদিন আমার এক-দেড় দিরহাম করে আয় হয়। আমি চাই, আপনি আমাকে বেশি করে সময় দিন। বেশি করে ব্যাকরণ শেখান। আমি আপনাকে প্রতিদিন এক দিরহাম করে দেব। আর কথা দিচ্ছি, আমার শেখা শেষ হয়ে যাক বা আপনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাক—আজীবন আপনাকে রোজ এক দিরহাম করে দিয়েই যাব। যাজ্জাজ বলেন, এরপর আমি তার সঙ্গে ওঠাবসা শুরু করি। সবসময় তার সঙ্গে সময় কাটাই। সবক্ষেত্রে তার সেবা করি। তারপরও প্রতিদিন তাকে এক দিরহাম করে দিয়ে যাই। তিনি আমাকে বেশি করে জ্ঞানার্জনের উপদেশ দিতেন। শেষ পর্যন্ত আমার পড়াশোনা শেষ হয়। তখন একবার তার কাছে মাযিমা গোত্র থেকে তাদের সন্তানদের জন্য ব্যাকরণের শিক্ষক চেয়ে একটি চিঠি আসে। তা দেখে আমি বললাম, তাদেরকে আমার কথা বলুন। তিনি তাদেরকে আমার কথা বললেন। তারা সম্মত হলে আমি তাদের কাছে চলে গেলাম। তাদেরকে ব্যাকরণ শেখাতে লাগলাম। আর প্রতি মাসে ত্রিশ দিরহাম করে উস্তায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতাম। পরবর্তী সময় সাধ্যমতো বেশিও পাঠাতাম। এভাবে একটা সময় পর্যন্ত চলতে লাগল। একদিন শাসক উবায়দুল্লাহ বিন সুলাইমান তার পুত্র কাসিমের জন্য মুবাররিদের কাছে শিক্ষক চাইলেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমার জানামতে এই মুহূর্তে কোনো শিক্ষক নেই। তবে মাযিমা গোত্রে কর্মরত একজন আছেন, যিনি মূলত কাঁচে নকশা তৈরির কাজ করেন। এরপর খলিফা উবায়দুল্লাহ মাযিমা গোত্রে চিঠি লিখলেন আমাকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য। তারা আমাকে অব্যাহতি দিল। খলিফা আমাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলেন। শাহজাদা কাসিমকে আমার হাতে তুলে দিলেন পড়ানোর জন্য। এই ছিল আমার

[১] নাকরিযি: আল-খুতাত ২: ৩৬৫।



ধনী হওয়ার ইতিহাস। যতদিন সুবাররিদ বেঁচে ছিলেন, ততদিনই তাকে এক দিরহাম করে দিয়ে গেছি। সাধ্যমতো তাঁর খোঁজখবর নিতে আমি কোনো ক্রটি করিনি।<sup>[১]</sup>

সুবারমান নামে খ্যাত মুহাম্মাদ বিন আলি বিন ইসমাইল ছিলেন ব্যাকরণে পারদর্শী। সিবাওয়াইর বিখ্যাত ব্যাকরণগ্রন্থ পড়ানোর জন্য তিনি এক শ দিনার করে নিতেন।<sup>[২]</sup> তেমনি শাইখ শামসুদ্দিন সুয়ুতি ছিলেন আরবি ভাষাবিদ ও পণ্ডিত। খুব সুন্দর করে তিনি আরবি ভাষার পাঠ দিতেন। আলফিয়া ইবনু মালিক গ্রন্থের প্রতিটি কবিতা পড়ানোর বিনিময়ে তিনি এক দিরহাম করে নিতেন।<sup>[৩]</sup>

### নিজামিয়া মাদরাসার শিক্ষকমণ্ডলী

নিজামিয়া মাদরাসাগুলো ছিল উচ্চশিক্ষার জন্য বিখ্যাত। তাই সেসব মাদরাসার শিক্ষকগণও ছিলেন সুনামধন্য এবং যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। এসব মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িত্বে থাকা কয়েকজন মনীষীর নামের তালিকা আমি করতে পেরেছি। জ্ঞানী ও মুসলিম সমাজে এসব মনীষীর ছিল বিপুল প্রভাব-পরিচিতি। নিজামিয়া মাদরাসাগুলোর শিক্ষার মান কত উন্নত ছিল, এ তালিকা পড়লেই তা অনুমান করা যায়। পাশাপাশি এসব নাম আমাদেরকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করবে। তা হলো, এসব মাদরাসাগুলো কখন বিলুপ্ত হয়। বিশেষ করে সবচেয়ে বিখ্যাত বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসার ইতিহাস কখন শেষ হয়, তা জানা যাবে। নিচে মৃত্যুর তারিখ অনুযায়ী সেসব মহান শিক্ষকের নাম উল্লেখ করলাম :

শিক্ষকের নাম	মৃত্যুর সন (হিজরি)	যে-এলাকার নিজামিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন	তথ্যসূত্র
আবু ইসহাক শিরায়ী	৪৭৬	বাগদাদ	ইবনু খাল্লিকান: ১/৬
আবু নাসর সাকবাগ	৪৭৭	বাগদাদ	তারিখু আলে সালজুক: পৃ. ৭৫

[১] ইয়াকুত: মু'জামুল উদাবা ১: ৪৭-৪৮।

[২] বুগিয়াতুল ওয়াত পৃ ৭৪।

[৩] প্রাগুক্ত তথ্যসূত্র পৃ ৩৭।

ইমামুল হারামাইন আবুল আমালি ইউসুফ জুওয়াইনি	৪৭৮	নিশাপুর	ইবনু খাল্লিকান: ১/৪০৭
আবুল কাসিম আলভী দাব্বুসী	৪৮২	বাগদাদ	ইবনুল আসির: ১০/৬৭
আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনু সাবিত খুজানদি	৪৮৩	আসফাহান	ইবনুল আসির: ১০/২৫১
মুহাম্মাদ ইবনু সাবিত শাফিয়ী	৪৮৩	আসফাহান	সাইদ নাকিস: পৃ. ২
আবু বকর আশ-শাসী	৪৮৫	হেরাত	তাবাকাতুশ শাফিয়ীয়া (৩/৭৯-৮০) এবং ইবনুল ইমাদের রচিত শাযারাতুয যাহাব গ্রন্থ অনুসারে (৩/৩৭৫)। ক্রকিলমান (১/৩৯০) এক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন ইবনুল আসিরের বলা মৃত্যুসনটি (৫০৭ হিজরি)।
মুহাম্মাদ ইবনু আলি ইবনু হামিদ	৪৯৫	হেরাত	ইবনু কাযি শাহবা ১৬৫
আবু আবদিল্লাহ তাবারী	৪৯৫	বাগদাদ	ইবনুল আসির: ১০/১২৩
আবদুর রহমান বিন মামুন	৪৯৮	বাগদাদ	ইবনুল আসির: ১০/৯৬
আবু মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহাব শিরায়ী	৫০০	বাগদাদ	ইবনুল আসির: ১০/১৬৩
আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া খতীব তাবরিযী	৫০২	বাগদাদ	মুজামুল উদাবা: ৭/২৮৭
ইলকিয়া হিরাসী	৫০৪	বাগদাদ	কাশফুয যুনুন: ১/৪৫
আবু হামিদ গাযালী	৫০৫	বাগদাদ ও নিশাপুর	মুকাদ্দিমাতু ইহয়াউ উলুমিদ্দিন
আলী বিন মুহাম্মাদ বিন ফাসিহী	৫১৬	বাগদাদ	মুজামুল উদাবা: ৫/৪১৫
আবুল ফাতহ বিন বুরহান	৫১৮	বাগদাদ	তাবাকাতুশ শাফিয়ীয়া: ৪/৪২
আবু সাইদ বাযযার	৫২০	বাগদাদ	তাবাকাতুশ শাফিয়ীয়া: ৪/৩২৩



আহমাদ গায়ালী	৫২০	বাগদাদ	ইবনু খাল্লিকান: ১/৩৯
আহমাদ মাইহানী	৫২৮	মার্ত	তাবাকাতুশ শাফিয়্যা: ৪/২০৩
মুঈনুদ্দিন সাইদ ইবনুর রায়যায়	৫৩৮	বাগদাদ	আর-রাওয়াতাইন: ১/১৮৫
মুঈনুদ্দিন সাইদ ইবনুর রায়যায়	৫৩৮	বাগদাদ	শাযারাতুয যাহাব: ৪/১২২
মাওদুব বিন আহমাদ জাওয়ালিকী বাগদাদী	৫৩৯	বাগদাদ	মুজামুল উদাবা: ৭/১৯৮
মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া	৫৪৮	নিশাপুর	ইয়াদগার (ফারসি পুস্তিকা)
আবু সাইদ আহমাদ বিন আবু বকর	৫৫১	আসফাহান	ইবনুল আসির: ১১/৩৫
শরফুদ্দিন ইউসুফ দিমাশকী	৫৫৭	বাগদাদ	ইবনুল আসির: ১১/১৭৪
শাইখ আবুন নজিব	৫৬৩	বাগদাদ	ইবনুল আসির: ১১/১০০
ইউসুফ দিমাশকী	৫৬৩	খুরিস্তান	ইবনুল আসির: ১১/২১৯
রযিয়ুদ্দিন কায়ভিনী	৫৭৫	বাগদাদ	ইবনুয জুবাইর: ২১৯
আবুল বারাকাত আনবারী	৫৭৭	বাগদাদ	ইবনু খাল্লিকান: ১/৩৯৪- ৩৯৫
আবুল খায়ির ইসমাইল কায়ভিনী	৫৮১	বাগদাদ	ইবনুল আসির: ১১/৩৪৪
আবু তালিব মুবারক ইবনুল মুবারক	৫৮৫	বাগদাদ	মুজামুল উদাবা: ৬/২৩০
মুহিউদ্দিন আবু হামিদ	৫৮৬	মুসেল	ড. দাউদ জালবি, মুসেলে পাওয়া হস্তলিখিত গ্রন্থ পৃ. ১০
মাজদুদ্দিন আবু আলি ইয়াহইয়া ইবনুর রবি	৬০৬	বাগদাদ	ইবনুল আসির: ১১/৩৪৪
ইয়াহইয়া ইবনুল কাসিম	৬১৬	বাগদাদ	মুজামুল উদাবা: ৭/২৮৯
বাহাউদ্দিন ইবনু শাদদাদ	৬৩২	বাগদাদ	Hitti . p. 411
নাজমুদ্দিন বায়রাই	৬৫৫	বাগদাদ	আন-নুআইমি: ১/২০৫

আবুল মানাবিক যুনজানি	৬৫৬	বাগদাদ	তাবাকাতুশ শাফিয়িয়া: ৫/১৫৪
শামসুদ্দিন কিশী	৬৬৫	বাগদাদ	আল-আযাভী: ১/২৬৩
নাহিদুদ্দিন ফারুকী	৬৭২	বাগদাদ	আল-আযাভী: ১/২৭৫
মাজদুদ্দিন বিন জাফর	৬৮২	বাগদাদ	আল-আযাভী: ১/৩১৮
শরফুদ্দিন শাহরাস্তানী	৬৯১	বাগদাদের সহকারী শিক্ষক	তারিখু উলামায়ি বাগদাদ: পৃ. ৩৭
মুহাম্মাদ ইবনুল ওকায়লী	৮ম শতকের শুরুর দিকে	বাগদাদ	আল-আযাভী: ২/২২৬
আবদুল্লাহ বিন বাকতশ	৮ম শতকের শেষদিকে	বাগদাদ	আল-আযাভী: ২/৩২৯
ফিরুজাবাদী	৮১৭	বাগদাদে ইবনু বাকতশের সহকারী	আল-আযাভী: ২/৩২৯

## ❖ দুটি টীকা

১. মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার পর সেখানে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিতেন উজির নিজামুল মুলক। অনেক সময় কেবল একজন শিক্ষককে কেন্দ্র করেই একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া হতো। তখন শিক্ষক নিয়োগ হয়ে যেত আগেই। তবে বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসা উদ্বোধনের দিন একটি অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে যায়। সেদিকে আমি ইঙ্গিত করছি:

ইবনুল আসির লেখেন:<sup>[১]</sup> ৪৪৯ হিজরির যিলকদ মাসে বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসার নির্মাণকাজ শেষ হয়। সেখানে দরস প্রদানের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয় শাইখ আবু ইসহাক শিরায়ীকে। প্রথম দিন দরসে উপস্থিত হওয়ার জন্য মানুষ জমায়েত হয়। সবাই ছিল শাইখের আগমনের অপেক্ষায়। কিন্তু তিনি দেরি করছিলেন। খোঁজ নিয়েও তাঁকে পাওয়া যায়নি। বিলম্বের কারণ হলো, এক লোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলল, জোরপূর্বক দখল করা জায়গায় আপনি কী করে দরস দেবেন? ওই লোকের কথা শুনে সেখানে তিনি শিক্ষকতার ইচ্ছা বর্জন করেন। এরপর বেলা হয়ে গেলে সমবেত লোকজন হতাশ হয়ে পড়ে। তখন আশ-শামিল গ্রন্থকার বিশিষ্ট মনীষী আবু নাসর ইবনুস

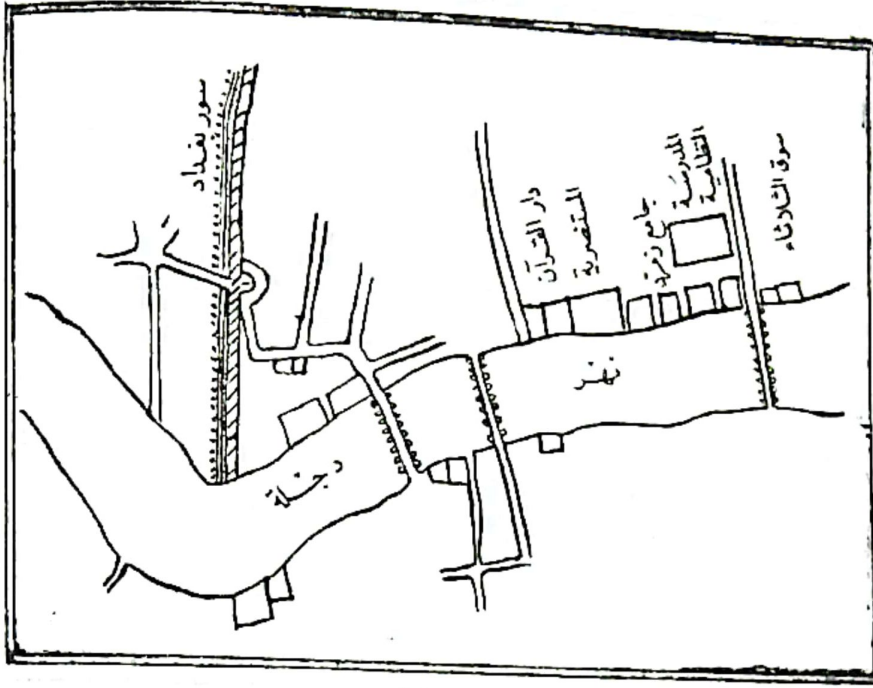
[১] আল কামিল ফিত তারিখ ১০: ৩৮।



সাব্বাগকে সাময়িক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের পরামর্শ দিয়ে শাইখ আবু মনসুর বিন ইউসুফ বলেন, এই প্রথমবার মানুষ এখানে জড়ো হয়েছে। শিক্ষকের উপস্থিতি ছাড়া এই জমায়েত বিচ্ছিন্ন হবে না। হওয়া উচিতও নয়। এরপর শাইখ আবু নাসর সেখানে দরস দিতে বসেন। অপরদিকে নিজামুল মুলক এই খবর শুনে শাইখ আবু ইসহাককে অনুরোধ জানান আসার জন্য। মাদরাসার জমি নিয়ে তাঁর মন থেকে সন্দেহ দূর করে দেন। অবশেষে শাইখ শিরায়ী সেখানে দরস দেওয়া শুরু করেন। ইবনুস সাব্বাগ সেখানে কেবল বিশ দিন দরস দিয়েছিলেন।

২. নানা তথ্যসূত্র ঘেঁটে গবেষণার আলোকে এবং উপর্যুক্ত তালিকা থেকে এ কথা বলতে পারি যে, অন্যান্য স্থানের নিজামিয়া মাদরাসার তুলনায় বাগদাদের নিজামিয়ার স্থায়িত্ব ছিল বেশি। হিজরি পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের আলোচনায় খুরাসান, মুসেল, নিশাপুর, আসফাহান, মার্ভ ইত্যাদি অঞ্চলের নিজামিয়া মাদরাসাগুলোর কথা উল্লেখ থাকলেও বাগদাদের নিজামিয়ার বিবরণ পরবর্তী শতাব্দীর অনেক ইতিহাসগ্রন্থে পাওয়া যায়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসা ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলের নিজামিয়া মাদরাসাগুলো হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীতে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর প্রধান কারণ ছিল, সেলজুকদের পতনের পর এসব অঞ্চলে চলে লাগাতার যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানি আর ক্ষমতার লড়াই। অপরদিকে বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসার অবস্থান ছিল রাজধানী বাগদাদে। বাগদাদ ছিল অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে সমৃদ্ধ। ফলে বাগদাদ ও এর প্রতিষ্ঠানগুলো হিজরি নবম শতকের গোড়া পর্যন্ত সুমহিমায় টিকে ছিল। মনে হচ্ছে, এ সময়ের মাঝে বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসাও বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ ওই শতাব্দীর সূচনালগ্নে মৃত্যুবরণকারী ফিরুজাবাদীর পর মাদরাসাটির আর কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। আমাদের এই ধারণার পেছনে আরও কিছু যুক্তি আছে: এ সময়ে (৮১৩ হিজরিতে) তুর্কমেন বাহিনী সিরিয়ার ভূখণ্ডে মিশরীয় ও পারসিকদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। তা ছাড়া আনাদোলিয়াতেও তারা তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এসব ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি ঘটে। বাগদাদের অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন ও স্থাপনা বিলীন হয়ে যায়। ধারণা করা হয়, এসব যুদ্ধে বিলীন হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম হলো বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসা। তা ছাড়া এসব লড়াই ও সংঘাতের কারণে অর্থনৈতিক সঙ্কট ও মন্দা তৈরি হয়। আর সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে শাসক ও ক্ষমতাসালীরা যে-যার মতো করে নানা ওয়াকফ প্রকল্প ও স্থাপনা দখল করে নেয়। এরপর সেগুলোও

নষ্ট ও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেলে জনৈক শাসক সেগুলো নিজের খাস সম্পত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করে নেন।<sup>[১]</sup> এভাবেই অপমৃত্যু ঘটে একটি কালজয়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের।



হিজরি সপ্তম শতকে বাগদাদ শহরের আনুমানিক মানচিত্র।

তাতে চিহ্নিত করা হয়েছে নিজামিয়া মাদরাসার অবস্থান।

৩) বিশ্ববিখ্যাত এ মহান মাদরাসার এতটাই করুণ পরিণতি হয়েছিল যে, মাদরাসাটি কোন জায়গায় অবস্থিত ছিল, সেটি নিয়েও গবেষকগণ একমত হতে পারেননি। কারণ লুটেরা ও দুর্বৃত্তরা এ মাদরাসা দখল করে নিজেদের খাস সম্পদ বানিয়ে ফেলে। ইতিহাসের নানা গ্রন্থ ঘেঁটেও নিজামিয়া মাদরাসার সেই স্থান সম্পর্কে চূড়ান্ত নির্দেশনা পাইনি। যার ফলে ১৯৫০ সনে আমি যখন বাগদাদে যাই, তখন অনুমান করে সেই স্থানটি চিহ্নিত করার চেষ্টা করি। এ ব্যাপারে ড. মুস্তাফা জাওয়াদ-সহ ইরাকের নামকরা আলিমদের সাহায্য নিই। তা ছাড়া প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ইতিহাসের গ্রন্থসমূহ থেকে পাওয়া যে কয়টি ক্ষুদ্র তথ্য আমার কাছে ছিল, সেগুলোও বেশ কাজে আসে।<sup>[২]</sup> নিজামিয়া মাদরাসা যেখানে অবস্থিত ছিল বলে ধারণা করা হয়, ড. জাওয়াদকে নিয়ে আমি সেই স্থানটি দেখতে যাই। কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও প্রাচীন স্থাপনা এখনো টিকে

[১] ১৯৪২ সনে প্রকাশিত আল ইলমুল জাদিদ সাময়িকীতে উস্তায মুস্তাফা জাওয়াদের লেখা প্রবন্ধটি পড়ুন: পৃ ১১৫।

[২] ইবনুল আসির ১০ পৃ ৭১, ৭৩ আরও দেখুন: তাবাকাতুশ শাফিইয়া ৩: ৯০।



আছে। এসব গবেষণার ফলস্বরূপ আমরা ধারণা করি, বর্তমানে যেখানে মাজার তৈরির মার্কেট, সেখানেই ছিল বাগদাদের ঐতিহাসিক নিজামিয়া মাদরাসা। নিচের চিত্র থেকে মনে হয়েছে, হিজরি সপ্তম শতকে আনুমানিক এটাই ছিল নিজামিয়া মাদরাসার এলাকার মানচিত্র।<sup>[১]</sup>

## সহকারী শিক্ষকবৃন্দ

আরবি ইতিহাসগ্রন্থে সহকারী শিক্ষকদের স্তর ও দায়িত্বের কথা পাওয়া যায়। তাদের স্তর ছিল শাইখদের নিচে এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপরে। তাদের দায়িত্ব ছিল, শাইখ দরস শেষ করে চলে যাওয়ার পর শিক্ষার্থীদের সামনে দরস রিপিট করা। তাকে বলা চলে জ্ঞান বিতরণে শাইখের সহযোগী।<sup>[২]</sup> সুবকী লেখেন:<sup>[৩]</sup> শাইখের দরস শোনার জন্য ছাত্রদের সঙ্গেই বসতেন সহকারী শিক্ষক। তবে দরস গ্রহণের পাশাপাশি তার দায়িত্ব ছিল দুর্বোধ্য বিষয়গুলো ছাত্রদের বুঝিয়ে দেওয়া। শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা। দরস শেষে শাইখ উঠে যাওয়ার পর তার দায়িত্ব শুরু হতো। বোঝা গেল, শিক্ষকের কাজ শেষ হওয়ার পর শুরু হতো সহকারী শিক্ষকের কার্যক্রম। তার অন্যতম কর্তব্য ছিল, দরসের কঠিন বিষয়গুলো সহজভাবে তুলে ধরা। অথবা প্রথমবার যেসব বিষয় বুঝতে কষ্ট হয়েছিল, দ্বিতীয়বার তা বুঝিয়ে দুর্বল ছাত্রদের সহায়তা করা। ধারণা করা হয়, হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে মাদরাসাগুলোতে এ পদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ ধারণার কারণ হলো, এই শতকের পূর্বে ইতিহাসে কোথাও তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। এরচেয়েও জোরালো কারণ হলো, সহকারী শিক্ষকের পদ ছিল প্রতিষ্ঠানিক মাদরাসার সঙ্গে যুক্ত। আর প্রাতিষ্ঠানিক মাদরাসার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে হিজরি পঞ্চম শতকের শেষার্ধ্বে।

কেন প্রাতিষ্ঠানিক মাদরাসার সঙ্গেই এ পদ যুক্ত হলো? কারণ মাদরাসায় যেসব শিক্ষার্থী পড়তে আসত, তাদের মেধা ও যোগ্যতা হতো নানা স্তরের। ফলে দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে অন্যান্য ছাত্রের সঙ্গে এগিয়ে নেওয়ার কাজে সহায়তা করতেই সহকারী শিক্ষক পদের সৃষ্টি। অপরদিকে মসজিদ-ভিত্তিক পাঠশালায় কোনো শিক্ষার্থী যদি নিজের দুর্বলতা ও পিছিয়ে পড়া টের পেত, তখন সে তার স্তর অনুপাতে অন্য দরসে গিয়ে বসতো।

[১] প্রাপ্তান্ত ড. মুস্তফা জাওয়াদের প্রবন্ধটি পড়ুন।

[২] তায়কিরাতুস সামি' ১৫০ (টিকায় দ্রষ্টব্য)।

[৩] মুঈদ্দুন্নিআম ওয়া মুবিদ্দুন্নিআম ১৫৪-১৫৫।

নাশাপাশি সব দরসেই থাকত কিছু প্রতিভাবান ছাত্র। শিক্ষকদের সঙ্গে তারা সবসময় যোগাযোগ রাখত। শিক্ষকদের কাছে বেশি করে সময় দিত। ফলে ধীরে ধীরে তারা সহকারী শিক্ষকে পরিণত হয়। এরপর নিজেদের প্রতিভা ও যোগ্যতার বলে নিজেরাই সুতন্ত্র দরসগাহ শুরু করে। ইবনু খাল্লিকান লেখেন :<sup>[১]</sup> আবুত তায়্যিব তাবারীর কাছে দীর্ঘদিন অবস্থান করেন আবু ইসহাক শিরায়ী। নানা শাস্ত্রে তাঁর থেকে উপকৃত হন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর মজলিসে দরস দিতেন শিরায়ী। শিরায়ীকে তিনি সহকারী শিক্ষক বানিয়ে নেন। পরবর্তী কালে শিরায়ী হয়ে ওঠেন বাগদাদের বিখ্যাত ইমাম।

নিজামিয়া মাদরাসাগুলোর আলোচনায় সহকারী শিক্ষকদের উল্লেখ বেশি পাওয়া যায়। আবু শামা লেখেন :<sup>[২]</sup> ফকিহ আবুল ফাতাহ ইবনু আবিল হাসান আশতারী নিজামিয়া মাদরাসায় সহকারী শিক্ষক ছিলেন। তেমনি ইবনুল আসির বর্ণনা করেন :<sup>[৩]</sup> ৬০২ হিজরিতে ইন্তেকাল করা আবুল হাসান আলি বিন আলি বিন সাআদাহও নিজামিয়ায় সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

আইয়ুবী শাসনামলে সহকারী শিক্ষকের পদ বেশ সমাদর পায়। সে আমলে প্রতিষ্ঠিত প্রায় সব মাদরাসাতেই এ পদের অস্তিত্ব ছিল। সালাহুদ্দিন আইয়ুবী যখন আল-মাদরাসাতুন নাসিরিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সেখানে শিক্ষক ও ওয়াকফ প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে খাবুশানিকে নিয়োগ দেন। পাশাপাশি অনেক সহকারী শিক্ষকও নিযুক্ত করেন।<sup>[৪]</sup> আল-মালিকুস সালিহ (পুণ্যবান সম্রাট) উপাধিতে খ্যাত খলিফা নাজমুদ্দিন আইয়ুব আল-মাদরাসাতুস সালিহিয়া প্রতিষ্ঠা করার পর সেখানে চারজন শিক্ষক নিয়োগ দেন। প্রত্যেক শিক্ষককে সহযোগিতার জন্য দুজন করে সহকারী নিযুক্ত করেন।<sup>[৫]</sup>

স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক মাদরাসার শিক্ষার মান একই রকম ছিল না। এমনও হতে পারে যে, এক মাদরাসার সহকারী শিক্ষক অন্য মাদরাসায় মূল শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতেন। কারণ ওই মাদরাসার শিক্ষার মান ছিল দ্বিতীয় মাদরাসা থেকে উন্নত। ফলে ওই মাদরাসায় সহকারীর পদ পাওয়া অন্য মাদরাসার সুতন্ত্র শিক্ষকের চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিল না। অনেক সময় একজন ব্যক্তি একইসাথে উভয় পদ সামলাতেন। এক মাদরাসার শিক্ষক অন্য

[১] ওয়াফয়াতুল আ'য়ান ১: ৫।

[২] আর রাওয়াতাইন ১: ১৩।

[৩] আল কামিল ১২: ১৬১।

[৪] সুয়ুতি: হুসনুল মুহাদারা ২: ১৫৭, আল-খুতাত ২: ৪০০।

[৫] আল-খুতাত ২: ৩৭৪।



মাদরাসায় সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। এক্ষেত্রে সেই মাদরাসার প্রধান শিক্ষক জ্ঞানে পরিপক্ব, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হতো। ফলে তার সহকারী হিসেবে কাজ করলে অনেক উপকার ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা যেত। সুযুতি লেখেন: [১] নুসাইর ইবনুত তাব্বাখ ছিলেন ফিকহের শাখাগত মাসআলার ব্যাপারে গভীর জ্ঞানী। তিনি আল-কিতাবিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন, পাশাপাশি আস-সালিহিয়া মাদরাসায় ইবনু আবদিস সালামের সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আবার অনেক সময় দেখা যায়, কোনো মাদরাসায় প্রধান শিক্ষক ছিল না। শুধু সহকারী শিক্ষকগণ পাঠদান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। এভাবে তারা সহকারী হিসেবে শিক্ষকতার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করলেও পূর্ণ শিক্ষকের মতো বেতন পেতেন না। সুযুতি লেখেন: [২] আস-সালিহিয়া মাদরাসায় টানা ত্রিশ বছর পূর্ণ শিক্ষক পদবির কেউ ছিল না। এ দীর্ঘ সময় জুড়ে কেবল সহকারী শিক্ষকগণই শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ত্রিশ বছর পর সেখানে সূতন্ত্র শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। [৩]

## শিক্ষকদের আচরণ ও দায়িত্ব

বাগ্‌বিধি, সংলাপ রচনার পদ্ধতি, বক্তব্যকে গুছিয়ে বলার নিয়ম ইত্যাদি সম্পর্কে সুবহুল আ'শা গ্রন্থে সুদীর্ঘ অধ্যায় রচনা করেছেন কালকাশান্দি। [৪] তবে সেই অধ্যায়ের কোথাও তিনি 'শিক্ষক' শব্দটি উল্লেখ করেননি। তা থেকে অনেকে মনে করতে পারেন যে, সেখানে শিক্ষক উদ্দেশ্য নয়। তবে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, ওই অধ্যায়ের গোটা আলোচনাই শিক্ষককে কেন্দ্র করে। এর কারণ হলো, কালকাশান্দি খতিব ও খিতাবত শব্দের ব্যবহার করেছেন। তা ছাড়া বক্তা শব্দটিও ব্যবহার করেছেন। আর সে সময় 'মুহাদারা' শব্দের পরিবর্তে 'খুতবা' শব্দ ব্যবহৃত হতো—সেটিও আমরা সহকারী শিক্ষকদের আলোচনায় উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ খতিব হলেন মুহাদির। তাই যদি হয়, তবে সংলাপ-নির্মাতা (সানিউল কালাম) বলে শিক্ষক (মুদাররিস) উদ্দেশ্য হবে এটাই স্বাভাবিক। কালকাশান্দি সংলাপ-নির্মাতার গুণ অর্জন করার জন্য যেসব শর্ত উল্লেখ করেছেন, তা নানা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য ধার্য করা শর্তগুলোর সঙ্গে অনেকাংশে মিলে যায়। শিক্ষক পদে নিয়োগ পেতে আগ্রহীদের

[১] হুসনুল মুহাদারা ১: ১৯৪।

[২] প্রাগুক্ত তথ্যসূত্র ২: ১৫৭।

[৩] আরও দেখুন আল-খুতাত: মাকরিযি ২: ৪০০।

[৪] প্রাগুক্ত ২ পৃ ১৮৩-৩২৮।

এসব শর্তের আলোকে নিজেদের প্রস্তুত করতে হতো। কালকাশান্দি কিছু শর্তের কথা উল্লেখ করেছে।

» দৈহিক বৈশিষ্ট্য : সুঠাম দেহ, উজ্জ্বল কপাল, ভরাট চেহারার অধিকারী হতে হবে।

» বুদ্ধিবৃত্তিক বৈশিষ্ট্য : পরিণত জ্ঞান, পরিপক্ব মেধা, প্রখর বোধশক্তির অধিকারী হতে হবে।

» নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি : সততা, ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা ও দয়াশীলতা থাকতে হবে।

নিজের ভাবনাকে কিভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে হবে, সে জন্যও একটি সরল পদ্ধতি বলে দিয়েছেন কালকাশান্দি। তিনি বলেন, তুমি যদি কোনো কথা মানুষের সামনে পেশ করতে চাও, তবে শুরুতে তার অর্থ ও উপাদানগুলো তোমার মস্তিষ্কে জমা করে নাও। সে জন্য সেরা ও সুন্দর বাক্য চয়ন করো। সেগুলো নোট করে ফেলো, যেন সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। বক্তব্য খুব দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার দরকার নেই। সহজ, সরল, সাবলিল, স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করো। বক্তব্যকে অসুন্দর ও দুর্বোধ্য করে তোলে এমন সব বাক্য এড়িয়ে চলো।

মিনহাজুল মুতাআল্লিম গ্রন্থেও এ ধরনের বহু নির্দেশনা উল্লেখ রয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষকদের জন্য সেগুলো ধারণ করা আবশ্যিক, এ কথা সরাসরি বলা হয়েছে। এসব গ্রন্থের পাশাপাশি আমরা দেখি—যারনুজি, ইবনু জামাআ, গাযালী, আবদারি-সহ অনেক মনীষী শিক্ষকদের আখলাক ও দায়িত্ব সম্পর্কে খুব গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এসব তথ্যসূত্র ঘেঁটে শিক্ষকদের কয়েকটি গুণের সারকথা এখানে তুলে ধরছি :

» ইবনুল মুকাফফা পরামর্শ দেন :<sup>[১]</sup> ধর্মীয় নেতা হিসেবে যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তার কর্তব্য হলো আগে নিজেকে গড়ে তোলা। নৈতিক মূল্যবোধ গঠন, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বিশুদ্ধ শব্দ চয়নে নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলা। তা করতে পারলে তিনি তার বক্তব্যের চেয়ে নিজের আচরণ ও কীর্তি দিয়ে বেশি প্রভাবিত করতে পারবেন। যে অন্যকে নীতি ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়, তার চেয়ে যে নিজেকে নৈতিকতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে পারে, সে বেশি উত্তম। মহান আল্লাহ বলেন,

[১] আল আদাবুস সাগীর পৃ ১৪।



اتَّامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ

তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে  
ভুলে যাও।<sup>[১]</sup>

» হাসান বসরি বলেন, কেউ কেউ আলিমদের থেকে ইলম সংগ্রহ করে,  
জ্ঞানীদের থেকে প্রজ্ঞা শিক্ষা করে, কিন্তু বোকা ও নির্বোধের মতো কথাবার্তা  
বলে। তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। একজন শিক্ষকের মনে রাখা  
উচিত যে, ইলম অর্জন করা হয় শিক্ষকের অন্তর্দৃষ্টি থেকে। আর আমল  
অর্জন করা হয় শিক্ষকের আচরণ দেখে। বেশিরভাগ মানুষ আমল দেখেই  
শিক্ষক নিয়োগ করে থাকে।<sup>[২]</sup>

» ছাত্রদের প্রতি দয়াশীল হওয়া। তাদেরকে নিজের সম্মানের মতো  
দেখা। তাদের সাথে নিজের পুত্রদের মতো আচরণ করা। উপদেশ দিতে  
থাকা। যোগ্য হওয়ার আগেই কোনো উদ্যোগ গ্রহণ থেকে তাদের বারণ  
করা। পাশাপাশি শিক্ষক বারবার ছাত্রদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবেন যে,  
ইলম অনুেষণের উদ্দেশ্য হলো নিজেকে শিক্ষিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা  
এবং নেতৃত্ব, বড়ত্ব ও প্রতিযোগিতার ইচ্ছা না করে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি  
অর্জনকে লক্ষ্য হিসেবে স্থির করা। শিক্ষকগণ ছাত্রদের মেধা ও স্তর অনুযায়ী  
গুরুত্বের সঙ্গে তাদের মাঝে নানা চরিত্র, গুণ ও বৈশিষ্ট্য রোপন করবেন।  
বাজে অভ্যাস, অনৈতিক আচরণ ও মন্দ স্বভাব থেকে তাদের নিষেধ  
করবেন। প্রাথমিক পর্যায়ে যথাসম্ভব নম্রতা অবলম্বন করবেন। তাতে কাজ  
না হলে ধর্মকের সুরে কড়া ভাষায় বলবেন। তবে অতি জরুরি পর্যায়ে না  
গড়ালে ধর্মক ব্যবহার করবেন না।<sup>[৩]</sup>

» প্রাথমিক স্তরের ছাত্রদের জন্য মৌলিক ও সহজ বিষয়গুলো নির্বাচন  
করা। কারণ সেগুলো তাদের জন্য বোঝা ও আয়ত্ত্ব করা সহজ।<sup>[৪]</sup> আল্লাহর  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মানুষ বোঝে না এমন কিছু  
তাদের বললে সেটি তাদের মাঝে বিশৃঙ্খলা তৈরি করবে।<sup>[৫]</sup> তা ছাড়া  
নির্দিষ্ট একটি শাস্ত্রে পারদর্শী শিক্ষক শিক্ষার্থীর সামনে অন্যান্য শাস্ত্রের নিন্দা

[১] সূরা বাকারা ২: ৪৪।

[২] আল গাযালী: ইহয়াউ উলুমুদ্দীন ১: ৪৮-৪৯।

[৩] আল গাযালী: ইহয়াউ উলুমুদ্দীন ১: ৪৬-৪৭।

[৪] যারনুজ্জি: তা'লিমুল মুতাআল্লিম পৃ ২২।

[৫] আল গাযালী: ইলজামুল আওয়াম আন ইলমিল কালাম পৃ ৩৩।

করবেন না। শিক্ষক যদি কোনো তথ্য না জানেন, তাহলে 'আমি জানি না' এ কথা বলতে দ্বিধা করবেন না।<sup>[১]</sup>

» ছাত্রদের মধ্যে গবেষণা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী যোগ্যতা তৈরির চেষ্টা করা। কেবল অনুসরণ অনুকরণ ও কপি পেস্টের প্রবণতা থেকে বের করে আনা। যেন তার জ্ঞান ও মেধা স্বাধীনভাবে অগ্রসর হয়। একেবারে শিক্ষকের ফটোকপি না হয়।<sup>[২]</sup>

» ইবনু জামাআ পরামর্শ দেন: শিক্ষক ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুশ্চিন্তা, রাগ, অস্থিরতা, উদ্বেগ ইত্যাদি নিয়ে দরস দিতে যাবেন না। তা ছাড়া শিক্ষক দরসকে অত্যধিক লম্বা করবেন না। তাহলে শিক্ষার্থীরা বিরক্ত হয়ে যাবে। অথবা একেবারে খাটো করবেন না। তাহলে ছাত্ররা দরস বুঝে উঠতে পারবে না। এক্ষেত্রে উপস্থিত লোকদের সুবিধার দিতে লক্ষ রাখা। আওয়াজ যেন শ্রেণিকক্ষের বাইরে না যায়, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। উপস্থিত সবাই ভালোভাবে শুনতে পাচ্ছে কি না, সে ব্যাপারেও নিশ্চিত হওয়া চাই।

» দরসে বিশেষ কারও জন্য জায়গা বরাদ্দ না রাখা বা রাখতে না দেওয়া। আগে আসলে আগে বসবে—সবসময় এ নীতি অবলম্বন করা। তবে প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ আলিম বা সহকারী শিক্ষকদের জন্য সামনের দিকে জায়গা বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।<sup>[৩]</sup>

» আল আদাবু ফিদ্বীন গ্রন্থে ইমাম গায়ালী কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। বিশেষ করে শিশু-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে। কারণ শিশুদের চলাফেরা স্বাধীন থাকে না। স্বাধীনভাবে সবকিছু চিন্তাও করতে পারে না। সবসময় তারা শিক্ষকের আচরণ দেখে, শিক্ষকদের সুভাব অনুকরণ করে। তাই শিক্ষককে সেটা ভালো করে উপলব্ধি করতে হবে। ছাত্ররা সবসময় তাকে দেখছে, তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। শিক্ষক যা ভালো বলবেন, তা তারা ভালো মনে করবে। শিক্ষক যা মন্দ বলবেন, তা তারা মন্দ মনে করবে।<sup>[৪]</sup>

সর্বশেষ কথা হলো, একজন শিক্ষক সকল ছাত্রকে সমান নজরে দেখবেন। সবার প্রতি সমভাবে যত্ন নেবেন। সবার প্রতি ইনসাফ ও সুবিচার করবেন। কে ধনী সন্তান আর কে গরিবের সন্তান, কখনো তা পার্থক্য করতে যাবেন না।<sup>[৫]</sup>

[১] আল গায়ালী: রিসালাতুল আদাব ফিদ্বীন পৃ ৪৩।

[২] জনৈক সুফি সাহেবের লেখা কিতাবুল ইরশাদ ওয়াত তা'লীম পৃ ৯০।

[৩] আল আবদারী: আল মাদখাল ১: ১৯৯।

[৪] আল আদাবু ফিদ্বীন পৃ ৪৩।

[৫] আল আবদারী: আল মাদখাল ২: ১৫৮।



## ইজাযত বা শিক্ষকতার অনুমতি প্রদান

ইসলামের একেবারে প্রাথমিক যুগে শিক্ষা-সনদ বলতে কিছু ছিল না। তখন ছাত্ররা নিজেদের সময়, অর্থ ও প্রতিভা অনুযায়ী ইলম ও জ্ঞান অনুযায়ী লিপ্ত হতো। অনেকে অল্প জ্ঞান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত। আবার অনেকে বিশেষ আগ্রহের কারণে গভীর জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করত। কোনো শিক্ষার্থী যখন জ্ঞানে-গুণে পরিপক্ব হতো, নিজেকে শাইখদের মজলিসে বসে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনার উপযুক্ত ভাবত, তখন সে শিক্ষকতার সিদ্ধান্ত নিতে পারত। তবে শাইখদের স্থানে বসা এতটা সহজ ছিল না। তাই তো শিক্ষার্থীরা আসন থেকে শিক্ষকের আসনে যেতে অনেক প্রাক্ত ছাত্রই ভয় পেত। দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগত। কারণ ছাত্ররা নানাভাবে শিক্ষকের প্রতি প্রশ্নের তির ছুড়ে দিত। অনেক সময় সেই প্রশ্নোত্তর পর্ব চ্যালেঞ্জের পর্যায়ে পৌঁছে যেত। নতুন শিক্ষকদের বেলায় এমনটি বেশি ঘটত। নতুন শিক্ষক যদি সেই প্রশ্নের তির ভালোভাবে সামলাতে পারতেন, সদুত্তর দিয়ে ছাত্রদের সন্তুষ্ট করতে পারতেন, তবেই তিনি তার শিক্ষকতা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতেন। প্রথম প্রথম ছাত্রদের সামনে উৎরে যাওয়ার পর পরবর্তী সময়ে ভুল করলেও তাতে শিক্ষকের কোনো ক্ষতি হতো না। কারণ, যত রকম ঝড়ঝাপ্টা ছিল, শুরুতেই তিনি সব মোকাবিলা করে এসেছেন। আর যদি প্রথম দরসে সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হতেন, তবে যতই শাইখদের মজলিসে বসে ইলম অর্জন করে পরিপক্ব হোন না কেন, তাকে আবার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দরসে বসতে হতো। বর্ণিত আছে, ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমানের দরসে বসতেন আবু হানিফা। একপর্যায়ে তিনি ভাবলেন, তিনি যোগ্য হয়ে গেছেন। এবার নিজেই একটা দরসগাহ খুলে ছাত্রদের পড়াবেন বলে স্থির করলেন। যেই ভাবনা, সেই কাজ। কিন্তু এক ছাত্র তাকে প্রশ্ন করল। তিনি উত্তর দিতে পারলেন না। ফলে তার দরস ভেঙে গেল। তিনি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে উস্তাযের দরসে ফিরে এলেন।<sup>[১]</sup>

একবার ইমাম আবু হানিফার অন্যতম ছাত্র আবু ইউসুফ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইমাম আবু হানিফা তাঁকে দেখতে যান। একপর্যায়ে তাঁর সামনে বলেন, আমি ভেবেছিলাম, আমার পরে তুমিই হবে মুসলমানদের নেতা...। সুস্থ হওয়ার পর উস্তাযের এ আশাবাদ শুনে আবু ইউসুফ নিজেকে সুযোগ্য জ্ঞানী ও পণ্ডিত ভেবে বসলেন। এরপর নিজের বয়ান ও দরস লেখানোর জন্য হালাকা গঠন করলেন। আবু ইউসুফ যে তাড়াহুড়ো করছেন, তা ইমাম আবু হানিফা টের পারলেন। এরপর ইমাম সাহেব পাঁচটি প্রশ্ন দিয়ে এক ব্যক্তিকে

[১] সুয়ুতি: তাবয়য়িস সাহীফা ফী মানাকিব আবু হানিফা পৃ ১৫।

তার দরসে পাঠালেন।

**প্রথম প্রশ্ন:** এক ধোপার কাছে জনৈক ব্যক্তি কাপড় দিল ধোওয়ার জন্য। পরে ওই ব্যক্তি তার কাপড় ফেরত নিতে এলে ধোপা বলল, আপনি আমাকে কোনো কাপড় দেননি। মিথ্যা কথা বলে কাপড়টি ধোপা নিজের কাছে রেখে দিল। এরপর লোকটি প্রশাসনের কাছে নালিশ করল। তারা তদন্ত করে ধোপার কাছ থেকে কাপড়টি উদ্ধার করে লোকটিকে ফেরত দিল। এবার প্রশ্ন হলো, ধোপা যে কাপড় ধুয়েছে, সে কি এর মজুরি পাবে?

আবু ইউসুফ : মজুরি পাবে।

প্রশ্নকারী : আপনি ভুল বলেছেন।

আবু ইউসুফ : আচ্ছা ঠিক আছে, মজুরি পাবে না।

প্রশ্নকারী : এবারও ভুল বলেছেন। সঠিক উত্তর হলো, ধোপা অস্বীকার করার আগে কাপড় ধুয়ে থাকলে মজুরি পাবে। আর পরে ধুয়ে থাকলে মজুরি পাবে না।

**দ্বিতীয় প্রশ্ন:** কোন কাজ দিয়ে নামাজে প্রবেশ করতে হয়, ফরয কাজ নাকি সুন্নাত?

**তৃতীয় প্রশ্ন:** চুলার ওপর একটি পাতিলে গোশত ও ঝোল রান্না হচ্ছিল, হঠাৎ একটি পাখি এসে তার ভেতর পড়ে যায়। এখন ওই পাতিলের গোশত ও ঝোল খাওয়া যাবে কি?

**চতুর্থ প্রশ্ন:** জনৈক মুসলিমের একজন অমুসলিম (যিম্মী) স্ত্রী ছিল। ওই মুসলমানের সঙ্গে মিলনের পর সে গর্ভবতী হলো। এরপর গর্ভাবস্থায় সে মারা গেল। তাকে কোন কবরস্থানে দাফন করা হবে? (মুসলমানদের নাকি কাফিরদের?)

**পঞ্চম প্রশ্ন:** মনিবের সঙ্গে মিলনের ফলে এক দাসীর সন্তান হলো। এরপর মনিবের অনুমতি ছাড়া সে অন্য কাউকে বিয়ে করে ফেলল। এরপর মনিব মারা গেল। এবার মনিবের মৃত্যুর কারণে তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে কি?

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে আবু ইউসুফ হ্যাঁ বললে প্রশ্নকারী তা নাকচ করে দেন। আবার না বললে সেটিও নাকচ করে দেন। কারণ উভয় দিক থেকেই উত্তরটি ভুল হবে। সঠিক উত্তর দিতে হলে প্রথম প্রশ্নের উত্তরের মতো বিশ্লেষণ করে দিতে হবে। এরপর আবু ইউসুফ নিজের ভুল বুঝতে পেরে ইমাম আবু হানিফার দরসে ফিরে আসেন। তখন আবু ইউসুফকে দেখে ইমাম আবু হানিফা



বললেন, অকালপক্ব হয়ে গেছে নাকি? তুমি কি মনে করো যে, আর শেখার দরকার নেই? মানুষের উচিত নিজের এই পরিণতির জন্য কাঁদা।<sup>[১]</sup>

মৃত্যুগিলা সম্প্রদায়ের গুরু ওয়াসিল বিন আতা শুরুতে হাসান বসরির দরসে বসতেন। এরপর যখন ইখতেলাফ শুরু হলো, কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে খারিজি সম্প্রদায়ের লোকেরা কাফেরা বলতে লাগল আর আরেকদল তাদেরকে মুমিন বলতে লাগল, তখন ওয়াসিল উভয় দলের মত থেকে বেরিয়ে সুতন্ত্র একটি মত তৈরি করল। সে বলল, কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিনও নয় আবার কাফিরও নয়। বরং এ দুটির মাঝামাঝি স্তরে সে অবস্থান করবে। এরপর সে হাসান বসরির দরস বর্জন করে নিজেই দরস খুলে বসল। মানুষজন তার পাশে জড়ো হতে লাগল। নিজের বাক্‌চাতুর্য ও যুক্তিকৌশল দিয়ে নতুন মজলিসকে প্রাণবন্ত করে তুলল। এরপর থেকে সে নিজেই হয়ে গেল শাইখ।<sup>[২]</sup>

### ❖ ইজায়তনামার সূত্রপাত

হাদিস বর্ণনা ও সংরক্ষণে মুসলমানগণ বিশেষ যত্ন ও ভূমিকা পালন করেছেন। অন্যান্য শাস্ত্র অর্জনে যতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করা হতো, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি সাবধানতা ছিল হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে। হাদিস বর্ণনায় সনদ উল্লেখ করা ছিল জরুরি। সনদ ছাড়া হাদিস বর্ণনা করলে কেউ তা গ্রহণ করত না। যারা হাদিস বর্ণনা করতেন, তারা অন্য কোনো শাস্ত্রে পাঠদান করার সাহস করতেন না। আর হাদিসের শিক্ষকতার বিষয়টিকে আরও বিগুঞ্জন ও শক্তিশালী করতে মুহাদিসগণ হাদিসের ছাত্রদেরকে বিশেষ এক ধরনের সনদ প্রদান করতেন। তিনি ওই ছাত্রের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তাকে সেসব হাদিস বর্ণনা করার ইজায়ত দিয়েছেন—এ জাতীয় কথা সনদে লেখা থাকত।

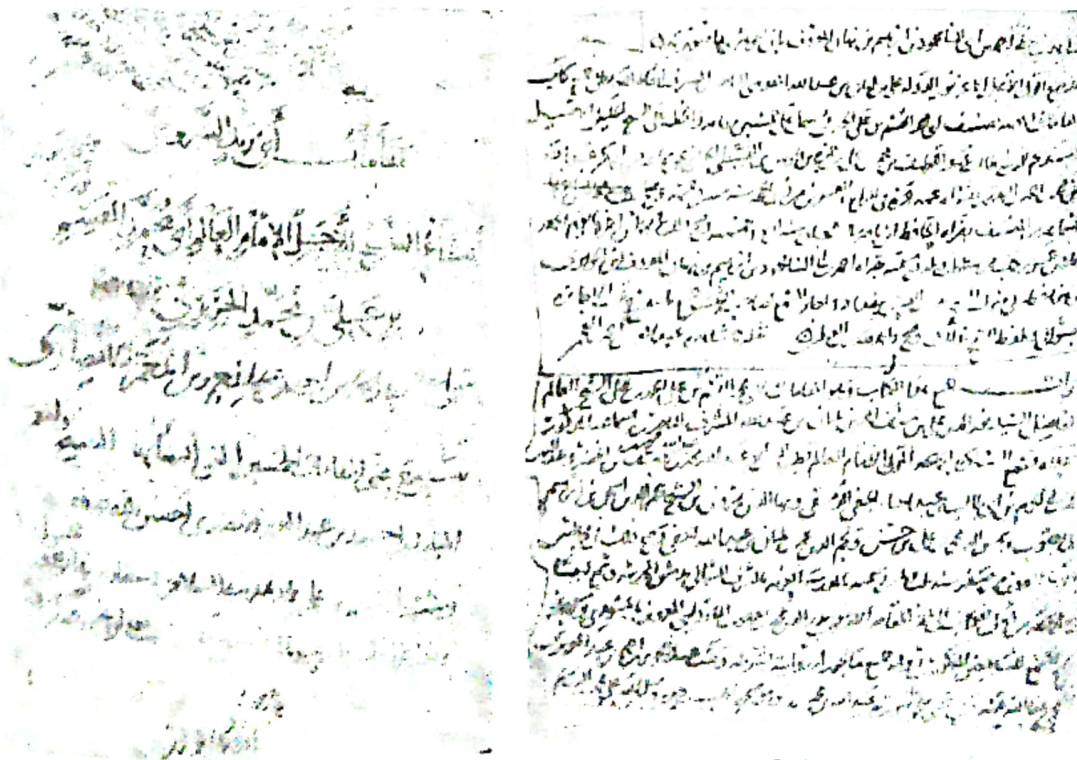
হাদিসের দেখাদেখি অন্যান্য শাস্ত্রের পাঠদানের জন্যও এ রকম সনদ প্রদানের প্রচলন শুরু হয়। সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি শাস্ত্রে শাইখের ভাষণগুলো ছাত্ররা যত্ন সহকারে লিখত। ছাত্র খুব ভালোভাবে শাস্ত্রটি আয়ত্ত্ব করতে পেরেছে কি না, এ ব্যাপারে শিক্ষক আগে আশ্বস্ত হতেন। এরপর ওই খাতার প্রথম অথবা শেষ পৃষ্ঠায় তিনি একটি সনদ লিখে দিতেন। উদাহরণস্বরূপ সেখানে লেখা থাকত: ‘অমুক ছাত্র এই গ্রন্থটির পাঠ সম্পন্ন করেছে। আমি তাকে এই গ্রন্থ পাঠদানের অনুমতি দিচ্ছি।’ শিক্ষকের এই লেখাটিই ফিকহ,

[১] মুহাম্মাদ যাহিল আল কাওসারি: আবু ইউসুফ আল কাযি পৃ ৫৭-৫৮।

[২] ইবনু খাল্লিকান: আল ওয়াফায়াত ২: ২৫২, ইয়াকুত: মুজাম্মুল উদাবা ৭: ২২৪।

সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি শাস্ত্রে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা প্রমাণ করত। পাশাপাশি এই অনুমতি প্রদানের স্তরও হতো নানা রকম। গ্রন্থের কলেবর, বিষয়বস্তুর গভীরতা, বিস্তৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটত। সে অনুযায়ী যেসব গ্রন্থের ওপর শিক্ষকদের সনদ লেখা থাকত, সেই গ্রন্থগুলোর তালিকা দেখেও তার শিক্ষার মান নির্ণয় করা হতো। এমনও হতো, এক বিষয়ে একজন ছাত্র সনদ পেয়ে গেছে। কিন্তু অন্য বিষয়ে এখনো সে শিক্ষার্থী হয়েই রয়েছে।

বিখ্যাত মনীষীদের লেখা নানা সনদপত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও নিরীক্ষণে বিপুল শ্রম ব্যয় করেছেন নাজাফের শাইখ আগা বাযরাক। এ ক্ষেত্রে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ উৎস। নাজাফ এলাকায় পরিদর্শনকালে তাঁর সঙ্গে আমার বসার সুযোগ হয়। সেখানে নানা জ্ঞান ও শাস্ত্র নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। তাঁর সংগ্রহে থাকা সবচেয়ে প্রাচীন সনদপত্রের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি নিজ হাতে একটি হস্তলিখিত সনদের কপি দেখালেন। সেটি ছিল আয যারিআতু ইলা তাসানিফিশ শিআ গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড। সেটি আমাদের জানামতে বর্তমান যুগে পাওয়া সবচেয়ে প্রাচীন সনদপত্র। এটি ৩০৪ হিজরিতে মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন জাফর তাঁর শিষ্য আবু আমির সাইদ বিন আমরকে প্রদান করেন। সেই সনদপত্রে যা লেখা হয়, তা অনেকটা হাদিসের সনদের মতো। ওই ইজাযতপত্রের বিবরণ ছিল এ রকম:



শাকামাতুল হারিরি গ্রন্থকারের নিজ হাতে লেখা একটি ইজাযতপত্র



দুটি ইজায়তপত্রের চিত্র। একটি পত্র আবদুল লতিফ বিন মুহাম্মাদ নিজ হাতে লিখে দেন আলি নাসিরিকে ইজায়ত প্রদানের উদ্দেশ্যে। আর অপর পত্রটি আলি নাসিরি নিজ হাতে লিখে দেন তাঁর ছয় জন ছাত্রকে ইজায়ত প্রদানের উদ্দেশ্যে।

‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। হে আবু আমির সাইদ বিন আমর, তুমি আমার কাছে এই কিতাবের পাঠ সম্পন্ন করার পর আমি তোমাকে তা বর্ণনা করার অনুমতি প্রদান করছি। এটা আমি আমার পিতা থেকে অর্জন করেছি। এতে আছে বকর আযদী এবং সাদান বিন মুসলিমের বর্ণনাসমগ্র...। এ সনদপত্রটি ৩০৪ হিজরির সফর মাসে মুহাম্মাদ বিন জাফর হিমযারী নিজ হাতে লিখে দিচ্ছেন।’

মিশরের দারুল কুতুবে মাকামাতুল হারিরি গ্রন্থের একটি হস্তলিখিত খণ্ড রয়েছে। তাতে একুশটি ইজায়তনামা লেখা রয়েছে। এর প্রথমটি সুয়ং মাকামাত গ্রন্থ-প্রণেতার হাতের লেখা। যার বিবরণ নিম্নরূপ:

‘আমার রচিত পঞ্চাশটি মাকামাত আমার কাছ থেকে শুনেছেন শাইখ আবুল মিমার মুবারক আহমাদ বিন আবদুল আযিয আনসারি। মহান আল্লাহ তাঁকে সুসামর্থ্য দান করুন। এবং ৫০৪ হিজরির শাবান মাসে আস-সালাম শহরে কাসিম বিন আলি বিন মুহাম্মাদ তা লিখে রেখেছেন। আমি তাঁকে আমার থেকে শ্রুত সকল কিছু বর্ণনা করার ইজায়ত দিলাম।’ (চিত্র দ্রষ্টব্য)

তা ছাড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা তুলে ধরতে আরও দুটি ইজায়তনামার চিত্র এখানে উপস্থাপন করেছি। আর তা হলো, ইজায়তদাতা যদি সরাসরি গ্রন্থের রচয়িতা না হতেন, তাহলে তিনি সনদের মতো ধারাবাহিকভাবে সকল শাইখের নাম লিখতেন। অর্থাৎ সুয়ং গ্রন্থপ্রণেতা থেকে নিয়ে ধারাবাহিকভাবে যতজন শাইখ তা বর্ণনা করেছেন, সবার নাম পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করার পর অনুমতিপ্রাপ্ত ছাত্রের নাম লিখতেন। এভাবে ইজায়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলতেন: অমুক শাইখের কাছ থেকে শ্রবণ করার ফলে আমি তোমাকে ইজায়ত দিচ্ছি। আর তিনি অমুক শাইখের কাছ থেকে শ্রবণ করে আমাকে ইজায়ত দিয়েছেন। এভাবে বলতে বলতে একেবারে সুয়ং গ্রন্থপ্রণেতা পর্যন্ত পৌঁছাত।

আরেকটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। তা হলো: ‘শ্রবণ’ শব্দটিই ছিল তখন সনদের পরিভাষা। বেশ কিছু প্রাচীন ইজায়তনামায় আমরা এমনটিই

দেখেছি। ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে যোগাযোগ হওয়ার পর একে অন্যের কাছ থেকে ইলম শুনতেন। এবং সেই শ্রবণের ওপর ভিত্তি করেই শিক্ষক ছাত্রকে সনদপত্র দিতেন। শিষ্যকে তা অন্যদের কাছে বর্ণনা করার অনুমতি দিতেন।

অপরদিকে ‘ইজায়ত’ পরিভাষার মাধ্যমে পাঠদান ছাড়া অনুমতি প্রদান বোঝাত। এভাবে কোনো শাইখ অন্যকে নির্দিষ্ট কিছু হাদিস বর্ণনা করার অনুমতি দিতেন। অথবা তার লিখিত কোনো গ্রন্থ পাঠদানের ইজায়ত দিতেন।

শ্রবণের সনদপত্র যদিও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু পাঠদান ছাড়া কেবল ইজায়তের সনদপত্রের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আলিমগণ ইখতেলাফ করেছেন। জনৈক মনীষী বলেন, কোনো আলিম সরাসরি শিক্ষকের কাছ থেকে ইলম না-শুনে ইজায়ত নিলে তার বর্ণনাকে বৈধ মনে করতেন না ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ। তবে আল-ভিজায়া ফি সিহহাতিল কাওলি বিআহকামিল ইজায়া গ্রন্থে আবুল আব্বাস ওয়ালিদ বিন বকর এই যুক্তি নাকচ করে দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে যারা ইমাম শাফিয়ির বলেছেন, তাদের কথাকে তিনি ভুল আখ্যায়িত করেছেন।<sup>[১]</sup>

এ ধরনের ইজায়তনামা শ্রুত বিষয়ের সনদের মতো শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিপক্বতার মানদণ্ড হিসেবে গণ্য হতো। যাদের মাঝে শাইখগণ নির্দিষ্ট কিতাব পাঠদানের যোগ্যতা লক্ষ্য করতেন, অনুমোদিত হাদিস বর্ণনার যোগ্যতা দেখতে পেতেন, কেবল তাদেরকেই ইজায়ত দিতেন। তারা জ্ঞানে-গুণে ও নির্দিষ্ট শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠত। ইজায়ত যথার্থ হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো, যিনি ইজায়ত দিচ্ছেন এবং যাকে ইজায়ত দেওয়া হচ্ছে—উভয়ের যোগ্যতা সমান স্তরের হওয়া। ইজায়তপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই নির্দিষ্ট জ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে। উত্তীর্ণ হতে হবে ধার্মিকতা ও বর্ণনার মানদণ্ডে। আর যিনি ইজায়ত দেবেন, তিনিও হবেন প্রাজ্ঞ জ্ঞানী ও মহান শাইখ। জ্ঞানের সকল গুণ ও শর্ত তার মাঝে বিদ্যমান থাকবে। যাতে করে ইলম কেবল আহলে ইলমের কাছেই সযত্নে হস্তান্তর করা হয়।<sup>[২]</sup>

## ✽ ইজায়তের প্রকারভেদ

» ১. শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে কোনো রাবী বলে দেন : ‘এই অংশটি তুমি নিয়ে নাও। কারণ এটি আমার বর্ণনা করা হাদিস। এতে যে ইলম আছে, সে

[১] বাগদাদ নিবাসী উস্তায় আব্বাস আল-আযাভীর সংগ্রহে থাকা একটি হস্তিলিখিত পাণ্ডুলিপি।

[২] প্রাগুক্ত তথ্যসূত্র ৩০ বা ৩১ আলিফ।



সম্পর্কে আমি খুব ভালোভাবে অবগত। আমার নাম দিয়ে এখান থেকে হাদিস বর্ণনা করো। অথবা এখান থেকে হাদিস লিখে নাও। আমার তরফ থেকে মানুষের কাছে বর্ণনা করো।' ইজায়তের এ প্রকারকে বলা হয় মুনাওয়াল। এটি ইজায়তের সর্বোচ্চ স্তর।<sup>[১]</sup>

» ২. কোনো রাবী লিখে দেন: 'অমূকের পুত্র অমূকের উদ্দেশে। অমূক আমার থেকে যা যা শুনেছে, সে ব্যাপারে আমি তাকে ইজায়ত দিলাম। অথবা অমূক পাণ্ডুলিপিতে যা আছে তা বর্ণনা করতে আমি তাকে অনুমতি দিলাম।' রাবীর নিজ হাতে লেখার বিষয়টি প্রমাণিত হলে এটিও অনেকটা মুনাওয়ালার মতোই ধরা হয়।<sup>[২]</sup>

» ৩. কোনো রাবী মৌখিকভাবে এ কথা বলে দেন: 'আমার বর্ণনা করা হাদিস থেকে যা সহিহ এবং তোমার কাছে যা সহিহ মনে হয়েছে, সেগুলো বর্ণনা করার অনুমতি তোমাকে দিলাম।' এটি হলো ইজায়তের সর্বনিম্ন স্তর।<sup>[৩]</sup>

সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ ইজায়তনামা হলো, ৩১৩ হিজরিতে হারুন বিন মুসা আকবারীকে প্রদান করা মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল আশআসের অনুমতি। এটা শাইখ আগা বায়রাকের মত। কী কী বিষয় পাঠদানের অনুমতি ছিল, তা একে একে ওই ইজায়তনামায় তিনি লিখে দেন।<sup>[৪]</sup>

অনেক সময় শাইখ সনদ প্রদান করতেন, যাতে শ্রবণ ও ইজায়ত উভয়ই शामिल ছিল। যেমন কোনো ছাত্র শাইখের সামনে বসে তার রচিত একটি গ্রন্থ পুরোটা শেষ করল। তখন ওই ছাত্র শাইখ থেকে যত বিষয় শুনেছে, এমনকি তার রচিত গ্রন্থসমূহ থেকে যেগুলো শুনেনি, সেসব বর্ণনার ব্যাপারেও শাইখ তাকে ইজায়ত দিতেন। বিখ্যাত মনীষী সাখাভী জনৈক ছাত্রকে তাঁর রচিত গ্রন্থ আদ-দাওউল লামি-সহ অন্যান্য কিতাব বর্ণনার ব্যাপারে অনুমতি দিয়ে দেন। ওই ইজায়তনামায় তিনি লেখেন:

'সকল প্রশংসা আল্লাহর। আদ-দাওউল লামি গ্রন্থটি আমার সামনে পাঠ করেছেন আবদুল আযিয বিন উমর বিন মুহাম্মাদ বিন ফাহদ হাশিমি। তিনি শ্রেষ্ঠ গুণে গুণান্বিত। তাই তাঁর ও তাঁর পূর্বপুরুষদের

[১] প্রাগুক্ত তথ্যসূত্র ২২, ২৩ (সংক্ষেপিত)।

[২] প্রাগুক্ত তথ্যসূত্র ২৪ আলিফ।

[৩] প্রাগুক্ত তথ্যসূত্র ২৪ বা ২৫ আলিফ।

[৪] আগা বায়রাক: রিসালাতু মাশিখাতিল আকবারী।

নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার মনে করছি না। মহান আল্লাহ তাঁর জ্ঞানে বরকত দান করুন। তাঁর মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দিন। বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল অনিষ্ট থেকে তাঁকে রক্ষা করুন। তাঁর বংশধরদের ওপর রহম করুন। তাঁকে তাঁর পুণ্যবান পূর্বপুরুষদের মতো তাওফিক দান করুন। তাঁর সে আশা পূরণ করুন। আমি তাঁকে আমার সকল বিবরণ বর্ণনা করার এবং আমার রচিত সকল গ্রন্থ পাঠদান করার অনুমতি দিয়ে দিলাম।<sup>[১]</sup>

অনেক শাস্ত্র আছে যার সনদ খুবই স্পর্শকাতর; যেমন চিকিৎসাবিদ্যা। কারণ যে-কাউকে সনদ দিয়ে দিলে সে ছুটহাট চিকিৎসা করে মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলা শুরু করবে। এই আশঙ্কা ছিল। তাই তো আমরা দেখি, একেবারে প্রাথমিক যুগ থেকেই চিকিৎসাবিদ্যায় যারা পারদর্শী হতো, তাদেরকে সনদ দেওয়ার আগে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করা হতো। ওই পরীক্ষায় সে উন্নীত হলে কী কী রোগের সে চিকিৎসা করতে পারবে, সনদে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হতো। সাবিত বিন সিনান বিন কুররাহ বলেন, ৩১৯ হিজরিতে খলিফা মুকতাদির খবর পান যে, জনৈক শিক্ষার্থীর ভুল ট্রিটম্যান্টের ফলে এক লোক মারা গেছে। তখন মেডিক্যাল সাইন্সের সকল শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা পরিচালনার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে ইবরাহিম বিন মুহাম্মাদকে নির্দেশ দেন খলিফা মুকতাদির। যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা নিয়ে আমার পিতা সিনান নিজ হাতে যার পারদর্শিতার ব্যাপারে প্রত্যয়ন লিখে দেবেন, কেবল সেই চিকিৎসা সেবা দিতে পারবে বলে জানিয়ে দেন। এর ফলে প্রত্যয়ন গ্রহণের আশায় আব্বুর কাছে নবীন ডাক্তারদের ভিড় লেগে যায়। তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখেন। এরপর তাদের যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে প্রত্যেককে একটি করে সনদ লিখে দেন।<sup>[২]</sup>

## শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শাস্তি ও দণ্ড

ইবনু খালদুন এ বিষয়ে সূত্র একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। তাতে বলেন, শিক্ষার্থীদের শাস্তি প্রদান তাদের জন্য ক্ষতিকর। দৈহিক আঘাত ছাত্রদের অপকার করে। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে। কারণ জোরপূর্বক শিক্ষার্থীদের ওপর কিছু প্রয়োগ করতে গেলে তাদের প্রাণচাঞ্চল্য ব্যাহত হয়। স্বাভাবিকভাবে

[১] আস সাখাবী: আদ দাওউল লামি' ১২: ১৬৮।

[২] ইবনু আব্বি উসাইবিয়া: তাবাকাতুল আতিব্বা ১: ২২২।



গ্রহণ করার প্রবণতা বাধাগ্রস্ত হয়। এতে খুব দ্রুত সে অলস হয়ে পড়ে। শারীরিক নির্যাতন ও প্রহারের ভয়ে সে মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না। অনেক সময় মিথ্যা বলতে বলতে, প্রতারণা করতে করতে এগুলো তার অভ্যাসে পরিণত হয়। একসময় তার মাঝে মানবতাবোধ বলতে কিছু থাকে না। উত্তম চরিত্র ও শ্রেষ্ঠ গুণাবলি অর্জনের ইচ্ছা মরে যায়। কারণ সে তো কঠোরতার মাধ্যমে জোরপূর্বক উত্তম চরিত্র ধারণে অভ্যস্ত। এরপর যখন তার ওপর থেকে কঠোরতা উঠে সে স্বাধীন হয়ে যায়, তখন উত্তম চরিত্র তার থেকে ছিটকে পড়ে। অনেক সময় সে অন্যায় পথে পা বাড়ায়।<sup>[১]</sup>

এ রকম কঠোরতা ও জোরপূর্বক শিক্ষাদান-রীতি বর্জনের পরামর্শ দিয়েছেন ইবনু খালদুন। ফলে ইলমী প্রতিষ্ঠানগুলোতে এটি একটি সর্বজনবিদিত ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়ায়। তবে মুসলমানগণ অতি শাসন ও হালকা শাসনের মাঝে পার্থক্য করেছে। অতি শাসন নিষিদ্ধ এবং হালকা শাসন প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক ব্যবহার করতে পারবে বলে সম্মতি দিয়েছেন। ইবনু খালদুন লেখেন: ইবনু সাহনুন তাঁর গ্রন্থে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য পালনীয় বিধানের আলোচনায় বলেন—খুব বেশি প্রয়োজন দেখা দিলে মজবুর শিক্ষক বড়জোর তিনটি বেত্রাঘাত করতে পারবেন। এর বেশি নয়।<sup>[২]</sup> দরস শেষে অন্যান্য ছাত্ররা চলে যাওয়ার পর নির্দিষ্ট কোনো ছাত্রকে আটকে রাখাও ছিল এক প্রকার শাস্তি। এ ব্যাপারে আমরা সামনে আলোচনা করব।

দৈহিক শাস্তি শিক্ষকদের অন্যতম হাতিয়ার হওয়ার কিছু কারণ রয়েছে। ঘরের বাইরে শিশু কোনো অন্যায় করলে শাসনের মাধ্যমে তাকে সংশোধন করার অনুরোধ করতেন বেশিরভাগ অভিভাবক। ফলে সে সময় একজন শিক্ষকের দায়িত্ব কেবল পাঠদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এর বাইরে শিশুর আচার-আচরণ গঠনের দায়িত্বও ছিল তার কাঁধে। বদঅভ্যাস ছাড়ানো এবং শিশু কোনো অন্যায় করলে শাসনের মাধ্যমে তাকে সংশোধন করাও শিক্ষকের কর্তব্য ছিল। একবার কাজি গুরাইহ তাঁর পুত্রের ব্যাপারে শিক্ষকের কাছে অভিযোগ করেন:<sup>[৩]</sup>

ترك الصلاة لأكل يلهو بها # طلب الهراش مع الغواة الرجس

[১] মুকাদ্দিমাতু ইবনি খালদুন পৃ ৩৩৯।

[২] আল মুকাদ্দিমা পৃ ৩৯৯।

[৩] কামালুদ্দিন উমর: আদ দারারি ফিয যারারি পৃ ৩৮, আল হায়াওয়ান: জাহিয় ২: ৮৪-৮৫, আল ইকদুল ফারিদ: ইবনু আবদি রাব্বাহি ১: ৩৬৩, ইবনু কুতায়বা: উয়ুনুল আখবার ২: ১৬৮।

فإذا خلوت فقضه بلامه # أو عظه موعظة الأديب الأكيس

وإذا هممت بضربه فبدره # وإذا ضربت بما ثلاثا فاحبس

আমার পুত্র নামাজ ছেড়ে দিয়ে কুকুরছানাদের সঙ্গে খেলা করে।

ঠিক যেমন নির্বোধেরা নোংরা লোকদের সাথে সময় কাটায়।

কাজেই আমার পুত্র যখন আপনার কাছে যাবে,

তখন তার কাছে এ ব্যাপারে কৈফিয়ত চাইবেন।

বুদ্ধিমান শিক্ষকের মতো তাকে উপদেশ দেবেন।

আর যদি শাসন করতে চান, তবে বেত দিয়ে শাসন করবেন।

আর যদি মারতে চান, তবে তিনটি আঘাত করেই ক্ষান্ত থাকবেন।

এর পরিপ্রেক্ষিতে মক্তবগুলোতে শাস্তির প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এমনকি শিক্ষকের বেত হয়ে যায় মক্তবগুলোর অবিচ্ছেদ্য অংশ। ‘শিক্ষকের বেত জান্নাতের অংশ’ এ কথাও প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। ফলে শিশুর আপনজনের চেয়েও বেশি প্রহার করতে পারতেন স্কুলের শিক্ষকগণ। অনেক সময় দেখা যেত, শিক্ষক শিশুকে মেরেছেন—বাচ্চার মা এ কথা মেনে নিলেও পিতার শাসনের ব্যাপারটি তিনি মানতে পারতেন না। কারণ, শিক্ষকের বেত জান্নাতের অংশ। আর অন্যদের লাঠি তেমনটি নয়। এর ফলে পাঠশালাগুলোতে দৈহিক শাস্তির প্রচলন লক্ষ করা যায়। ইসহাক মুসেলি বলেন, আমার পিতাকে মক্তবে ভর্তি করা হয়। তিনি কিছুই শিখতে চাইতেন না। তাকে প্রহার করা হতো। ক্লাসে আটকে রাখা হতো। এতেও কোনো কাজ হলো না। এরপর তিনি পালিয়ে মুসেলে চলে যান। সেখানে গিয়ে নাশীদ শেখেন।<sup>[১]</sup>

বিখ্যাত কবি আবু নাওয়াস একবার হাফসের মক্তবে যান। গিয়ে দেখেন এক শিশুকে প্রহার করা হচ্ছে। সেই ঘটনার বিবরণ তিনি এ কবিতায় তুলে ধরেন :

إنني أبصرت شخصا # قد بدا منه صدود

جالسا فوق مصلى # وحواليه عبيد

فرمى بالطرف نحوي # وهو بالطرف يصيد

[১] আল আগানী ৫: ১৫৭ (দারুল কুতুব)।



ذاك في مكتب حفص # إن حفصا لسعيد  
قال حفص: اجلدوه # إنه عندي بليد  
لم يزل مذ كان في الدر # س عن الدرس يحيد  
আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি তার জায়নামাজে বসা।  
তার চারপাশে বসে আছে অনেক বালক।  
তার চেহারায় রাগের ছাপ।  
তিনি আমার দিকে তাকালেন।  
তার দৃষ্টি যেন শিকারীর তির।  
বলছি হাফস-এর মজবুতের কথা।  
হাফস খুব ভাগ্যবান।  
হাফস বললেন, এই ছেলেকে বেত্রাঘাত করো। সে অবাধ্য।  
সে শুধু দরস ফাঁকি দেয়। আজ তার চালাকি ফাঁস হয়ে গেছে।  
তার আর রক্ষা নেই...।

এমনকি শাহজাদাদেরকেও বেত্রাঘাত ও আটকে রাখার শাস্তিও দিতেন শিক্ষকগণ। বাদশাহ হারুনুর রশিদের পুত্র আল-আমিনের শিক্ষকের প্রতি বাদশাহর নির্দেশনায় লেখা ছিল: ‘... আদর দিয়ে উপদেশ দিয়ে যথাসম্ভব তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করবেন। তাতে কাজ না হলে কঠোরতা আরোপ করবেন।’<sup>[১]</sup>

আহমার বলেন, আমি প্রায়ই শাহজাদার প্রতি কঠোর হতাম। তাকে নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা দিতাম। যে সময় সে খেলাধুলা করতে অভ্যস্ত, প্রায়ই সে সময় তাকে আটকে রাখতাম।<sup>[২]</sup>

শাহজাদা আমিন ও মামুনের শিক্ষক আবু মারিয়াম একদিন আমিনকে কাঠের বেত দিয়ে প্রহার করলেন। ফলে আমিনের বাহুতে দাগ ও আঁচড় পড়ে গেল। পিতা হারুনুর রশিদ তাকে খাবারের জন্য ডাকলেন। আহারের সময় আমিন ইচ্ছা করে তার বাহু খোলা রাখলেন। হারুনুর রশিদ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে আমিন বললেন, আবু মারিয়াম আমাকে মেরেছেন। হারুনুর রশিদ তখন শিক্ষককে তলব করে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার! ছেলে আপনার বিরুদ্ধে

[১] ইবনু খালদুন: আল মুকাদ্দিমা পৃ ৩৯৯।

[২] আল বায়হাকী: আল মাহাসিন ওয়াল মাসাভী পৃ ৬১৭।

অভিযোগ করছে কেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমিনের দুষ্টমি ও অনাধ্যাতার কারণে আমি অতিষ্ঠ হয়ে গেছি। তখন হারুনুর রশিদ বললেন, তাকে খতম করে ফেলুন। এ রকম দুষ্ট ও অনাধ্যাত হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো।<sup>[১]</sup>

শাহজাদা মামুনের শিক্ষক ছিলেন আবু মুহাম্মাদ ইয়াযিদি। যথারীতি একদিন তিনি ক্লাসে এসে দেখেন মামুন অনুপস্থিত। তখন মামুনকে ডাকার জন্য একজন খাদেম পাঠালেন। খাদেম গিয়ে মামুনকে জানালেও তিনি দেরি করলেন। দ্বিতীয়বার তাকে ডাকা হলো। এবারও তার আসতে দেরি। উপস্থিত হওয়ার পর আবু মুহাম্মাদ শাস্তিস্বরূপ রাজপুত্রকে নয়টি বেত্রাঘাত করলেন।<sup>[২]</sup>

শিশুকে কিভাবে নৈতিকতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হবে এবং তার ওপর কতটুকু শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে, সে বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন ইবনু মাসকুওয়াই। তিনি বলেন, ‘প্রথমবার ভুল করার পর শিশুকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর দ্বিতীয়বার তাকে মৌখিকভাবে বুঝিয়ে সতর্ক করা হবে। তাকে উপদেশ দিয়ে বলতে হবে, এমনটি করা ভালো নয়। এটা খুবই মন্দ কাজ। আর তৃতীয়বার তাকে সরাসরি ধমক দেবে। এরপরও যদি তাতে লিপ্ত হয়, তবে মৃদু প্রহার করবে। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার পরও যদি শিশু ভুল থেকে বিরত না হয়, তবে তাকে কিছুদিন ছাড় দিয়ে নতুন করে তার ওপর একই পদ্ধতি প্রয়োগ করবে। ইবনু মাসকুওয়াই এ ব্যাপারে বিশিষ্ট আইনবিদ মাওয়ারদির বক্তব্য উল্লেখ করেছেন: ‘বারবার চেষ্টা ও উপদেশ দেওয়ার পরও শিশুর আচরণ যদি সংশোধন না হয়, তবে তাকে কিছুদিন সময় দেবে। এরপর আবার তার ওপর একই পদ্ধতি প্রয়োগ করবে।’<sup>[৩]</sup>

আলোচনা শেষ করার আগে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা তুলে ধরা সমীচীন মনে করছি:

» ১. যেসব শিশুর বয়স দশের ওপরে; অর্থাৎ যারা নাবালগ কিশোর-শ্রেণির, কেবল তাদের ওপরই সামান্য প্রহারের অনুমতি ছিল। দশ বছরের নিচে এবং বালগ শিক্ষার্থীদের ওপর প্রহারের অনুমতি ছিল না।<sup>[৪]</sup>

» ২. মৌখিক উপদেশের সীমা ছাড়িয়ে গেলে বা খুব বেশি প্রয়োজন হলে, তখনি দৈহিক প্রহার করতে পারতেন শিক্ষক। তবে খুব বেশি না করারও

[১] আসফাহানী: মুহাদারাতুল উদাবা ১: ৩০।

[২] আল বায়হাকী: আল মাহাসিন ওয়াল মাসাভী পৃ ৬১৭।

[৩] তাহযিবুল আখলাক পৃ ২০।

[৪] আল আহওয়ানী: দেখুন আল ফাদালাহ লি আহওয়ালিল মুতাআল্লিমিন: আল কাবেসি পৃ ১৩৩।



নির্দেশনা ছিল। অগত্যা দরকার পড়লে রুঢ় মনোভাব নিয়ে নয়; বরং নীতি শিক্ষাদান ও দয়াশীলতার মনোভাব নিয়ে করতে হবে।<sup>[১]</sup>

» ৩. প্রহার করতে হবে নরম বেত দিয়ে। মাথা বা চেহারায় নয়; আঘাত করা যাবে উরু ও পায়ের গোছায়। কারণ, এসব স্থানে প্রহার করলে কোনো ক্ষতি বা ঝুঁকির আশঙ্কা নেই।<sup>[২]</sup>

## শিক্ষাবৃত্তি ও পুরস্কার

আগের পরিচ্ছেদ এবং এই পরিচ্ছেদের মাঝে আছে গভীর যোগসূত্র। শাস্তি ও পুরস্কার—এ দুটি বিষয়কে মুসলিম শিক্ষকগণ সবসময় পাশাপাশি রেখেছেন। কারণ, দুটি পদ্ধতিই ছাত্রদের অভ্যাস পরিবর্তনে বিরাট ভূমিকা রাখে। ছাত্রের আদবকেতা যখন খারাপ হয়ে যায় বা তার মধ্যে ঢিলেমি চলে আসে, তখন তাকে শাস্তি দিতে হয়। অপরদিকে তার চালচলন যখন উত্তম হয়, বা অন্যদের চেয়ে সে এগিয়ে যায়, তখন তাকে পুরস্কৃত করতে হয়। শাস্তি ও পুরস্কারের মাঝে এই গভীর সম্পর্কের কারণেই এ দুটি আলোচনাকে সবসময় পাশাপাশি রাখা হয়েছে। তাই শাস্তির আলোচনার পরপরই পুরস্কার ও বৃত্তির কথা তুলে ধরিছি।

আমরা জেনে এসেছি, শিক্ষার্থীদের শাস্তির ধরন ছিল বিচিত্র। কিছু ছিল মৌখিক। যেমন: উপদেশ ও শাসানো। আর কিছু ছিল দৈহিক। যেমন: প্রহার ও আটক। অপরদিকে ছাত্রকে পুরস্কৃত করার ধরনও ছিল বিচিত্র। কখনো তা হতো প্রশংসা ও উৎসাহ দিয়ে। আবার কখনো আর্থিক পুরস্কার দিয়ে। তা ছাড়া পরীক্ষায় বা প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হলে তাকে সম্মানিত করা হতো। এটাকে বলা হতো ‘জাইয়া’। আর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোনো কৃতিত্বের নজির দেখালে তাকে বলা হতো ‘মুকাফাআ’। অনেক লেখক ও গবেষক এ দুটির ব্যবহারকে পরস্পরের মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছেন।

ইবনু মাসকুওয়াই লেখেন:<sup>[৩]</sup> শিক্ষার্থী থেকে কোনো উত্তম চরিত্র ও সুন্দর কাজ প্রকাশ পেলে, সে জন্য তার প্রশংসা করবে। তাকে পুরস্কৃত করবে। ইমাম

[১] রিসালাতুল আদাব ফিদ্বীন: আল গাযালী পৃ ৪৩।

[২] আল আবদারী: আল মাদখাল ২: ৩১৭, নিহায়াতুর রুতবা ফি তালাবির হিসবা পৃ ১০৪, মাআলিমুল কুরবা ফি তালাবিল হিসবা পৃ ১৭১।

[৩] তাহযিবুল আখলাক পৃ ২০।

গায়ালি বলেন।<sup>[১]</sup> নম্রভদ্র শিক্ষার্থীর তারিফ করতে হবে। ছাত্র কোনো সুন্দর গুণ ও প্রশংসনীয় কাজ করলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। তাকে প্রতিদান দিয়ে খুশি করা হবে। মানুষের সামনে তার প্রশংসা করা হবে।

এ নির্দেশনা সামনে রেখেই শিক্ষকগণ কাজ করতেন। নীতিবান শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করতেন। ভালো ফলাফল করলে বা ভালোভাবে উত্তীর্ণ হলে তাকে সম্মানিত করতেন। শিষ্টাচারের একটি পুরস্কার এমন ছিল—মর্যাদাপূর্ণ পোশাক পরিয়ে তাকে উট বা ঘোড়ায় চড়ানো হতো। শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে তাকে নিয়ে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হতো। তার চারপাশে থাকত তার ভাই ও সাথিরা। ঘরের জানালা দিয়ে এবং বারান্দায় দাঁড়িয়ে মানুষ সেই নীতিবান ছাত্রকে অভিবাদন জানাত। অনেকে তাকে ফলমূল দিত। তার দিকে বাদাম ছুড়ে মারত। আবুল ফারাজ আসফাহানী লেখেন:<sup>[২]</sup> বিখ্যাত কবি আলি বিন জাবালা যখন শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পদার্পণ করেন, তখন তাকে পাঠশালায় ভর্তি করা হয়। এরপর কোনো একটি বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করার পর তাকে উটে চড়িয়ে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। তার ওপর বাদাম ছিটানো হয়।<sup>[৩]</sup>

অপরদিকে আর্থিক বৃত্তি ও প্রতিদানের চলনও ছিল বেশি। অনেক মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতাগণ মাদরাসার ওয়াকফ প্রকল্পের আয়ের একটি অংশ আলাদা করে রাখতেন মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়ার জন্য। আল-মালিকুল আশরাফ যখন দামিশকে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁর ওয়াকফনামায় এ কথা লিখে দেন: 'এখানে কর্মরতদের আট দিরহাম করে দেওয়া হবে। কাজ বেড়ে গেলে ভাতাও বেড়ে যাবে। কাজ কমে গেলে ভাতাও কমে যাবে। শ্রবণকারী (শিক্ষার্থীদের) দেওয়া হবে তিন বা চার দিরহাম করে। তাদের মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাড়ানো যেতে পারে। কারও মেধা ও যোগ্যতা প্রমাণিত হলে, তাকেও আট দিরহাম করে দেওয়া হবে। কেউ হাদিসের কোনো কিতাব মুখস্থ করলে শাইখ তাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করবেন।'<sup>[৪]</sup>

[১] ইহয়াউ উলুমুদ্দীন ৩: ৫৮।

[২] আল আগানী ১৮: ১০১।

[৩] লন্ডন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর সার্জেন্ট আমাকে বলেছেন, ইয়েমেনের হাদরামাউতে এই রীতি এখনো প্রচলিত।

[৪] ওয়াকফুল মালিকিল আশরাফ (দামিশকে উস্তায সালাহুদ্দিন আল মুনায্জিদদের সংগ্রহে থাকা হস্তলিখিত গ্রন্থ)।



মাকরিযি লেখেন:<sup>[১]</sup> দাআইমুল ইসলাম ওয়া মুখতাসারুল উজির গ্রন্থটি মানুষকে হিফজ করাতে দাসীদের নির্দেশনা দেন খলিফা যাহির। যারা গ্রন্থটি মুখস্থ করবে, তাদের তিনি পুরস্কার দেবেন।

যামাখশারির লেখা আল-মুফাসসাল গ্রন্থটি মুখস্থ করতেন খলিফা আল-মালিকুল মুআজ্জাম। যারা গ্রন্থটি মুখস্থ করত, তাদেরকে এক শ দিনার করে দিতেন। আর আল-জামিউল কাবীর গ্রন্থটি মুখস্থ করলে দিতেন দুই শ দিনার। আল-ঈয়াহ গ্রন্থটি মুখস্থ করলে ত্রিশ দিনার দিতেন।<sup>[২]</sup>

### শিক্ষকদের পোশাক

উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগ পর্যন্ত খলিফা, ফকিহ ও প্রাদেশিক শাসকগণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো পোশাক পরতেন। নবিজির পোশাক ছিল সাদামাটা। বেশিরভাগ সময় তিনি লুঙ্গি, জামা, আবায়্যা, পাগড়ি ও মোজা পরতেন। আল্লাহর রাসূলের কাছে সবচেয়ে পছন্দের রঙ ছিল সাদা।<sup>[৩]</sup>

উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে শাসকগণ পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের আদলে পোশাক পরা শুরু করেন। উমাইয়া খিলাফতের রাজধানী ছিল দামিশক। এই দামিশক ছিল খ্রিষ্টান রোমকদের মূল আবাসভূমি। পারস্য সাম্রাজ্য পদানত হলে, উমাইয়ারা খুলাফায়ে রাশিদিনের ঐতিহ্য আর ধরে রাখতে পারেননি। তারা নিজেদেরকে পাল্টে ফেলেন। পোশাক-আশাক, খাবার-দাবার ও রাজপ্রাসাদ উন্নত করার দিকে মনোযোগ দেন। সে সময় রাজ্যের আলিম ও ফকিহগণও খলিফাদের অনুকরণ করেন। তবে পোশাকের দিক থেকে সেই উন্নতিতে খুব বেশি বাড়াবাড়ি ছিল না। তখন পর্যন্তও খুলাফায়ে রাশিদিনের পোশাকের ঐতিহ্য কিছু না কিছু অবশিষ্ট ছিল।

এরপর পারস্যঘেঁষা বাগদাদে যখন আব্বাসী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন পারস্য ঐতিহ্যের ঢেউ খলিফাদের প্রাসাদে উপচে পড়তে থাকে। খলিফা ও বড়লোকদের প্রাসাদে পারসিক বেশভূষার প্রচলন দেখা যায়। খলিফা মনসুর সর্বপ্রথম রাজকীয় পাগড়ি পরে জনসমক্ষে আসেন। তিনিই সর্বপ্রথম পারস্যের

[১] আল-খুতাত ১: ৩৫৫।

[২] আন নুআইমি: আদ দারিস ১: ৫৮৪।

[৩] সহিহুল বুখারি ৮: ৪৯৬-৫০৪।

এই পোশাক ধারণ করেন।<sup>[১]</sup>

খলিফাদের গায়ে পারস্য-রাজাদের মতো প্রশস্ত জামা ও পাজামা শোভা পায়। লম্বা হাতাযুক্ত টিলা জুব্বা অথবা রুমাল-আবৃত আবায়্যা ছিল রাষ্ট্রের অভিজাত শ্রেণীর পোশাক। কবি আবু কাবুস হিরী এ জাতীয় সব পোশাককে নিচের এই কবিতায় একত্র করেছেন। ঈদের মৌসুমে পরার জন্য কিছু পোশাক চেয়ে কবিতাটি তিনি জাফর বিন ইয়াহইয়ার উদ্দেশে লিখেছিলেন:

فلا بد لي من جبة من جبابكم # ومن طيلسان من جياذ الطيالس  
ومن ثوب قوهي وثوب غلالة # ولا بأس لو أتبعك ذلك بخامس  
إذا تمت الأثواب في العيد خمسة # كفتك فلم تحتج إلى لبس سادس

আপনাদের ঐতিহ্যের আদলে কিছু জুব্বা

আর কিছু রুমাল আমার চাই।

কুহেস্তানের কিছু সাদা কাপড় এবং কিছু অন্তর্বাস।

পাঁচটি হলেই চলবে।

ঈদে পরার মতো এ রকম পাঁচটি জামা পেয়ে গেলে

আর বেশি কেনার দরকার নেই।<sup>[২]</sup>

খলিফা যে ধরনের পোশাক ভালোবাসতেন, রাজ্যের জ্বানী-গুনী বিশেষ করে সরকারি কর্মকর্তাগণ সে রকমই বেছে নিতেন। বাদশাহ হারুনুর রশিদের শাসনকাল পর্যন্ত ওটাই ছিল আলিমদের পোশাক। এরপর হারুনুর রশিদ তাদের জন্য বিশেষ এক ধরনের পোশাক বাধ্যতামূলক করেন। ইবনু খাল্লিকান লেখেন:<sup>[৩]</sup> বর্তমান সময়ে আলিমগণ যে ধরনের পোশাক পরেন, তা সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন আবু ইউসুফ। এর আগে সব মানুষ এক রকম পোশাক পরতেন। পোশাকে তাদের মাঝে ছিল না কোনো ভিন্নতা। আবু ইউসুফ সেই প্রথা ভেঙে আলিমদের জন্য কালো পাগড়ির সাথে দুটি বা একটি রুমাল পরার প্রস্তাব করেন।<sup>[৪]</sup> এরপর থেকে এটিই হয়ে ওঠে শিক্ষক ও ফকিহদের পোশাক। একবার বিখ্যাত উজির সাহিব ইবনু আব্বাদ বিদ্যালয়ে হাদিস বর্ণনা করতে

[১] Hitti: History of the Arabs P. 294.

[২] আল জাহশিয়ারি: আল উজরা ওয়াল বাতুক পৃ ০১২।

[৩] ওয়াকায়াতুল আ'য়ান ২: ৪৫০।

[৪] আল মুখাসসাস লি ইবনি সাইয়িদহি ৪: ৭৮, ইবনু খাল্লিকান ২: ৪৫০, আল আগানী ৫: ১০৯, ৬: ৫৯, আল মাকদিসি: আহসানুত তাকাসীম পৃ ৩২৮।



যান। দরসের আসনে বসার আগে তিনি উজিরের পোশাক খুলে আলিমদের পোশাক পরে নেন।<sup>[১]</sup>

আলিমগণ পাগড়ির এক বিঘত বা তার চেয়ে সামান্য লম্বা একটি অংশ দুই কাঁধের মাঝখানে ঝুলিয়ে দিতেন। তা ছাড়া সেই পাগড়ির ওপর চারকোণা রুমাল রেখে কাঁধের দিকে ঝুলিয়ে দিতেন।<sup>[২]</sup>

পোশাক শিল্পের ব্যাপারে নৈপুণ্যের পরিচয় দেন ফাতিমি শাসকগণ। সে সময় পোশাকের জন্য আলাদা কোষাগার ও কারখানা তৈরি করা হয়। সেখান থেকে সকল আমির ও রাজ্যের উচ্চপদস্থ লোকদের জন্য বিশেষ পোশাক সরবরাহ করা হতো। সে আমলে স্তরভেদে মানুষের পোশাক তৈরি করা হয়। শিক্ষকদের পোশাক ছিল সূর্যখচিত। তাতে ছিল ছয়টি অংশ। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল টুপি ও রুমাল।<sup>[৩]</sup> আব্বাসীদের সময়ে যে কালো পাগড়ি পরা হতো, ফাতিমিদের আমলে সেটিকে সবুজে রূপান্তরিত করা হয়। তাই সেই আমলে আলিম ও জ্ঞানীদের মাথায় শোভা পেত সবুজ পাগড়ি।<sup>[৪]</sup>

আইয়ুবী শাসনামলে আলিম ও বিচারকদের পোশাক সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন কালকাশান্দী। তিনি বলেন, তারা খুব বড় আকারের পাগড়ি পরতেন। অনেকে আবার পাগড়ির কিছু অংশ পেছন দিকে দুই কাঁধের মাঝখানে ঝুলিয়ে দিতেন। বাহনে উঠার সময় সেটা তার গদিতে লেগে যেত। অনেকে আবার ঝোলানো অংশের পরিবর্তে বড় রুমাল ব্যবহার করতেন। আর জামার ওপরে লম্বা হাতাবিশিষ্ট প্রশস্ত জুব্বা পরতেন। যার সামনের অংশ খোলা এবং পা পর্যন্ত ঝোলানো থাকত। অনেকে এর পরিবর্তে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত ঢিলেঢালা লম্বা পাঞ্জাবি পরতেন, যার নিচে থাকত লুঙ্গি। তবে তাদের কেউই রেশমি কাপড় পরতেন না। রেশম-মেশানো জামাও কারোর গায়ে শোভা পেত না। তাদের পোশাকের রঙ হতো সাদা। ঘরের বাইরে তারা রঙিন পোশাক পরতেন না।<sup>[৫]</sup>

অপরদিকে আন্দালুসের শিক্ষক ও আলিমদের পাগড়ির রীতি ছিল প্রাচ্যের

[১] ইয়াকুত: মু'জামুল উদাবা ২: ৩১২।

[২] পোশাকের ব্যাপারে জনৈক অজ্ঞাত লেখকের লেখা হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ ৪৯ বা ৫৩ আলিফ ও বা।

[৩] আল-বুতাত ১: ৪০৯-৪১৩, ২: ২৭০।

[৪] আল আইনী: ইকদুল জুমান ১২: ১৯২।

[৫] সুবহল আশা ৪: ৪১-৪২।

আলিমদের থেকে ভিন্ন। এই কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে মাকাররি লেখেন: স্পেনের মুসলমানরা পোশাক ও হাতিয়ার ব্যবহারে প্রতিবেশী ফিরিজিদের অনুসরণ করেন। সমকালীন জনৈক লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে সৈয়দ আমির আলি বলেন,<sup>[১]</sup> স্পেনের ভ্যালেন্সিয়া ও অন্যান্য পাশ্চাত্য অঞ্চলের শিক্ষক ও আলিমগণ পাগড়ির পরিবর্তে মাথা ঢাকার জন্য এক রকম টুপি পরতেন। অনেকে কিছুই না পরে মাথা খালি রাখতেন। জনসমক্ষে বা সুলতানদের দরবারে খালি মাথায় আসতেন। সমকালীন বিখ্যাত স্পেনিশ লেখক ইবনু সাইদ বলেন, ইবনু হুদ কখনো পাগড়ি পরেননি। ইবনুল আহমারও পরেননি। কর্ডোভা ও সেভিলের মতো স্পেনের পূর্বাঞ্চলের ফকিহ ও বিচারকগণ মাথায় পাগড়ি পরতেন। তবে তা ছিল প্রাচ্যের আলিমদের ব্যবহৃত পাগড়ি থেকে অনেক ছোট।

আন্দালুসের মুসলমানগণ ফিরিজিদের অনুকরণে পাগড়ি ছোট করেছেন। কিন্তু ইউরোপের লোকেরাই আবার মুসলিমদের আদলে পোশাক পরত। মুসলিম আলিম ও শিক্ষকদের ব্যবহৃত এসব পোশাক দ্বারা ইউরোপীয় স্কুলগুলোও বিরাট প্রভাবিত হয়েছে। ইদানীং একই পোশাক ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য (সমাবর্তনের সময়) প্রচলিত। তবে নিজস্ব রীতি ও সংস্কৃতি অনুযায়ী তাতে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে তারা যে গাউন, হুড ও ক্যাপ পরে—সেগুলো মুসলিমদের আবিষ্কৃত জুব্বা, রুমাল ও পাগড়িরই বিবর্তিত রূপ। গাউন হলো অনেকটা জুব্বার মতো। সামনের দিক থেকে খোলা। এটা জামার ওপরে পরা হয়। আর হুড অনেকটা রুমালের মতো। এর দুই ধার কাঁধকে ঘিরে পেছন দিকে বুলে থাকে। তাতে উজ্জ্বল রঙের মিশ্রণ থাকে। আর ক্যাপ হলো শাল কাপড় দিয়ে তৈরি কালো রঙের ফেজ টুপি।

সুন্দর, চমৎকার ও আকর্ষণীয় পোশাক পরা এবং চুল পরিপাটি রাখা হলো উত্তম গুণ। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট হাতার রুমী জুব্বা পরতেন। সবসময় তিনি পাকপবিত্র থাকতে পছন্দ করতেন। একবার জুব্বা পরতেন। সবসময় তিনি পাকপবিত্র থাকতে পছন্দ করতেন। একবার এক লোকের গায়ে ময়লা কাপড় দেখে তিনি বললেন, তার কাছে কি কাপড় ধোয়ার মতো কিছু নেই? আরেকবার এক লোকের মাথার চুল এলোমেলো দেখে তিনি বললেন, তার কাছে কি চুল আঁচড়ানোর মতো কিছু নেই? একজন সাধারণ ব্যক্তির ব্যাপারে যদি এই নির্দেশনা হয়, তবে শিক্ষকদের ব্যাপারে তো এটি আরও জোরালো হবে। কারণ শিক্ষকগণ হলেন আদর্শ। ছাত্রদের দৃষ্টি সবসময় শিক্ষকদের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। শিক্ষকদেরকেই তারা অনুসরণ করতে

[১] নাক্ষত তীব ১: ১০৫।

[২] A Short History if the Saeacense p. 571.



পছন্দ করে। আর তাই শিক্ষকদেরকে উত্তম ও পছন্দনীয় পোশাক পরতে হবে। কিছু আলিম এরকম চমৎকার ও আকর্ষণীয় পোশাক পরেই বিখ্যাত হয়েছেন। ইমাম মালিক কিছুটা মিহি ও মসৃণ কাপড় পরতেন। নরম জায়গায় বসতেন। পাতলা রুটি খেতেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াযিদ এ কাজের নিন্দা জানিয়ে তাঁর কাছে চিঠি লেখেন। উত্তরে তিনি লেখেন : আপনার পত্র পেয়েছি। এটি আমি উপদেশ হিসেবে গ্রহণ করলাম। আপনি যা উল্লেখ করেছেন, তা ঠিক আছে। আমরা এমনটিই করে থাকি। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে অবগত আছেন। আমরা কুরআনের এ আয়াত পড়েছি :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

আপনি বলুন, যেসব শোভামণ্ডিত বস্তু ও পবিত্র জীবিকা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, কে তা হারাম করল? [১]-[২]

### শিক্ষকদের সমিতি

মধ্যযুগের মুসলিম শিক্ষকগণ সমবায় সমিতি ও সঙ্ঘের সাথে পরিচিত ছিলেন। আরবি ইতিহাসের কিতাবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। এসব সঙ্ঘ ও সমিতির অধীনে ছিল অনেক সংগঠন। সাবুর বিন আরদেশির প্রতিষ্ঠিত দারুল ইলম পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়া সাংগঠনিক সভাপতি মুরতাযা আবুল কাসিমের কথা আলোচনা করেছেন ঐতিহাসিক ইয়াকুত হামাভী।<sup>[৩]</sup> ফাতিমিদের শাসনামলে সরকারি বস্ত্র কারখানায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত সঙ্ঘের সভাপতির জন্য বিশেষ পোশাক তৈরি হতো। এ কথা উল্লেখ করেছেন ইতিহাসবিদ মাকরিযি।<sup>[৪]</sup>

আবদুর রহমান ইবনুল জাওযি লেখেন :<sup>[৫]</sup> ৪৬২ হিজরিতে একবার আমিদ আবু নাসর স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একত্র করেন। এরপর উজির নিজামুল মুলক তাঁর মাদরাসাগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যে ওয়াকফনামা লেখেন, তা তাঁদের সামনে পাঠ করেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে ছিলেন দুজন সভাপতি,

[১] সূরা আ'রাফ ৭: ৩২।

[২] জনৈক সুফীর লেখা কিতাবুত তা'লীম ওয়াল ইরশাদ পৃ ৪২৯।

[৩] মু'জামুল উদাবা ৬: ৩৫৯।

[৪] আল-খুতাত ১: ৪১১।

[৫] আল মুনতামাম ৮: ২৫৬।

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ এবং প্রধান বিচারপতি।

এভাবে মুসলিম বিশ্ব নানা সংগঠন ও সমিতির সঙ্গে পরিচিত ছিল। এমনকি ঝাড়ুদার ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের অধিকার রক্ষার জন্যও ছিল আলাদা সমিতি। তবে সেদিকে না গিয়ে আমরা কেবল শিক্ষকদের সংগঠন ও সমিতি নিয়েই আলোচনা করব। কেউ যদি প্রশ্ন করেন, সে যুগে শিক্ষকদের স্বেচ্ছা কোনো সমিতি ছিল কি? আমি বলব, হ্যাঁ ছিল। পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের যদি সংগঠন থাকতে পারে, তবে শিক্ষকদের না থাকাটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ শিক্ষকগণ ছিলেন জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণির। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হস্তক্ষেপে তাঁদের ক্ষমতা ছিল। যার ফলে, একতা বজায় রাখতে এবং যাবতীয় প্রয়োজন পরিচালনা করতে সংগঠন ছিল অপরিহার্য। এ কথা খুঁজে বের করে উপস্থাপন করাই কেবল আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং আমাদের কাছে এমন সব জোরালো বর্ণনা আছে, যা নিছক শিক্ষকদের সঙ্ঘ ও সদস্যদের কথাই বলে না, বরং সেসব সদস্যের ক্ষমতা অনেক সময় খলিফাকেও ছাপিয়ে যেত—এটাও প্রমাণ করে। নিম্নে এমন কিছু বিবরণ তুলে ধরছি:

» ইয়াকুত লেখেন:<sup>[১]</sup> খলিফা কাইম বিআমরিলাহ'র শ্রুত কিছু অংশ (গ্রন্থ) খতিব বাগদাদীর হস্তগত হলো। এরপর খতিব ওই অংশ হাতে নিয়ে খলিফার দরজা পর্যন্ত গেলেন। এরপর তিনি এই অংশটি খলিফার কাছে পাঠ করার অনুমতি চাইলে খলিফা বললেন, এই লোক হাদিসশাস্ত্রের বড় পণ্ডিত। আমার কাছ থেকে তা শ্রবণ করার কোনো প্রয়োজন নেই তাঁর। হয়তো তাঁর কোনো চাওয়া আছে। এর মাধ্যমে তিনি ওই চাওয়া পূরণ করতে চান। এরপর জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার চাওয়া কী? তিনি বললেন, আমি চাই, আল-মানসুর জামে মসজিদে আমাকে হাদিস লেখার অনুমতি দেওয়া হোক। এরপর খলিফা তাঁকে এই কাজের অনুমতি প্রদানের জন্য সমিতির প্রধানকে অনুরোধ করলেন।

» সেই আমলে সংগঠন ছিল, এ বিবরণ থেকে তা স্পষ্ট। এমনকি সেসব সংগঠনের কর্মতৎপরতা নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল সাংগঠনিক প্রধানের মুখপাত্রও ছিল। এ কথাও স্পষ্ট যে, এসব সংগঠনের সিদ্ধান্তের বাইরে খলিফা নিজ থেকে কিছু অনুমোদন দেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন না। তাঁদের সঙ্গ পরামর্শ না করে, কাউকে শিক্ষকতার সুযোগও দিতে পারতেন না। আর যদি খলিফা একান্তই চাইতেন, তবে সমিতির প্রধানের অনুমতি

[১] মু'জামুল উদাবা ১: ২৪৬-২৪৭।



পেলে তবেই তা বাস্তবতার মুখ দেখত। মাকরিযি লেখেন:<sup>[১]</sup> একবার প্রধান বিচারপতির (তিনিই শিক্ষক-সমিতির প্রধান) নির্দেশে রাশিদা জামে মসজিদে জুমুআর খতিব হিসেবে নিযুক্ত হলেন আবু তালিব আলি বিন আবদুস সামী আব্বাসী। জুমুআর আগমুহূর্তে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন ইবনু উসফুরা। আবু তালিব নয় বরং খুতবা দেবেন ইবনু উসফুরা—খলিফা যাহির লি ইয়াযি দ্বীনিল্লাহ'র পক্ষ থেকে জারি করা ফরমানটি তিনি সবাইকে দেখান। কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়, খুতবা দেবেন আবু তালিব। আর ইবনু উসফুরা তাঁর পেছনে নামাজ পড়বেন।

» ফাতিমি শাসনামলে প্রধান আহ্বায়কের ক্ষমতা ও ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করেছেন মাকরিযি।<sup>[২]</sup> তিনি বলেন, প্রধান আহ্বায়কের পদ ছিল প্রধান বিচারপতির পরেই। প্রধান বিচারপতির মতোই ছিল তার পোশাক। তিনি হতেন আহলে বাইতের সকল মাযহাব সম্পর্কে অভিজ্ঞ। অন্য মাযহাব থেকে যারা তাদের মাযহাবে যোগ দিত, তাদের কাছ থেকে তিনি অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন। অঙ্গীকার গ্রহণের সময় তার সামনে শিক্ষক-সমিতির বারো জন সদস্য উপস্থিত থাকতেন।

» আবু শামার বিবরণ থেকে জানা যায়: শিক্ষকগণই তাঁদের সমিতির সদস্য ও প্রধান নির্বাচন করতেন। সুলতান এ ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করতেন না। তবে সদস্যদের মাঝে বিরোধ দেখা দিলে খলিফা তা সুষ্ঠুভাবে মীমাংসা করে দিতেন। সেখানে কোনো অধিকার বা ক্ষমতার প্রয়োগ করতেন না। আবু শামা লেখেন:<sup>[৩]</sup> মুকাল্লিদ দাওলাঈ বলেন, হাফিয মুরাদি যখন মারা যান, তখন আমরা ফকিহদের দল দুইভাবে বিভক্ত ছিলাম। একদল কুর্দি এবং অপর দল আরব। আমাদের কেউ মাযহাবের কথা ভেবে শাইখ শরফুদ্দিন বিন আবি আসরুনকে নিযুক্ত করতে চাইল। আবার কেউ যুক্তিবিদ্যা ও ইখতেলাফকে প্রাধান্য দিয়ে কুতুব নিশাপুরিকে নিয়োগ দিতে চাইল। এটাকে কেন্দ্র করে ফকিহদের মাঝে বিশৃঙ্খলা তৈরি হলো। সুলতান নুরুদ্দিন তা জানতে পেয়ে ফকিহদের তলব করলেন। সুলতানের নায়েব হিসেবে মাজদুদ্দিন ইবনুদায়া তাঁদের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁদের বললেন, এসব মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ইলমের প্রচার-প্রসার ও বিদআতের মূলোৎপাটন। কিন্তু আপনারা যা শুরু করেছেন, তা

[১] আল-খুতাত ২: ২৮২।

[২] আল-খুতাত ১: ৩৯১।

[৩] আর রাওয়াতইন ১: ১৩।

কোনোভাবেই কাম্য নয়। আপনাদের থেকে আমরা এটা আশা করিনি। সুলতান বলেছেন, উভয়পক্ষের মাঝে মীমাংসা করতে। উভয় শাইখকে ডাকতে। এরপর উক্ত দুজন শাইখকে তলব করে শাইখ শরফুদ্দিনকে স্বতন্ত্র মাদরাসার দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরে ওই মাদরাসাটি তাঁর নামেই বিখ্যাত হয়ে যায়। আর আন-নাফারি মাদরাসার দায়িত্ব দেওয়া শাইখ কুতুবুদ্দিনকে।

শিক্ষক-সমিতি সম্পর্কে এগুলোই ছিল উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিবরণ। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, এসব সংগঠন ও সমিতি সেই মুসলিম আমল থেকেই শুরু হয়। তবে তখন সেসব সমিতি এতটা পরিণত ও সুসংগঠিত ছিল না। এ কথা স্বাভাবিকভাবেই আমরা স্বীকার করি। তবে এটা অবশ্যই পরিষ্কার হয়েছে যে মধ্যযুগে শিক্ষকদের অধিকার রক্ষায় ছিল স্বতন্ত্র সমিতি এবং সেসব সমিতির সদস্যদের ছিল দারুণ প্রভাব। বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক আর্নস্ট ডাইস ইসলামি জ্ঞানভাণ্ডারের আলোচনা করতে গিয়ে মসজিদ অধ্যায়ে এ নিয়ে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি বিষয়টি উল্লেখ করে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।



## চতুর্থ অধ্যায়

# শিক্ষার্থী সমাজ

মুসলিম শিক্ষার্থীগণ ইলম অনুেষণে নজিরবিহীন ও বিস্ময়কর উদ্যমতার পরিচয় দিয়েছেন, যা এ অধ্যায় থেকেই আপনারা জানতে পারবেন। ইলম অনুেষণে তারা ছিলেন উচ্চাভিলাষী, পর্বতসম সাহসী, অদম্য ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। দুর্গম পথ মাড়িয়ে, সকল বাধা বেরিয়ে, সব ধরনের কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে তারা ইলম অর্জন করেছেন। সে সময় ইলম অনুেষণ করা অতটা সহজ ছিল না। যোগাযোগব্যবস্থা এতটা উন্নত ছিল না। তারপরও দূরের কটকাকীর্ণ পথ মুসলিম শিক্ষার্থীদের সামনে বাধা হতে পারেনি। কোনো ভয় ও শঙ্কা তাদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। জীবন ও পরিবারের মায়া ত্যাগ করে নির্দিধায় ও নিঃসংকোচে তারা ইলম অনুেষণে দূরদেশে পাড়ি জমিয়েছেন।

### জ্ঞান অর্জনের অনুপ্রেরণা

কোন শক্তি এ কাজে তাদের উদ্বুদ্ধ করল? কোন বল তাদের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার পেছনে শক্তি জোগাল? যার ফলে খুব সহজেই তারা অসম্ভবকে সম্ভব করে নিল। ইস্পাতকঠিন বিষয়কে মোমের মতো নরম করে দিল? আমার কাছে মনে হয়েছে, তা কুরআনুল কারীমের শক্তি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের শক্তি। এরপর মুসলিম জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ও মনীষদের নানা জ্ঞান, বাণী ও উপদেশ অর্জনের বিপুল আগ্রহ।

মুসলিম শিক্ষার্থীগণ যতবার ইলম অর্জনের উপকার সংক্রান্ত আয়াত শুনেছে বা হাদিস পড়েছে, ততবার তারা ফিকহ অর্জনের প্রত্যয় নিয়েছে। দীনের ব্যাপারে গভীর জ্ঞান (ফিকহ) অর্জন করে স্বজাতির কাছে ফিরে এসে

তা প্রচারের সংকল্প নিয়েছে। আহলে ইলমের কাতারে शामिल হয়ে আল্লাহর কাছে উচ্চমর্যাদা লাভের ইচ্ছা করেছে। এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিস তারা যতই পড়ত, অন্তরে ততই ইলমের প্রতি আগ্রহ জন্মাত। সব দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে নতুন সংকল্প নিয়ে সে বের হতো ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে। তাই এই অধ্যায়ের শুরুতে আমি ইলম অর্জনের ফজিলত সংক্রান্ত কিছু আয়াত, হাদিস ও বাণী উল্লেখ করতে চাই। আমি মনে করি, ইসলামি বিশ্বে শিক্ষার বিপ্লব রচনায় এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

### ❁ কুরআন থেকে কিছু আয়াত

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেবেন।<sup>[১]</sup>

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?<sup>[২]</sup>

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ  
لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ

তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে?<sup>[৩]</sup>

قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

বলুন, হে আমার পালনকর্তা! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।<sup>[৪]</sup>

[১] সূরা মুজাদালা ৫৮: ১১।

[২] সূরা যুমার ৩৯: ৯।

[৩] সূরা তাওবা ৯: ১২২।

[৪] সূরা আত্বাহ ২০: ১১৪।



فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অতএব তোমরা যদি না জানো, তাহলে জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস  
করো।<sup>[১]</sup>

### ✽ হাদিস থেকে কিছু বিবরণী

غدوة في طلب العلم أحب إلى الله من مائة غزوة

এক সকাল ইলম অর্জন করা আল্লাহর কাছে এক শ যুদ্ধে অংশগ্রহণ  
করা থেকে বেশি প্রিয়।<sup>[২]</sup>

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

মহান আল্লাহ কারও বিষয়ে কল্যাণ চাইলে, তাকে দ্বীনের ব্যাপারে  
গভীর জ্ঞান দান করেন।<sup>[৩]</sup>

العلماء ورثة الأنبياء

আলিমগণ হলেন নবিদের উত্তরসূরি।<sup>[৪]</sup>

أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد

আলিম ও মুজাহিদগণই হলেন নবুওয়তের স্তরের সবচেয়ে কাছাকাছি  
সম্প্রদায়।<sup>[৫]</sup>

يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء

কিয়ামতের দিন আলিমদের কলমের কালি শহীদদের রক্তের সঙ্গে  
ওজন করা হবে।<sup>[৬]</sup>

[১] সূরা আশ্শুরা ২১: ৭।

[২] আসাসুল ইকতিবাস: ১১ নং পাতার কভার (হস্তলিখিত)।

[৩] সহিহুল বুখারি: ১: ২৮।

[৪] আল জামিউস সাগীর: ৫৬৮৭।

[৫] আল মাকাসিদুল হাসানাহ: ৩৪০।

[৬] তাখরিজুল ইহইয়া লিল ইরাকী ১: ২০।

## أفضل الناس المؤمن العالم

আলিম মুমিন হলো মানুষের মধ্যে সবেচেয়ে শ্রেষ্ঠ।<sup>[১]</sup>

## لموت قبيلة أيسر من موت عالم

একজন আলিমের মৃত্যুর চেয়ে একটি গোত্র মারা যাওয়াও কম ক্ষতিকর।<sup>[২]</sup>

### ❁ মনীষীদের বাণী

‘আলিম নয় আবার তালিবুল-ইলমও নয়—উম্মতের এ ধরনের লোকদের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই।’

‘মানুষ আলিম হবে, নাহয় তালিবুল-ইলম হবে। এ ছাড়া বাকি সবাই বর্বর।’<sup>[৩]</sup>

আলী ইবনু আবু তালিব একবার কুমাইলকে বললেন, হে কুমাইল, অর্থবিত্তের চেয়ে ইলম ভালো। ইলম তোমাকে পাহারা দেবে। আর তুমি অর্থকে পাহারা দেবে। ইলম হলো শাসক আর অর্থ হলো শাসিত। অর্থ খরচ করলে কমে। আর ইলম খরচ (প্রচার) করলে বাড়ে।<sup>[৪]</sup> তিনি আরও বলেন, যেদিন তুমি কোনো ইলম অর্জন করোনি, সেদিনের সূর্যোদয় তোমার কোনো কাজে আসেনি। তোমার জন্য কল্যাণকর হয়নি। অর্থ বৃদ্ধিতে কোনো মঙ্গল নেই; মঙ্গল কেবল ইলমের বৃদ্ধিতে।<sup>[৫]</sup>

আহনাফ বলেন, যে সম্মানে ইলমের কৃতিত্ব নেই, একদিন তা লাঞ্ছনার কারণ হবে।<sup>[৬]</sup>

[১] তাখরিজুল ইহইয়া জিল ইরাকী ১:২০।

[২] তাখরিজুল ইহইয়া জিল ইরাকী। এর পরেই লেখক ভুলবশত একটি জাল হাদিস বর্ণনা করেছেন। জাল হাদিস বর্ণনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমরা সেটি উল্লেখ করলাম না। - সম্পাদক

[৩] আসফাহনী: মুহাদ্দারাতুল উদাবা ১: ২৬।

[৪] ইবনু আবদি রাব্বাহি: আল ইকদুল ফারিদ ১: ২৬৫, ইবনু কুতায়বা: উয়ুনুল আখবার ২: ১০০।

[৫] ইবনুল হাজ: আল আলিফ বিল আলিব্বা ৯ হামযাহ (হস্তলিখিত)।

[৬] আসফাহনী: মুহাদ্দারাতুল উদাবা ১: ১৬।



যুবাইর ইবনু আবি বকর বলেন, ইরাক থেকে আমার পিতা পত্র মারফত লেখেন : অবশ্যই তুমি ইলম অর্জন করো। কারণ প্রয়োজন হলে ইলম তোমার জন্য অর্থের ব্যবস্থা করবে। আর অর্থ না চাইলে সে তোমার সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দেবে।

ইবনু আবদিল হাকাম বলেন, একবার আমি ইমাম মালিকের কাছে ইলম অর্জন করছিলাম। সে সময় যোহরের ওয়াক্ত হলো। (সুন্নত) নামাজ পড়ার জন্য আমি কিতাব গুটিয়ে নিলাম। তিনি বললেন, এই ছেলে, যে ইবাদতের জন্য তুমি উঠছ, তা তোমার এ কাজ (ইলম অনুেষণ) থেকে বেশি উত্তম নয়।

জনৈক আলিম বলেন, যে ব্যক্তি ইলম হারিয়েছে, সে কিছুই পায়নি। আর যে ইলম পেয়েছে, সে কিছুই হারায়নি।

জনৈক জ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কী সংগ্রহ করছেন? তিনি বললেন, জাহাজ ডুবে গেলেও যে জিনিস তোমার সঙ্গে সাঁতার কাটবে। অর্থাৎ ইলম।<sup>[১]</sup>

ইবনুল মুকাফফা বলেন, সুদিনের সৌন্দর্য আর দুর্দিনের ত্রাতা হলো ইলম।<sup>[২]</sup>

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে বলা হলো : মনে করুন, আল্লাহ আপনাকে জানিয়ে দিলেন যে, আজ রাতে আপনি মৃত্যুবরণ করবেন। তাহলে আপনি কী করবেন? তিনি উত্তর দিলেন : আমি ইলম অনুেষণ করব।<sup>[৩]</sup>

## শিশুদের প্রতিপালন ও সুস্থ বিকাশ

শিশুদের সুস্থ প্রতিপালনের উদ্যোগ নেওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশু তার মা-বাবার কাছে আমানত। শিশুর কোমল হৃদয় থাকে পবিত্র ও নির্ভেজাল। তাতে কিছুই রোপন করা থাকে না। যা তাতে রোপন করা হবে, তা গ্রহণের জন্যই সে মুখিয়ে থাকে। শিশুকে যে অভ্যাসের মাঝে বড় করা হবে, তা নিয়েই সে বেড়ে উঠবে। যদি ভালো সুভাব ও গুণের অভ্যাস করানো হয়, উত্তম শিষ্টাচার শেখানো হয়, তবে সে ওভাবেই বেড়ে উঠবে। দুনিয়া আখিরাতে সফলকাম হবে। এর পুরস্কার তার মা-বাবা, শিক্ষক সবাই ভোগ করবে। অপরদিকে যদি তাকে অনিষ্ট ও অকল্যাণে অভ্যস্ত করে তোলা হয়, তবে সে পাপিষ্ঠ হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। এর দায় তার অভিভাবককেও নিতে হবে। তাই

[১] আল গাযালী: ইয়াহইয়া ১: ৬-৭।

[২] আল আদাবুস সাগীর পৃ ২২।

[৩] মিনহাজ্জল মুতাআল্লিম: ৫ আলিফ।

অভিভাবকের কর্তব্য হলো, সকল প্রকার পাপাচার থেকে শিশুকে রক্ষা করা। সুশিক্ষা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া। উত্তম চরিত্রের ওপর গড়ে তোলা। খারাপ সঙ্গীদের থেকে দূরে রাখা। খুব বেশি আরাম ও বিলাসিতায় অভ্যস্ত না করা। অত্যধিক সৌন্দর্য, সাজসজ্জা ও শৌখিনতায় অভ্যস্ত না করা। নয়তো বড় হওয়ার পর সে ভোগ-বিলাসের পেছনেই জীবন কাটিয়ে দেবে।

একজন অভিভাবকের স্মরণ রাখা উচিত যে, শিশুদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা কেবল শিক্ষাদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় রয়েছে। একেবারে শুরু থেকেই সেগুলোর চর্চা করতে হবে। শিশুর দুধপান ও পরিচর্যার জন্য হালাল রুজি খেয়ে অভ্যস্ত দীনদার নারী নির্বাচন করতে হবে...। সবসময় শিশুর প্রতি গভীর নজর রাখতে হবে। শিশুর মাঝে লজ্জাশীলতার বীজ বুনতে হবে। খাবার গ্রহণ ও সম্মিলিত আহারের সময় খাওয়ার সঠিক নিয়ম শেখাতে হবে। শিশু নিজের পাশ থেকে খাবে। অন্যদের আগে খাবারের দিকে দৌড়ে যাবে না। খাদ্য বা আহারকারীর দিকে লুলোপ দৃষ্টিতে তাকাবে না। দ্রুত খাবার খাবে না। ভালো করে চিবিয়ে খাবে। দ্রুত একের পর এক লুকমা মুখে দেবে না। খাবারের সময় হাত ও কাপড় নোংরা করবে না। বেশি পরিমাণ খাওয়া থেকে বিরতসাহিত করতে হবে। অন্যদের খাদ্য দান, খাবার নিয়ে অতি মগ্নতা ও অতি উৎসাহ পরিহার, মাঝে মাঝে অমুখরোচক খাবারে তুষ্ট থাকা—এ সব তাকে উৎসাহিত করতে হবে। ভোগবিলাস ও অহংকারপূর্ণ পোশাক থেকে সন্তানকে দূরে রাখতে হবে। পাশাপাশি দুষ্ট শিশুদের থেকেও সন্তানকে বাঁচাতে হবে।

শিশুকে মক্তব-পাঠশালায় পাঠাতে হবে। সেখানে কুরআন শিখবে। সেরা মনীষীদের ঘটনা জানবে। পুণ্যবান লোকদের কীর্তি শুনবে। এভাবে শিশুর হৃদয়ে নেককার লোকদের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হবে। আল্লাহর প্রেম ও আল্লাহওয়ালাদের প্রতি ভালোবাসার কবিতা মুখস্থ করবে। যেসব কবি বেগানা নারীদের প্রতি প্রেম-ভালোবাসাকে স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়, তাদের থেকে শিশুকে দূরে রাখতে হবে। কারণ মেয়েদের প্রতি প্রেম নিবেদনের কবিতা শুনলে শুরু থেকেই তার মনে অনৈতিকতার বীজ জন্ম নেবে।

শিশু থেকে কোনো সুন্দর আচরণ বা ভালো উদ্যোগ প্রকাশ পেলে তাকে পুরস্কৃত করতে হবে। তাহলে সে আনন্দিত হবে। মানুষের সামনে তার প্রশংসা করতে হবে। তবে মাঝে মাঝে দুয়েকবার তার থেকে এর ব্যতিক্রম কিছু প্রকাশ পেলে তা গোপন করা উচিত। তার মর্যাদা নষ্ট করা অনুচিত। বিশেষ করে



শিশু নিজেই যখন তা গোপন রাখতে চেষ্টা করে। সবসময় শিশুকে বকাঝকা বা ধমকানো যাবে না। সবসময় ধমক ও তিরস্কার শুনে অভ্যস্ত হলে তার আত্মবিশ্বাস তলানিতে এসে ঠেকবে। নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলবে।

বাবা তাকে সবসময় বকাঝকা করবে না। তবে মাঝেমাঝে দুয়েকবার করা যেতে পারে। কিন্তু মা তাকে বাবার ভয় দেখিয়ে মন্দ আচরণ থেকে ফেরাবে। দিনের বেলায় ঘুমানো থেকে বারণ করবে। কারণ দিবানিদ্রা শরীরে অলসতার ভাব তৈরি করে। তবে রাতে ঘুমানো থেকে কখনো বারণ করবে না। একেবারে নরম গদগদে বিছানায় শোয়া থেকে নিষেধ করবে। এভাবে তার পেশি ও দেহ মজবুতভাবে বেড়ে উঠবে। এভাবে ধৈর্য ধারণ করার ফলে সে আয়েশী খাবার, পোশাক ও বিছানার প্রতি বিরূপ মনোভাব নিয়ে বড় উঠবে। দিনের কোনো এক সময় তাকে হাঁটাচলা, খেলাধুলা ও কায়িক পরিশ্রমে অভ্যস্ত করতে হবে। এতে করে তার মধ্যে অলসতার ভাব তৈরি হবে না।

নিজের কী কী খাতাপত্র আছে, পিতার কী কী সহায়-সম্পদ আছে, বাড়ি-গাড়ি আছে, এ নিয়ে সহপাঠীদের ওপর গর্ব করা থেকে তাকে বারণ করতে হবে। সহপাঠীদের সঙ্গে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা শেখাতে হবে। সুন্দর কথা বলা শেখাতে হবে। অন্য শিশুদের থেকে কিছু গ্রহণ করা থেকে বারণ করতে হবে। ধনীর সন্তান হলে অন্যদের থেকে নেওয়া নয়; বরং অন্যদেরকে দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করতে হবে। অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করা দীনতা ও অপমান এ কথা বোঝাতে হবে। আর দরিদ্রের সন্তান হলে তাকে অল্পেতুষ্টি শেখাতে হবে। অন্যের জিনিসের প্রতি লোভ করা ও অন্যের থেকে কিছু গ্রহণ করা লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা—এ কথা তাকে বোঝাতে হবে।

সবার সামনে থুথু ফেলা বা নাক ঝাড়া থেকে বারণ করতে হবে। অন্যের সামনে হাই তোলা যাবে না। অন্যের দিকে পিঠ দিয়ে বসা, এক পায়ে ওপর অন্য পা রেখে বসা, খুতির নিচে হাতের তালু ঠেকিয়ে বসা, বাহুতে মাথা ঠেকিয়ে রাখা থেকে নিষেধ করতে হবে। এগুলো আলসেমির নিদর্শন। শিশুকে বসার সঠিক ধরন শেখাতে হবে। অতিমাত্রায় কথা বলা থেকে নিষেধ করতে হবে। সত্য হোক বা মিথ্যা—খুব বেশি প্রয়োজন না হলে শপথ করা থেকে বারণ করতে হবে। বড়রা কথা বললে তা মনোযোগ দিয়ে শোনা, বড়রা এলে দাঁড়িয়ে যাওয়া, বড়দের জন্য জায়গা করে দেওয়া—এগুলো শেখাতে হবে। অশ্লীল বলিয়েদের সঙ্গে মেলামেশা থেকে বাধা দিতে হবে। শিক্ষক প্রহার করলে খুব বেশি চোঁচামেচি ও চিৎকার করবে না। অন্য কারও সুপারিশ চাইবে না। বরং বীর পুরুষের মতো প্রহার সহ্য করে নেবে।

পাঠশালা থেকে ফেরার পর শিশুকে উপযুক্ত খেলাধুলার সুযোগ দিতে হবে। যেন পড়াশোনার ক্লান্তি সে ভুলে যেতে পারে। তবে খেলতে খেলতে যেন খুব বেশি দুর্বল না হয়ে যায়, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। শিশুকে যদি সারাক্ষণ পড়াশোনায় ব্যস্ত রাখা হয়, খেলাধুলার সুযোগ না দেওয়া হয়, তবে তার হৃদয় ভেঙে যাবে। মেধা নষ্ট হয়ে যাবে। গোটা জীবনটাই তার কাছে হয়ে উঠবে বিষাদময়।<sup>[১]</sup>

ইবনু সিনা বলেন, খুব বেশি গুরুত্ব দিতে হবে শিশুর নৈতিক ও চারিত্রিক বিকাশকে। যেন অতিমাত্রায় রাগ বা ভয়ের সম্মুখীন না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। সে কী চায়, এই মুহূর্তে তার কী দরকার, কী দিলে তার হৃদয় জয় করা যাবে—তা দিয়ে তাকে খুশি করতে হবে। যা সে অপছন্দ করে, তা থেকে তাকে দূরে রাখতে হবে। এটি কেবল তার হুকুম পালনের জন্য নয়, তার জীবনযাপন সহজ করার জন্য। এতে দুটি উপকার: একটি তার আত্মার, অপরটি দেহের। এর ফলে শৈশব থেকেই রুচি ও মেজাজ অনুযায়ী তার মাঝে সুস্বভাব তৈরি হবে। কারণ রুচি ও মেজাজ ভালো থাকলেই সুন্দর আচরণ প্রকাশ পায়। আর মেজাজ খারাপ থাকলে যত বাজে স্বভাব তৈরি হয়। সুস্বভাব শিশুর আত্মিক ও দৈহিক সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

ঘুম থেকে জাগার পর সবচেয়ে উত্তম হলো, তাকে গোসল করতে দেওয়া। এরপর কিছুক্ষণ খেলাধুলা করতে দেওয়া। এরপর কিছু খাবার খাইয়ে আবার তাকে লম্বা সময় খেলতে দেওয়া। এরপর তাকে গোসল করিয়ে খেতে দেওয়া...। শিশু ছয় বছরে উপনীত হলে তাকে আদব শিক্ষাদানকারী মুয়াল্লিমের কাছে পাঠানো উচিত। এভাবে ধীরে ধীরে শিক্ষকের কাছে যাতায়াতে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। প্রথম বারেই তাকে পাঠশালায় থাকতে বাধ্য করা যাবে না। কারণ এ বয়সে পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ কম থাকে। ফলে ধকল বেড়ে যাবে।<sup>[২]</sup>

মিনহাজুল মুতাআল্লিম<sup>[৩]</sup> গ্রন্থে আছে: পিতার কর্তব্য হলো, সন্তানকে আদব শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষকের কাছে পাঠানো। যদি সে আদব না শেখে বা মুয়াল্লিমের কাছে না বসে, তবে তার মাঝে বদভ্যাস তৈরি হবে। বিশেষ করে তার জবানে।

[১] ইহয়াউ উলুমুদ্দীন ৩: ৫৭-৫৯।

[২] আল কানুন ১ পৃ ৭৯।

[৩] জনৈক অজ্ঞাত মনীষীর লেখা পাতা ৯।



## শিক্ষার অব্যবহিত সুযোগ সৃষ্টি

ইসলামি বিশেষ ধনী গরিব সবার জন্য শিক্ষা গ্রহণের অব্যবহিত সুযোগ ছিল। দরিদ্র কখনোই শিক্ষার অন্তরায় হতে পারেনি। এ কথা নির্দিষ্টভাবে সবাই স্বীকার করতে বাধ্য।

ইসলামি শিক্ষার সূচনা ঘটে মসজিদে। আর মসজিদ সবার জন্য উন্মুক্ত। এ ব্যাপারে কারও সন্দেহ নেই। মসজিদ-কেন্দ্রিক পাঠশালা ও দরসগায়ে সর্বস্তরের শিক্ষার্থী নিঃশর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে পারত। এর জন্য তাদের কোনো অর্থ খরচ করতে হতো না। সে সময় প্রত্যেক পাঠশালার নিয়ম ছিল, নবাগত শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা ফাঁকা রাখা।

আগেও আলোচনা করেছি যে, এসব পাঠশালায় নির্দিষ্টরূপে কারও জন্য জায়গা বরাদ্দ ছিল না। বরং শিক্ষকের সামনে সবার স্তর সমান ছিল। যারা আগে আসত, তারা আগে বসতো।<sup>[১]</sup> এই সমতা কেবল বসার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং দরিদ্র ছাত্রদের সাথে শিক্ষক ধনীদের মতোই আচরণ করতেন। তা ছাড়া ধনী ও গরিবকে আলাদা দৃষ্টিতে না দেখার এবং তাদের মাঝে পার্থক্য না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হাদিসে।<sup>[২]</sup>

ইয়াকুত বলেন,<sup>[৩]</sup> মসজিদে মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন কাইসানের (মৃত্যু ২৯৯ হিজরি) বিরাট পাঠশালা ছিল। সেখানে অভিজাত সম্প্রদায়, লেখক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরও অংশ নিত। মসজিদের সামনে প্রায় এক শ'র বেশি বাহন দাঁড়ানো থাকত। জীর্ণশীর্ণ দেহের ছেঁড়া কাপড় পরা ব্যক্তিদের সামনে ইবনু আহমাদ যেভাবে আসতেন, অভিজাত ব্যক্তিদের সামনেও ঠিক সেভাবেই আসতেন। দুই শ্রেণীর মাঝে কোনো তারতম্য করতেন না।

এই ছিল মুসলিম শিক্ষকদের অবস্থা। অপরদিকে শিক্ষার্থীরাও একই ভূমিকা পালন করত। শিক্ষকের সামনে তারা সবাই সমান। এক্ষেত্রে ধনী-গরিব ও অভিজাত-মজদুরের কোনো পার্থক্য নেই। এ কথা তারা অনুধাবন করে নেয়। যারা দরসের আদব রক্ষা করবে, শিক্ষকের নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করবে, তারাই হবে অগ্রগামী। তারাই শিক্ষকের সমাদর পাওয়ার বেশি উপযুক্ত। ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বিখ্যাত হাদিস-বিশারদ কাযি শারিকের (মৃত্যু ১৭৭ হিজরি) দরসে একবার খলিফা মাহদির পুত্রগণ উপস্থিত

[১] আল আবদারী: আল মাদখাল ১: ১৯৯।

[২] মুহাম্মাদরাতুল উদাবা ১: ৩০।

[৩] মু'জামুল উদাবা ৬: ২৮২।

হলো। তিনি তখন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে দরস প্রদান করছিলেন। মাহদির এক পুত্র দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে হেলান দিয়ে একটি হাদিস জিজ্ঞেস করল। শারিক তার দিকে ফ্রফ্রপও করলেন না। শাহজাদা আবার জিজ্ঞেস করল। এবারও তিনি তাকালেন না। তখন খলিফার পুত্র বলল, শাহজাদাদের আপনি অবজ্ঞা করছেন? শারিক বললেন, না তো! আলিমদের কাছে ইলম অত্যন্ত মূল্যবান। এটিকে তারা কখনো নষ্ট হতে দেন না।<sup>[১]</sup> এ কথাও আমরা জেনে এসেছি যে, দামিশকের দুর্গ থেকে কিতাব বগলে করে নেমে আসতেন বিখ্যাত আইয়ুবি সুলতান আল-মালিকুল মুয়াজ্জাম ঈসা। এরপর জাইরুন এলাকার আল-আজমী নামক গলিতে অবস্থিত তার উস্তায কিনদির বাড়িতে উপস্থিত হতেন। অনেক সময় তাঁর সিরিয়াল ছুটে যেত। তখন সুলতান নিজ দরসের পালা আসার জন্য উস্তাযের অপেক্ষায় বসে থাকতেন।<sup>[২]</sup>

প্রখর মেধার অধিকারী ও অদম্য শিক্ষার্থীগণ বিশেষ সমাদর লাভ করত। মেধাবী শিক্ষার্থীকে ইলম অর্জনের সুযোগ না দেওয়া বিরাট অবিচার বলে গণ্য হতো। ইমাম গাযালী লেখেন: কারও পাওনা আদায় না করলে যেমন অবিচার হয়, অযোগ্য ব্যক্তিকে ইলম প্রদান করলে এরচেয়ে বেশি অবিচার হয়।<sup>[৩]</sup> শিক্ষকগণ ছাত্রদের প্রতি খুব বেশি যত্নশীল ছিলেন। তাঁরা এত বেশি পড়াশোনার তাগিদ দিতেন যে, অনেক সময় নিজেই শিক্ষার্থীর খরচ চালিয়ে যেতেন। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, ফিকহ ও হাদিস পড়াকালীন আমি ছিলাম দরিদ্র। আমার অবস্থা ছিল করুণ। একদিন আমি আমার উস্তায ইমাম আবু হানিফার কাছে বসা। এমন সময় আমার বাবা সেখানে হাজির হলেন। আমি বাবার সঙ্গে দরস থেকে উঠে চলে এলাম। বাবা আমাকে বললেন, আবু হানিফার কাছে বসে তোমার কী লাভ! আবু হানিফার রুটি তরতাজা ও সুস্বাদু (তিনি ধনী মানুষ)। তোমার উচিত রোজগার করা। না হলে পেট চলবে কিভাবে?! বাবার কারণে আমি প্রায়ই দরস বাদ দিয়ে রোজগারে চলে যেতাম। বাবার কথাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলাম। একদিন উস্তায আমার খোঁজ নিলেন। আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। বেশ কিছুদিন অনুপস্থিত থাকার পর তাঁর কাছে এলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো, কোন কাজে তুমি ব্যস্ত হয়ে গেলে? আমি বললাম, বাবার কথামতো আয়-রোজগার করতে হয়। এরপর আমি দরসে বসলাম। দরস শেষে সব শিক্ষার্থী চলে গেলে আবু হানিফা আমাকে একটি

[১] তায়কিরাতুস সামি' ৮৮-৮৯।

[২] দাহমান: আল মানসুরাতুন নাজিয়া পৃ ১১।

[৩] আল ইহয়া ১: ৪৭।



থলে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এই অর্থ খরচ করবে। খুলে দেখলাম, তাতে এক শ দিরহাম। তিনি আমাকে বললেন, নিয়মিত দরসে বসবে। এই অর্থ শেষ হয়ে গেলে আমাকে জানাবে। এরপর আমি নিয়মিত তাঁর দরসে বসতে লাগলাম। কিছুদিন পর তিনি আবার এক শ দিরহাম দিলেন। এভাবে যতদিন আমার প্রয়োজন ছিল, ততদিন তিনি অর্থ দিয়ে গেলেন।<sup>[১]</sup>

কেবল শিক্ষকগণই দরিদ্র ছাত্রদের প্রতি বিশেষ যত্নশীল ছিলেন, এমনটি নয়। বরং অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য ধনীদের পক্ষ থেকে নানা ওয়াকফ প্রকল্প চালু ছিল। সেসব প্রকল্প থেকে আসা অর্থ দরিদ্র শিক্ষার্থীর পেছনে ব্যয় হতো। ইসলামি বিশ্বে নানা প্রান্তে থাকা এসব প্রকল্প শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিকাশে বিরাট ভূমিকা পালন করত। এ কারণে আমরা দেখতে পাই, মুসলিম জ্ঞানী ও মনীষীদের একটি বিরাট অংশ দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা। তাঁদের মধ্যে :

» বিখ্যাত কবি আবু তামাম তাঈ। তিনি আমার ইবনুল আস মসজিদে বসে জ্ঞান বিতরণ করতেন।<sup>[২]</sup>

» জাহিয়। তিনি প্রাথমিক জীবনে সিহান অঞ্চলে রুটি ও মাছ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এরপর ইসলামি বিশ্বে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি হয়ে ওঠেন বিশ্ববিখ্যাত মনীষী। সমকালীন ও পরবর্তী অনেক প্রজন্ম তাঁর জ্ঞান ও নির্দেশনা মেনে বিপুলভাবে উপকৃত হয়েছে।<sup>[৩]</sup>

» ইমাম শাফিয়ি। তিনি তাঁর মায়ের কোলে ইয়াতিম হিসেবে পালিত হয়েছেন। তাঁর মা ছিলেন অতি দরিদ্র। ছেলের জন্য খাতা-কলম কিনে দেওয়ার সামর্থ্যটুকু তাঁর ছিল না। কিন্তু শাফিয়ি ঠিকই নিয়মিত মসজিদের দরসে বসতেন। আলিমদের থেকে জ্ঞান অর্জন করতেন। এরপর তিনি ইমাম মালিকের শরণাপন্ন হন। ইমাম মালিক তাঁর পৃষ্ঠপোষক করেন। তাঁর যাবতীয় কিছু ব্যবস্থা করেন। এভাবেই নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান সাধনার ফলে একপর্যায়ে তিনি হয়ে ওঠেন ইসলামি ফিকহের বিখ্যাত ইমাম। প্রসিদ্ধ মাযহাব-প্রণেতা।<sup>[৪]</sup>

ইসলামি বিশ্বে যখন মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রচলন শুরু হয়, তখন দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সামনে জ্ঞানার্জনের সুযোগ ছিল অব্যাহত। কারণ মাদরাসার

[১] ইবনু খাল্লিকান ২: ৪৫১ তিনি লেখেন: শৈশবেই আবু ইউসুফের বাবা মারা যান। আবু হানিফার মজলিসে বসতে তার মা তাকে নিষেধ করেন...।

[২] ইবনু খাল্লিকান ১: ১৭২।

[৩] মু'জামুল উদাবা ৬: ৩৬৯।

[৪] প্রায়শঃ।

প্রতিষ্ঠাতাগণ উপলব্ধি করেন যে, যারা ইলম ও মারোফাত শিখতে আসে, তাদের অধিকাংশই হলো সীমিত আয়ের দরিদ্র পরিবারের সন্তান। আর বেশিরভাগ মতো কঠিন পথ পাড়ি দিতে সক্ষম হয় না। অপরদিকে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের যদি সামান্য আয়ের ব্যবস্থা হয়, মাথা গোঁজার ঠাই হয়, তবে তার ও ইলম হতে এবং অধরা সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করতে শিক্ষা তাদের উদ্বুদ্ধ করত। আর তাই মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতাগণ দরিদ্র ছাত্রদের জীবনমান সহজ করতে এবং তাদের জন্য নির্বিঘ্নে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পরিবেশ তৈরিতে সচেষ্ট ছিলেন। এই প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনার সূচনা করেন উজির নিজামুল মুলক। তিনি ঘোষণা করেন যে, মাদরাসায় শিক্ষা গ্রহণ করা সবার অধিকার। মাদরাসায় বিনামূল্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে। শুধু তাই নয়, অবৈতনিক শিক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি উত্তীর্ণ ও মেধাবী ছাত্রদের তিনি ভাতা ও বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।<sup>[১]</sup> বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। একদিকে সেখানে ছিল শাসকের সন্তান। অপরদিকে ছিল সবচেয়ে দরিদ্র পরিবারের নিঃস্ব শিশু শিক্ষার্থী। সবাই একসঙ্গে বিনামূল্যে শিক্ষাগ্রহণ করত। দরিদ্র শিক্ষার্থীরা ওয়াকফ প্রকল্প থেকে নির্ধারিত ভাতা পেত।<sup>[২]</sup>

যেসব ছাত্র এ রকম সুবিধা পেয়ে ইলম অর্জন করেছিল, তাঁদের অন্যতম ছিলেন ইমাম আবু হামিদ গাযালী এবং তাঁর ভাই আহমাদ। ইমাম গাযালীর জীবনীতে এসেছে: তাঁর পিতা তাঁকে এবং তাঁর ভাইকে এক সুফী সাধকের তত্ত্বাবধানে রাখেন শিক্ষাদীক্ষার জন্য। সুফী সাহেব সাধ্যমতো তাঁদের দেখাশোনা করতে থাকেন। একপর্যায়ে পিতার দেওয়া অর্থ ফুরিয়ে গেল। নিজের পকেট থেকে তাঁদের খরচ দেওয়ার সামর্থ্য সুফী সাহেবের ছিল না। তাই তিনি তাঁদের ডেকে বললেন, শোনো, তোমাদের জন্য যে অর্থ আমার কাছে ছিল, তা শেষ হয়ে গেছে। আমি একজন দরিদ্র মানুষ। তোমাদের খরচ চালানোর মতো পর্যাপ্ত অর্থ আমার কাছে নেই। আমার কাছে ভালো মনে হয়, তোমরা ইলম অর্জনের জন্য কোনো মাদরাসায় ভর্তি হয়ে যাও। তাহলে যেমন ইলম অর্জনের অব্যবহিত সুযোগ পাবে, অপরদিকে খরচ চালানোর মতো প্রয়োজনীয় অর্থও পেয়ে যাবে। সুফী সাহেবের পরামর্শে তাঁরা তাই করলেন। এভাবেই ইলম অর্জন করতে করতে একসময় তাঁরা জ্ঞান ও খ্যাতির শীর্ষে উঠে গেলেন।

[১] আস সুবকি: তাবাকাতুশ শাফিয়িয়াতিল কুবর ৩: ১৩৭।

[২] মুহাম্মাদ আবদুহ: আল ইসলাম ওয়ান নাসরানিয়া পৃ ৯৮।



মিসরুল মুসল্লের দেখানো পথেই ইংটেন সুলতান নুরুদ্দিন জেনগি। তিনি দামিষ্কে অসংখ্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সেগুলোর জন্য বিপুল অর্থের ওয়াকফ প্রকল্প বরাদ্দ রাখেন। এসব প্রকল্প থেকে যা আয় হতো, তা দিয়ে ছাত্র ও শিক্ষকগণ নিবিঘ্নে জীবন ধারণ করতে পারতেন। অনায়াসে তাদের সমুদয় খরচ নির্বাহ করতে পারতেন। ইবনু জুবাইর এ উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, প্রাচ্যের সকল অঞ্চলে এ রকম ওয়াকফ ব্যবস্থাপনা প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে দামিষ্কে। তাই তো পাশ্চাত্যের দূর দেশ থেকেও জ্ঞানপিপাসু ছাত্ররা ইলম অর্জনের আশায় প্রাচ্যে আগমন করত। তার মুখ থেকেই শুনুন : প্রাচ্যের সকল অঞ্চলে তালিবুল-ইলমদের জন্য প্রচুর ওয়াকফ প্রকল্প চালু ছিল। বিশেষ করে দামিষ্কে। আমাদের পাশ্চাত্য অঞ্চলে যারা সফলতা অর্জন করতে চায়, তারা যেন প্রাচ্য অঞ্চলে পাড়ি জমায়। সেখানে তাদের জন্য সহায়ক অনেক কিছু বরাদ্দ আছে। এর মধ্যে প্রধান হলো, জীবিকা উপার্জনের পেরেশানি থেকে মুক্তি।<sup>[১]</sup>

মিশরের ইতিহাস পড়লে সেখানেও আমরা শিক্ষার্থীদের প্রতি প্রচুর সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা এবং তাদের জীবনযাত্রা সহজ করার কথা জানতে পারি। আল-আবহার বিশুবিন্দ্যালয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিখ্যাত গবেষক ট্যানলি লেইন বলেন, আল-আবহার বিশুবিন্দ্যালয়ে প্রচুর শিক্ষার্থী সমবেত হয়। ইবনুনাযিম বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে তারা এখানে পড়তে আসে। ইয়েমেনের গোত্তমোহর থেকে দ্বীপদেশ মালয়েশিয়া—সব জায়গা থেকে শিক্ষার্থীরা দলে দলে এখানে আসে। প্রতিটি অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে পৃথক আবাসন-ব্যবস্থা। ছাত্ররা সেখানে মহান জ্ঞানী ও সুবিজ্ঞ শাইখদের থেকে দরস গ্রহণ করে থাকে। সেখানে শিক্ষাব্যবস্থা কেবল অবৈতনিকই নয়; বরং নানা ওয়াকফ প্রকল্প থেকে আনা অর্থ থেকে ছাত্রদের বৃত্তি ও ভাতা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা সেই ভাতা থেকে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। ছাত্রদের জাত, ভাষা, বর্ণ ও দেশ নির্বিশেষে সবার জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে আল-আবহার বিশুবিন্দ্যালয় একটি আদর্শ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান।<sup>[২]</sup>

আইয়ুবী শাসনামলে মিশরের প্রতিটি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি করে বাসস্থান এবং একজন করে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হতো। তা ছাড়া তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থাও সেখানে করা হতো।<sup>[৩]</sup>

[১] রিহলাতু ইবনি জুবাইর ৮৫।

[২] The Story of Cairo p. 124.

[৩] রিহলাতু ইবনি জুবাইর পৃ ৪২।

এভাবেই দরিদ্র শিক্ষার্থীগণ খুব বেশি কষ্ট ও দুশ্চিন্তা ছাড়াই ইলম অর্জনের পথ পাড়ি দেন। নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে সক্ষম হন। মিশরে শত শত আলিম ও বিদ্বান রয়েছেন, যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ময়দানে তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। মূল ঘাটলে জানা যাবে, পারিবারিকভাবে তাঁদের উল্লেখযোগ্য কোনো মর্যাদা ও খ্যাতি ছিল না। তাঁরা দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। এমন জ্ঞানীদের অন্যতম হলেন ৪৬০ হিজরিতে মৃত্যুবরণকারী বিখ্যাত মিশরী ডাক্তার আলি বিন রিদওয়ান। তিনি চিকিৎসা, দর্শন, যুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে বিপুল পারদর্শিতা অর্জন করেন। সমকালীন মিশরের ডাক্তারদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এমনই আরেকজন হলেন বিখ্যাত ফকিহ নাজমুদ্দিন খাবুশানী (মৃত্যু ৫৮৭ হিজরি)।

আলোচনা শেষ করার আগে আরেকটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত দিতে চাই। তা হলো, এ রকম বিনামূল্যে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ কেবল মসজিদ ও মাদরাসাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মক্তব ও ক্ষুদে পাঠশালাতেও এ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সেখানে দুঃস্থ, অভাবী, ছিন্নমূল, ইয়াতিম ও দরিদ্র শিশুদের পড়ার জন্য সব রকম সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান ছিল। দরিদ্রতা কারও পড়াশোনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াত না। এ রকম অবৈনিতক মক্তব ইসলামি বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। এর কয়েকটি আমি তুলে ধরছি:

» ইসলামি বিশ্বে অবৈতনিক ক্ষুদে পাঠশালার প্রচলন ছিল বহু আগে থেকেই। জাহশিয়রী লেখেন: [১] ইয়াহইয়া বিন খালিদ বারমাকী ইয়াতিমদের জন্য বহু মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা প্রসার লাভ করার পর সেখানে ভর্তির যোগ্য করে তুলতে অবৈতনিক মক্তবেরও প্রসার ঘটতে থাকে। ইমাদুদ্দিন আসফাহানী লেখেন: [২] শামসুল মুলক বিন নিজামুল মুলকের মন্ত্রিত্বকালে আজিজুদ্দিন আবু নাসর আহমাদ বিন হামিদ অর্থবিভাগের দায়িত্ব পান। তখন তিনি বাগদাদের মাহাল্লাতুল আতাবীন এলাকায় ইয়াতিমদের জন্য একটি মক্তব চালু করেন। এর জন্য দীর্ঘমেয়াদী ওয়াকফ প্রকল্পও চালু করে দেন। সেখানে শিক্ষারত ইয়াতিমরা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত ভরণপোষণের সুবিধা পেত। তাদেরকে খাবার, পোশাক ও খরচ প্রদান করা হতো। শিষ্টাচার শেখানো হতো। কুরআনুল কারীম হিফজ করানো হতো। হালাল-হারাম শিক্ষা দেওয়া হতো।

» নুরুদ্দিন জেনগি তাঁর নিয়ন্ত্রিত অনেক অঞ্চলে ইয়াতিমদের জন্য মক্তব

[১] আল ওজারা ওয়াল কুত্তাব পৃ ২১২।

[২] তারিখু আলি সালজুক ১৩৬-১৩৭।



চালু করেন। সেখানে তাদের জন্য নিশ্চিত করেন উপযুক্ত শিক্ষা ও পর্যাপ্ত সুবিধা।<sup>[১]</sup> সালাহুদ্দিন আইয়ুবির শাসনামলে দামিশকে বিশাল পাঠশালা ছিল। সেজন্য সূত্র ওয়াকফ প্রকল্প জারি রাখা হয়। সেই ওয়াকফ প্রকল্প থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিয়ে শিক্ষকরা ইয়াতিম শিশুদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করতেন।<sup>[২]</sup>

» মিশরের আলোচনা করতে গিয়ে ইবনু জুবাইর লেখেন :<sup>[৩]</sup> সালাহুদ্দিন আইয়ুবির অন্যতম প্রশংসনীয় কীর্তি হলো, তিনি প্রচুর পাঠশালা নির্মাণের উদ্যোগ দেন। সেসব পাঠশালায় আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। তাঁরা বিশেষভাবে ইয়াতিম ও দরিদ্র শিশুদের পাঠদান করতেন। সেখানে শিক্ষারত শিশুদের জন্য উপযুক্ত ভাতার ব্যবস্থা ছিল। তা ছাড়া কাযি ফাদিলও মজুবে শিক্ষারত ইয়াতিমদের জন্য নানা ওয়াকফ প্রকল্প চালু করে যান।<sup>[৪]</sup>

ইসলামি বিশ্বের প্রতিটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সুযোগ ছিল। দরিদ্রতা কখনো ইলম অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। সেই সাথে মেধাবী ও প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। নানা ওয়াকফ প্রকল্প চালু করা হয় মাদরাসার জন্য।

## প্রতিভা ও ঝোঁক অনুযায়ী নির্দেশনা প্রদান

প্রতিভা ও ঝোঁক বুঝে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা প্রদানের বিষয়টি মধ্যযুগ থেকেই মুসলমানদের কাছে পরিচিত। একজন ছাত্র যখন শিক্ষার প্রাথমিক স্তর পার হতো, তখনি তাকে এমন নির্দেশনা প্রদান করা হতো। হাজি আবু খলিফা<sup>[৫]</sup> এবং আবু ইয়াহইয়া<sup>[৬]</sup> লেখেন : পাঠ, লিখন ও গণিতের মতো জরুরি জ্ঞানের কিছু অংশ শিক্ষা করা প্রতিটি শিশুর জন্য আবশ্যিক...। এরপর তার দক্ষতা ও প্রবণতা বুঝে তাকে কোনো একটি জ্ঞানে পারদর্শী হওয়ার পথ বেছে নিতে হবে। কারণ সব শাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া কারও জন্য সম্ভব নয়। তাই কোন বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার পথ সে বেছে নেবে, সেটি তার ঝোঁক ও প্রবণতা

[১] ইবনু ওয়াসিল: মুফাররিজুল কুরব ১৬৫-১৬৬।

[২] ইবনু জুবাইর: পৃ ২৭২।

[৩] প্রাগুক্ত।

[৪] মাকরিযি: আল-খুতাত ২: ৩৬৬, নুআইমি ১: ৯২, আর রাওয়াতাইন ২: ২৪১।

[৫] কাশফুয যুনুন ১: ২৯।

[৬] আল লুলুন নাযিম ফি ক্রমিত তা'লীম পৃ ৫।

অনুযায়ী ঠিক করতে হবে। কারণ সব জ্ঞান সবাই সমানভাবে বুঝতে ও ধারণ করতে পারে না।

যারনুজী বলেন,<sup>[১]</sup> শিক্ষার্থী নিজ থেকেই সেই বিদ্যা নির্বাচন করতে যাবে না। বরং বিষয়টি তার উস্তাযের হাতে ছেড়ে দেবে। কারণ দীর্ঘ সময় পর্যবেক্ষণের ফলে কোন দিকে ছাত্রের ঝোঁক বেশি, কোন বিষয়ে ছাত্রের প্রতিভা কেমন—তা তিনি উপলব্ধি করেছেন। তাই ছাত্রের জন্য কোনটি উপযুক্ত, তা তিনিই বেশি বুঝবেন। শিক্ষকের কর্তব্য হলো, নিজ মেয়ের জন্য তিনি যেমন পাত্র খোঁজেন এবং হবু জামাইকে পরখ করে দেখেন, তেমনি ছাত্রদেরকেও পরখ করবেন। আসফাহানীর বক্তব্যও এমন।<sup>[২]</sup> পাশাপাশি শিক্ষকের কর্তব্য হলো, যতটুকু গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে, ততটুকুই তাকে দেওয়া। কারণ সবক'টি শাস্ত্র শিশু গ্রহণ করতে পারবে না। তবে তার রুচি ও আগ্রহের অনুকূলে হলে সেটি ভিন্ন কথা।<sup>[৩]</sup>

শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাইয়ের অভিনব সব উপায় বর্ণিত আছে মিনহাজুল মুতাআল্লিম গ্রন্থে। তাতে বলা আছে, শিক্ষকের অন্যতম কর্তব্য হলো, একেবারে প্রাথমিক স্তরেই শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই করা। তার ধারণক্ষমতা অনুযায়ী তাকে শেখানো। অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে না দেওয়া। কারণ বেশি বোঝা চাপাতে গেলে ইলম অর্জনের আগ্রহটাই সে হারিয়ে ফেলবে। নিজের খেয়াল-খুশিমতো সবকিছু করতে চাইবে। তার শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যহত হবে।

শিক্ষার্থীদের মেধার তারতম্যের বিষয়টি মুসলিম শিক্ষক ও মনীষীগণ খুব ভালোভাবেই অনুধাবন করেন। ইমাম গায়ালী বলেন, আত্মিক ক্ষমতার চেয়ে দৈহিক শক্তি বেশি হলে শিক্ষার্থীকে দীর্ঘসময় ধরে শিখতে হবে। আর যদি দৈহিক শক্তির চেয়ে বুদ্ধির দীপ্তি বেশি হয়, তবে অধিক সময় ব্যয় না করে অল্প চিন্তার মাধ্যমেই তা অর্জন করে নিতে পারবে।<sup>[৪]</sup> কাজেই আদর্শ শিক্ষকের কর্তব্য হলো, পড়ানোর সময় মেধাবী ও বোকা শ্রেণী দুটোকে গুলিয়ে না ফেলা। এতে করে মেধাবীর প্রতি অবেহলা দেখানো হয়, অপরদিকে নির্বোধের প্রতি অতি যত্নআত্তি প্রকাশ পায়।<sup>[৫]</sup>

কিভাবে শিক্ষকরা মেধা যাচাই করতেন, আমার জানামতে এ বিষয়ে

[১] তা'লীমুল মুতাআল্লিম হরিকুত তা'আল্লুম পৃ ১৩।

[২] মুহাদ্দারাতুল উদাবা ১: ২৫।

[৩] ইবনু সিনা: আল কানুন ১: ২৭।

[৪] আর রিসালাতুল লাদুন্নিয়া পৃ ৩৩।

[৫] মিনহাজুল মুতাআল্লিম ৯ বা।



ইতিহাসবিদগণ বিস্তারিত কিছু বলে যাননি। তবে বোঝা যায়—শিক্ষকগণ নিজেদের দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থেকে সেটি ধরে ফেলতেন। তারা পরীক্ষা করে দেখতেন যে, মুখস্থ করার দিকে তার ঝোঁক বেশি, নাকি চিন্তা-গবেষণার দিকে। মুখস্থ করার আগ্রহ বেশি হলে ছাত্রকে ইলমুল হাদিস বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিতেন। আর চিন্তা-গবেষণার ঝোঁক বেশি হলে দর্শন, যুক্তিতর্ক ও বাগিতা বেছে নেওয়ার কথা বলতেন।

এভাবে শিক্ষার্থীকে কোনো একটি শাস্ত্রে বেছে নেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হতো। অথবা উস্তাযের পরামর্শ ছাড়াই সে নির্দিষ্ট কোনো শাস্ত্রের দরসে গিয়ে বসতো। কিন্তু ওই শাস্ত্রের শিক্ষক তাকে অনুপযুক্ত মনে করলে, অন্য দরসে যোগদানের পরামর্শ দিতেন। ইবনু জামাআ বলেন,<sup>[১]</sup> শিক্ষার্থী কোনো শাস্ত্রে ভালো করতে না পারলে, শিক্ষক তাকে মেধা ও আগ্রহ অনুপাতে অন্য সাবজেস্ট বেছে নেওয়ার কথা বলতেন। বর্ণিত আছে, ইউনুস বিন হাবিব শুরুতে হুন্দশাস্ত্র শেখার জন্য খলিল বিন আহমাদের কাছে আসা-যাওয়া করতেন। একসময় তাঁর জন্য সেটি কঠিন হয়ে পড়ে। খলিল তাঁকে একদিন বলেন, নিচের এই কবিতাটি কোন সমুদ্র থেকে আনা?

إذا لم تستطع شيئاً فدعه # وجاوزه إلى ما تستطيع

কোনো বিষয় পেরে না উঠলে, তা ছেড়ে দাও।  
যা পারো, তাই নিয়েই ব্যস্ত হয়ে যাও।

খলিলের ইঙ্গিত তিনি বুঝে ফেললেন। এরপর হুন্দশাস্ত্র ছেড়ে আরবি ভাষা ও ব্যাকরণ শেখা শুরু করলেন। একপর্যায়ে তিনি হয়ে ওঠেন ভাষা ও ব্যাকরণের ইমাম ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত।<sup>[২]</sup> তেমনি মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারিও শুরুতে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের কাছে ফিকহ পড়া শুরু করেন। কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান তাঁকে বললেন, তুমি গিয়ে ইলমুল হাদিস শেখো। কারণ তিনি তাঁর মেধা ও স্বভাবের সঙ্গে ইলমুল হাদিসের সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছিলেন। উস্তাযের নির্দেশনা অনুযায়ী ইলমুল হাদিস চর্চা করে তিনি হয়ে ওঠেন প্রাজ্ঞ ইমাম।<sup>[৩]</sup>

## শিক্ষার বয়স

[১] তাযকিরাতুস সাগি' পৃ ৫৭।

[২] আসফাহানী: মুহাদারাউল উদাবা পৃ ২৫।

[৩] যারনুজী: তা'লীমুল মুতাআল্লিম পৃ ১৩।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা মায়ের কোল থেকে শুরু করে কবরে যাওয়া পর্যন্ত ইলম অর্জন করতে থাকো।<sup>[১]</sup> এ হাদিসের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, শিক্ষার কোনো বয়স নেই। বরং যখন সুযোগ আসে, তখন জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যিক। প্রতিটি মুসলিম এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। এমনকি বয়স বেড়ে যাওয়ার পরও। আমার ইবনুল আলাকে একবার প্রশ্ন করা হয় : কতটুকু বয়স পর্যন্ত একজন মানুষের জ্ঞানার্জন চালিয়ে যাওয়া আবশ্যিক? উত্তরে তিনি বলেন, আজীবন শিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যিক।<sup>[২]</sup> জনৈক জ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করা হয় : শিক্ষার সীমারেখা কতটুকু? তিনি বলেন, জীবনের সীমারেখা যতটুকু।<sup>[৩]</sup> যারনুজি লেখেন : বয়স যতই হোক, একজন সুস্থ-সবল ও বিবেকবান মানুষের কখনোই ইলম অর্জন ত্যাগ করা উচিত নয়। এ ব্যাপারে কোনো অজুহাত চলবে না।<sup>[৪]</sup> ইবনু কুতায়বা লেখেন : একজন ব্যক্তি যতক্ষণ জ্ঞান অর্জনে লিপ্ত থাকে, ততক্ষণ সে জ্ঞানী। যখন সে নিজেকে পণ্ডিত ভেবে জ্ঞানার্জন থেকে বিরত হয়ে যায়, তখন সে মূর্খ হিসেবে গণ্য হয়।<sup>[৫]</sup>

এই চিন্তার আলোকে আমরা দেখি, নবিজির সাহাবিগণ বয়স বেড়ে যাওয়ার পরও ইলম অর্জন করতেন। ইমাম বুখারি এমনটিই বর্ণনা করেন।<sup>[৬]</sup> শুধু তাই নয়, মৃত্যুশয্যাতেও অনেক মনীষী নির্দিষ্ট মাসআলায় তাঁর সন্দেহ দূর করে সঠিক জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসুক ছিলেন। এই ধরনের ঘটনাও আমরা জানতে পারি।<sup>[৭]</sup>

এসব কিছু ফলাফল হলো, জীবনের প্রতিটি স্তরকে শিক্ষাদান হিসেবে নিতে হবে। তবে অল্পবয়সে জ্ঞানার্জন দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে অনেক উপকারী। এ কথা মুসলিম মনীষীগণ খুব ভালোভাবে অনুধাবন করেন। হাজি খলিফা লেখেন :<sup>[৮]</sup> বয়সে তরুণ হওয়া, ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হওয়া, পার্শ্বব পিছুটান থেকে খালি হওয়া, বুট-ঝামেলা কম থাকা, এমনকি পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও সুদেশের টান হৃদয় থেকে ঝেড়ে ফেলা—এগুলো ইলম

[১] হাজি খলিফা: কাশফুয় যুনুন ১: ১৩।

[২] ইবনু খাল্লিকান: আল ওয়াফায়াত ১: ৫৫১।

[৩] আসফাহানী: মুহাদারা তুল উদাবা ১: ২৬।

[৪] তা'লিমুল মুতাআল্লিম পৃ ২৫।

[৫] উয়নুল আখবার ২: ১১৮।

[৬] সহিহুল বুখারি ১: ৩০।

[৭] ইয়াকুত: মু'জামুল উদাবা ৬: ৩০৯।

[৮] কাশফুয় যুনুন ১: ২৮।



অর্জনের অন্যতম শর্ত। ইবনু জামআ লেখেন : সুস্থতা, তারুণ্য, কৈশোর এবং অবসর মুহূর্তগুলো খুব যত্নের সাথে কাজে লাগিয়ে ইলম অর্জন করা আবশ্যিক। অন্যথায় ব্যস্ততা বেড়ে গেলে বা বড় পদে বসে গেলে সেই সুযোগ আর মিলবে না।<sup>[১]</sup> শিক্ষার্থী যথাসম্ভব অবিবাহিত হলে ভালো। অন্যথায় বিবাহিত জীবনের ব্যস্ততা ও জীবিকার তাগিদ বারবার তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।<sup>[২]</sup> তারুণ্য ও যৌবনের প্রাথমিক সময়গুলো ইলম অর্জনে কাটাতে চেষ্টা করবে। টালবাহানা, আলসেমি ও কালক্ষেপণ থেকে বিরত থাকবে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাবে। কেননা, ফুরিয়ে যাওয়া সময় কখনো ফিরে আসবে না। নানা রকম ব্যস্ততা বেড়ে ফেলে এবং বাধা-বিপত্তি মাড়িয়ে পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। নিরলসভাবে জ্ঞানার্জনের সাধনায় লিপ্ত হতে হবে। পার্থিব ব্যস্ততা শিক্ষার্থীদের জন্য ডাকাতির মতো। তাই পূর্ববর্তী জমানার মনীষীগণ ইলম অর্জনের জন্য দূরদেশে পাড়ি জমানোর পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ, চিন্তার পরিধি বেড়ে গেলে জ্ঞানের সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়গুলো অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ে। কথায় আছে, 'তুমি যখন ইলমের জন্য সবকিছু উজাড় করে দেবে, ইলম তখন তোমাকে তার কিছু অংশ প্রদান করবে।'<sup>[৩]</sup> আসফাহানী লেখেন : অনেক মনীষী বলেন, নানা ব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়ার আগে শৈশবেই তোমরা সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষা সম্পন্ন করো। বড় হওয়ার পর তার চিন্তা ও বুদ্ধি পরিপক্ব হলেও, তখন সে নানা ব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়ে।<sup>[৪]</sup> ইলম অর্জন করার মতো সময় সুযোগ আর থাকে না।

ইসলামি বিশ্বে এই উপদেশ ও নির্দেশনাগুলো জ্ঞানী ও শিক্ষকদের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। মানুষও তাঁদের পরামর্শ মেনে শৈশবেই সন্তানদের পাঠশালায় পাঠানোর উদ্যোগ নেয়। তেমনি শিশুরাও বড়দের উপদেশ শুনে জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করে। শুধু তাই নয়, ভালো করে দরস শুনতে এবং বেশি পরিমাণ উপকৃত হতে কে কত বেশি উস্তাযের কাছাকাছি বসতে পারে, এ নিয়ে তাদের মাঝে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। অনেক মুহাদ্দিস তাঁর দরসে দাড়িবিহীন বালকদের বসতে দিতেন না। ইতিহাসে আছে, হাদিস শোনার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল এক বালকের। কিন্তু দাড়ি না থাকায় তাকে দরসে বসার অনুমতি

[১] তাযকিরাতুস সামে' পৃ ১৩৪।

[২] প্রাণ্ডল।

[৩] তাযকিরাতুস সামে' ৭০-৭১।

[৪] মুহাদ্দারাতুল উদাবা ১: ২৬।

দেওয়া হতো না। পরে সে রোজ কৃত্রিম দাড়ি লাগিয়ে দরসে বসতো।<sup>[১]</sup>

অল্প বয়সে শিক্ষাজীবন শুরু করার ফলে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় বিপুল জ্ঞান আহরণ করে। যৌবনের শুরুতেই একেকজন শিক্ষার্থী হয়ে ওঠে বিদগ্ধ জ্ঞানী। অল্প বয়সে শিক্ষাজীবন শুরু করার ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থী বিশ্বায়কর সাফল্যের দৃষ্টান্ত রাখতে সক্ষম হয়। কাতাদাহ বলেন, আমি সাত মাসে কুরআন হিফজ করি।<sup>[২]</sup> সাহল বিন তাসাতুরি যখন কুরআনুল কারীম হিফজ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ছয় কী সাত বছর।<sup>[৩]</sup> তাজুদ্দিন কিনদি মাত্র দশ বছর বয়সে দশ কিরাতাতের ওপর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।<sup>[৪]</sup> উমর বিন আহমাদ বিন আদিম বলেন, মক্কে ভর্তি হওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল সাত বছর। আর কুরআনুল কারীম হিফজ করার পর তাঁর বয়স ছিল নয়। দশ কিরাতাত পাঠ শেষ করার সময় তাঁর বয়স ঠেকে দশ বছরে।<sup>[৫]</sup>

ইমাম শাফিয়ি সাত বছর বয়সে কুরআনুল কারীম হিফজ শেষ করেন। এগারো বছর বয়সে আল-মুয়াত্তা গ্রন্থ মুখস্থ করে ফেলেন। তিনি যখন পনেরো বছরে উপনীত, তখন লোকজন তাঁকে বলতে শুরু করে, হে আবু আবদিল্লাহ, আপনি ফতোয়া দেওয়া শুরু করুন। আল্লাহর শপথ! আপনার যে যোগ্যতা, তাতে আপনার ফতোয়া প্রদানের সময় হয়ে গেছে। সুফিয়ান বিন ওয়াইনার কাছে কেউ ফতোয়া বা তাফসির জিজ্ঞেস করতে এলে তিনি শাফিয়ির দিকে তাকিয়ে বলতেন, এই বালককে জিজ্ঞেস করুন।<sup>[৬]</sup> বিখ্যাত মনীষী ইবনু সিনার বয়স যখন দশ, তখন তিনি কুরআনের বিদ্যা ও সাহিত্য রপ্ত করেন। পাশাপাশি ধর্মীয় মূলনীতি, জৌতির্বিদ্যা, বীজগণিত ইত্যাদি থেকেও অনেক কিছু মুখস্থ করে নেন।<sup>[৭]</sup>

## পাঠশালা বা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী সংখ্যা

হাদিস শিক্ষাদানকারী শিক্ষকগণ কিছু মূলনীতির আলোকে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। তার অন্যতম ছিল শিশুদেরকে তার সমবয়সী শিশুদের সঙ্গে বসে

[১] আদম মিতয: আল হাদারাতুল ইসলামিয়া ১: ৩০৩ (আরবি অনূদিত গ্রন্থ থেকে)।

[২] ইবনু আবদি রাব্বাহি: আল ইকদুল ফারিদ ১: ২৬৭।

[৩] আল গাযালি: আল ইহইয়া ৩: ৫৯।

[৪] নুআইমি: আদ দারিস ১: ৪৮৩-৪৮৪।

[৫] ইয়াকুত: মু'জামুল উদাবা ৬: ৩৬।

[৬] ইবনু খাল্লিকান: ওয়াফয়াতুল আ'য়ান : ৬৩৭।

[৭] প্রাপ্ত।



পড়ানো। শিক্ষকগণ শিশুদের কাছে মূল পাঠ বলতেন। এরপর তাদের থেকে সেটি শুনতেন। শিশুদের সুষ্ঠু শিক্ষাদানের জন্য এটি একটি জরুরি ও কার্যকরী পদ্ধতি। তা ছাড়া সম্মিলিতভাবে পাঠদান করলে দ্রুত আয়ত্ত্ব করা সহজ। অন্যদিকে পাঠ-পর্বটিও শিশুদের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। তা না করে শিশুদেরকে যদি বড়দের সঙ্গে বসানো হয় বা পড়ানো হয়, তবে চিন্তা ভাবনা ও ব্যবহারে তার মাঝে নানা সমস্যা দেখা দেয়। এটি বড় গৌরবের বিষয় যে মুসলমানগণ সে যুগেই এটি অনুধাবন করেন। বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ইবনু সিনা তার ভাষায় বলেন, মক্তবের শিশুর সঙ্গে তার সমবয়সী অনেক শিশুকে জড়ো করে সবাইকে একসঙ্গে পাঠ দিতে হবে। কারণ, সম্মিলিত পাঠদান শিশুদের ক্ষেত্রে খুব কার্যকর। এভাবে পাঠ দিলে শিশু সহজেই পাঠ গ্রহণ করতে পারে। তার কাছে সেটি আনন্দদায়ক মনে হয়।<sup>[১]</sup> তাই তো আমরা দেখি, খলিফা ও শাসকগণ সন্তানদের জন্য কেবল যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করেই ক্ষান্ত হতেন না। রাজপাঠশালায় পড়ার জন্য আরও অনেক শিশুকে নিয়ে আসতেন। যেন শাহজাদাগণ ওদের সঙ্গে বসে পাঠশালা উপভোগ করতে পারে। পাঠপর্ব শেষ হলে প্রাসাদের ভেতর তাদেরকে আরও অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হতো। যাতে করে তারা ভবিষ্যৎ জীবনে নেতৃত্ব গ্রহণে যোগ্য হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। সম্মিলিত পাঠশালায় শিশু শাহজাদাদের যাতায়াতের অনেক ঘটনা আমরা ইতিপূর্বে পড়ে এসেছি।

ইসলামের স্বর্ণযুগে মসজিদের পাঠশালা এবং মাদরাসাগুলোতে উপস্থিত ছাত্র সংখ্যার মাঝে বড় রকমের তারতম্য ছিল। শাইখের পরিচিতি এবং নির্দিষ্ট জ্ঞানে তাঁর পাণ্ডিত্যের কারণে সুভাবতই মসজিদের উন্মুক্ত পাঠশালাগুলোতে ছাত্রসংখ্যা তুলনামূলক বেশি হতো। কারণ মসজিদ ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত। সেখানে উপস্থিত ছাত্র সংখ্যাও হতো অগণিত। বিখ্যাত শাইখদের দরসে শত শত ছাত্র অংশগ্রহণ করত। কায়ভিনী লেখেন:<sup>[২]</sup> শাইখ রযিয়ুদ্দিন নিশাপুরীর দরসে গণ্যমান্য চার শ ফকিহ অংশগ্রহণ করতেন। নিশাপুরের বিখ্যাত মুফতি আবুত তাইয়িব সালুকির দরসে পাঁচ শ'র বেশি তালিবুল-ইলম উপস্থিত হতো।<sup>[৩]</sup> বাগদাদের আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক মসজিদে দরস দিতেন সুনামধন্য শাইখ আবু হামিদ আসফারাইনী। তাঁর দরসে তিন শ থেকে সাত শ ছাত্র উপস্থিত

[১] ইবনু সিনা: আল কানুন ১: ৭৯-৮০।

[২] আসারুল বিলাদ ওয়া আখবারুল ইবাদ পৃ ৩১৭।

[৩] আস সুবকি: আবাকাতুশ শাফিইয়্যা তুল কুবরা ৩: ১৭০।

হতো।<sup>[১]</sup> মিশরে মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান নাআলী ছিলেন মালিকি মাদহাবের বিখ্যাত ফকিহ। মিশরে ফিকহের নেতৃত্ব ছিল তাঁর হাতে। শিক্ষার্থীরা দলে দলে তাঁর কাছে আসত। তাঁর দরসে উপস্থিত ছাত্র সংখ্যা মসজিদের সাতেরোটি খুঁটি ছাড়িয়ে যেত।<sup>[২]</sup>

এবার আসুন মাদরাসার আলোচনায়। মাদরাসার শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল সীমিত। নির্দিষ্ট কোটা পূরণ হয়ে গেলে আর ছাত্র ভর্তি করা হতো না। মসজিদে শিক্ষার্থী সংখ্যার তুলনায় সেটি ছিল অতি নগণ্য। বেশিরভাগ সময় প্রতিষ্ঠাতাকেই সেখানে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হতো। তাঁর দরসে কতজন বসতে পারবে, সেটি ওই শিক্ষকই ঠিক করে নিতেন। মাদরাসার ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ছাত্র উপস্থিত ছিল আল-মাদরাসাতুল মুস্তানসিরিয়ায়। ইবনুল আবরীর বর্ণনামতে,<sup>[৩]</sup> খলিফা মুস্তানসির তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় চার মাদহাবের জন্য আলাদা আলাদা ক্লাসরুম নির্দিষ্ট করে দেন। প্রতিটি ক্লাসে স্নাতক শিক্ষক ছিল। তাঁর থেকে ফিকহ শিখতে সেখানে পঁচাত্তর জন করে শিক্ষার্থী বাছাই করেন। অপরদিকে দামিশক ও মিশরের মাদরাসাগুলোতে প্রতিটি দরসে গড়ে ছাত্র ছিল বিশ জন। মাদরাসা সিতুশ শাম আল-জাওয়ানিয়ার ওয়াকফনামায় আমরা পড়ে এসেছি যে, সেখানে সহকারী শিক্ষক-সহ দরসের ছাত্র সংখ্যা হবে বিশ। অবশ্য শিক্ষক, মুরাজ্জিন ও নিরীক্ষক এ সংখ্যার (বিশ) আওতাধীন নয়। তবে ওয়াকফ প্রকল্পের আয় অনুসারে সেই সংখ্যা বাড়ানো-কমানো যেতে পারে।<sup>[৪]</sup> মিশরের আল-মাজদিয়াতুল খলিলিয়া মাদরাসায় ওয়াকফকারী এ কথা লিখে দেন যে, সেখানে একজন শাফিযি মাদহাবের শিক্ষক, দুইজন সহকারী শিক্ষক এবং বিশ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করবে।<sup>[৫]</sup>

এই ছিল শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির কিছু উদাহরণ। তবে নির্দিষ্ট কোনো মাদরাসায় বিশেষ কোনো শাইখকে নিয়োগ দেওয়ার ফলে, ছাত্রদের আগ্রহবশত এই শর্ত অনেক সময় পালন করা সম্ভব হতো না। সুবকি লেখেন: নিশাপুরের নিজামিয়া মাদরাসায় ইমামুল হারামাইনের দরসে তিন শ'র মতো ছাত্র অংশগ্রহণ

[১] প্রাগুক্ত ৩: ২৫।

[২] আস সুয়ুতি: হুসনুল মুহাদারা ১: ২১২।

[৩] তারিখু মুখতাসারিদ দুওয়াল পৃ ৪২৫।

[৪] নুআইমি: আদ দারিস ১: ৩০৩।

[৫] মাকরিযি: আল-খুতাত ২: ৪০০।



করত।<sup>[১]</sup>

আরেকটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার, শিক্ষকদের সামনে এত বিপুল সংখ্যক ছাত্রের উপস্থিতি কেবল উচ্চশিক্ষার ক্লাসে প্রযোজ্য ছিল। অপরদিকে মক্তব বা ক্ষুদ্রে পাঠশালাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক শিশুকে পাঠদান করা হতো। সেখানে ছাত্র সংখ্যা বেড়ে গেলে শিক্ষকও বাড়িয়ে দেওয়া হতো। প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাত্র ঠিক করা হতো। ইবনু আবদুন বলেন, মক্তব-শিক্ষকের কর্তব্য ছিল, খুব বেশি শিশু জড়ো না করা। এগুলো থেকে বারণ করা..। সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে শিক্ষক তাদেরকে কিছুই শেখাতে পারবেন না।<sup>[২]</sup>

উচ্চশিক্ষার ক্লাসে থাকবে বিপুল পরিমাণ ছাত্র, আর ক্ষুদ্রে পাঠশালায় সীমিত—এই যুগের স্কুলগুলোতেও এই নিয়ম রক্ষা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায়, শত শত ছাত্র একসঙ্গে বসে ক্লাস করছে। আর প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের সামনে আছে বিশ কি ত্রিশ জন ছাত্র।

## দেহ ও বোধশক্তি

সুস্থ দেহ ও বোধশক্তির মাঝে রয়েছে গভীর বন্ধন। এ কথা প্রথম যুগেই উপলব্ধি করতে পারেন মুসলমানগণ। ‘সুষ্ঠু বুদ্ধি কেবল সুস্থ দেহেই বাস করে’—এমন প্রবাদ বহু আগে থেকেই আরবে প্রচলিত ছিল। তাই তো মুসলমানগণ শরীরকে চাঙা রাখতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। দেহের ওপর থাকা অতিরিক্ত বোঝা কমানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। যেন রুহ বড় কিছু গ্রহণ করতে পারে। শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের জন্য তা উপযোগী হয়ে ওঠে।

দৈহিক শক্তি ক্ষয় হয়, প্রাণচাঞ্চল্য বিনষ্ট হয়—মুসলিম মনীষীগণ কখনোই এ রকম কিছু করার অনুমতি দেননি। মাত্রাতিরিক্ত ইবাদতে লিপ্ত হয়ে দৈহিক শক্তি দুর্বল করা বা কোনো হালাল বিষয় নিজের জন্য হারাম করে নেওয়া থেকে বারণ করেছে ইসলাম। সহিহুল বুখারিতে আছে:<sup>[৩]</sup> আল্লাহর রাসূল লাগাতার রোজা রাখছে। কখনো রোজা ভাঙছে না। তা দেখে নবিজি তাকে তোমার দেহেরও কিছু অধিকার রয়েছে। (দেহের সেই অধিকার তুমি আদায়

[১] তাবাকাতুশ শাফিইয়া ২: ২৫২।

[২] রিসালাতু ইবনি আবদুন, The Journal Asiatique, ১৯৩৪ -এ প্রকাশিত।

[৩] সহিহুল বুখারি ৩: ৩৮৯।

করো)।

শিক্ষাক্ষেত্রেও একই মূলনীতি অনুসরণ করা হয়। রোগাপটকা শরীর কখনো সঠিকভাবে সবকিছু বুঝে উঠতে পারে না। এ কথা মুসলিম মনীষীগণ উপলব্ধি করেন বহু আগেই। আসফাহানী পরামর্শ দেন:<sup>[১]</sup> নিজের দেহ ও মনকে প্রফুল্ল রাখতে ইলম অনুেষণ করার ফাঁকে ফাঁকে নানা রকম (হালাল) বিনোদন চর্চা করতে হবে। একটানা জ্ঞান আহরণে পড়ে থাকা যাবে না। মাঝেমধ্যে বিশ্রাম ও শরীরচর্চা করতে হবে। খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতে হবে। তা না করে বিরতিহীন পড়াশোনায় লেগে থাকলে এর ফল হবে উল্টো। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস থেকে আসফাহানী দলিল পেশ করেন:

إن المنيب لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى

অর্থ : ‘বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এমন উদ্ভিদ, যা না ভূমি বিদীর্ণ করে আর স্থায়ীভাবে ছায়াদার হয়।’

হাদীসের মর্ম হচ্ছে, অল্প দিনে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিলে ব্যক্তি ক্লান্ত হয়ে মাঝপথেই হাঁপিয়ে উঠে আবার বাহনও দুর্বল হয় যায়। এমন ব্যক্তির না ভ্রমণ সফল হয় আর না বাহন স্থায়ী হয়।

আসফাহানি আরও যোগ করেন: যতক্ষণ শিক্ষার্থীর মন চাঙা থাকে, বোধশক্তি চঞ্চল থাকে, ততক্ষণ জ্ঞান আহরণ করবে। অপরদিকে যখন বোধশক্তিতে ভাটা পড়বে, তখন জ্ঞান আহরণ থেকে বিরতি নেবে। (হালাল) খেলাধুলায় লিপ্ত হবে। কারণ, রুগ্ন বুদ্ধির কোনো প্রতিষেধক নেই। এমন লোকের কথায় কোনো সার্থকতা নেই।

মুসলিম মনীষীগণ আরও উপলব্ধি করেন যে, শিশুরা অত্যধিক চঞ্চল প্রকৃতির হবে, অধিক হারে নড়াচড়া ও খেলাধুলা করবে। এগুলো তার স্বভাবজাত প্রবণতা। তারা শিশুদের এই প্রবণতাকে চাঙা রাখতে উৎসাহিত করতেন। তারা বুঝতেন, এর মাধ্যমে বুদ্ধি প্রখর হয়, মস্তিষ্কের ধার বেড়ে যায়। অপরদিকে শিশুর নীরবতা ও চাঞ্চল্যহীনতাকে তারা অস্বাভাবিক মনে করতেন। এসব শিশুকে তারা রুগ্ন ও জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত মনে করতেন। মানসিক বিপর্যস্ত হিসেবে ধরে নিতেন। মরক্কোর আলিম আবুল কাসিম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ একবার মুআইকিব ইবনু আবিল আযহারকে প্রশ্ন করলেন: মজ্রবের শিশুদের কী অবস্থা? মুআইকিব উত্তরে বলেন, খেলাধুলার প্রতি তাদের ঝোঁক

[১] মুহাদারাভুল উদাবা ১: ২৮।



খুব বেশি। আবুল কাসিম তখন বলেন, তারা যদি এ রকম খেলাধুলা না করে, তবে তাদের গলায় তাবিজ ঝুলিয়ে দিন।<sup>[১]</sup>

কিতাবুল ইরশাদ ওয়াত তা'লীম গ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নিচে এর কয়েকটি আমি উল্লেখ করছি:

» অতি আশ্চর্যের বিষয় হলো, খেলাধুলায় অমনোযোগী অচঞ্চল প্রকৃতির শিশুদের নিয়ে মানুষ খুব খুশি থাকে। তাদেরকে বুদ্ধিমান ও গুণধর ভাবে। এ ধরনের শিশুদের মাঝেই কল্যাণ লুকিয়ে থাকে বলে মনে করে। অথচ মানুষ জানে না—নিস্তেজ প্রকৃতির শিশুরা দৈহিক বা মানসিকভাবে অসুস্থ থাকে। একপর্যায়ে তাদের জীবন সাধনা দুর্বল হয়ে পড়ে। জীবনের চ্যালেঞ্জ নিতে তারা অক্ষম হয়ে যায়। কারণ শৈশব থেকে সে খেলাধুলা, শরীরচর্চা ও দৈহিক বিনোদনে অভ্যস্ত নয়। কাজেই, ছাত্রদেরকে খেলাধুলার সুযোগ দিতে হবে। শুধু সুযোগই নয়; বরং খেলাধুলা, শরীরচর্চা ও দৌড় প্রতিযোগিতায় তাদের উৎসাহিত করতে হবে। দেহের গঠন ও বৃদ্ধিতে সহায়ক সব খেলায় তাকে অভ্যস্ত করতে হবে। তাহলে তারা মধুর জীবন উপভোগ করবে। জীবন নিয়ে তাদের মাঝে কোনো হতাশা কাজ করবে না। দেহের সঠিক বিকাশ নিশ্চিত হবে। তাদের বোধশক্তির উন্নতি ঘটবে।<sup>[২]</sup>

» শরীরচর্চা, মুক্ত বাতাস গ্রহণ, দেহের স্বাভাবিক স্পন্দন নিশ্চিত করতে হবে। পায়ে হাঁটা, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটা ইত্যাদি কাজে অভ্যস্ত করতে হবে। শক্তিশালী দেহ গঠনে এগুলো বড় সহায়ক। আর দেহ শক্তিশালী হলে আত্মাও শক্তিশালী হবে। স্বপ্ন ও আশা বড় হবে। দায়িত্ব ও কাজের প্রতি আন্তরিকতা বেড়ে যাবে।<sup>[৩]</sup>

» ঘরে হোক বা মাদরাসায়—এ ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের উচিত, শিশুদের খেলাধুলার পরিবেশ নিশ্চিত করা। বিশেষ করে দিনের বেলায় স্কুল শেষে বাড়ি ফেরার পর। যখন তাদের শরীরে দুর্বলতার ভাব দেখা দেবে, বোধশক্তিতে ভাটা পড়বে, তখন তাদের জন্য মুক্ত বাতাসে খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করবে।<sup>[৪]</sup>

» অনেক রকম খেলাধুলাই প্রচলিত আছে। অনেক খেলা আছে, যাতে বেশি দৌড়াতে হয়। আর কিছু খেলা আছে যাতে ছোট্টাছুটি কম। যেমন

[১] আল মুয়াহ্মিনুল জাদীদ (সাময়িকী): নবম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা পৃ ২৫।

[২] কিতাবুল ইরশাদ ওয়াত তা'লীম পৃ ৫৪০।

[৩] প্রাপ্ত পৃ ৫৩৯।

[৪] প্রাপ্ত পৃ ৫৪০।

নানা রকম খেলনাপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া করা। পশু-প্রাণীদের নিয়ে খেলা। তবে খেলার ধরন যাই হোক, খেলার সময় মা-বাবা ও শিক্ষকগণ শিশুদের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। কিভাবে খেলতে হয়, তা শিখিয়ে দেবেন। এভাবে তারা নিয়মনীতি ও নানা পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হবে। মাঝেমাঝে নিজেও শিশুদের সঙ্গে খেলায় মেতে উঠবেন। এভাবে খেলাধুলার ফাঁকে ফাঁকে তাদেরকে নানা বিষয় শিক্ষা দেবেন। প্রতিপক্ষের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হয়, কিভাবে অন্যদের বোঝাতে হয়, কিভাবে জামাতবদ্ধ কাজ করে সফলতা আনতে হয়—তা তাদের শিক্ষা দেবেন।<sup>[১]</sup>

» ঘুম দেওয়া হয়েছে বিশ্রামের জন্য। তেমনি জাগরণ দেওয়া হয়েছে কর্মতৎপরতার জন্য। শিশুদের জন্য খেলাধুলাই হলো একটি স্বতন্ত্র কাজ। শিশুদের স্বভাবজাত প্রবণতা হলো খেলাধুলা ও ছোট্টাছুটি করা। এর মধ্য দিয়েই তাদের দৈহিক গঠন ও বিকাশ সম্পন্ন হয়। তাদের বিবেক-বুদ্ধি পরিপক্ব হয়। জীবনটা তাদের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। তবে সেসব খেলাধুলা ও বিনোদন অবশ্যই নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে, সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে, শিশুর বয়স ও বুদ্ধির স্তর অনুযায়ী নিশ্চিত করতে হবে।<sup>[২]</sup>

ইমাম গাযালী আরও বলেন,<sup>[৩]</sup> মজ্রুব থেকে ফেরার পর শিশুকে সঠিক খেলাধুলার সুযোগ দিতে হবে। এতে করে মজ্রবে পড়ার ক্লান্তি সে ভুলে যাবে। তা না করে শিশুকে খেলাধুলা থেকে দূরে রাখলে, সবসময় পড়াশোনায় ব্যস্ত রাখলে তার হৃদয় মরে যাবে। তার মেধা বিনষ্ট হবে। জীবনটা বিষাদময় হয়ে উঠবে। পড়াশোনা থেকে নিষ্কৃতি পেতে সে একের পর এক বাহানা খুঁজে বেড়াবে।<sup>[৪]</sup> ইবনু মাসকুওয়াই লেখেন:<sup>[৫]</sup> মাঝেমাঝে শিশুকে ভালো ভালো খেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া উচিত। এতে করে সে পড়াশোনার ধকল থেকে কিছুটা বিশ্রাম পাবে। তবে খেলাধুলা করতে গিয়ে বড় রকমের ব্যথা ও দুর্ঘটনা যেন না ঘটে, সে দিকেও নজর রাখতে হবে। কারণ খেলাধুলা করলে দেহ সুস্থ থাকে। আলসেমি দূর হয়। বুদ্ধি শানিত হয়। মন ফুরফুরে থাকে। দেহ চাঙা হয়ে ওঠে। মেধা শক্তিশালী হয়।

ছাত্রদের মানসিক আরামের জন্য এবং নতুন করে জ্ঞানচর্চায় মনোযোগ

[১] প্রাগুক্ত পৃ ৫৪১।

[২] প্রাগুক্ত পৃ ৫৪১।

[৩] আল ইহইয়া ৩: ৫৯।

[৪] আরও দেখুন: আল আবদারী: আল মাদখাল ৩: ৩১২।

[৫] তাহযিবুল আখলাক পৃ ২০।



বাড়ানোর জন্য ইসলামি স্কুলগুলো খুব চমৎকার আয়োজন ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করেছিল। সে সময় বৃহস্পতিবার অর্ধবেলা ও শুক্রবার পুরো দিনের জন্য ছাত্রদের ছুটি দেওয়া হতো। তা ছাড়া আরও অন্যান্য উপলক্ষ্যে তাদের ছুটির ব্যবস্থা ছিল। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ছুটি। এসব ছুটি সাধারণত এক সপ্তাহ ধরে চলত।

ছাত্রদের অনুশীলন করানোর জন্য নানা রকম খেলার প্রচলন ছিল। বিখ্যাত সাহাবি এবং ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাতাবের পরামর্শ হচ্ছে: ছাত্রদেরকে সাঁতার, তিরনিষ্কেপ ও ঘোড়ায় চড়া শেখাতে হবে।<sup>[১]</sup> তা ছাড়া দৌড় প্রতিযোগিতাও ছিল মুসলিম ছাত্রদের অন্যতম প্রিয় খেলা।<sup>[২]</sup>

## শিক্ষার্থীর আদবকেতা ও দায়িত্ব-কর্তব্য

অনেক মুসলিম লেখক ও মনীষী শিক্ষার্থীদের আচরণ ও দায়িত্ব নিয়ে কথা বলেছেন। অনেক গবেষক তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহে এ নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। নানা উৎস থেকে বাছাই করে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা এখানে তুলে ধরছি:

» শিক্ষার্থীদের নানা বাজে স্বভাব ও আচরণ থেকে পবিত্র থাকতে হবে। কারণ ইলম অর্জনের জন্য সদাচরণ ও আত্মিক বিশুদ্ধতা অন্যতম শর্ত। অসৎ চরিত্রের লোকজন ইলম অর্জন করে নিলেও তা থেকে সে নিজে উপকৃত হতে পারে না। অন্যদেরও কোনো উপকার করতে পারে না। ফলে ধরে নেওয়া হয় সে কোনো ইলমই অর্জন করেনি।<sup>[৩]</sup>

» শিক্ষার্থীদের কর্তব্য, পার্থিব সকল বুটঝামেলা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। পরিবার ও সুদেশ থেকে দূরে থাকা। যেন ইলম অর্জনের পথে এগুলো বাধা না হয়ে দাঁড়ায়।<sup>[৪]</sup> তা ছাড়া জনপ্রিয়তা, পার্থিব ভোগ-বিলাস এবং শাসকের সমাদর পাওয়ার উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করবে না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা জ্ঞানীদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া, নির্বোধ লোকদের ওপর গর্ব করা এবং মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করো না। মূর্থতার অন্ধকার দূর করে নিজেকে এবং

[১] আল মুবাররিদ: আল কামিল পৃ ১৫০।

[২] কিতাবুল ইরশাদ ওয়াত তা'লীম পৃ ৫৪০।

[৩] আল গামালী: আল ইহইয়া ১: ৪০, আল আবদারী: আল মাদখাল ২: ৯৮।

[৪] আল ইহইয়া ১: ৪১।



সকল মানুষকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করাই হবে ইলম অর্জনের প্রধান উদ্দেশ্য।<sup>[১]</sup>

» শিক্ষার্থীদের কর্তব্য হলো, শিক্ষকের প্রতি বিনয়ী হওয়া। শিক্ষককে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া। মুয়াল্লিমের কদর করা। অজ্ঞ রোগী যেমন অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মন দিয়ে শোনে, তেমনি একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষকের কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে। মনে রাখবে, মা-বাবার অধিকারের চেয়ে শিক্ষকের অধিকার বড়। কারণ পিতার মাধ্যমে সে এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে এসেছে ঠিক। কিন্তু শিক্ষকের মাধ্যমে তার চিরস্থায়ী জীবন নিরাপদ হবে। কথায় আছে, পিতা তিন রকম—জন্মদাতা পিতা, লালনকারী পিতা, শিক্ষক পিতা। এর মধ্যে যিনি তোমাকে শিক্ষা দেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ পিতা।<sup>[২]</sup>

» মুসলিম শিক্ষার্থীরা এ সকল উপদেশ মেনে শিক্ষকদেরকে খুব সম্মান করতেন। খুব মর্যাদা দিতেন। শাফিয়ি বলেন, ইমাম মালিকের সামনে আমি কিতাবের পাতা খুব ধীরেসুস্থে উল্টাতাম। পাছে পাতা উল্টানোর শব্দ তাঁর কানে যায়, এই ভয়ে।<sup>[৩]</sup> শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রদের পালনীয় কিছু কর্তব্য ও আচরণের বিবরণ দিতে গিয়ে যারনুজি বলেন, ছাত্রদের কর্তব্য হলো, শিক্ষকের সামনে দিয়ে না হাঁটা। শিক্ষকের আসনে না বসা। শিক্ষকের অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে কথা শুরু না করা। বকবক না করা। শিক্ষক বিরক্ত হলে কিছু জিজ্ঞেস না করা। শিক্ষক রাগ করেন এমন কাজ থেকে বিরত থাকা। হারাম না হলে শিক্ষকের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা।<sup>[৪]</sup>

» ইসলামি স্কুলগুলোতে ছাত্রদের মাঝে একটি বিষয় খুব পরিচিত ছিল। আর তা হলো, যে শিক্ষককে তার ভালো লাগত, তার দরসেই সে ইলম অর্জন করত। তবে উস্তায নির্বাচনের ক্ষেত্রে খুব তাড়াছড়ো না করে বুঝে বুঝে ধীরস্থিরে তা করার পরামর্শ দিয়েছেন মনীষীগণ। শিক্ষকের মাঝে ইলমের পাশাপাশি আখলাক আছে কি না, তাও দেখে নেবে। সবসময় প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত আলিমদের বেছে নিতে হবে, এমনটি জরুরি নয়। কারণ অনেক সময় প্রচারবিমুখ অচেনা ব্যক্তিদের মাঝেও বিজ্ঞ আলিম থাকেন।<sup>[৫]</sup> শিক্ষক নির্বাচন সম্পন্ন করার পর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে অবিচল থেকে ইলম

[১] যারনুজি: তা'লিমুল মুতআল্লিম ৬-৭, আল ইহইয়া: ১: ৪৮।

[২] মিনহাজুল মুতআল্লিম ১২ বা।

[৩] ইবনু জামাআ: তাযকিরাতুস সামি' পৃ ৮৮।

[৪] যারনুজি: তা'লিমুল মুতআল্লিম পৃ ১২।

[৫] ইবনু জামাআ: তাযকিরাতুস সামি' পৃ ৮৫-৮৬।



অর্জনে মনোনিবেশ করবে। শিক্ষক নির্বাচন করার পর যদি তাঁকে অ্যাপ করা হয়, তবে ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের জন্য তা ক্ষতিকর। উভয়ের মাঝেই কুধারণা তৈরি হবে। শিক্ষক নির্বাচনের পর ধৈর্যের সাথে অটল থেকে তাঁর কাছে ইলম অর্জন করবে। ঠিক সেভাবে কোনো একটি গ্রন্থ পাঠ শুরু করলে ধৈর্যের সাথে পড়ে শেষ করবে। মাঝপথে বন্ধ করে দেবে না। তেমনি এক শাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলে, তা ভালোভাবে শেষ করেই অন্য শাস্ত্রে হাত দেবে। এক দেশে থিতু হলে বিনা প্রয়োজনে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হবে না। কারণ, এতে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। মন অস্থির হয়ে হয়ে ওঠে। সময় নষ্ট হয় প্রচুর।<sup>[১]</sup>

» প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের উচিত ইখতেলাফি মাসআলায় খুব বেশি মনোযোগ না দেওয়া। এটা করলে জ্ঞান-বুদ্ধি জরাগ্রস্ত হবে। শিক্ষার উচ্চ স্তরে পৌঁছালে তখন এসব বিষয় নিয়ে ভাবা যাবে। শুরুতে মৌলিক জ্ঞানসমূহের কিছু কিছু অংশ শিখবে। সেসব জ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে নজর দেবে। এরপর গভীর সাধনায় লিপ্ত হতে কোনো একটিকে বেছে নেবে। তবে এক দফাতেই পুরো জ্ঞান আয়ত্ত্ব করতে যাবে না। ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আগে শুরু করবে।<sup>[২]</sup>

» ছাত্রদের কর্তব্য হলো, ইলমকে নিজের কাছে প্রিয় করে তোলা। সবসময় ইলমের সঙ্গে থাকা, ইলম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া। যেন ইলম হয়ে যায় তার প্রাণপ্রিয় বন্ধু, তার আত্মহের কেন্দ্রবিন্দু, তার অমীয়া সুখ।<sup>[৩]</sup> ছাত্রদের আরও কর্তব্য হলো, ইলম অর্জন ও আদব শিক্ষায় কোনো অহংকার দেখাবে না। কারণ, সাধারণ মানের একজন ডুবুরি সাগরের তলদেশ থেকে মণিমুক্তা খুঁজে বের করে আনলে তার দাম একটুও কমে না।<sup>[৪]</sup> উচ্চাভিলাষী ও কর্মচঞ্চল হতে হবে শিক্ষার্থীকে। প্রচণ্ড আগ্রহ এবং অদম্য ইচ্ছা নিয়ে ইলম অর্জনে মনোনিবেশ করতে হবে।<sup>[৫]</sup>

» ছাত্রের কর্তব্য হলো, নিজ থেকে বা শিক্ষকের নির্দেশে কিছু লিখলে তা সুন্দরভাবে লিখবে। টীকা যোগ করার জন্য পাশে জায়গা রেখে দেবে। দুই

[১] যারনুজ্জি: তা'লিমুল মুতাআল্লিম পৃ ১০।

[২] আল গাযালী: আল ইহইয়া ১: ৪২।

[৩] ইবনুল মুকাফফা: আদ দুররাতুল ইয়াতিমা পৃ ৮৩।

[৪] ইবনুল মুকাফফা: আল আদাবুস সাগীর পৃ ২২।

[৫] হাজ্জি খলিফা: কাশফুয যুনুন ১: ২৯।

লাইনের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে কিছু লিখতে যাবে না।<sup>[১]</sup>

» শিক্ষার্থী যতই ইলম অর্জন করুক, যতই অভিজ্ঞ হয়ে যাক—পুরো জ্ঞান অর্জন করে ফেলেছে, এ কথা সে যুগাক্ষরেও ভাববে না। ইবনুল মুবারকের ততক্ষণ সে আলিম। যখন সে নিজেকে জ্ঞানী ভেবে বসে, তখন গণ্ডমূর্খের রূপ নেয়।<sup>[২]</sup>

## শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সম্পর্ক

এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে অপর শিক্ষার্থীর সম্পর্ক কেমন হবে, তা নিয়ে মুসলিম মনীষীগণ লেখালেখি করেছেন। তাঁরা বলেন, দুজনের মাঝে সম্পর্ক হবে আত্মীয়-স্বজনদের পারস্পরিক সম্পর্কের মতো। ইমাম শাফিয়ি বলেন, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকদের মাঝে জ্ঞান হলো একটি আত্মার বন্ধন।<sup>[৩]</sup> শিক্ষার্থীরা যখন এক শাইখ থেকে ইলম অর্জন করে বা এক মাদরাসায় পড়াশোনা করে, তখন তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক হবে আরও শক্তিশালী। আরও মজবুত। কারণ তারা হলো এক বাবার অনেক রুহানী সন্তানের মতো। তাই ভ্রাতৃত্বের এই বাঁধন যেন সবসময় অটুট থাকে, সেজন্য সচেষ্টি থাকতে হবে। পারস্পরিক হৃদয়তাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। ইমাম গায়ালী বলেন, এক ব্যক্তির একাধিক সন্তানের পারস্পরিক অধিকার হলো, ভালোবাসা ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক রাখা, সবার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমানভাবে একে-অন্যকে সহায়তা করা। তেমনি এক শিক্ষকের সকল ছাত্রের কর্তব্য হলো, পরস্পর হৃদয়তা, সৌহার্দ, সম্প্রীতি বজায় রাখা।<sup>[৪]</sup> যারনুজি<sup>[৫]</sup> ও হাজি খলিফা<sup>[৬]</sup> মাদরাসায় অধ্যয়নরত দুই সহপাঠীকে পরস্পরের ‘সহযাত্রী’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিছু বিষয় আছে যেগুলো পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। সম্ভবত এ কারণেই সহপাঠীদের সাথে এ উপাধি জুড়ে দিয়েছেন বিখ্যাত এই মনীষীরা। তাদের পরস্পর সহযোগিতা উভয়ের জন্য নানা কল্যাণ বয়ে আনে। ঠিক যেমন অংশীদারত্বের ব্যবসায় দুজন অংশীদার সমানভাবে মুনাফা অর্জন করে। কারণ, তাদের পারস্পরিক

[১] যারনুজি: তা‘লিমুল মুতাআল্লিম পৃ ১৪, তাযকিরাতুস সামি‘ ৮৫-৮৬।

[২] আল গায়ালী: আল ইহইয়া ১: ৩৯।

[৩] আল গায়ালী: আল ইহইয়া ১: ৩৯।

[৪] আল গায়ালী: আল ইহইয়া ১: ৩৮।

[৫] তা‘লিমুল মুতাআল্লিম পৃ ১৪।

[৬] কাশফুয় যুনুন ১: ২৯।



বক্তৃতি সহযোগিতার দ্বারা দুজনই সমানভাবে উপকৃত হবে। যে লক্ষ্যপানে তারা ছুটে চলেছে, তা অর্জনে উভয়ে সমানভাবে সফল হবে।

শিক্ষার্থীর এ পথ মসৃণ ও সহজ করতে মুসলিম মনীষীগণ কিছু পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। সহপাঠীদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কী করবে আর কী বর্জন করবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। যারনুজি লেখেন : চঞ্চল, তৎপর, কৃতিত্ববান ও সরল স্বভাবের সহপাঠীদের সঙ্গে মিশবে। অপরদিকে অলস, নির্বিকার ও বাচাল প্রকৃতির ছাত্রদের থেকে দূরে থাকবে।<sup>[১]</sup> তা ছাড়া শিক্ষার্থী নিজের কৃতিত্বের কিছু নিয়ে তার সহপাঠীদের ওপর গর্ব করবে না। অহংকার দেখাবে না। কথায় কথায় তার অর্জিত সাফল্যের বড়াই করবে না। রাগের সময় পারিবারিক ক্ষমতা ও দাপট দেখাবে না। শিশুদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করবে না। বরং শিশুদের স্নেহ করবে। উত্তম বদলা দিয়ে তাদের পুরস্কৃত করবে। কিন্তু বাচ্চাদের লাভ ও মুনাফায় অভ্যস্ত করবে না।<sup>[২]</sup>

## ইলম অর্জনে শিক্ষার্থীদের পরিশ্রম ও সাধনা

আরবি সাহিত্য, তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য বই ও ইতিহাস পাঠ করলে বোঝা যায়, ইলম অর্জনে মুসলিম শিক্ষার্থীদের ছিল অদম্য আগ্রহ। ইলম অন্বেষণ করতে গিয়ে তারা নজিরবিহীন ত্যাগ ও সাধনার ইতিহাস রচনা করেছেন। নানা ইতিহাস-গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্ময়কর সব ঘটনা বর্ণিত আছে। মুসলিম ছাত্ররা জ্ঞানার্জনে যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখিয়েছে, তা সত্যিই অকল্পনীয়। ইলম অর্জন করতে গিয়ে নানা কষ্ট ও দুর্ভোগ তারা হাসিমুখে মেনে নিয়েছে। আকাশসম বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করেছে। এ রকম কিছু বিস্ময়কর ঘটনা আমি তুলে ধরছি। জ্ঞানার্জনে কী পরিমাণ উচ্চাশা তারা লালন করতেন, এসব বিবরণ থেকে পাঠক কিছুটা আঁচ করতে পারবেন :

» জাহিযের লেখা আল-হায়াওয়ান গ্রন্থটি পাঠ করেন আবু বকর ইবনুল আখশাদ। বইটির শুরুতে জাহিয কিছু গ্রন্থের তালিকা উল্লেখ করেছিলেন। ওই তালিকায় আল-ফারকু বাইনান নাবী ওয়াল মুতানাব্বী গ্রন্থটিও ছিল। আবু বকর বইটি অনেক জায়গায় খোঁজ করেন। কিন্তু কোথাও পাননি। এরপর যখন হজ করতে মক্কায় যান, তখন আরাফার ময়দানে এক ঘোষককে এ কথা এলান করতে দাঁড় করিয়ে দেন : আবু উসমান আমার ইবনু বাহর

[১] তা'লিমুল মুতাআল্লিম পৃ ১০।

[২] ইবন মাসকওয়াইট. তাহযিরুল আখলাক প ৯৯।

জাহিযের রচিত আল-ফারকু বাইনান নাবী ওয়াল মুতানাব্বী গ্রন্থটির সন্ধান কেউ দিতে পারবে কি? মহান আল্লাহ তার ওপর রহম করুন।<sup>[১]</sup>

» বিখ্যাত প্রধান বিচারপতি আবু ইউসুফ বলেন, একবার আমার সন্তান মারা গেল। তাকে দাফন করার দায়িত্ব অন্য একজনের ওপর ন্যস্ত করে আমি আবু হানিফার দরসে চলে আসি। আবু হানিফার একটি দরস ছুটে যাবে আমি কখনোই তা চাইতাম না।<sup>[২]</sup>

» বিখ্যাত মনীষী আবু ইসহাক কায়রুনি ইলম অর্জনের আশায় একটি মাদরাসায় ভর্তি হলেন। তখন তার পিতা বললেন: বাছাধন! আমরা তো গরিব। তুমি বরং ব্যবসা শেখো। তাহলে অর্থকড়ি উপার্জন করতে পারবে। তখন সন্তান উত্তর দিলেন: ঠিক আছে আবু। ব্যবসা আমাদের জন্য খুব দরকার। আমি সারাদিন ব্যবসা করব। কিন্তু ভোরবেলা তিনি ইলম অর্জনের জন্য চলে যেতেন। বেলা হলে তিনি ব্যবসায় লেগে যেতেন। এভাবেই সময় বের করে ইলম অর্জন করতেন। একপর্যায়ে তিনি শ্রেষ্ঠ বিদ্বান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।<sup>[৩]</sup>

» অপর বিখ্যাত মনীষী ইবরাহিম যাজ্জাজ প্রতিদিন দেড় দিরহাম আয় করতেন। একসময় তিনি ইলমের প্রতি আগ্রহ বোধ করেন। মুবাররিদের কাছে আরবি ব্যাকরণ শেখার আগ্রহের কথা জানান। বিনিময়ে তিনি উস্তাযকে রোজ তাঁর আয়ের দুই-তৃতীয়াংশ (এক দিরহাম করে) প্রদানের অঙ্গীকার করেন। আরও শর্ত করেন যে, যতদিন তিনি জীবিত থাকবেন, প্রতিদিন এই অর্থ তাকে দিয়ে যাবেন।<sup>[৪]</sup>

» মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম আবু বকর ইবনুল আনবারি একবার দাস-ব্যবসায়ীদের বাজারে যান। সেখানে এক সুন্দরী দাসী দেখতে পান। তিনি বলেন, দাসীকে আমার পছন্দ হয়ে যায়। এরপর আমি আমিরুল মুমিনিন রাযী বিল্লাহর দরবারে গমন করি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কোথায় ছিলেন আপনি? আমি তাঁকে সব খুলে বলি। দাসীর কথাও জানাই। এরপর তিনি ওই দাসীটি ক্রয় করে আমার ঘরে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর ঘরে এসে একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে যাব; কিন্তু কিছুতেই তা

[১] ইয়াকুত: মু'জামুল উদাবা ৬: ৭২-৭৩।

[২] আল আবশিহী: আল মুস্তাতরাফ ফি কুল্লি ফান্নিন মুস্তাযরাফ ১: ২০।

[৩] Di Vita des Schich p. 14, Abu Ishaq al Kazruni, Edited by Fritz Meier 1948.

[৪] ইয়াকুত: মু'জামুল উদাবা ১: ৪৭।



হয়ে উঠছিল না। বারবার আমার মন ওই দাসীর মাঝেই পড়ে থাকত। একপর্যায়ে আমি সেবককে বললাম, দাসীকে ওই বাজারে নিয়ে যাও। কারণ ইলম অর্জন থেকে সে আমাকে বিমুখ রাখে। ওকে আমার দরকার নেই। জ্ঞান অর্জনই আমার কাছে পৃথিবীর সবথেকে প্রিয়।<sup>[১]</sup>

» বিশিষ্ট ফকিহ আলি বিন ঈসা ওয়ালওয়াজী বলেন, আমি আবুর রাইখান আল-বিরুনির ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি তখন মৃত্যুশয্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন। এমন অন্তিম মুহূর্তে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, উত্তরাধিকার সক্রান্ত আইনে নানির প্রাপ্য সম্পদের ব্যাপারে তুমি যেন ওই দিন আমাকে কী বলেছিলে? আমি তার এ অবস্থা দেখে কাতর সুরে বললাম, এই অন্তিম মুহূর্তে আপনি মাসআলা জিজ্ঞেস করছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আরে..., না জেনে মরার চেয়ে মাসআলাটি জেনে মৃত্যুবরণ করা আমার জন্য বেশি ভালো নয় কি?<sup>[২]</sup>

» আহমার ছিলেন বিখ্যাত ভাষাবিদ কিসাঈর অন্যতম শিষ্য। খলিফা রশিদের দরবারে কিসাঈর ছিল বিরাট কদর। আহমার আরবি ভাষাজ্ঞান পছন্দ করতেন। তিনি রশিদের দরবারে কিসাঈর গমনকালের প্রতীক্ষা করতেন। যখন কিসাঈ আসতেন, তখন আগেভাগে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তাঁর বাহনের লাগাম বেঁধে দিতেন। তাঁকে বাহন থেকে নামিয়ে দরবারের গালিচা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে হেঁটে যেতেন। এ সময় তিনি একের পর এক আরবি ভাষার নানা বিষয় তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন। কিসাঈ যখন দরবারে প্রবেশ করতেন, তখন আহমার সুস্থানে ফিরে আসতেন। এরপর তিনি যখন বের হতেন, তখন গালিচার শেষ প্রান্ত থেকে আবার তাঁর হাত ধরে তাঁর সঙ্গে হেঁটে বাহন পর্যন্ত আসতেন। পথিমধ্যে নানা বিষয় তাঁর কাছে প্রশ্ন করে জেনে নিতেন। এরপর কিসাঈ যখন বাহনে চড়ে রওনা হয়ে যেতেন, তখন তিনি ফটকের দিকে ফিরে আসতেন। এভাবে একের পর এক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে করতে এক সময় আহমার হয়ে ওঠেন বিখ্যাত ভাষাবিদ। পরবর্তী সময় আহমার খলিফা রশিদের পুত্রদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান।<sup>[৩]</sup>

শিক্ষকদের দেখাদেখি ছাত্ররাও ইলম অর্জনে বিপুল উদ্দীপনা ও অসামান্য আগ্রহ প্রকাশ করে। ইতিহাস থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। শিক্ষকগণ জ্ঞান

[১] প্রাগুক্ত ৭: ৭৫।

[২] প্রাগুক্ত ৬: ৩০৯।

[৩] ইয়াকুত: মূ'জামুল উদাবা ৫: ১০৮-১০৯, মুকাদ্দিমাতু ইবনি খালদুন প ৩৯৯।

বিতরণে কতটা উৎসুক ছিলেন, শিক্ষার্থীদের অদম্য আগ্রহ থেকেই তা অনুমান করা যায়। শত কষ্টের মাঝে এবং প্রতিকূল পরিবেশেও শিক্ষকগণ ছিলেন জ্ঞান বিতরণে তৎপর। এ রকম দুটি ঘটনা আমি এখানে উল্লেখ করছি:

» আব্বাসীয় খলিফা মুওয়াফফাক বিল্লাহর প্রতি বদদুআ না-করার অপরাধে বাক্কার ইবনু কুতায়বাকে আটক করেন তলুনি রাজবংশের বিখ্যাত শাসক আহমাদ বিন তলুন। দুই বছর তাকে বন্দী রাখেন। তবে বাক্কার দমে যাননি। কারাগারে থেকেও তিনি হাদিস বর্ণনা করে যান। কারাগারের যে কক্ষে তিনি বন্দী থাকতেন, তার দেয়ালের বাইরের অংশে শিষ্যরা জড়ো হতো। আর বাক্কার প্রতিদিন ওই দেয়ালের কাছে এসে বাইরে থাকা ছাত্রদের উদ্দেশে হাদিস বর্ণনা করতেন।<sup>[১]</sup>

» একবার এক নারী এসে আবুল হাসান যাইয়াতের কাছে একটি ফতোয়া জিজ্ঞেস করল। তিনি উত্তর দিলেন। নারী চলে গেল। কিছুক্ষণ পর শাইখের চেহারা মলিন হয়ে গেল। তিনি তাঁর জামার এক অংশে কামড় দিয়ে খালি পায়ে দৌড়ে ওই নারীর কাছে পৌঁছালেন। এরপর তার কাছে সঠিক উত্তরটি বলে আবার ফিরে এলেন। আসার পর ছাত্ররা এভাবে দ্রুত খালি পায়ে ছুটে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, আমার মনে হলো, উত্তরটি সঠিক নয়। তাই নিরুদ্দেশ হওয়ার আগেই ওই নারীর কাছে ছুটে গেলাম। ছাত্ররা বলল, আমাদের বললেই তো আমরা তাকে সেটি জানিয়ে দিয়ে আসতাম। তিনি বললেন, এটি তোমাদের দায়িত্বে নয়। কারণ আমি তোমাদের কাউকে বললে সে হয়তো একটু ধীর গতিতে যেত। এরপর নারী দূরে চলে গেলে তাকে হয়তো আর খুঁজেই পেত না।<sup>[২]</sup>

## ইলমের জন্য দূরদেশে সফর

ইলম অর্জনের লক্ষ্যে দূরদেশে পাড়ি জমানোর আলোচনার প্রাক্কালে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত একটি হাদিস এখানে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। নবিজি বলেন,

من سافر في طلب العلم كان مجاهدا في سبيل الله، ومن مات وهو  
مسافر يطلب العلم كان شهيدا

[১] ইবনু হাজার: রাফউল ইসর আন কুযাতি মিশর: পৃ ২৬, ইবনু খাল্লিকান ১: ১২৮।

[২] আল আবদারী: আল মাদখাল ২: ১০৮-১০৯।



ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে যে সফর করবে, সে আল্লাহর পথে মুজাহিদের মতো পুরস্কার পাবে। ইলম অনুেষণে সফররত অবস্থায় যে মারা যাবে, সে শহীদ।<sup>[১]</sup>

মহানবির এই অমূল্য বাণী মুসলমান শিক্ষার্থীদের মাঝে টনিকের মতো কাজ করে। বিপুলভাবে তাদেরকে জ্ঞান অর্জনে উদ্বীপ্ত করে। ইলম অনুেষণে পথে সকল কষ্ট ও বাধাকে ম্লান করে দেয়। কবি ও সাহিত্যিকগণও নবিজির সুরে সুর মিলিয়ে নানা কবিতা রচনা করেছেন। নানা ভঙ্গিতে সেই কথাগুলো কবিতার ভাষায় তুলে ধরেছেন। যা শুনলে সত্যিই হৃদয় প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে। মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। কবি বলেন,

উচ্চ মাকাম লাভ করাটা খুবই সহজ ভেবেছ নাকি!  
মৌমাছির কামড় ছাড়া মধু সংগ্রহের উপায় নেই বাকি।<sup>[২]</sup>

আসফাহানী বলেন, নরম বিছানা ও আরামদায়ক পোশাক পরিহার না করলে শিষ্টাচার শেখা যায় না।<sup>[৩]</sup> ইবনু জামাআ বলেন, শিক্ষার্থী যথাসম্ভব ব্যস্ততা ও ঝামেলা থেকে অবসর হয়ে ইলম তলব করতে আসবে। ব্যস্ততা ও পিছুটান থাকলে তা ইলম তলবে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। জ্ঞান সাধনায় বিপত্তি তৈরি করবে। জ্ঞানার্জনের পথে এগুলো ঠিক ডাকাত ও ছিনতাইকারীর মতো।<sup>[৪]</sup> তাই তো পূর্ববর্তী কালের মনীষীগণ ইলম অনুেষণের জন্য পরিবার ও স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমানোর পরামর্শ দিয়েছেন। কেননা ব্যস্ততার কারণে চিন্তার পরিধি বেড়ে যায়। ফলে সূক্ষ্ম নিয়মনীতি ও দুর্বোধ্য বিষয়গুলো বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে।

বিখ্যাত সাহাবি আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর কালামের কোনো একটি আয়াত যদি আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে, আর যদি সংবাদ পাই যে এর একমাত্র সমাধান সুদূর বারকুল গিমাড অঞ্চলের এক ব্যক্তির কাছে আছে, তবে আমি অবশ্যই তার কাছে চলে যাব। শাবী বলেন, কোনো জ্ঞানপিপাসু যদি জ্ঞানের একটি কথা শোনার জন্য শামের এক প্রান্ত থেকে সুদূর ইয়েমেনের শেষ প্রান্তে গমন করে, তবে আমি মনে করি তার এই ভ্রমণ বৃথা

[১] আবুল হাজ: আল আলিফ বিল আলিব্বা ৮ হামযাহ, মিনহাজুল মুতাআল্লিম ১৬ বা।  
[২] ইবনু জামাআ: তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম পৃ ২৭।  
[৩] মুহাদ্দারাতুল উদাবা ১: ২৮।

[৪] তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম পৃ ৭০-৭১।

বিদ্যানুরাগী মুসলিমরা এসব আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেন। সে সময় যোগাযোগ-ব্যবস্থা এতটা উন্নত ছিল না। পথ অতটা মসৃণ ছিল না। সুশৃঙ্খল কোনো কাফেলাও ছিল না। রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে লম্বা সময় নিয়ে ভীষণ পরিশ্রম করে ভ্রমণ করতে হতো। কিন্তু জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে কোনো কাজকেই তারা কষ্টকর ভাবতেন না। কোনো যাতনাকে ভয় করতেন না। বরং বুকভরা সাহস নিয়ে কখনো একাকী আবার কখনো দলবেঁধে বের হয়ে যেতেন। গোটা ইসলামি বিশ্বকে মনে হতো যেন একটি দেশ। একটি পতাকা। গোত্র, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে সবাই মুসলমান। ইরাকের অধিবাসী কেউ মিশরে গিয়ে অথবা স্পেনের অধিবাসী কেউ সিরিয়ায় গিয়ে নিজেকে প্রবাসী মনে করত না।

ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ইবনু খালদুন।<sup>[১]</sup> এখানে তার কিছু অংশ আমি উল্লেখ করছি:

জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে দূরদেশ সফর করা খুবই উপকারী। কারণ মানুষ কখনো পাঠ করে আবার কখনো সরাসরি শিক্ষকের মুখে শুনে জ্ঞান অর্জন করে। তবে সরাসরি উস্তাযের মুখ থেকে শুনে জ্ঞান আহরণ করাটা খুবই কার্যকরী। এভাবে জ্ঞান অর্জন করলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। সফর করলে অনেক শাইখের সান্নিধ্য লাভ হয়। যত বেশি শাইখের শরণাপন্ন হওয়া যাবে, তত বেশি ইলমের গভীরতা প্রমাণিত হবে। ততবেশি সে যোগ্য ও অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে। একাধিক শাইখের সঙ্গ লাভ করা মানে একাধিক শিক্ষাপদ্ধতির সাথে পরিচিত হওয়া। কারণ, প্রত্যেক শাইখের শিক্ষাদানরীতি ভিন্ন।<sup>[২]</sup>

গবেষক মাত্রই দেখতে পাবেন যে, ইসলামের একেবারে সূচনালগ্ন থেকেই জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে দূরদেশে ভ্রমণের ধারা প্রচলন শুরু হয়। তখন প্রয়োজনও ছিল দূরদেশে ভ্রমণ করা। কারণ একদিকে নানা দেশ ইসলামের পতাকাতলে আসতে থাকে। অপরদিকে নওমুসলিমদের দীন, কুরআন ও হাদিস শেখাতে বিজ্ঞ সাহাবিগণ নব্যবিজিত এসব অঞ্চলে পাড়ি জমাতে থাকেন। যে অঞ্চলেই তাঁরা গিয়েছেন, সেখানেই গড়ে তুলেছেন জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। সেই প্রজন্মের বিখ্যাত সাহাবিদের মধ্যে ছিলেন:

[১] জামিউ বায়ানিল ইলম পৃ ২৫।

[২] আল মুকাদ্দিমা ৩৯৯-৪০০।

[৩] আরও দেখুন: কাশফুয় যুনুন ১: ৫৭।



সাহাবির নাম	যে অঞ্চলে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন
আবদুল্লাহ বিন উমর	মদিনা
আবদুল্লাহ বিন আব্বাস	মক্কা
মুয়ায বিন জাবাল	ইয়েমেন
আবু মুসা আশআরী	বসরা (ইরাক)
আবদুল্লাহ বিন মাসউদ	কূফা (ইরাক)
আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস	মিশর

উক্ত সাহাবিদের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র বিদ্যাপিঠ গড়ে তোলেন। অনেক হাদিস ছিল, যা কেবল মুষ্টিমেয় কিছু সাহাবি আল্লাহর রাসূল থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদিস বর্ণনায় মানুষের ছিল বিপুল আগ্রহ। তাই বিদ্যার্থীরা ইলম অর্জনের বাসনায় এবং হাদিস গ্রহণের আশায় সেই সব সাহাবির কাছে যেতেন।

দ্বিতীয় প্রজন্মে এসে ইলম অর্জনের ধারায় কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একেক মনীষী একেক বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। কেউ তাফসির শাস্ত্রে, কেউ হাদিস বর্ণনায়, কেউ যুক্তিবিদ্যায়, আবার কেউ ফিকহে। সেই প্রজন্মের বিখ্যাত কয়েকজন জ্ঞানী ও মনীষীর নাম ও অঞ্চলের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হল:

তাবিয়ির নাম	যে অঞ্চলে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন
সাদ্দ ইবনুল মুসাইয়াব	মদিনা
রবিআতুর রাই	কুবা
আতা ইবনু আবি রাবাহ	মক্কা
আতা ইবনু আবদিল্লাহ খুরাসানি	খুরাসান
হাসান বসরি	বসরা
নাখঈ	কুফা
মাকহুল	সিরিয়া
ইয়াহইয়া ইবনু কাসির	ইয়ামামা
তাউস	ইয়েমেন
ইয়াযিদ ইবনু আবি হাবিব	মিশর

যে শিক্ষার্থী যত বেশি দেশ ভ্রমণ করত, যত বেশি শাইখের সান্নিধ্য লাভ করত, তার জ্ঞান ও দৃষ্টিও তত বেশি প্রসারিত হত।

[১] ইয়াকুত: মু'জামুল উদাবা ৪: ৪১২-৪১৩, সূরতি: ৮৮৮

করত, সে তত বেশি মানুষের কাছে মূল্যায়ন পেত। এমন কারণে বিদ্যার্থীরা নানা শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জনের লক্ষ্যে পৃথিবীর নানা অঙ্গুলে ভ্রমণ করত। তাদের উচ্চাভিলাষ কেবল ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং ভাষা, দর্শন, চিকিৎসা প্রভৃতি বিদ্যা অর্জনের লক্ষ্যেও তারা দূর দেশে পাড়ি জমাত। প্রফেসর নিকলসন এসব ভ্রমণের বিষয়ে চমৎকার মন্তব্য করেছেন: ভ্রমণ করতেন। এরপর সুদেশে ফিরতেন। ঠিক যেমন মৌমাছি মধু বহন করে উৎসুক জনতা আগে থেকেই তাঁর আগমনের প্রতিক্ষায় থাকত। তাঁর চারপাশে বসতো। তিনি তাদেরকে নিজ জ্ঞান দ্বারা সিক্ত করতেন। জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করতেন। অপরদিকে অনেক জ্ঞানী তাঁদের অর্জিত জ্ঞান সংকলন করতে বই লিখে প্রকাশ করতেন। সেগুলো ছিল সুবিন্যস্ত। ভাষা ছিল সুমধুর। সেসব গ্রন্থই আধুনিক জমানার গবেষকদের জ্ঞানের প্রধান উৎস। সকল জ্ঞানী ও লেখকের প্রদেয় তথ্যসূত্র। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় সেসব গ্রন্থ থেকেই এরা তথ্য সংগ্রহ করে।<sup>[১]</sup>

জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান বিতরণে তারা কীরকম সাধনা ও পরিশ্রম করেছেন, এর কিছু চিত্র আমি নিচে তুলে ধরলাম:

» আবদুল্লাহ বিন উনাইস জুহানি রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে হাদিস শুনেছেন বলে জানতে পারেন জাবির বিন আবদুল্লাহ আনসারি। এরপর তিনি একটি উট কেনেন। সুদূর পথ পাড়ি দিয়ে মিশরে এসে আবদুল্লাহর মুখ থেকে হাদিসটি শুনে নেন।<sup>[২]</sup>

» জাবির বিন আবদিল্লাহ-এর অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল। তাই তিনি উট কিনে সওয়ার হয়ে মিশরে যান। কিন্তু অনেক অসচ্ছল শিক্ষার্থীর বাহন কেনা বা জন্তু ভাড়া করার সামর্থ্য ছিল না। তারপরও ইলম অর্জনের অদম্য ইচ্ছার কারণে এই অসামর্থ্য এবং দূরের পথ পাড়ি দেওয়ার কষ্ট তাদের কাছে ম্লান হয়ে যেত। আযহারির রচিত একাধিক খণ্ডের আত-তাহযিব ফিল লুগাহ গ্রন্থের একটি কপি ছিল ইবনুল খতিব তাবরিযির কাছে। তিনি সেই কপিটি একজন অভিজ্ঞ ভাষাবিদকে শোনানোর এবং নিরীক্ষণ করানোর উদ্যোগ নেন। খোঁজ নিয়ে আবুল আলা মাজারির কথা জানতে পারেন। এরপর গ্রন্থের সবক'টি খণ্ড একটি বস্তায় ভরেন। এরপর সেগুলো কাঁধে

[১] Literary History of the Arabs p. 281.

[২] সাহিহুল বুখারি ১: ৩১, জামিউ বায়ানিল ইলমি ১: ৯৪, সুয়ুতি: হুসনুল মুহাদারা ১: ৮৮।



নিয়ে পায়ে হেঁটে তাবরিয় (ইরানের একটি শহর) থেকে সুদূর মাজারাতুন নুমান (সিরিয়ার ইদলিবের একটি এলাকা) গমন করেন। এই দীর্ঘ পথ কষ্ট করে পাড়ি দেওয়ার ফলে বস্তাভর্তি খণ্ডগুলো ঘামে ভিজে যায়।<sup>[১]</sup>

» ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া লাইসি বড় হন কর্তোভায়। তিনি যখন প্রাচ্যের উদ্দেশে ভ্রমণ করেন, তখন তাঁর বয়স আটশ। মধ্যপ্রাচ্যে এসে প্রথমে তিনি মদিনায় অবস্থান করে ইমাম মালিক থেকে আল-মুয়াত্তা শোনেন। এরপর মক্কা ভ্রমণ করে সুফিয়ান বিন ওয়াইনার কাছে হাদিস শোনেন। এরপর মিশরে ভ্রমণ করে লাইস বিন সাদ, আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব ও আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম থেকে হাদিস শোনেন। সবশেষে আন্দালুসে ফিরে যান।<sup>[২]</sup>

» বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম বুখারি (মৃত্যু ২৫৫ হিজরি) বিপুল পরিমাণ সহিহ হাদিস একত্র করার সংকল্প করেন। প্রথমে তিনি নিজ এলাকা বুখারায় থাকা সহিহ হাদিসগুলো জমা করেন। এরপর বালখে গিয়ে সেখানকার মুহাদ্দিসদের থেকে হাদিস গ্রহণ করেন। একে একে তিনি মার্ত, নিশাপুর, রাই, বাগদাদ, বসরা, কুফা, মক্কা, মদিনা, মিশর, দামিশক, কাইসারিয়া, আসকালান, হিমস ভ্রমণ করেন। প্রতিটি শহরে পাওয়া সহিহ হাদিসগুলো তিনি একত্র করেন। সবক'টি ভ্রমণে তাঁর ষোলো বছর লেগে যায়। সীমাহীন কষ্ট ও দুর্ভোগ সহ্য করে তিনি দীর্ঘমেয়াদী এ যাত্রা সম্পন্ন করেন। হাদিস ও ইলমের জন্য এ রকম আত্মত্যাগ কেবল বীরসাহসী ধৈর্যশীল পুরুষদের পক্ষেই সম্ভব। সবশেষে তিনি নিজ দেশে ফিরে আসেন।<sup>[৩]</sup>

» সাহল বিন আবদুল্লাহ তাসাত্তুরি ইলম অর্জনে বিপুল আগ্রহ লালন করতেন। অল্প বয়সেই তিনি ইলমের মজলিসে অংশ নেওয়া শুরু করেন। একবার একটি তাত্ত্বিক বিষয় তাঁর কাছে জটিল ঠেকে। কোনোভাবেই সঠিক উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাঁর বয়স তখন তেরো। স্বদেশে সঠিক উত্তর না পেয়ে পরিবারকে বলেন, তাঁকে যেন বসরায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরিবার তাঁকে বসরায় পাঠায়। তিনি সেখানকার আলিমদের কাছে জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু সেখানেও হৃদয়কে শান্ত করার মতো সদুত্তর পাননি। বসরা থেকে তিনি উবাদানের এক আলিমের কাছে যান। তাঁর নাম আবু হাবিব হামযাহ বিন আবু আবদিল্লাহ। তাঁর কাছে সুস্পষ্ট ও সঠিক উত্তরটি পেয়ে যান।

[১] ইবনু খাল্লিকান ২: ৩৪৬, ইয়াকুত: মু'জামুল উদাবা ৭: ২৮৬।

[২] ইবনু খাল্লিকান ২: ৩২০-৩২১।

[৩] ইবনু খাল্লিকান ২: ১০২।

এরপর কিশোর সাহল তাঁর কাছে অবস্থান করে ইলম অর্জন করেন। তাঁর বক্তব্য ও জ্ঞান থেকে বিরাট উপকৃত হন।<sup>[১]</sup>

» বিখ্যাত গবেষক ও ডাক্তার হুনাইন বিন ইসহাকও প্রচুর ভ্রমণ করে গ্রন্থ সংগ্রহ করতেন। নানা জায়গায় ঘুরেফিরে জ্ঞানার্জন করতেন। ভ্রমণ করতে করতে তিনি রোম সাম্রাজ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত যান। ইরাক, শাম ও মিশরও সফর করেন।<sup>[২]</sup>

শহর ও জনপদ ছেড়ে দূরের মরুপাঠশালায় জ্ঞান অর্জনের ইতিহাস আমরা পড়ে এসেছি। বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শেখার উদ্দেশ্যে তারা মরুভূমির স্কুলে চলে যেতেন। সেখানে আরব বেদুইনদের কাছ থেকে কবিতা, সাহিত্য ও ইতিহাস শিখতেন। শহরের বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে ধূ-ধূ মরুপ্রান্তরে গিয়ে তাদেরকে সাদাসিধে জীবনযাপন করতে হতো। সাধারণ খাবার খেয়ে পড়তে হতো। কারণ, ওটাই ছিল মরুবাসীর স্বাভাবিক জীবনমান। এত কিছুর পরও শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের আগ্রহে একটুও ভাটা পড়েনি। বরং ভাষা শিখতে পেরে তারা দারুণ পুলকিত হতেন। সেখানে প্রশান্তচিত্তে জীবন পার করতেন। বর্ণিত আছে, আসমাসির ভাতিজা আবুল আব্বাস একবার মরুপাঠশালার রক্ষ ও কঠিন জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। পরিবারের কথা মনে করে বাড়ি ফিরতে মনস্থির করেন। এরপর এক আরব্য লোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। লোকটি বেদুইনদের কাছে ভাষা শেখার কাজে তার সহায়তা চান। আবুল আব্বাস তাকে এক বেদুইনের কাছে নিয়ে আসেন। এরপর বেদুইন তাকে একটি সাহিত্যপূর্ণ লম্বা কবিতা শোনান। কবিতা শোনার পর আবুল আব্বাস বলেন, আল্লাহর শপথ, এ কবিতা শুনিয়া আপনি আমাকে পরিবারের কথা ভুলিয়ে দিয়েছেন। দীর্ঘ প্রবাস জীবনের ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। আমার জীবনটা আনন্দে ভরে গেছে।<sup>[৩]</sup>

বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক ও বিদ্বান মনীষী আলবিরুনি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সৈয়দ আমির আলি বলেন, আলবিরুনি হলেন খুরাসানের বাসিন্দা। সুলতান মাহমুদ গযনভী ও সুলতান মাসুদের শাসনামলে তিনি বড় হন। তিনি হিন্দুস্তানে দীর্ঘ ভ্রমণ করেন। হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের সঙ্গে লম্বা সময় কাটান। তাদের ভাষা শেখেন। তাদের জ্ঞান, দর্শন ও শিষ্টাচার আয়ত্ত্ব করেন। তাদের আচার-অভ্যাসের সঙ্গে পরিচিত হন। তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি এবং

[১] আল গাযালী: আল ইহইয়া ৩: ৫৯।

[২] ইবনু আবি উসাইবিয়া: উয়ুনুল আখবার ১: ১৮৭, আল কিফতি: তারিখুল হকামা পৃ ১৭৩।

[৩] আহমাদ আমীন: দুহাল ইসলাম ২: ৩১৮।



অদ্ভুত কুসংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। এরপর গবেষণা করেন হিন্দুস্তানের ভৌগোলিক জ্ঞান ও প্রকৃতি নিয়ে। এসব তথ্য উপাত্ত তিনি চমৎকার ভাষাশৈলী ব্যবহার করে একটি দীর্ঘ কলেবরের গ্রন্থে সংকলন করেন।<sup>[১]</sup>

মুসলিম শিক্ষার্থীগণ জ্ঞান আহরণ ও ইলম অর্জনে যে বিপুল শ্রম, সাধনা ও তাগ সূঁকার করেছে, এগুলো তার কয়েকটি নমুনা মাত্র। ইলম অর্জনে অসামান্য আত্মতাগের এ ধারা ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীসমূহে একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল। বিশেষ করে হাদিস গ্রহণ ও সংরক্ষণে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। হাদিসের জ্ঞানই তাদেরকে বিপুলভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল এ নিদারুণ কষ্ট ও দুর্ভোগ সহ্য করতে। এরপর চতুর্থ শতকে এসে একটি চিন্তাদারা স্পষ্ট হয়, যা এর আগে ছিল সংশয়যুক্ত। সেটি হলো, সরাসরি বিজ্ঞ মুহাদ্দিসের কাছে উপস্থিত হয়ে হাদিস না শুনে কেবল গ্রন্থের ওপর নির্ভরশীল হয়ে হাদিস সংকলন করা বা গবেষণা করা জায়েয আছে কি না...!<sup>[২]</sup>

এর ফল এই দাঁড়ায় যে হাদিস সংগ্রহে বা হাদিস নিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে দূরদেশে ভ্রমণ করা শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কমে যায়। এমনকি ইবনু মান্দা নামে খ্যাত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসহাককে (মৃত্যু : ৩৫৫ হিজরি) সর্বশেষ মুসাফির হাফিজুল হাদিস হিসেবে গণ্য করা হয়। হাদিস মুখস্থ করা, হাদিসের জ্ঞান লাভ করা, সত্যবাদিতা ও অধিক পরিমাণে গ্রন্থ রচনায় বিখ্যাত ছিলেন ইবনু মান্দা। দীর্ঘ যাযাবর জীবনে তিনি সতেরো শ শাইখের সাক্ষাৎ লাভ করেন। বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। বাড়ি ফেরার সময় চল্লিশটি বাহনে করে সেসব গ্রন্থ নিয়ে আসেন।<sup>[৩]</sup> কিন্তু তারপরও শাইখদের সংশ্রবে যেয়ে হাদিস ও ইলম অর্জনের ধারা অব্যাহত ছিল। মুসলিম শিক্ষার্থীগণ যুগ যুগ ধরে এ ঐতিহ্য লালন করে বিশ্ববাসীর খেদমত করে গেছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে হিজরি পঞ্চম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষা ও পাঠদানের নতুন আরেকটি ধারা শুরু হয়। সেটি হলো, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে যোগ্য উস্তাযদের সেখানে নিয়ে আসা। মাদরাসার যাবতীয় চাহিদা নিশ্চিত করা। এর ফলে শিক্ষার্থীরা বিখ্যাত মাদরাসার দিকে ভ্রমণ করা শুরু করে। মাদরাসায় পড়াশোনার সকল উপকরণ সহজলভ্য হওয়ায় সেখানে এসে বিজ্ঞ শাইখদের দরস শুনে উপকৃত হতে থাকে।

বিচিত্র কিছু মুসলিম পর্যটকদের কথা এখানে না বললেই নয়। সেসব

[১] A short History of the Saracens p. 463

[২] আল খতীবুল বাগদাদী: তাকয়িদুল ইলম পৃ ১০১।

[৩] শাহহুয যারকানী আল্লাল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়া ১: ২৩০।



মুসাফির গবেষক শাইখদের সান্নিধ্যে বসে জ্ঞান অর্জন করার মতো শিক্ষার্থী ছিলেন না। বরং তাঁরা ছিলেন জ্ঞানে-গুণে সমৃদ্ধ। নানা বিষয়ে গবেষণা করতে তাঁদের বিপুল আগ্রহ ছিল। কেউ ধর্মীয় বিষয়ে, কেউ সামাজিক বিষয়ে, কেউ শিক্ষা সংক্রান্ত, কেউ ভৌগোলিক বিষয়ে গবেষণা করতে নানা দেশে পাড়ি জমান। তাঁরা কেবল গ্রন্থ অধ্যয়নের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকতেন না। বরং বিশেষ গবেষণা উপহার দিতে এবং জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটাতে নানা দেশ ঘুরে বেড়াতেন। নানা অঞ্চলে পাড়ি জমাতেন। তাঁদের দেখা বিস্ময়কর ঘটনাসমূহ লিপিবদ্ধ করতেন। অদ্ভুত সব রীতিনীতির ইতিহাস সংরক্ষণ করে রাখতেন। ইসলামি বিষয়ে গবেষণার জন্য তাঁরা বিপুল পরিমাণ পাথেয় রেখে যান। এই আধুনিক যুগে যারা এ বিষয়ে গবেষণা করতে চায়, তাদের জন্য সেসব মহান পর্যটকদের গ্রন্থই নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে ধরা হয়। এসব মহান মনীষীদের অন্যতম হলেন: ইয়াকুবি, আস্তাখরি, মাকদিসি, ইবনু হাওকাল, নাসির খসরু, ইবনু জুবাইরি, ইয়াকুত ও ইবনু বতুতা।

নানা সুযোগ-সুবিধার কারণে এবং দেশে দেশে মানুষের সমাদর পাওয়ায় শিক্ষার্থীদের মাঝে ইলম অর্জনের স্পৃহা আরও বেড়ে যায়। তারা ইলমী অভিযাত্রাকে আরও লম্বা করার উৎসাহ পান। আসুন, ইবনু বতুতার ভ্রমণ থেকে আতিথেয়তার কিছু ঘটনা আমরা জেনে নিই। ইবনু বতুতা লেখেন: আমরা আকসারা শহরে উপনীত হলাম। সেটি ছিল ইরাকি শাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন। সেখানে শাসকের প্রতিনিধি ছিলেন শরিফ হুসাইন। আমরা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাদেরকে যারপরনাই ইজ্জত দিলেন। মেহমানদারি করলেন। আমরা সিওয়াস শহরে গেলাম। সেটিও ইরাকের অধীন ছিল। সেখানে এক ভাইয়ের দাওয়াত আমরা গ্রহণ করলাম। শহরের অনেক লোক তাদের বাড়িতে অবস্থান করার জন্য আমাদের অনুরোধ করল। কিন্তু অনেকের দাওয়াত গ্রহণ করে ফেলেছি বিধায় তাদের আবদার রাখতে পারিনি। আমরা প্রথমে যাদের বাড়িতে অবস্থান করেছি, আমাদের পেয়ে তারা দারুণ খুশি হয়। সেদেশের প্রধান আমাদের জন্য অনেক ঘোড়া, দামি পোশাক ও অর্থকড়ির ব্যবস্থা করে দেন। আমাদের আতিথেয়তা এবং সার্বিক সহায়তা করতে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সরকারি প্রতিনিধিদের কাছে চিঠি লিখে দেন। ইরযুরুম শহরে এক বয়োবৃদ্ধ লোকের বাড়িতে আমরা মেহমান হলাম। তার বয়স এক শ ত্রিশ। তিনিও আমাদের খাতিরযত্ন করলেন। নিজে আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করলেন। দ্বিতীয় দিন আমরা চলে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি খুব কষ্ট পান। আমাদের যেতে না দিয়ে বলেন, আপনারা চলে গেলে আমার অসম্মান হবে। কোথাও



উঠলে কমপক্ষে তিনদিন সেখানে মেহমান হিসেবে থাকতে হয়...। আমরা ইয়ারকি শহরে গেলাম। সেখানকার স্থানীয় এক লোকের কাছে আমাদের মেজবানের ঠিকানা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, ঠিক আছে, আসুন। আমি আপনাদেরকে তার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা তার সাথে গেলাম। তিনি আমাদেরকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। খুব আদর-আপ্যায়ন করলেন। পরদিন আমাদেরকে ওই ঠিকানায় পৌঁছে দিলেন।<sup>[১]</sup>

দীর্ঘদিন অধ্যয়ন শেষ করার পর শিক্ষার্থীদের যখন সুদেশে ফিরে যাওয়ার সময় হতো, তখন শাইখগণ তাদেরকে নানা মূল্যবান নসিহত করতেন। এরকম কয়েকটি উপদেশের কথা এখানে উল্লেখ করলাম।

ইউসুফ বিন খালিদ সামতী ছিলেন ইমাম আবু হানিফার বিশিষ্ট ছাত্র। জন্মভূমি বসরায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইলে ইমাম সাহেব তাকে বললেন, আমার কিছু বিশেষ কথা আছে, সেগুলো শুনে তারপর যাবে। কিছু বিষয় আছে, যেগুলো ভালোভাবে মানলে তোমার ইলম হয়ে উঠবে সুশোভিত। কখনো হৌচট খাবে না। ইলমের কারণে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। কেউ তোমার সাথে শত্রুতা করবে না। ইউসুফ সেই উপদেশ শোনার জন্য একদিন দেরি করলেন। এরপর আবু হানিফা নির্জনে তাকে বললেন: তুমি কি ভাবছ বসরায় গিয়ে বিরোধীদের সাথে ওঠেপড়ে লাগবে? তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে? তোমার জ্ঞান দিয়ে তাদের টুটি চেপে ধরবে? এভাবে তারা তোমার থেকে দূরে থাকবে আর তুমিও তাদের থেকে সরে যাবে?! ইউসুফ সামতী বলেন, আমি তো তাই করতে চেয়েছিলাম।

তখন আবু হানিফা বললেন: শোনো, বসরায় যাওয়ার পর মানুষ তোমাকে স্বাগত জানাবে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে ছুটে আসবে। তোমার মর্যাদা বুঝবে। তাই প্রত্যেক মানুষকে স্তর অনুপাতে ইজ্জত দেবে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মর্যাদা রক্ষা করবে। জ্ঞানীদের সম্মান করবে। বড়দের শ্রদ্ধা করবে। ছোটদের স্নেহ করবে। সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর ঘনিষ্ঠ হবে। পুণ্যবান লোকদের সঙ্গে মিশবে। সুলতানদের অবমূল্যায়ন করবে না। শাসকদের টার্গেট করে কোনো কটুক্তি করবে না। কিন্তু শাসকদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে না। কোনো উপহার কবুল করবে না...। মানুষকে খাবার খাওয়াবে। কারণ কৃপণ কখনো ধনী হতে পারে না। মানুষ তোমার কাছে আসুক বা না আসুক, তুমি সবার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। মানুষ তোমার প্রতি সদাচরণ করুক বা না করুক, তুমি সবার প্রতি সদাচরণ করবে। সবসময় ক্ষমা করবে। ছাড় দেবে। ভালো কাজের

নির্দেশ দেবে। আপন ভাইদের কেউ অসুস্থ হলে নিজে গিয়ে তার সেবা করবে। সাহায্য করবে। কেউ অনুপস্থিত হলে তার খোঁজ নেবে। কেউ তোমাকে মূল্যায়ন করতে বিলম্ব করলেও তুমি তাকে মূল্যায়ন করতে দেরি করবে না। যে তোমাকে কষ্ট দেবে, তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। তোমার কাছে আসা মেহমানদের আপ্যায়ন করবে। তোমার প্রতি অবিচারকারীদের মাফ করে দেবে। বিষণ্ণ ও শোকাহত লোকদের পাশে থাকবে। কেউ সুসংবাদ পেলে তাকে সাধুবাদ জানাবে। কেউ সাহায্য চাইলে তাকে সহায়তা করবে। কোনো জনসভায় উপস্থিত হওয়ার পর মানুষকে তোমার মতের উল্টো পেলে তাদের বিরোধিতা করবে না। কেউ প্রশ্ন করলে প্রথমে স্থানীয়দের মতের অনুকূলে উত্তর দেবে। এরপর বলবে, এ বিষয়ে আরেকটি মত আছে। এ কথা বলে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করবে। তারা যতটুকু তোমার কথা গ্রহণ করবে, ততটুকু তাদের সামনে ব্যাখ্যা করবে। ততটুকুর প্রমাণ তাদের সামনে পেশ করবে। মানুষ (বৈধ সীমার মধ্যে) নিজেদের ব্যাপারে যতটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চায়, তাদেরকে ততটুকুর ওপর ছেড়ে দিয়ে তুমি সন্তুষ্ট থাকবে।<sup>[১]</sup>

## নারীদের শিক্ষাদীক্ষা

এ বিষয়ে আমি একাধিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছি। না, দুটি-তিনটি নয়; সত্যি বলতে অনেক কিতাব পড়েছি। এসব গ্রন্থের আলোকে আলোচনার শুরুতেই আমি একটি বিষয় পরিষ্কার করতে চাই। প্রাচ্যে হোক বা পাশ্চাত্যে, মধ্যযুগে সর্বত্র নারীশিক্ষা এতটা বিস্তৃত ও পরিকল্পিতরূপে ছিল না। পুরুষদের জন্য জ্ঞানচর্চা ও পড়াশোনার যে বিপুল সুযোগ ছিল, নারীদের জন্য সে রকম সুবিধা তুলনামূলক কম ছিল। প্রাচ্যে নারীশিক্ষার আলোচনা শুরুর আগে তৎকালীন ইউরোপের অবস্থা কেমন ছিল, ইউরোপীয় ইতিহাসবিদদের গ্রন্থ থেকে সে সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করতে চাই।

### ✿ তৎকালীন ইউরোপে নারীশিক্ষা

খ্রিস্টান ক্যাথলিক মতাদর্শ অনুযায়ী ইউরোপে নারী অধিকার ও শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের বিচরণ ছিল একেবারেই সীমিত। ক্যাথলিক মতাদর্শে নারীকে দ্বিতীয় সারির জীব হিসেবে গণ্য করা হতো। মধ্যযুগে ইউরোপীয় নারীদের ক্ষমতা একেবারেই সীমিত পর্যায়ে ছিল। কেবল ঘরোয়া পরিবেশ ছাড়া অন্য কোনো

[১] পুরো ওসিয়তনামা ইস্তাশুল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হস্তলিখিত গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে।



ক্ষেত্রে তাদের অধিকার খাটানো বা ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ ছিল না।<sup>[১]</sup>

ইউরোপীয় নারীর সামাজিক স্তর ও মূল্যায়ন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বিশেষত শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তা এ রকম: ‘ভবিষ্যৎ জীবনে সংসার পরিচালনায় যতটুকু প্রয়োজন—মহৎ ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর তরুণীদের জন্য ততটুকু পড়ালেখার অনুমতি দেন ফ্রান্সেসকো দ্য বার্বেরিকো। অপরদিকে রাজকন্যা, বিচারক ও চিকিৎসাবিদদের মেয়েদের পড়াশোনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে কি না, একটা সময় পর্যন্ত এ বিষয়ে তারা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন। অবশেষে তাদেরকে পড়াশোনায় অংশগ্রহণের সুযোগ না দেওয়ার ব্যাপারেই তারা সিদ্ধান্ত নেন। পড়াশোনায় মনোযোগ না দেওয়া কেই তাদের জন্য অধিক কল্যাণকর বলে মনে করেন। অপরদিকে ব্যবসায়ী ও শ্রমিক শ্রেণীর মেয়েদের জন্য যেকোনো ধরনের শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া ছিল নিষিদ্ধ।’<sup>[২]</sup>

উচ্চশ্রেণীর নারীদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে জন ল্যাংডন ডেভিস আরেকটি চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রথমে তিনি প্রশ্ন করেন: রাজপ্রাসাদে আমির শ্রেণীর নারীরা কিভাবে জীবনযাপন করত। উত্তরে তিনি বলেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা যৎসামান্য শিক্ষার সুযোগ পেত। শিশু অবস্থায় বিশেষ শিক্ষকের কাছে দিনের একটি অংশে বসতো। অথবা কোনো পাঠশালায় ভর্তি হয়ে পড়ালেখা শিখত। মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে যেসব ভ্রাম্যমান বই-বিক্রেতা গল্পকাহিনীর বই বিক্রি করত, সেসব বই পড়ার যোগ্যতা অর্জন করাটাই ছিল তাদের শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর। সেসব ভ্রাম্যমান বই-বিক্রেতা নিজেরাই সেসব গল্প রচনা করত। অনেক সময় কবিতার ভাষায় বা সংগীতের আদলে সেগুলো তৈরি করে মানুষের কাছে বিক্রি করত।<sup>[৩]</sup>

কোনো সংশয় ছাড়াই আমরা বলতে পারি যে, শিক্ষাক্ষেত্রে অভিজাত ও রাজবংশের নারীদের যতটা অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল, সাধারণ শ্রেণীর নারীদের ততটা ছিল না। অপরদিকে মধ্যযুগের শেষদিকে ব্রিটিশ নারীদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এ. আবরাম লেখেন: ‘পুরুষদের শিক্ষার তুলনায় নারীদের শিক্ষার গুরুত্ব কম ছিল। পুরুষরা যে রকম উচ্চশিক্ষার কথা চিন্তা করত, সেই তুলনায় নারীরা অতটা শিক্ষিত হওয়ার চিন্তা করত না। এক্ষেত্রে আবরাম একজন সম্ভ্রান্ত

[১] Feminism by K. A. Wieth – Knudsen, translated from the Danish by Arthur G. Chater, p. 209

[২] The Encyclopaedia of Education IV p. 1790.

[৩] A Short History of Women p. 229.



লোকের একটি উক্তি তুলে করেন। সেই উক্তিটি নারীদের শিক্ষার বিষয়ে তার মতের সঙ্গে মিলে যায়। তিনি বলেন, আমি চাই, আমার মেয়েরা অন্তত পাঠ চরিত্রের কথা শিখতে পারে। যেন দাম্পত্য জীবনে তারা সুখী সংসার করতে পারে।'

আবরাম আরও যোগ করেন, নানা ইতিহাস-গ্রন্থ থেকে বোঝা যায়, সে যুগে নারীদের থেকে উচ্চশিক্ষা কাম্য ছিল না। তাই তো শিক্ষার ওয়াকফ ব্যবস্থা কেবল ছেলে শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সেখানে বালিকাদের জন্য তেমন ব্যবস্থা ছিল না। বেশিরভাগ পিতা কন্যাদের অল্প শিক্ষাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। এরপর সাংসারিক জীবনের কাজে যোগ্য ও আদর্শ বধূ হিসেবে গড়ে তুলতে তাদেরকে নানামুখী কাজ শিক্ষা দেওয়া হতো।<sup>[১]</sup>

### ✻ মুসলিম বিশ্বের নারীসমাজ

এই ছিল ইউরোপীয় লেখকদের গ্রন্থ থেকে নেওয়া মধ্যযুগে নারীশিক্ষার কয়েকটি চিত্র। এবার আসুন আমরা মুসলিম নারীদের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করি। শুরুতেই একটি বাস্তবতা আমি স্বীকার করে নিতে চাই, যা অনেক মুসলিম লেখক স্বীকার করে নিতে চাননি। সেটি হলো, পুরুষদের শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা যতটা বিস্তৃত ছিল, সেই তুলনায় নারীদের পড়াশোনা ততটা ছিল না। এবার মনে প্রশ্ন উদয় হতে পারে যে, ইসলাম তো জ্ঞানচর্চার জন্য কোনো লিঙ্গ নির্ধারণ করেনি, নারী-পুরুষের মধ্যে তারতম্য করেনি; তারপরও শিক্ষায় কেন নারীরা পিছিয়ে ছিল? আমার কাছে এর প্রধান কারণ মনে হয়েছে, সে যুগে শিক্ষাগ্রহণ ও জ্ঞানচর্চা অতটা সহজ ছিল না। শিক্ষার্থীদের দূর-দূরান্তে সফর করে বিজ্ঞ শিক্ষকদের কাছে দীর্ঘদিন অবস্থান করে জ্ঞানচর্চা করতে হতো। এক দেশ থেকে অপর দেশে ঘুরতে হতো। নানা কষ্ট ও দুর্ভোগ সহ্য করতে হতো। এই কষ্ট ও দুর্ভোগ পুরুষরা সহ্য করলেও দৈহিক ও মানসিকভাবে তুলনামূলক দুর্বল হওয়ায় নারীরা তা সহ্য করার সাহস করত না। অপরদিকে আরবদেশে নারীরা ছিল খুব সম্মানের পাত্র। তাদের আদরযত্নে কোনো অবহেলা করা হতো না। তাই জ্ঞানার্জন করতে গিয়ে আদরের দুলালী কন্যা এত দুর্ভোগ সহ্য করুক; কোনো অভিভাবক তা চাইতেন না। এ কারণেই সে যুগে নারীদের মধ্যে শিক্ষিতের হার তুলনামূলক কম দেখা যায়। তবে অনেক মুসলিম নারী নানা কষ্ট ও দুর্ভোগ সহ্য করে কোনো কোনো শাস্ত্রে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করতে

[১] English Life and Manners in the Later Middle Ages p. ২১৮।



সক্ষম হন। মুসলিম সমাজে এ রকম নারীর সংখ্যা মোটামুটি দেখা গেলেও ইউরোপের নারীদের মাঝে তা একেবারেই ছিল না বলা যায়।

নারীদের শিক্ষা সম্পর্কীয় কিছু চিত্র তুলে ধরার আগে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা দরকার। তা হলো, এসব নারী কোথায় শিক্ষাগ্রহণ করত। তারা কি শৈশবে মক্তবে গিয়ে পড়াশোনো করত? বড় হয়ে পুরুষদের সঙ্গে একই পাঠশালায় বসতো? নাকি শিশু ও পুরুষদের সঙ্গে না বসিয়ে বিশেষ শিক্ষক নিয়োগ করে তাদেরকে ঘরেই পাঠদান করা হতো?

ড. মুহাম্মাদ ফুয়াদ আহওয়ানী বলেন,<sup>[১]</sup> নারীরা ক্ষুদ্রে পাঠশালায় গিয়ে পড়াশোনা করত। তবে ড. আহওয়ানী পরবর্তী সময় এ মত থেকে ফিরে এসে তিন মত প্রকাশ করেন। সেই মতটিই আমার কাছে যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি বলেন,<sup>[২]</sup> নারীশিক্ষার প্রচলন ছিল ঘরোয়া পরিবেশে।

ড. খলিল তাওতাহ তাঁর রচিত আত-তারবিয়াহ ওয়াত তালীম গ্রন্থেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ‘আল বিনতু ওয়াল মাকতাব’ অধ্যায়ে তিনি বলেন, আল-আগানী গ্রন্থ থেকে বোঝা যায়, হিজরি দ্বিতীয় শতকে নারীরা মক্তবে আসা-যাওয়া করত। এরপর ড. তাওতাহ আল-আগানী গ্রন্থ থেকে অসম্পূর্ণ কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরে নিজের বক্তব্য প্রমাণের চেষ্টা করেন। সেগুলো আমরা পরে উল্লেখ করব। এসব উদ্ধৃতির ওপর তিনি মন্তব্য যোগ করেন : ‘এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায়, নারীরা সে সময় মক্তবে আসা-যাওয়া করত।’

ড. তাওতাহ আল-আগানী গ্রন্থের যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা হলো—১৪ : ৪৯ এবং ২১ : ৪৮। আমরা আল-আগানী গ্রন্থের সেই দুটি উৎস নিরীক্ষণ করে দেখি, প্রথম উদ্ধৃতিতে লেখা আছে : কুফায় আলি বিন আদম নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে কুফার জনৈক ব্যক্তির এক সুন্দরী দাসীর প্রেমে পড়ে যায়। অল্পবয়সী সেই দাসী মক্তবে আসা-যাওয়া করত। তার পিছু পিছু আলি বিন আদমও মক্তবে উপস্থিত হতো। সারাক্ষণ সে দাসীর দিকে তাকিয়ে থাকত। এরপর দাসীটি সাবালিকা হওয়ার আগেই তার মনিব তাকে হাশেমি বংশের এক লোকের কাছে বিক্রি করে দেন। এরপর আলি বিন আদম সেই দাসীর বিরহ বেদনায় মারা যায়।<sup>[৩]</sup>

[১] আত তালীম ইনদাল কাবিস পৃ ৮৭।

[২] প্রাগুক্ত ১৪৩।

আর দ্বিতীয়টি উদ্ধৃতিটি এ রকম: মুহাম্মাদ বিন হাসান থেকে কাতরানী মুগনী আমার কাছে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, শিক্ষক খলিলকে ‘খলিলান’ (দুই খলিল) বলে ডাকা হতো। কারণ তিনি একই জায়গায় বাচ্চাদের প্রাথমিক শিক্ষা এবং দাসীদের নাসীদ শেখাতেন। সেই পাঠশালায় উপস্থিত হওয়া এক ব্যক্তি আমাকে বলেন, একবার আমি তার কাছে বসা ছিলাম। তিনি এক শিশুকে কুরআনের এই আয়াতের পাঠ শেখাচ্ছিলেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
بِغَيْرِ عِلْمٍ

একশ্রেণীর লোক আছে, যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে..[১]

এরপর তিনি এক মেয়েশিশুর দিকে তাকালেন। তাকে নাসীদ শেখানোর উদ্দেশ্যে একটি কবিতা উচ্চারণ করলেন।[২]

আল-আগানী গ্রন্থের এ দুটি উদ্ধৃতি পড়ার পর ড. তাওতাহ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তাঁর সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। কারণ ইসলামের একেবারে সূচনালগ্নে যে মেয়েরা শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিল এবং যথেষ্ট পরিমাণ শিক্ষিত হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল, তারা সবাই ছিল স্বাধীন শ্রেণীর (দাসী নয়)। অপরদিকে আল-আগানী গ্রন্থের এ দুটি ঘটনা দাসী মেয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই দাসীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে সব শ্রেণীর নারীদের মজুবে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে পড়ার কথা আমরা সাব্যস্ত করতে পারি না। কারণ মজুবে দাসীদের পড়ার দ্বারা সেখানে স্বাধীন মেয়েদের পড়ার বিষয়টি প্রমাণ করে না। কারণ সহশিক্ষার প্রতি নিরুৎসাহিত করার যে প্রবণতা, তা দাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। কারণ তাদের ক্ষেত্রে অনেক ছাড় ছিল, যা স্বাধীন মেয়েদের ক্ষেত্রে ছিল না।

দাসীদের পড়াশোনায় পাঠানোর পেছনে যতটা না তাদের শিক্ষিত করা উদ্দেশ্য ছিল, তার চেয়ে বেশি উদ্দেশ্য ছিল তাদের দাম বাড়িয়ে তোলা। কারণ শিক্ষিত হলে তাকে চড়া মূল্যে বিক্রি করে বিপুল মুনাফা অর্জন করা যেত। আল-আগানী গ্রন্থের প্রথম উদ্ধৃতিটি এ উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিলে যায়। নাসীদ শিখিয়ে তাদের উচ্চমূল্যে বিক্রি করে দেওয়াও লক্ষ্য হতে পারে। দ্বিতীয়

[১] সূরা লুকমান ৩১: ৬।

[২] আল আগানী ২১: ৪৮।



উদ্ভূতিটি এ লক্ষ্যের সঙ্গে মিলে যায়। তা ছাড়া দ্বিতীয় উদ্ভূতিতে নাশীদ শেখানোর যে কথা বলা হয়েছে, তা আরও অবাস্তব মনে হয়। কারণ সেকালে নাশীদ শিল্প ছিল অনেক উঁচু মানের। মক্তবের সাধারণ শিক্ষকেরা নাশীদে পারদর্শী হওয়া ছিল দুর্লভ। শিক্ষকতার সাথে সাথে সংগীত-চর্চার বিষয়টি অলীক মনে হয়। আজকাল মিশরের গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষকগণ পাঠশালায় বসে শিক্ষকতার পাশাপাশি শাখের বসে টুকটাক যে হাতের কাজ করেন, ওই লোকের সংগীত শেখানোর বিষয়টিও ছিল অনেকটা সে রকম। তাই বাস্তবে ওই মেয়ের সঙ্গে মক্তবের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

মেয়েরা যে শৈশবে মক্তবে যেত না, বড় হয়ে পুরুষদের সঙ্গে একই শ্রেণীতে বসে পাঠ গ্রহণ করত না, এ বিষয়ে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং অনেক বিবরণ রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়েরা মাহরামের মাধ্যমে অথবা বিশেষভাবে নিযুক্ত শিক্ষকের মাধ্যমে নিজ বাড়িতেই পড়াশোনা করত।

» বালায়ুরি বলেন,<sup>[১]</sup> ইসলামের আবির্ভাবের সময় আরবে পাঁচজন বিখ্যাত নারী ছিলেন, যারা পড়তে ও লিখতে পারতেন। তাঁরা হলেন: হাফসা বিনতু উমর, উম্মু কুলসুম বিনতু ওকবা, আয়িশা বিনতু সাদ, কারিমা বিনতুল মিকদাদ এবং শিফা বিনতু আবদিল্লাহ আদাভিয়া। শোষোক্ত জন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লামের স্ত্রী হাফসাকে পড়ালেখা শেখাতেন। নবিজির সাথে হাফসার বিয়ের পরও তাঁকে পড়ালেখা শেখানো চালিয়ে যেতে শিফাকে অনুরোধ করেন আল্লাহর রাসূল।

» ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন:<sup>[২]</sup> নারী সাহাবিগণ মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, সবসময় আপনার আশপাশে পুরুষদের ভিড় থাকে (ফলে দ্বীন শিখতে আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না)। তাই আমাদের জন্য আপনি একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দেন। সে দিন তিনি তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তাঁদেরকে দ্বীনের যাবতীয় বিধান শিক্ষা দিতেন।

» বিখ্যাত জ্ঞানী আ'শা তাঁর কন্যাকে শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলেন। একপর্যায়ে ওই কন্যা খ্যাতনামা সাহিত্যিক হয়ে ওঠেন। বর্ণিত আছে, আ'শা কোনো কবিতা রচনা করলে, প্রথমে ওই কন্যার কাছে উপস্থাপন করতেন।

[১] ফুতুহুল বুলদান পৃ ৪৫৮।

[২] সহিহুল বুখারি ১: ৩৮।

তাঁর কন্যা সেসব কবিতা নিরীক্ষণ করে দিতেন।<sup>[১]</sup>

» ঈসা বিন মিসকিন (মৃত্যু ২৭৫ হিজরি) আসর পর্যন্ত ছেলেদের পাঠদান করতেন। আসরের নামাজের পর তাঁর দুই কন্যা, ভাতিজী ও নাতনীদের কুরআন ও জ্ঞান শিক্ষা দিতেন।<sup>[২]</sup> তেমনি বিখ্যাত মনীষী আসাদ ইবনুল ফুরাত তাঁর কন্যা আসমাকে এবং ইমাম সাহনুন তাঁর কন্যা খাদিজাকে শিক্ষা দিতেন। তা ছাড়া অভিজাত ও রাজবংশের মেয়েদের পড়াশোনার জন্য বিশেষ শিক্ষকদের রাজপ্রাসাদে নিয়োগ করা হতো।<sup>[৩]</sup>

এখানে আরেকটি কারণ আমি যুক্ত করতে চাই। তা হলো, পুরুষ শিক্ষার্থীরা যে পরিমাণ পুরুষ শিক্ষকদের কাছে পড়তে যেত, নারী শিক্ষার্থীরা মহিলা শিক্ষিকাদের কাছে সে পরিমাণ পড়তে যেত না। কারণ সে সময় নারীদের শিক্ষার মাধ্যম ছিল মাহরাম শিক্ষক অথবা পর্দার সাথে নিযুক্ত ঘরোয়া শিক্ষক। এ দুটো মাধ্যম অবলম্বন করা সব শ্রেণীর নারীদের জন্য সহজ ছিল না। অপরদিকে ছেলেদের জন্য সেগুলো ছিল একেবারেই সহজলভ্য। শৈশবে সে মজ্জবে যেত, আর বড় হয়ে মসজিদে বিজ্ঞ শাইখের দরসে উপস্থিত হতো। এভাবে পর্যায়ক্রমে তার জ্ঞানের স্তর উন্নত হতো। এত কিছু পরও বিশেষভাবে নিযুক্ত শিক্ষকদের কাছে পড়ে অনেক নারী নানা শাস্ত্রে বিপুল পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সেগুলো পুরুষদের থেকে কোনো অংশে কম ছিল না। বরং অনেক সময় তা পুরুষদেরকেও ছাপিয়ে যেত।

আরেকটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত না করলেই নয়। তা হলো, মুসলিম নারী কেবল ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েই বসে থাকত না। বরং তারা ইসলামি আদর্শ, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং উন্নত চরিত্রের আধার হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করত। ইতিহাস ও শিষ্টাচারের গ্রন্থগুলো এ রকম মহীয়সীদের কীর্তিগাথা দিয়ে ভরপুর। সেগুলোর কয়েকটি আমি এখানে তুলে ধরছি। ঘটনাগুলো প্রসিদ্ধ হওয়ার পরও জৌলুস একটুও কমেনি।

আট বছর শাসন করেন আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু। ইরাক, হিজায় ও ইয়েমেনে তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের সেনাবাহিনীর সামনে তাঁর পরাজয় ঘটতে থাকে। ওই সেনাদলের নেতৃত্বে ছিল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। রাজত্ব সংকুচিত হতে হতে একপর্যায়ে

[১] আল আগানী ১৫: ১০৬।

[২] ইবনু সাহনুনের লেখা আদাবুল মুআল্লিমীন গ্রন্থের হাসান হুসনি আবদুল ওয়াহহাবের লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

[৩] প্রাগুক্ত পৃ ২৩।



কেবল মক্কা নগরী অবশিষ্ট থাকে। অবশেষে সেখানেই হাজ্জাজের বাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। পাথর ও গোলার আঘাতে মক্কা নগরী জর্জরিত হয়ে যায়। তাঁর সহযোগী ও সমর্থক কমতে থাকে। শত্রু-শিবির ভারী হতে থাকে। তরবারি রেখে উমাইয়া শাসনের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে নিলে উমাইয়াদের পক্ষ থেকে তাঁকে শাসক হিসেবে নিযুক্ত করার আশ্বাসও দেয় হাজ্জাজ। সে সময় আবদুল্লাহ বিন যুবাইর তাঁর মা আসমা বিনতু আবু বকরের কাছে যান। সেদিন মা-ছেলের মাঝে হওয়া সংলাপটি ছিল এ রকম:

আবদুল্লাহ: আমিজন, মানুষ আমাকে লাঞ্ছিত করেছে। এমনকি আমার পরিবার ও সন্তানও। অল্প কজন ছাড়া আর কেউই আমার পাশে নেই। যা আছে তা দিয়ে হয়তো দিনের কিছু অংশ টিকে থাকা যাবে। পৃথিবীতে আমি যা চাই, তা বিরোধী পক্ষ আমাকে দিতে চাচ্ছে। আপনি কী বলেন?

আসমা: হায় আল্লাহ, হায় আল্লাহ! তুমি সত্যের ওপর অবিচল আছ—এ কথার বিশ্বাস যদি হৃদয়ে থেকে থাকে, তবে আত্মসমর্পণ না করে অবিচল থাকো। আর যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় দুনিয়ার ভোগ বিলাস, তাহলে তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট আর কেউ নেই। তোমার আত্মা ও তোমার সহযোগী সবার ধ্বংস অনিবার্য। আর যদি তুমি মনে করো যে, তুমি সত্যের ওপর অবিচল ছিলে, তবে এখন সহযোদ্ধা কমে যাওয়ায় মনোবল ভেঙে পড়েছে, তবে এটি স্বাধীন বীরপুরুষের কাজ নয়। দুনিয়াতে তুমি কত বছর বেঁচে থাকবে? এই ভোগ-বিলাসের চেয়ে শত্রুর হাতে নিহত হয়ে যাওয়া অনেক ভালো হে যুবাইরের ব্যাটা। আল্লাহর শপথ! সম্মানের সাথে তরবারির আঘাত সহ্য করা, লাঞ্ছনার সাথে চাবুকের আঘাত সহ্য করা থেকেও বেশি প্রিয় আমার কাছে।

আবদুল্লাহ: আমিজন, আমার ভয় হয়! পাছে শামের লোকেরা আমাকে হত্যা করে আমার লাশ ফ্রুশবিদ্ধ করবে।

আসমা: ছেলে আমার! জবাই করে ফেলার পর ছাগলের চামড়া খসালে এতে ছাগলের কোনো অনুভূতি হয় না। কোনো সংশয় ও ভয়কে প্রশ্রয় না দিয়ে তুমি যুদ্ধ চালিয়ে যাও।<sup>[১]</sup>

## নারীদের দক্ষতার ক্ষেত্রসমূহ

নারীদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির কথা যা ওপরে বলা হয়েছে, এতে কোনো অত্যাতি নেই। শিক্ষার নানা বিভাগে নারীদের প্রভূত উন্নতি ও অগ্রগতি

[১] ইবনু আসাকির: তাহযিবু তারিখি দিমাশক ৭: ৪১৫-৪১৬, ইবনুল আসির ৪: ১৪৭।

সাধন হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে তারা পুরুষদেরকেও টেক্কা দিয়েছেন। যা তাদের জ্ঞানের বিশালতার কথা প্রমাণ করে। যেসব ক্ষেত্রে নারীদের দক্ষতা ও পারদর্শিতা লক্ষ করা গেছে, নিচে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

## ❖ দ্বীন শিক্ষা

দ্বীনশিক্ষায় নারীদের তুমুল আগ্রহ লক্ষ করা গেছে। ধর্মীয় বিষয়েই তারা সবচেয়ে বেশি যত্নশীল ছিলেন। বিশেষ করে হাদিসের জ্ঞান আহরণে তাদের উৎসাহ ছিল বিপুল। ইতিপূর্বে আমরা পড়ে এসেছি: নারী সাহাবিগণ মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, সবসময় আপনার পাশে পুরুষদের ভিড় থাকে (ফলে দ্বীন শিখতে আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না)। তাই আমাদের জন্য আপনি একটি দিন নির্দিষ্ট করুন। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করলেন। সেদিন তিনি তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তাঁদেরকে দ্বীনের বিধিবিধান শিক্ষা দিতেন। এর ফলে প্রথম ইসলামি প্রজন্ম, বিশেষ করে আনসারি নারীদের অনেকেই ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আনসারি নারীগণ কত ভালো, লজ্জা তাদেরকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন থেকে দমিয়ে রাখতে পারেনি।<sup>[১]</sup> আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজেই ওই প্রজন্মের নারীদের প্রধান উস্তাযা ছিলেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি এক হাজার হাদিস বর্ণনা করেন। এই বিপুল পরিমাণ হাদিস তিনি ছাড়া অন্য কোনো নারী বর্ণনা করেননি।<sup>[২]</sup>

এই প্রজন্ম ও তার পরবর্তী প্রজন্মের নারীরা হাদিস বর্ণনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। আত-তাবাকাতুল কাবীর গ্রন্থে মুহাম্মাদ বিন সাদ হাদিস বর্ণনাকারী নারীদের আলোচনায় সাত শ নারী সাহাবির কথা আলোচনা করেছেন, যারা সরাসরি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অথবা নির্ভরযোগ্য সাহাবিদের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। সেসব মহীয়সী নারীদের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ইমামগণ। বিশিষ্ট হাদিস-বিশারদ ইবনু হাজার ১৫৪৩ জন নারী সাহাবির বৃত্তান্ত উল্লেখ করে বলেন, তাঁরা সবাই নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসা ও আলিমা। তা ছাড়া ইমাম নববী তাঁর তাহযিবুল আসমা গ্রন্থে, খতিব বাগদাদী তাঁর তারিখু বাগদাদ গ্রন্থে এবং সাখাভী তাঁর আদ-

[১] সহিহুল বুখারি ১: ৪৬।

[২] আন নববী, তাহযিবুল আসমা পৃ ৮৪৮।



দাওউল লামি গ্রন্থে বিপুল সংখ্যক নারীর কথা উল্লেখ করেছেন, যারা ছিলেন নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষিত। বিশেষ করে ধর্মীয় ও হাদিসের জ্ঞানে।

হাফিজ যাহাবী চার হাজার মুহাদ্দিসকে নিয়ে আপত্তি করেছেন। অপরদিকে নারী মুহাদ্দিসাদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি বলেন, একজন নারী মুহাদ্দিসার বিষয়েও কেউ আপত্তি করেছেন, বা তার হাদিস বর্জন করেছেন বলে আমার জানা নেই।<sup>[১]</sup> হাদিস বর্ণনা ও সংরক্ষণে নারী মুহাদ্দিসাগণ কত বিশ্বস্ত ছিলেন, এ থেকেই তা উপলব্ধি করা যায়।

ধর্মীয় জ্ঞানচর্চায় কিছু কিছু নারীর নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁদের কয়েকজনের কথা এখানে উল্লেখ করছি:

» নাফিসা বিনতুল হাসান বিন যাইদ ইবনুল হাসান ইবনু আলি: তিনি ছিলেন বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ হাদিস বর্ণনাকারী। তাঁর দরসে বিখ্যাত আলিম ও মুজতাহিদগণ অংশগ্রহণ করতেন। ইমাম শাফিয়ি যখন মিশরে গমন করেন, তখন তাঁর কাছে উপস্থিত হন। তাঁর থেকে হাদিস শোনেন।<sup>[২]</sup>

» শাইখা শাহদাহ: তাঁকে ফখরুননেসা (নারী-জাতির গৌরব) নামে ডাকা হতো। তিনি বাগদাদের মসজিদে আম জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিতেন। বিপুল সংখ্যক বিদ্যার্থী তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথা শুনতে উপস্থিত হতেন। ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি তিনি সাহিত্য, অলংকারশাস্ত্র, কাব্য ইত্যাদি বিষয়েও পাঠদান করতেন। জ্ঞান ও ভাষার পাণ্ডিত্যে তিনি সমকালীন বিখ্যাত মনীষী ও মহান শিক্ষকদের মাঝে জায়গা করে নেন।<sup>[৩]</sup>

» যায়নাব ইবনু আবদির রহমান শারী: তিনি ছিলেন বিদূষী। তৎকালীন বিশিষ্ট মনীষীদের সাক্ষাৎ লাভ করে তাঁদের থেকে হাদিস গ্রহণ এবং হাদিস বর্ণনার ইজাযত লাভ করেন। মুহাম্মাদ ইবনু আবিল কাসিম ইবনু আবি বকর নিশাপুরী এবং আবুল মুজাফফার কুশায়রী-সহ অন্যান্য মুহাদ্দিস থেকে তিনি হাদিস গ্রহণ করেন। হাফিজ আবুল হাসান ফারিস, আল-কাশশাফ গ্রন্থকার আল্লামা আবুল কাসিম যামাখশারী-সহ অনেক বিজ্ঞ হাফিজুল হাদিস তাঁকে ইজাযত প্রদান করেন। এই বিদূষী নারী ৬১০ হিজরিতে ইবনু খাল্লিকানকে ইজাযত দান করেন। ইবনু খাল্লিকান তখন অল্পবয়স্ক। বড় হয়ে জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করবে, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করবে—এই আশায় ইলমের পরিবেশ

[১] মিয়ানুল ইতিদাল ৩: ৩৯৫।

[২] ইবনু খাল্লিকান ১: ২৫১।

[৩] Ameer Ali: The Spirit of Islam p. ২৫৫।

বেড়ে ওঠা শিশুদেরকে অগ্রীম ইজায়ত দেওয়ার প্রচলন ছিল সেই সনাজে।<sup>[১]</sup>  
 » বিখ্যাত মনীষী ও দরবেশ হাত-কাটা আবুল খাইরের দাদি (অথবা  
 নানি) ওনাইদাহ: তিনি ছিলেন বিদ্যাবতী রমণী। তিনি দরস দেওয়ার জন্য  
 বসতেন। তাঁর সামনে পাঁচ শ শিক্ষার্থী বসতো।<sup>[২]</sup>

বিখ্যাত মনীষী ও নামকরা হাদিস-বিশারদগণ যাদের কাছ থেকে জ্ঞান  
 অর্জন করেছেন, তাদের মাঝে অনেকে ছিলেন নারী। খতিব বাগদাদী সহিহুল  
 বুখারি পড়েছেন কারিমা ইবনু আহমাদ মারুফির কাছে। এই বিখ্যাত মনীষীকে  
 গড়ে তোলার পেছনে এই বিদুষী নারীর অবদান ছিল প্রচুর।<sup>[৩]</sup> অপর বিখ্যাত  
 মনীষী ইবনু আসাকির তাঁর উস্তায ও শাইখদের নামের তালিকা বর্ণনা করেন,  
 যাদের মধ্যে ৮১ জন হলেন নারী।<sup>[৪]</sup>

## ❖ সাহিত্য সাধনা

আরবি সাহিত্যের গ্রন্থসমূহে প্রচুর পরিমাণে নারী সাহিত্যিক, পণ্ডিত,  
 কবিদের কথা পাওয়া যায়। তাঁরা সমকালীন পুরুষ বিদ্বানদের সমকক্ষ ছিলেন।  
 অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা পুরুষদেরকেও ছাড়িয়ে যান। এ রকম বিদ্যাবতী কয়েকজন  
 রমণীর আলোচনা এখানে তুলে ধরলাম।

» হিজরতের আগে নযর ইবনুল হারিস আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
 ওয়া সাল্লামকে খুব গালমন্দ করত। নবিজির ওপর খুব বাড়াবাড়ি করত।  
 বদর-যুদ্ধের দিন অন্যান্য যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে সেও মুসলমানদের হাতে বন্দী  
 হয়। নবিজির নির্দেশে তাকে কতল করা হয়। নযরের হত্যার সংবাদ পেয়ে  
 তার বোন একটি লম্বা শোকগাথা লিখেন:

أُم كَيْفَ يَسْمَعُ مِيتَ لَا  
 يَنْطِقُ  
 فِي قَوْمِهَا، وَالْفَحْلُ فَحْلُ  
 مَعْرَقُ

هَلْ يَسْمَعُنِي النَّضْرُ إِنْ نَادَيْتَهُ

أُمُّ مُحَمَّدٍ، يَا نَسْلَ خَيْرِ كَرِيمَةٍ

[১] ইবনু খাল্লিকান: আল ওয়াফয়াত ১: ২৭৮।

[২] পৃ ৫০ গ্রন্থ: শাকওয়া: আল মাজাল্লাতুল আসিয়াভিয়া: ১৩৯০ সন।

[৩] ইয়াকুত: মু'জামুল উদাবা ১: ২৪৭, ইবনু বাশকুওয়াল: আস সিলাতু ফি তারিখি ওলামাইল  
 আন্দালুস ১: ১৩৩।

[৪] ইয়াকুত: মু'জামুল উদাবা ৫: ১৪০, নুআইমি ১: ১০১।



ما كان ضرك لو مننت وربما  
فالنضر أقرب من أسرت قرابة  
من الفتى وهو المغيظ المحقق  
وأحقهم إن كان عتق يعتق  
لله أرحام هناك تشفق  
ظلت سيوف بني أبيه تنوشه

আমি ডাকলে নযর কি তা শুনতে পায়?  
নির্বাক মৃতরা কিভাবে শুনবে আমার ডাক?  
মুহাম্মাদ তাকে কতল করেছে?  
আমি তো জানতাম মুহাম্মাদ সৃজাতিতে সম্ভ্রান্ত, দয়াপরায়ণ।  
দয়া করাই তো বীর পুরুষের ভূষণ।  
তাকে কতল না করে অনুগ্রহ করলে কীই বা ক্ষতি হতো?  
প্রচণ্ড রাগের মাথায় সাধারণ মানুষও তো ক্ষমা করে দিতো।  
বন্দী লোকের মাঝে নযর ছিল আপনার সবথেকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।  
সে বেশি উপযুক্ত ছিল আপনার অনুগ্রহ এবং মুক্তি পাওয়ার।  
আজও তাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে তার পিতৃপুরুষদের তরবারি।  
আল্লাহর দোহাই! সৃজনের ওপর অনুগ্রহ করা আত্মীয়তার দাবি।

ইবনু হিশাম বলেন, কবিতাটি শোনার পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি যদি কতল করার আগে এই কবিতা শুনতাম, তবে নযরের ওপর অনুগ্রহ করতাম।<sup>[১]</sup>

» ফারায়দাকের স্ত্রী : বিখ্যাত কবি ফারায়দাকের স্ত্রীও ছিলেন বিশিষ্ট কবি।<sup>[২]</sup>

» রাবিয়া আদাভিয়া : পুণ্যতা ও ইবাদতে তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ। তা ছাড়া তিনি ছিলেন কবি, সাহিত্যিক, সুফিয়া। আল্লাহর কাছে মুনাজাত করার সময় খুবই আবেগভরা কণ্ঠে বিনয়ের সাথে দুআ করতেন। তাঁর একটি দুআ ছিল এ রকম : হে আমার আল্লাহ, আপনাকে ভালোবাসে—এমন হৃদয়কে আপনি আগুনের শাস্তি দেবেন?

» যুবায়দা : আব্বাসীয় খলিফা রশিদের স্ত্রী ও জাফরের মাতা। তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন। নানা জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে তিনি পাল্লা দিতেন। তাঁর কবিতা ছিল খুবই চমৎকার, আকর্ষণীয় ও গাভীর্যপূর্ণ। স্বামীর কাছে পত্র লেখার সময় প্রায়ই তিনি কবিতার ভাষায় লিখতেন। তাঁর দুই পুত্র ছিল আল-আমিন ও মামুন। রাজদুন্দু উভয়েই পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে

[১] সিরাতু ইবনি হিশাম ২: ১১৮-১১৯।

[২] জাহিয়া: আল বায়ান ওয়াত তিবয়ান ২: ৯৩।

পড়েন। অবশেষে মামুনের হাতে নিহত হন ভাই আমিন। পুত্র বিয়োগে তিনি অত্যন্ত আবেগী ভাষায় মামুনের কাছে একটি দীর্ঘ শোকগাথা লিখে পাঠান।<sup>[১]</sup>

» হামদাহ বিনতু যিয়াদ এবং যায়নাব বিনতু যিয়াদ : এ দুজন বিদ্যাবতী নারী সম্পর্কে লিসানুদ্দীন ইবনুল খতিব বলেন,<sup>[২]</sup> তারা উভয়ে ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক। ছিলেন সুদর্শন ও বিত্তবতী। জ্ঞানে-গুণে অনন্যা। তবে সাহিত্যের প্রতি তাঁদের ঝোঁক ছিল প্রবল। সমকালীন কবিদের রীতির পাশাপাশি তারা কাব্যসাহিত্যে বিচিত্র ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। ইয়াকুত বলেন,<sup>[৩]</sup> হামদাহকে 'খানসাউল মাগরিব' উপাধি দেওয়া হয়। তা ছাড়া আন্দালুসের কবি হিসেবেও তিনি পরিচিতি পান।

» মরিয়ম বিনতু আবি ইয়াকুব আনসারি : তিনি ছিলেন বিদূষী কবি। নারীদেরকে সাহিত্য শেখাতেন। দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর লেখা অনেক কবিতা এখনো জনপ্রিয় হয়ে আছে।<sup>[৪]</sup>

» আবুল মুতাররিফ আবদুর রহমান ইবনু গালবুনের দাসী বাদানিয়া : তিনি তাঁর মনিব আবুল মুতাররিফের কাছ থেকে ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষা লাভ করেন। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি মনিবকেও ছাপিয়ে যান। ছন্দশাস্ত্রে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। মুবাররিদের রচিত বিখ্যাত আল-কামিল এবং আল-কালীর রচিত আন-নাওয়াদির গ্রন্থ মুখস্থ করেন। তিনি এ দুটো গ্রন্থের ব্যাখ্যা করতেন। আবু দাউদ সুলায়মান ইবনু নাজাহ বলেন, আমি তাঁর কাছে এ দুটো গ্রন্থ পড়েছি। তাঁর কাছ থেকে ছন্দশাস্ত্র শিখেছি।<sup>[৫]</sup>

» হাফসা বিনতুল হাজ্জ রুকুনী : লিসানুদ্দীন ইবনুল খতিব তাঁর সম্পর্কে বলেন,<sup>[৬]</sup> তিনি ছিলেন সমকালীন অনন্য ব্যক্তিত্ব। সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা, সাহিত্য ও চাতুর্যে অতুলনীয়। ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক, প্রচণ্ড উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী। দ্রুত কবিতা রচনায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। ইয়াকুত যোগ করেন :<sup>[৭]</sup> বংশে, সাহিত্যে ও সৌন্দর্যে তিনি ছিলেন বিখ্যাত। ছিলেন

[১] দেখুন: মুরাওভিজুয যাহাব ২: ৩১৫-৩১৬।

[২] আল ইহতাতা ফি আখবারি গারনাতা ১: ৩১৬।

[৩] মু'জামুল উদাবা ৪: ১৪৪।

[৪] আল মাকাররি: নাফহত তীব পৃ ১১৪৩।

[৫] প্রাপ্তপ্ত পৃ ১০৭৮।

[৬] আল ইহতাতা ফি আখবারি গারনাতা ১: ৩১৬।

[৭] মু'জামুল উদাবা ৪: ১১৯-১২২।



নামকরা শিক্ষিকা। তিনি আমিরুল মুমিনিন আবদুল মুমিন বিন আলির রাজপ্রাসাদে শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ পান।<sup>[১]</sup>

» নুহাতুল জুলাসা ফি আশআরিন নিসা নামে ইমাম সুয়ুতির লেখা একটি মূল্যবান গ্রন্থ আছে। গ্রন্থটি আজও দামিশকের আয-যাহিরিয়া গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। তাতে ৩৭ জন নারী কবিদের বৃত্তান্তের পাশাপাশি তাদের রচিত চমৎকার কবিতাও উল্লেখ আছে।

» তাকিয়া উম্মু আলি বিনতু আবিল ফারাজ: তিনি ছিলেন বিদ্যাবতী ও মহীয়সী নারী। নামকরা কবি। তাঁর অনেক ছন্দ ও কবিতা রয়েছে। সালাহুদ্দিন আইয়ুবির ভতিজা আল-মালিকুল মুজাফফর তকিয়ুদ্দিন উমরের প্রশংসায় তিনি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি ছিল মদ ও মদ্যশালাকে কেন্দ্র করে রচিত। খুব চমৎকার ও সুনিপুণভাবে মদ্যশালার বিবরণ তুলে ধরেন। সুলতান তকিয়ুদ্দিন তা পাঠ করে বলেন, ওই নারী কবি শৈশব থেকেই এগুলোর সঙ্গে পরিচিত। সুলতানের এ মন্তব্য শুনে তিনি যুদ্ধ সংক্রান্ত একটি কবিতা রচনা করেন। যুদ্ধের যাবতীয় বিবরণ তাতে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে তা সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দেন। এও বলেন যে, মদ্যশালার বিবরণ যেমন আমার জানা, তেমনি যুদ্ধের সকল বিবরণও আমার নখদর্পণে। তিনি ৫০৫ হিজরিতে দামিশকে জন্মগ্রহণ করেন। আর ৫৭৭ হিজরিতে মারা যান।<sup>[২]</sup>

## ❖ চিকিৎসা-সেবা

মুগান্নাম বলেন, আধুনিক যুগে রেডক্রস সংস্থা যে রকম সেবা দিয়ে থাকে, ইসলামের সূর্যযুগে ঠিক সে রকম সেবা দিতেন মুসলিম নারীরা।<sup>[৩]</sup> বর্ণিত আছে, বিখ্যাত নারী সাহাবি উমাইয়া বিনতু কাইস গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, গিফার গোত্রের কিছু নারীর সঙ্গে আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলাম। এরপর আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরাও আপনার সঙ্গে এ দিকে যেতে চাই। (নবিজি তখন খায়বার অভিযানে বের হচ্ছিলেন)। আমরা যুদ্ধে হতাহতদের চিকিৎসা-সেবা দিতে চাই। সাধ্যমতো সহযোগিতা করতে চাই। নবিজি বললেন, আলা বারাকাতিল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহর বরকত সাথে নিয়ে চলো)! রবি বিনতু মুআওওয়ায বলেন, আমরা আল্লাহর

[১] আল মাকাররি: নাফহত তীব পৃ ১০৭৮।

[২] পৃষ্ঠা নম্বর ৩ আলিফ - বা।

[৩] The Arab women p. ২৫।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধে যেতাম। যোদ্ধাদের পানি দিতাম। তাদের সেবা করতাম। আহতদের গুশ্রাবা করতাম। হতাহতদের মদিনায় নিয়ে আসতাম।<sup>[১]</sup>

তা ছাড়া চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠা অনেক মুসলিম নারীর নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ইবনু আবি উসাইবিয়া তাঁর রচিত তাবাকাতুল আতিব্বা গ্রন্থে এমন কিছু নারী চিকিৎসকের বৃত্তান্ত উল্লেখ করেছেন। তেমনি কিফতি রচিত তারিখুল হকামা গ্রন্থে এবং লিসানুদ্দিন ইবনুল খতিব রচিত আল-ইহাতা গ্রন্থে এ রকম অনেক নারী চিকিৎসকের আলোচনা করা হয়েছে। নিচে এ রকম কয়েকজন নারী চিকিৎসকের নাম উল্লেখ করছি:

» **যায়নাব:** তিনি ছিলেন আওয়াদ গোত্রের বিখ্যাত চিকিৎসক। চিকিৎসা বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। অপারেশনে তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ। ছিলেন চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ। আরবের সবাই তাকে এক নামে চিনত। জামাদ ইবনু ইসহাক তার পিতা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন: তার দাদা বলেন, একবার আমি চক্ষুপ্রদাহে আক্রান্ত হই। চিকিৎসার জন্য আওয়াদ গোত্রের এক নারী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হই। তিনি আমার চোখ দেখলেন। চোখে ওষুধ দিয়ে বললেন, আপনি কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন। যেন ওষুধ আপনার চোখের ভেতর ছড়িয়ে যেতে পারে। এরপর আমি শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে একটি কবিতা পাঠ করলাম। কবিতাটি শুনে তিনি মুচকি হেসে বললেন, আপনি জানেন কাকে উদ্দেশ্য করে কবিতাটি লেখা? আমি বললাম, না, জানি না। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমাকে উদ্দেশ্য করে লেখা। ওই কবিতায় যায়নাব বলে আমাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আমিই আওয়াদ গোত্রের ডাক্তার। আপনি জানেন কবিতাটি কে রচনা করেছে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আপনার চাচা আবু সিমাক আসাদী।<sup>[২]</sup>

» **উম্মুল হাসান:** তিনি হলেন বিচারক আবু জাফর তানজালির কন্যা। তিনি ছিলেন বিদ্যাবতী নারী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় পারদর্শী ছিলেন। পাশাপাশি ছিলেন নামকরা ডাক্তার। চিকিৎসাবিদ্যায় তিনি বেশি পরিচিতি লাভ করেন।<sup>[৩]</sup>

» **হাফিদ বিন যাহরের বোন ও তাঁর কন্যা:** তাঁরা উভয়ে চিকিৎসাবিদ্যায়

[১] ইবনু হাজার: আল ইসাবা ৪: ৫৭৫।

[২] ইবনু আবি উসাইবিয়া ১: ১২৩।

[৩] লিসানুদ্দিন ইবনুল খতিব: আল ইহাতা ১: ২৬৫-২৬৬।



যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। বিশেষ করে গাইনী ও প্রসূতি বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা ছিল বেশি। তাঁরা খলিফা মনসুরের প্রাসাদে অভিজাত নারীদের চেকাপ করতেন। খলিফা মনসুরের পরিবারে কেউ অসুস্থ হলে এ দুজন ছাড়া অন্য কাউকে চিকিৎসা করার অনুমতি দেওয়া হতো না।<sup>[১]</sup>

### ❁ যুদ্ধে অংশগ্রহণ

ইসলামে অনেক বীরঙ্গনা নারীর জন্ম হয়েছে, যারা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। উহুদের যুদ্ধে যাইদ বিন আসিমের স্ত্রী নুসাইবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যুদ্ধের শেষদিকে কুরাইশ বাহিনী যখন মুসলিম সেনাদের ওপর অতর্কিত হামলা করে, তখন নুসাইবা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবিজির পাশে ছিলেন। তিনি একাই যুদ্ধ করে এগারো জনকে আহত করেন। সেদিন তাঁদের অসামান্য বীরত্বের কারণেই কুরাইশ বাহিনী খুব বেশি সামনে এগোতে সক্ষম হয়নি।<sup>[২]</sup>

ইয়ারমুক যুদ্ধের দিন মুসলিম নারী যোদ্ধাগণ শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। হিন্দ বিনতু উতবা ঘোষণা করছিলেন, তোমরা তোমাদের তরবারিগুলো দিয়ে পুরুষদের কেটে ফেলো।<sup>[৩]</sup> আবু সুফিয়ানের কন্যা জুওয়াইরিয়া তাঁর স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন।<sup>[৪]</sup>

সিফফিনের যুদ্ধে একটি লাল উটের ওপর চড়ে যারকা বিনতু আদী হামাদানিয়া যোদ্ধাদের উজ্জীবিত করছিলেন। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর্থকদেরকে যুদ্ধে উদ্বীপ্ত করতে বলছিলেন, হে লোকসকল, সূর্যের উপস্থিতিতে কোনো বাতি জ্বলতে পারে না। চাঁদের উপস্থিতিতে কোনো তারকা আলো দিতে পারে না। আজ এক লোহা অপর লোহাকে কেটে ফেলবে...। তোমরা সম্মুখপানে এগিয়ে চলো। মনোবল না হারিয়ে, পিছু না হটে তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও।

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ শাসনামলে একবার যারকাকে ডাকলেন। উপস্থিত হওয়ার পর মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, হে যারকা, আল্লাহর শপথ! আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর যত রক্ত ঝরেছে, সবগুলোতে তুমি তাঁর সঙ্গে ছিলে। যারকা বললেন, মহান আল্লাহ আপনার সুধারণা কবুল করুন। মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি কি এতে খুশি? যারকা বললেন, হ্যাঁ

[১] ইবনু আবি উসাইবিয়া ২: ৭০।

[২] Mugannam. The Arab Women p. ২৫।

[৩] বালাযুরি: ফুতুহুল বুলদান পৃ ১৪১।

[৪] তাবারী: ২১০০-২১০১।

জাহাঙ্গীর শপথ! এরপর মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হেসে বললেন, জাহাঙ্গীর শপথ! তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি তোমাদের ভালোবাসা যতটা বিশ্বাস্যকর, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি তোমাদের আনুগত্য এরচেয়েও বিশ্বাস্যকর। এরপর তাঁর কোনো প্রয়োজন আছে কি না, জিজ্ঞেস করেন মুআবিয়া। উত্তরে যারকা বলেন, হে অমিরুল মুমিনিন! আমি নিজের ওপর শপথ করেছি—জীবনে কখনো শাসকের কাছে কিছু চাইব না। কোনো শাসকের সাহায্য গ্রহণ করব না।<sup>[১]</sup>

একই যুদ্ধে রণসাজে সজ্জিত হয়ে শামবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন ইকরিশা বিনতুল আতরাশ। লড়াই চালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করছিলেন সহযোদ্ধাদের।<sup>[২]</sup>

১৩৯ হিজরিতে রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেন সালিহ বিন আলি এবং আব্বা বিন মুহাম্মাদ। যুদ্ধে তাঁরা উভয়ে শত্রুপক্ষের ভেতরে ঢুকে পড়েন। তাঁদের দুই বোন উম্মু সৈসা ও লুবাবাও তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।<sup>[৩]</sup>

## ✽ নারীদের আরও কিছু অবদান

ইসলামের নানান অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন মুসলিম নারীগণ। নানা জ্ঞানে পারদর্শী হওয়ায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নানা পদে তারা নিয়োগ পান। গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পদে আসন লাভ করেন। নীতিনির্ধারণী বিভিন্ন পদে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

রাষ্ট্রের নানা বিষয় পরিচালনায় খলিফা মাহদীর স্ত্রী খিযরানের ভূমিকা ছিল অনন্য। স্বামী মাহদী, দুই পুত্র হাদী ও রশিদের শাসনামলে তিনি অনেক রাষ্ট্রীয় বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতেন। নিজ শাসনামলের সূচনাপর্বে হাদী তাঁর মায়ের আদেশ আমলে নিতেন। মানুষের কল্যাণে মাতা যা চাইতেন, হাদী তা বাস্তবায়ন করতেন। সবসময় তাঁর দরজায় প্রার্থীদের ভিড় লেগে থাকত। একবার তিনি হাদীকে কোনো একটি কাজের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু তাতে সাড়া পেলেন না। এর ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, অবশ্যই আমার প্রস্তাব মানতে হবে। এটাকে কেন্দ্র করে মা-ছেলের মাঝে দূরত্ব বাড়তে থাকে। বলা হয়, এরপর তিনি হাদী থেকে হাত গুটিয়ে নেন। পরবর্তী খলিফা রশিদের শাসনামলে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব উদ্ধারে নিজেকে নতুন করে তৈরি করার প্রতি মনোযোগ দেন।<sup>[৪]</sup>

[১] ইবনু আবি রাব্বাহি: আল ইকদুল ফারিদ ১: ২১৩।

[২] প্রাগুক্ত ১: ২১৫।

[৩] ইবনুল আসির ৫: ৩৭২।

[৪] আল মাসউদি: মুরাওভিযুয যাহাব ২: ২৫৫।



খিরযানের মেজাজ ছিল চড়া। তবে রশিদের স্ত্রী যুবাইদাহ'র মেজাজ ছিল নরম। নীরবে ও বুদ্ধি দিয়ে নানা রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপ করতেন। বর্ণিত আছে, একজন তুখোড় রাজনীতিক যেমন রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করেন, তিনিও নানা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।<sup>[১]</sup>

তবে রাজনীতির চেয়ে সামাজিক কল্যাণ সাধনে যুবাইদাহ'র আগ্রহ ছিল বেশি। মাসউদি বলেন, খলিফা রশিদের জমানায় সবচেয়ে বেশি সেবার কাজ করেছেন মানসুরের কন্যা উম্মু জাফর। তিনিই মক্কায় মুসাফিরখানা নির্মাণ এবং সে জন্য কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। তা ছাড়া শাম ও তারসুসের সড়কেও পথিকদের জন্য অনেক মুসাফিরখানা নির্মাণ করেন। সেগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নানা ওয়াকফ প্রকল্প চালু করেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি হলো, হিজায়ে নির্মিত আল-মাশাশ নহর। ঘটনা হলো, ১৮৬ হিজরিতে তিনি যখন হজে গমন করেন, তখন সুপেয় পানির জন্য মক্কাবাসীর দুর্দশার চিত্র নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাজকোষের প্রধানকে ডাকেন। এরপর প্রকৌশলী ও শ্রমিকদের ডেকে দীর্ঘ বারো কিলোমিটার উঁচু-নিচু জায়গা কেটে মক্কা নগরী পর্যন্ত একটি নহর খনন করার নির্দেশ দেন। যেন সুপেয় পানির জন্য মক্কাবাসীকে আর কষ্ট করতে না হয়। এ নির্দেশ পেয়ে রাজকোষের প্রধান দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যান। কারণ, এর জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন ছিল। যুবাইদা তার দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিষয়টি আঁচ করতে পেরে তাকে সাহস দিয়ে বলেন, এর জন্য যদি অর্থ-তহবিলের মুদ্রাগুলোতে কুঠার দিয়ে আঘাত করতে হয়, তারপরও তুমি এ কাজ শুরু করবে। প্রকল্প নির্মাণের কাজ শুরু হয়। যথাসময়ে শেষও হয়। প্রকল্পটি আজ পর্যন্ত সুনামে টিকে আছে। সে সময় তা নির্মাণ করতে খরচ হয়েছিল সতেরো লাখ দিনার।<sup>[২]</sup>

স্পেনের কর্ডোভায় মহীয়সী লুবানা যে উচ্চ রাষ্ট্রীয় পদে বহাল ছিলেন, ইতিহাসে খুব কম নারীই এ পদ লাভ করতে পেরেছে। তিনি ছিলেন খলিফা হাকামের বিশেষ সচিব।<sup>[৩]</sup>

একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা উল্লেখ করে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানে নারীদের বিচরণ সংক্রান্ত আলোচনার ইতি টানতে চাই। কালের পরিক্রমায় হয়তো কিছুটা রঙচঙ তাতে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু তাতে তার জৌলুস একটুও কমেনি।

একবার খলিফা রশিদের সামনে এক সুন্দরী দাসী উপস্থাপন করা হয়। তার

[১] নাখলা আল মুদাওওর: হাদারাতুল ইসলাম ফি দারিস সালাম পৃ ৯৭।

[২] মুরাওভিজুয যাহাব ২: ৫১৬।

[৩] Khuda Bukhsh: Islamic Civilization p. ২৯৫।

মূল্য চাওয়া হয় দশ হাজার দিনার। তার অগাধ পাণ্ডিত্য, অসামান্য পারদর্শীতা এবং নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞতার কারণেই এত দর। খলিফা রশিদ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে দাসীকে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন। যুক্তিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, তাফসির, চিকিৎসা-শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, সাহিত্য ও ক্রীড়াবিদ্যায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের দরবারে ডাকেন। সবাই দাসীকে একে একে পরীক্ষা করতে থাকেন। মেধাবী দাসী কেবল তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং প্রতিবার পরীক্ষকের দিকে একটি করে প্রশ্ন ছুড়ে দেন। কোনো পরীক্ষকই সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হননি। এই বিদুষী নারীর দুর্লভ প্রতিভা ও অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে কাঙ্ক্ষিত দামেই তাকে খরিদ করে নেন খলিফা রশিদ। এখানে আমরা বলতে চাই যে, ইসলামের স্বর্ণযুগে দাসীদের ক্রয়-বিক্রয় কেবল দাসত্ব ও প্রভুত্বের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং অনেক দাসী নিজেদেরকে জ্ঞানে-গুণে সমৃদ্ধ করতেন। যেন অভিজাত ব্যক্তিবর্গ ও শাসকগণ তাকে উচ্চমূল্যে ক্রয় করে নেন। আর রাজপ্রাসাদের সীমাহীন আরাম-আয়েশে আভিজাত্য ও সুখের জীবন তারা লাভ করেন।<sup>[১]</sup>

[১] জামিল নাখলা: হাদারাতুল ইসলাম ফি দারিস সালাম পৃ ৯৮।